বাংলার ছোটগল্প

বাংলার ছোটগল্প

দশম খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

BANGLAR CHHOTO GALPA
Collection of Bengali Short Stories
10th Volume
Edited by
Dr Bijit Ghosh

Price Rs 100/-

প্রচ্ছদ ঃ সুনীল শীল

ISBN 81-7332-382-2

দাম ঃ ১০০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন
ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি,

....

বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাই নি।।
আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাই নি।।

....

গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখ সুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান তো গাই নি।।'

প্রিয় বন্ধু
অমর পাল-কে

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ দশম খণ্ড

দশম খণ্ডে নির্বাচিত গল্পের সংখ্যা ৪২। অনিল ঘোষে শুরু করে থেমেছি সুকান্তি দত্তের গল্পে এসে।

পূর্ববর্তী ন'টি খণ্ডেই লেখকদের স্থান তথা সূচীপত্র নির্মাণ করেছি তাদের জন্মসনের ক্রম মেনেই। মোট দশটি খণ্ডের মধ্যে কেবলমাত্র এই শেষ খণ্ডটিতে লেখকদের সূচীপত্রে স্থান দিয়েছে তাঁদের নামের (বর্ণনানুক্রমিক) আদ্যক্ষর দিয়ে।

তার কারণ একটিই। এই ৪২জন লেখকের মধ্যে প্রয়াতদের জন্মসন খুঁজে পাইনি। এ-ব্যাপারে পাঠকদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। তা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সকৃতজ্ঞচিত্তে গৃহীত হবে।

আর এই খণ্ডের জীবিত লেখকদের জন্মসনসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি চেয়ে পত্র পাঠিয়েও কোনো উত্তর পাইনি। হয়তো কারো-কারো ঠিকানা বদল হয়েছে, কিন্তু সকলেরই? এই খণ্ডের লেখকদের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে সহযোগিতা প্রার্থনা করছি, পুনরায়। তাঁদের সহযোগিতা পেলে, এই শেষতম খণ্ডের লেখকদের সূচীপত্রটিও তাঁদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে না করে বাকি ন'টি খণ্ডের মতো জন্মসন ধরে করতে পারবো (পরবর্তী সংস্করণে)।
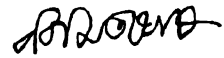
পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের **কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা**। সেখানে আছে বাংলা **গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প; ছোটগল্পের আবির্ভাব** ঃ তার **জন্ম ও উৎস** সন্ধান, **সংজ্ঞা** ইত্যাদি বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা। আছে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি সমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তরে ভেঙে পড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি; **দেশভাগ, খণ্ডিত-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু স্রোত**; সেই মহা-প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট অন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা তথা **'গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং'** আর ঠিক তার পরই **তেভাগা আন্দোলন**; পরবর্তীকালে **'নকশাল আন্দোলন', 'জরুরী অবস্থা'**, বার বার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, — এ-সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ। তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন (**'কল্লোল', 'শ্রুতি', 'হাংরি জেনারেশন', 'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন,' 'এই দশক', 'নিম সাহিত্য-আন্দোলন', 'নতুন রীতির গল্প আন্দোলন'** ইত্যাদি); লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বের কথা, সর্বোপরি পাঠকের কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

(ড. বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

ধর্মযুদ্ধ

অনিল ঘোষ

ধর্মে করি বাস
অধর্মে সর্বনাশ

পরপর তিন সন্তান। তিনটিই ছেলে। হরিনাথ ওদের নাম রেখেছিল যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন; কলিকালে ওর বুঝি পঞ্চপাণ্ডবের বাপ হওয়ার শখ জেগেছিল। জাগতেই পারে। কথায় আছে, শখ জাগলে সুখ হয়। হরিনাথের সুখের কথা থাক, তবে কলিকালে এ শখও দেখার মত। কিন্তু হরিনাথের বৌটা বড় বেয়াড়া। স্বামীর মন বুঝল না। তিন ছেলের পর তিন মেয়ে বিয়োল। সেই লজ্জা ঢাকতে বুঝি নিজেও চোখ ঢাকল, আর ছাই পড়ল হরিনাথের আশায়।

ছাই অনেক আশাতেই পড়েছিল, মেয়েগুলো তবু যাহোক খসে গিয়েছিল এক একজনের হাত ধরে। ওরা করিতকর্মা। বাপের দুঃখ ঠিক বুঝেছিল। স্বস্তি পেয়েছিল হরিনাথ। মেয়েদের এসব দোষঘাট ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। ওর চিন্তা ছেলেদের নিয়ে। ছেলে তো নয়, এক-একটা রত্ন। বড় যুধিষ্ঠির বা যদু, মাতাল লম্পট জুয়াড়ি। শোনা যায় নেশার টানে বাপের গলা টিপতেও কসুর করত না। করেনি ভীমে-র লাঠির ভয়ে। ভীমে পাকা লাঠিয়াল। নামডাক আছে এ দিগরে। লোকে বলে, লাঠি কথা বলে ভীমের হাতে। চেহারা স্বভাবে ভীষণ ভীমকে ভয় খায় যদু। ছোট অর্জুন। কোনো সাতে-পাঁচে নেই। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ওর নেশা। কাজের মধ্যে কাজ মদন কীর্তনিয়ার দলে খোল বাজায়। খোলে হাত মন্দ না। সে শিল্পী মানুষ, সম্মানীও বটে।

তিন ছেলে তিন অবতার। কলিকালে এমনটা বড় দেখা যায় না। তবু লোকে বলতে ছাড়ে না, হরিনাথের মনে বড়ই দুঃখ। ছেলেরা কেউ ওর হাত ধরা হলো না, দুঃখও বুঝল না।

হরিনাথ ভীরু মানুষ। পেশায় শিউলি। লোকে বলে, হরিনাথের হাতে জিরেন রস নলেন বাস যেমন খোলে, তেমনটা যদি মগজ খুলত তবে ভাবনা ছিল না।

ইছামতী তীরে এক লপ্তে একবিঘে খেজুর বাগান। করবাবুদের কর্তার আমলে হরিনাথ জমা নিয়েছিল ফল-ফসলের একভাগ বিনিময়ে। মুখে মুখে দেওয়া। সে আজ কতকালের কথা। বলতে গেলে বাগানটা একরকম হরিনাথেরই হয়ে গেছে। তারপর ইছামতী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেল। এখন হরিনাথ ভোগ দখল করলে কে আর বাধা দেয়! বাধা কেউ দেয়নি। বাধা সে নিজেই। হরিনাথ অধর্ম করতে চায়নি, ওতে ওর ভয়। বছর বছর ফল-ফসলের ভাগ ঠিকই দিয়ে এসেছে করবাড়ি। আর মনে মনে আশা করেছে, করবাবুরা বাগানটা ওকে ছেড়ে দেবে। কর্তার মুখের কথা কি তাঁর নাতিপুতিরা ফেলবে! লোকে তবু কতবার বলেছে, বোকামী করিস নে হরিনাথ। এখন সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই, কাগজ-পত্তর ঠিক রাখ্।

হরিনাথ কানে তোলেনি। না তুলে পস্তিয়েছে। কর্তা ছিলেন একরকম। তাঁর নাতিপুতিরা অন্য ধারার মানুষ। তাদের সে জৌলুস আর নেই। এখন শত শাখা-প্রশাখায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। এক এক শাখা এক এক-দিকে ছিটকে গেছে। বাকি যে আছে, সব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইটভাটায়।

ইছামতীর তীর ঘেঁষে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে যাচ্ছে ইটভাটা। দেখবার মতো পাড়ের কোনো জমিই বোধহয় ফাঁকা নেই। হাজামজা পতিত জমিও সোনার চেয়ে দামি। ইছামতীর পলির ইট নাকি খুব মজবুত। দামও আছে, নামও। কর্তাবাবুর নাতি মানিক করের নজর স্বভাবতই খেজুর বাগানের উপর পড়বে আশ্চর্য কি। বাগানটা পেলে ভাটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বাড়ে, সুবিধেও হয়। হরিনাথকে মানিক কর তাই মিষ্টি কথায় বোঝাতে বসে, বুইলে হরিদা, বাগানটা তুমি ছেড়ে দাও। বলতে গেলে বাগানটা এখনও আমাদের। তবু যা লাগে দেবো, তোমার লোকসান করব না।

হরিনাথ আকাশ থেকে পড়ে। এতদিন পরে এ কি কথা! এ কথা শোনার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। মাথায় বাজ ভেঙে পড়ার মতো ব্যাপার। মুখে বলে, তা কি করে হয়!

মানিক কর খুব ধৈর্যের সঙ্গে বোঝাতে থাকে, দ্যাখো আইনে তুমি পারবে না। সে জোর তোমার নেই। তাই বলি, আমি অধর্ম করব না। ভালো টাকাই দোবো।

কথায় আছে, আশা করলেই আশাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হরিনাথ মনে মনে খুবই দুঃখ পায়। এতদিন ধর্মপথে থাকার এই পরিণাম! হরিনাথ প্রাণে ধরে বাগানটা ছাড়তে পারেনি।

ওদিকে মানিক করও ছাড়বে না। সে যেন ছিনে জোঁক। এই নিয়ে টানাটানি চলে বেশ ক' বছর। টাকা নিয়ে, ভাটায় কাজ দেবার লোভ দেখিয়ে, আইনের মার প্যাঁচ করে এগোতে চেয়েছিল। এতে হ্যাপা অনেক, সময়েরও ব্যাপার। অথচ এর বেশি কিছু করার চেষ্টা করেনি মানিক কর। সে সাহসও হয়নি। দিনকাল খারাপ।

লোকে বলে, হরিনাথ — তখন কথা শুনলি না, হাতের পাঁচ ছাড়লি। এখন পস্তিয়ে কি হবে!

শোনা যায়, এরপর থেকে হরিনাথের মাথায় অদ্ভুত এক পাগলামী ভর করেছিল। দিনরাত সে বাগান পাহারা দিত। ভীমকে বলত, লাঠিটা নে আয় দিনি, বাগানে শকুন নেগেছে —

দিনরাত মুখে এই কথা থাকলে কোন্ মানুষ সুস্থ থাকতে পারে। হরিনাথ পাগলই হয়ে গেল। শোনা যায়, মরণকালে বুঝি ওর মতি ফিরেছিল। ভীমের হাত ধরে খাবি খেতে খেতে বলেছিল, বাগানডারে দেকিস,........ ছাড়িস নে—

লোকে বলে, হরিনাথ এ কথা বলেনি। এসব আসল ভীমের গপ্পো কথা। ভাইদের ফাঁকি দেবার মতলব।

।। ২ ।।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
চিরকালের কথা তাই।

চিরকালের কথাকে নতুন কি প্রমাণ করবে হরিনাথের সংসার! সংসার বড় বিচিত্র। উপরের ছায়া সরে গেলে নীচের বাঁধন আলগা হয়। তখন বলে, বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। মরণকালে হরিনাথের কি-ই বা ছিল! ভিটেটুকু আর বাগানটা। নেশাখোর যদু বলে বসল, তাই ভাগ হোক।

বেঁকে বসল ভীম। লোকে বলে, ভীমেই সব গ্রাস করতে চেয়েছিল। লোকের কথা থাক। যারা জানে এমনই জানে, ভীমের দেহখানা যেমন বিশাল, হৃদয়খানাও তেমনই চওড়া। ভাই-বোন অন্ত প্রাণ। দাদার প্রতি ভক্তি নাকি এমন, গোটা রামায়ণেও কুলোত না। দাদার কথায় ভীমে দুঃখ পেয়েছিল। ওর হুমদো মাথার গোবদা শরীরে বাবার শেষ কথা গুরুভারের মতো চেপে বসেছিল, আর বেরোবার পথ পায়নি। পিতৃঋণ বড় ঋণ। তাই সে ভেবেছিল, পৃথকান্ন কেন হবে? সবে মিলি করি কাজ......, যা আছে খড়কুটো তা ভাঙিয়ে খেলেই চলে যাবে। লোকবল বড় বল। সবে মিলে এক হলে ঠেকায় কে! কাজে ভীমে পেছপা নয়।

মগজে ঘিলু না থাক, গাধার মতো খাটতে পারে। বাপের মতো না হলেও শিউলিগিরি পারে মন্দ না। সকলে মিলে বাগানটা দেখলে ক্ষতি কি।

দাদার এ হেন কথায় ভীমের মাথা গরম হয়ে যায়। এ হলো ভরা বৈশাখের কথা। সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে। বাতাসে তাতের হলকা, মাথা গরমের আব দোষ কি। ভীমে হেঁকে বসে, ভাগ হবে না, সকলার থাককো —

ভীমের কথায় যদু ক্ষুণ্ণ হয়। যদিও মুখে কিছু বলে নি। গুম হয়ে যায়। শোনা যায়, যদু ভীমের উপর এতই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, বাপ মরার দু'মাস পুরতে না পুরতে বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে যায় পানিতর।

হাওয়ায় কথা রটে, ভীমে এভাবেই দাদাকে ফাঁকি দিল, তাড়াল। রটনার কথা থাক। যারা জানে এমনই জানে, যদুকে ফিরিয়ে আনার কম চেষ্টা করেনি ভীমে। দাদার পা দু'খানা জড়িয়ে খুব কেঁদেছিল, ক্যানো তুমি যাবে? দোষ যদি করি দু'ঘা মারো, ঘর ছাড়বা ক্যানো?

ভাইয়ের কান্নায় পাথর গলে তো দাদা গলেনি। পা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল। শোনা যায় পানিতর গিয়ে নাকি বাংলাদেশে মাল পাচারেব কাজ ধরেছে যদু। লোকে বলে, ওর নাম যদু, শয়তানীতে জুড়ি মেলা ভার। যাবার সময় শাসিয়ে গেছে, ভিটে-বাগান ভীমে কি করে রাকে দ্যাকপো!

যে যেখানে যাক, সুখে থাক — এমন ভাবাই তো ভালো। অথচ দাদার বিরহে নাকি ভীমের মন পুড়ত, বুক ফাটত। দুঃখ এতটাই তীব্র হয়েছিল, দুদিন নাকি জলস্পর্শ করেনি। গোলাদানার চরে গিয়ে একা একা লাঠি ঘুরিয়েছে। ওতে নাকি মন শান্ত হয়!

লাঠিতে মন শান্ত হয় কিনা কেউ জানে না, তবে ভীমের লাঠি চোখ চেয়ে দেখার মতো। পাঁচ হাত লম্বা। সরু বাঁশের লাঠি। তেলে জলে পাকানো। শোনা কথা, এ লাঠি নাকি তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার বাঁশে তৈরি। পুরুষের পর পুরুষ ধরে লাঠিয়ালদের হাতে হাতে ঘুরছে। পুঁড়োর বড় লাঠিয়াল মজনু শেখের এক নম্বর স্যাঙাৎ হওয়ার সুবাদে এ লাঠি পেয়েছিল ভীমে। মজনু বলেছিল, নাম রাকিস —

লাঠির মান বড় মান। এক সময় এ দিগর শাসন করত। কথায় আছে, টাকীর লাঠি, সাতক্ষীরের মাটি আর গোবরডাঙ্গার হাতি — এই তিনে নেই ফাঁকি। এখন সে দিনকাল নেই বটে, তবে টানটা রয়ে গেছে বুকের রক্তে, শিরা-উপশিরায়। লাঠি খেলার চল তো ফুরিয়ে যায়নি। সেখানে ভীমে এক নম্বর। এ লাঠি কথা বলে, মন শান্ত করে।

দুদিন বাদে মনটা খানিক শান্ত হলে ভীমে অর্জুনকে ডাকে। বিষণ্ণ গলায় বলে, কি করব?

অর্জুন পড়ে ফাঁপরে। সে সাংসারিক ব্যাপারে থাকতে চায় না। শিল্পী মানুষ গান-বাজনা নিয়ে আছে। রোগা পাতলা শরীর। মিহি-মিহি গলা। বয়েস হতে চলল পঁচিশ পার। এখনও ছাদনাতলায় যাওয়ার নাম নেই। ভীমের বৌ তো বোনটাকে ওর গলায় ঝোলাবার জন্যে ঝুলোঝুলি করে। পারে না ভীমের চোখ রাঙানির ভয়ে। ভীমের একরোখা জবাব, ঐ মেয়ে, একা রামে রক্ষা নেই আবার সুগ্রীব দোসর। ভীমের বৌটার গলা একটু বেয়াড়া। কাটা টিনের মতো খনখনে। গলা ছাড়লে কাক-চিলও বসার সাহস পায় না ঘরের চালে। তার খ্যাঁদা বোঁচা বোনটা এলে তো সাড়ে সর্বনাশ। শিল্পী ভাইয়ের জীবন ছারখার হয়ে যাবে। অথচ লোক এতেও গন্ধ পায়। কথা রটায়, এ হলো ছোট ভাইকে তাড়াবার মতলব, নইলে শালীর সঙ্গে বিয়ে দিতে এত আপত্তি কেন?

অর্জুন এসব কানে তোলে না। উদাসী বৈরাগী মানুষ হলে যা হয়। তবে দাদার খুব ন্যাওটা। তাই ভীমের 'কি করব' কথায় অর্জুন মিহিন গলায় বলে, আমি কি জানি। তুমি যা ভালো বুঝবে —

লোকে বলে, অর্জুন তুইও ঠকলি, ভীমের মতলব বুঝলি না। তোর দাদা যদু কিন্তু এত অল্পে ছাড়েনি।

।।৩।।

শকুন বসে ডালে
শিকার পড়ে জালে।

কথায় আছে, হোঁচট খেয়েছো কি মরেছো। কিন্তু ভীমেকে সামলায় কে? সে যেন হোঁচট খাওয়ার জন্যই চলেছে। লোকে কত বুঝিয়েছে, বাপ তো ধর্ম দেখিয়ে গেল, কি পেল। লবডঙ্কা। তবে আর কেন? বিষয় রাখতে গেলে বুদ্ধি খরচ করতে হয়। চোরা না শোনে ধর্মের বাণী। ও জানে লাঠির মান। মান থাকলেই ইমান থাকে। সেই ইমানে বাগান রাখতে গেল ভীমে। গিয়ে পড়ল করবাবুদের নতুন ভাটা ম্যানেজার আবুরাজের সামনে।

মানিক কর নেই। তার ছেলে দেবদাস কর নতুন মালিক। নতুন মালিকের নতুন ম্যানেজার। রতনে রতন। সে কি চাল চেলেছে কে জানে! আবুরাজ খিকখিকিয়ে বলে, রও, বাগানে ঢোকপা পরে —

শুনে রক্ত গরম হয়ে যায় ভীমের। এ হলো অগ্রহায়ণ মাসের কথা। বাতাসে কেমন জ্বরো ভাব সব সময়। বেলা এখনই ছোট, দেখতে না দেখতে ঢলে যায়। সময়টা বড় ব্যস্ততার। ভীমের নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। প্রায় শতখানেক গাছ ঝোড়া, নলী বসানো সোজা কথা নয়। তবে বড় ছেলে ঘনা হাত ধরা হয়েছে বলে বাঁচোয়া। ঘনা ইটিণ্ডার ইটভাটায়ে ইট কাটে। এবার নাকি খুব গোলমাল চলছে। সব ভাটা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। মজুরি নিয়ে মালিক-ইউনিয়নে গোলমাল। ঘনা বোঝাতে বসে বাপকে, কুনো পক্ষই কতা শোনবে না। ওদিকে মালিকপক্ষ কতা চালাবার ফাঁকে ওপার থে লোক আনিয়ে কাজে লাগাচ্ছে। ইউনিন শালা তলে তলে ট্যাকা খাচ্ছে। মধ্যে পড়ে আঙুল চুষতিছি আমরা।

ভীমের মাথায় এসব কথা ঢোকে না। সে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়ে বলে, দরকার কি ও কাজে যাবার! বাগানডা ন্যে লাগি আয় —

বাপ ছেলের কথার মধ্যে আবুরাজের এভাবে ঢুকে পড়াটা ভালো লাগেনি ভীমের। লোকটাকে দেখলেই ওর রাগ হয়। আবুরাজ কথার আগে হাসে। হাসিটা অদ্ভুত। শব্দের আগে ক্ষয়া-ক্ষয়া দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে নিঃশব্দে। খানিক পরে খিক্-খিক্ আওয়াজ শোনা যায়। হাসি দেখলে ভীমের গা জ্বলে। এই আবুরাজ ওর পিছনে কম লাগেনি। গোটা বর্ষা জুড়ে সমানে লোক-লোভানি দেখিয়েছে, ট্যাকা দিচ্ছি, ভাটায় কাজ দিচ্ছি — ভাটায় কাজ পাওয়া এখন মুখের কতা না, বাগানডা ছেড়ি দে বুইলি —

হেঁকে তাড়িয়েছিল ভীমে। তাই আবুরাজকে অমন হাসতে দেখে লাঠিটা শক্ত হাতে ধরে ভীমে। বলে, ক্যানে?

আবুরাজ আবার হাসে, তোরে ছোটবাবু ডাকতেছে।

— ছোটবাবু! ভীমে ঠিক বুঝতে পারে না।

— মানিকবাবুর ছেলে ছোটবাবু, আগে চল্ —

শোনা যায়, এই যাওয়াই কাল হয়েছিল ভীমের। ওর মাথা এমনিতে গরম ছিল, রক্ত ফুটছিল টগ্‌বগ্ করে। ও জানত বাগান নিয়ে করদের মুখোমুখি একদিন হতেই হবে। সেইদিন কি এলো! তবে এসপার কি ওসপার। গরম ভীমে হাতের লাঠিটা ঠক্ করে রেখেছিল অফিস ঘরের মেঝেতে। সামনে বসা অর্জুনের বয়সী ছেলেটা সেই শব্দেও চোখ তুলে তাকায় না। ভীমের মাথা আরও গরম হয়। গলায় স্বরে সেটা প্রকাশ পেয়েছিল, কি বলতেছো আঁ?

দেবদাস আস্তে আস্তে মাথা তুলল। শান্ত নির্লিপ্ত মুখ। সামান্য হেসে বলল, এত রেগে আছো কেন ভীমেদা, বসো — বসো দরকার আছে।

ভীমের রাগ যায়নি, বসপ না আমার কাজ আছে; কি বলবা বলো —

— তোমার ঐ বাগানটা —

—ওতো আমি ছাড়ব না আগেও বলেছি।

দেবদাস এবার শব্দ করেই হেসে ওঠে, তুমি ছাড়বে না বলেছো, কিন্তু বাগান তোমার একার নয়। তোমার দাদা তো ছেড়ে বসে আছে। এই দ্যাখো কাগজে সই দিয়ে পাঁচশো টাকা নিয়ে গেছে।

ভীমে চমকে ওঠে। চোখের সামনে নীলচে কাগজ দুলছে। অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। মনে তবু সন্দেহ যায় না। অস্ফুটে বলে, দাদা।

আবুরাজ এবার খিকখিকিয়ে হাসে, হ্যাঁ গো তুমার দাদা, ধম্মপুত্তুর যুধিষ্টির। এবার ভেবি দ্যাক কি করবি?

ভীমে রাগে দুঃখে ঘেন্নায় অন্ধ হয়েছিল। কার উপর রাগ করবে ঠিক করতে পারছিল না। দাদা না দেবদাসের উপর। মাথা ওর ঠিক ছিল না। লাঠি হাতে সে ছিটকে আসে বাইরে। গলায় ওর লাঠিয়ালের গা হিম করা হাঁকাড়, ওসব বুজরুকি বুঝিনে, আমার বাগানে যে পা দেবে তার মাথা থাকপে না বলে দেলাম —

ভীমের ভীষণ মূর্তি দেখে, শোনা যায়, আবুরাজ টেবিলের তলায় লুকিয়েছিল। অথচ দেবদাস ভয় পায়নি। সে হাসতে হাসতে বাইরে আসে। ভীমের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, শুনেছি তুমি খুব বড় লাঠিয়াল, তা হবে নাকি একহাত?

ভীমে গরম মাথায় হাঁক দেয়, কার সাথে?

— কেন আমার সাথে।

অতি রাগেও ভীমের হাসি পেয়ে যায়। হেসে ফেলে আর কি! তার মতো পাকা লাঠিয়ালের সঙ্গে লড়বে দুদিনের ঐ ছোকরা, যে কিনা লাঠি কিভাবে ধরতে হয় জানে না! ভীমের মুখে তাই অবজ্ঞার হাসি ফুটে ওঠে, হ্যা তুমার সাথে!

দেবদাস হাসে, কেন আপত্তি আছে? সামান্য শিখেছিলাম, তা তোমার মতো পাকা লাঠিয়ালের কাছে একটু ঝালিয়ে নিই —

শোনা যায়, এ সময় ভীমের মাথায় দুর্বুদ্ধি ভর করেছিল। ভেবেছিল, এই সুযোগ। মুখে ফুটেছিল তাই ক্রূর হাসি। বলেছিল, লাঠি তো এমনি-এমনি খেলা যায় না, বাজী রাখতে হয়।

দেবদাস বলে, কী বাজী রাখতে চাও?

— আমার বাগানডা।

— ঠিক আছে, তুমি জিতলে একসারি গাছ থাকবে, বাজী?

লোকে বলে, ওটা যে ফাঁদ ভীমে বোঝেনি। ঘুণপোকার মতো সর্বনাশ তখন ওকে বেঁধে ফেলেছে পাকে পাকে। দুর্বুদ্ধি হলে যা হয়। নইলে ছোকরা মানুষের সঙ্গে পাকা লাঠিয়াল লাঠি ধরবে কেন? এই কি লাঠির মান রাখা?

অগ্রহায়ণের বেলা বুঝি যায়। পিঠের রোদ অনেক আগেই পোড়া ইটের মতো লাল হয়ে গেছে। ইছামতীর বুকে কালো ধোঁয়ার মতো জমাট বাঁধা অন্ধকার। ভাটার চত্বরে শুরু হলো লাঠির ঠোকাঠুকি। খট্-খট্-খটাস্ শব্দ। শোনা যায়, ভীমে আসলে মজা পাচ্ছিল। মাছকে যেমন জলে খেলায়, তেমনই খেলাচ্ছিল প্রতিপক্ষকে। এতে নাকি খুব মজা।

অথচ লাঠির নেশা, বড় নেশা। একবার ধরলে খেয়াল থাকে না প্রতিপক্ষ কেমন! রক্তে তখন উদগ্র কামনা। শিরায় শিরায় আগুন ছোটে। বুকে হাঁক দেয়, তিতুমীর, মজনু শেখ। লাঠি কথা বলে, রক্ত চাই — রক্ত চাই—

রক্তের নেশায় লাঠি বুঝি বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যায় দেবদাসের মাথা লক্ষ্য করে। শোনা যায়, এই হলো ভীমের কাল। লাঠির মান সে দিতে জানেনি। নইলে সেই মুহূর্তে পা পিছলে যাবে কেন? মুহূর্তের এই ভুলে প্রতিপক্ষের আঘাত আছড়ে পড়ে হাতের কব্জিতে।

লোকে বলে, পাপ করলে ফল ভুগতেই হয়। ভীমে সব গ্রাস করতে চেয়েছিল ভাইদের ফাঁকি দিয়ে। নইলে যে লাঠি কথা কয়, তা হাতছাড়া হবে কেন।

।। ৪ ।।

বিষয় রাখে বাপে
বিষয় থাকে দাপে।

কথায় আছে, রাজার পাপে রাজ্য যায়, দম্ভে যায় মাটি। একবার নয়, পরপর তিনবার। তিনবারই ভীমের হাত থেকে লাঠি খসে পড়েছে। অদ্ভুতভাবে সে হেরে গিয়েছে। গিয়ে এখন গোলাদানার চরে যায় লাঠি ঘুরিয়ে মন শান্ত করতে। দেহে মনে সে মূহ্যমান। এ হারের কোনো জবাব নেই।

লোকে বলে, দম্ভ। দম্ভ করেছিল ভীমে, তাই প্রতিপক্ষের ওজন বোঝেনি। না বুঝেই সে ফাঁদে পা দিয়েছে। বোকা আর কাকে বলে! গাছ তো গেলই, মানও যে যায় যায়।

লোকের কথা থাক, ভীমে ভাবে নিজের কথা। ওর জীবন-মরণ সমস্যা। কোনোদিকে মন নেই। সমস্ত মন এখন লাঠিতে। তিতুমীরের ছোঁয়া, মজনু শেখের হাতের লাঠি — এর সমস্ত গৌরব যে মুখ থুবড়ে পড়েছে ঐ পুঁচকে ছোঁড়ার কাছে।

দেবদাস যে সে প্রতিপক্ষ নয়। তিনদিনে সেটা পরিষ্কার। মন মানতে চায় না। অথচ তিনবার হারের পর আর চাপা দেয় কি করে! ভীমে বড় শক্ত পাল্লায় পড়েছে। দেখতে ছোকরা, জাতে পাকা লাঠিয়াল। এ কথা আরও পরিষ্কার হয় আবুরাজের খিকখিক হাসি-মাখা কথায়। গতকাল যখন সে হেরে ভূত হয়ে ফিরছে, আবুরাজ তখন কানের কাছে খিকখিকিয়ে শোনায়, তুই কি ভেবেছ্লি ছোটবাবু কাঁচা প্লেয়ার! রীতিমত ট্রেনিং পাওয়া। বাগান তোর গ্যালো র্যা ভীমে, এহনও সোমায় আছে ভেবি দ্যাক —

ভীমে কর্ণপাত করেনি। জয়ের নেশা এমন, এরপর হেরেও সেটা যায় না। জেদ চেপে বসে। জয়ের নেশায় ভীমে উন্মাদ। গোলাদানার ফাঁকা চরে একমনে সে লাঠির প্যাঁচ কষে, কসরত করে। এই কাজে মন এমনই ডুবেছিল, খেয়াল করেনি কখন অর্জুন এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

অর্জুনকে ডেকে এনেছে ভীমের বৌ। ভীমে যেমন খেপে উঠেছে, ওকে রোখে কার সাধ্যি! ভিটেমাটি চাটি হলেও বুঝি থামবে না এই খ্যাপামি। থামাতে যদি পারে প্রাণপ্রিয় ভাই অর্জুন।

অর্জুন মিহিন গলায় ডাকল, দাদা —

ভীমে থমকে যায়। অগ্রহায়ণের শীত বাতাসেও ওর শরীর জুড়ে ঘাম। হাপরের মত চওড়া বুক ওঠানামা করছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতে সে প্রায় সন্ধ্যা নামিয়ে এনেছে চরে।

ভীমে থমকে গিয়ে রেগে ওঠে, এহানে ক্যানো?

— তুমি ঘরে চলো দাদা।

— না, এহন যাবো ভাটায়।

অর্জুন খপ্ করে ভীমের লাঠিটা ধরে ফেলে, ওহানে গে কি হবে, আমার কতাডা শোনো, ক্যানো তুমি মিছিমিছি —

ভীমে সহসা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, মিছিমিছি নয় র্যা অর্জুন।

—দ্যাকো দাদা ও বাগান এমনিতে আমাদের থাকপে না, আজ হোক কাল হোক যাবেই।

—সে আমিও জানি, শুধু গাছগুলো যদি —

অর্জুন বিষণ্ণ হাসে। হাসবে না কেন, লোকের কথা ওর কানে যায়। সে শোনে এমন — কি ছিল একদিন এইসব জায়গা। নলকোড়া, ধলতিতে, নৈহাটির তরিতরকারী গোটা বসিরহাটকে খাওয়াত। আর এখন চারদিকে ইটভাটা হয়ে বসুমতী কেবলই পুড়ছেন অন্তরে-বাইরে। অন্তরের আগুন — নিঃশ্বাসে মাটি আংরা হয়। বাইরে আগুন নিঃশ্বাসের ঝাপটায় গাছপালা বাঁজা হয়। অর্জুন জানে, ও বাগান থাকবে না, আজ হোক কাল হোক ইটপোড়া কালো ধোঁয়ায় খাক্ করবে। তাই সে ফিসফিসিয়ে বলে, গাছ আর একটাও থাকপে না দাদা—

ভীমে এত দুঃখেও হাসে, জানি রে জানি, তবু লাঠিটা ছাড়তি পারব না। করের ব্যাটা শক্ত লড়ুয়ে, আগে বুঝিনি। ভুলের খেসারত তিনবার দিছি, আর নয়।

— থাকা দাদা, ছেড়ি দাও ওসব।

— কি বলিস! ভীমে রেগে ওঠে, লাঠির মান আছে না, আমারে পালাতি বলিস?

— ও তোমায় জিততি দেবে না, ছলেবলে —

— খপরদার ওকতা মুকি আনবিনে। ছোটবাবু কুনো ছল্ করেনি। হেরেছি নিজির দোষে। না জেতা তক্ এ লড়াই আমি ছাড়তি পারব না। চল্—

অর্জুন এসেছিল দাদাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঘরে ফিরিয়ে নিতে। বদলে সেও চলল ভীমের পিছুপিছু। দাদার যন্ত্রণা কোথায় সে কি টের পাচ্ছে না? খুব পাচ্ছে। আরও বেশি করে পায় যখন ওরা বাগানের সামনে আসে। তিনদিনেই বাগানটার চেহারা হা-হতশ্রী। পরাজিত গাছগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে। আর একটু একটু করে ভাটা পা বাড়াচ্ছে। ভীমে এই দৃশ্য দেখে চোখের জল আর সামলাতে পারে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, গাছগুলো দেকতিছিস্ র‍্যা অর্জুন, বাপের বুকের ধন ছিল। আর আমি এমন অকালকুষ্মাণ্ড ওদের রাকতিই পারলাম না।

এই বলে সে নিজের পিঠেই সজোরে লাঠির চাপড় বসায়। লাল দাগ কেটে বসে। অর্জুন না ঠেকালে হয়ত গোটা পিঠই ভেঙে যেত। ভীমকে টানতে টানতে অর্জুন বলে, ওসব ভেবে মন ভার করো না দাদা, জেতার কথা ভাবো —

কথায় আছে, বারবার তিনবার। সব বারে পাখী ধান খায় না। একবার না একবার ধরা পড়তেই হয়। তিনবারের বার দুই লাঠিয়ালই বুঝেছে, এবার সহজ হবে না জেতা।

চত্বর জুড়ে লোক ভেঙে পড়েছে। আবুরাজ বুঝি ঢ্যাড়া পিটিয়ে লোক ডেকে এনেছে। ওর উৎসাহ বেশি। হবে না কেন, এতদিনে ভীমের থোঁতা মুখ ভোঁতা করা গেছে। এর আনন্দ কম নয়।

দুই প্রতিপক্ষ ঘুরে ঘুরে পরস্পরকে জরীপ করে। ভীমের চোখ স্থির, নিবদ্ধ। বুকের অনেক গভীরে তিতুমীর হাঁক দিয়ে উঠেছে। বাঁশের কেল্লার বাঁশ বুঝি ঠকঠকায়। ইছামতী ফুলে ফুলে ওঠে। ডাক দেয় মজনু শেখ। বুকের রক্তে তুফান। সমস্ত শরীরে জ্বলন্ত লাভা বয়ে যায়।

সন্ধ্যের অন্ধকার সবে ছড়াতে শুরু করেছে। আলো যা আছে, তাতে পরিষ্কার চেনা যায় না দুজনকে। লাঠির ঠোকাঠুকিতে বুঝি আগুন ছিটকোয়। চারপাশে দর্শকের চোখ স্থির, বিস্ময়ে স্তব্ধ। কোনো শব্দ নেই কারও মুখে। এমন লড়াই দেখা যায় কালেভদ্রে। পাঁকাল মাছের মতো পিছলে পিছলে যাচ্ছে দুই যোদ্ধা। শুধু একটা ছোবলের অপেক্ষা। অন্ধকার ঘন হওয়ার আগেই ভীমের বাজখাঁই গলা চমকে দেয় সকলকে, অর্জুন র‍্যা আমি জিতেছি, এই দ্যাখ —

দেখল সকলে, দেবদাসের লাঠি ভীমের হাতে খাঁড়ার মতো ধরা। বীভৎস স্বরে সে হাসছে। মাটিতে পড়ে আছে দেবদাস। নির্বাক।

লোকে তবু বলে, শত্তুরের শেষ কেন রাখলি ভীমে? তাতে যে ও আবার ছোবল তোলার সুযোগ পেয়ে গেল।

|| ৫ ||

ধর্মকথা বলি ভাই
লড়াইয়ের শেষ নাই।

শোনা যায়, দাদাকে জিততে দেখে অর্জুনের এতটাই আনন্দ হয়েছিল যে ওর মাথার ঠিক ছিল না। বোষ্টমহাটখোলার কীর্তন আসরে পাগলের মতো খোল বাজিয়েছিল, বাজাতে বাজাতে খোলই ফাটিয়ে ফেলল।

লোকে বলে, ভরা কীর্তনে খোল ফাটা অশুভ।

কীর্তন সবে জমজমাট, সোম্ থেকে তেছাইতে চাঁটি পড়ার মুখে অর্জুনের তাল কেটে যায়। আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘনা আছাড় খেয়ে পড়েছে পায়ের উপর, কাকা গো, বাপ আর নেই —

শোনা যায়, ভরা কীর্তনের আসর মাটি হওয়াতে অর্জুন বিরক্ত হয়েছিল। সে শিল্পী মানুষ। শিল্পের রস সংসার থেকে অনেক বড় ব্যাপার। সাধারণের নাগাল সেখানে পৌঁছয় না। অর্জুন তাই চোখের জলে ভাসাভাসি ঘনাকে দেখেও বিরক্তি গোপন করতে পারেনি। ব্যাজার মুখে জিগ্যেস করে, কি — কি হয়েছ্ আঁ?

ঘনা কাঁদতে কাঁদতেই বলে, বাপ গলায় দড়ি দেছে।

— ক্যানো?

ঘনা নিরুত্তর। কেন'র উত্তর সে কি দেবে! সে শুধু ঘটনা বলতে পারে। অনিচ্ছুক পা দুটোকে বাড়ির দিকে ঠেলতে ঠেলতে অর্জুন শান্ত মনে সে কথা শোনে। ভাই অন্ত জীবন দাদার মৃত্যু-সংবাদ এত শান্ত মনে শোনা মানায় না।

সন্দেহ যারা করে, তাদের সবেতেই সন্দেহ। কিন্তু যারা জানে এমনই জানে, অর্জুন সব শুনে গলা ছেড়ে কাঁদেনি বটে, তবে চোখ ওর শুকনো ছিল না। একবার নাকি দাঁতে দাঁত ঘসটেছিল। হাত দুটো মুঠো করেছিল সকলের অলক্ষ্যে। বিড়বিড় করে বলেছিল, ইমানটাই দেকলি দাদা, বেইমানের সাথে বেইমানীটা করতি পারলি নে!

লাঠি খেলায় জেতার আনন্দে ভীমে পরদিন নাচতে নাচতে বাগানে গিয়ে ছিল। লাঠির মান সে রেখেছে। একসারি হলেও গাছ বাঁচিয়েছে। এও বা কম কিসে!

কথায় বলে, বাতে ছক্কা দিলে ফক্কা। বাগানে গিয়ে ভীমে কি দেখল? দেখল গোটা বাগানই ফক্কা। সমস্ত গাছই শুয়ে পড়েছে। একটাকেও রেহাই দেয়নি দেবদাসের লোকেরা। রাতের অন্ধকারে চোরের মতো সব গাছ কেটে দিয়েছে।

শোনা যায়, রাগে ভীমে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এতটাই অন্ধ হয়েছিল, তখন যাকে পায় তার মাথাই দু'ফাঁক করে। দেবদাস কথা রাখেনি। লাঠির মান সে দেয়নি। এ তো বেইমানী! অসহ্য আক্রোশে ভীমে ছুটে যায় ভাটায়। হাতে লাঠি, মুখে লাঠিয়ালের গা হিম করা হাঁকাড়। ঐ মূর্তি দেখে, শোনা কথা, আবুরাজ নাকি কুলী ঘরে সেঁধিয়েছিল। ভীমে কোনোদিকে না তাকিয়ে দেবদাসের মাথা লক্ষ্য করে লাঠি তোলে। চিৎকার করে বলে, এই তুমার ইমান! শালো—

রাগে অন্ধ ভীমে লাঠি নামানোর আগে পর্যন্ত বোঝেনি, হাতে লাঠি থাকলেই হয় না, মগজে বুদ্ধিও থাকা চাই। বুঝল লাঠি নামানোর সময়। ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে দেবদাসের লোকজন। ওদের হাতে দা, সড়কি, রিভলবার, পাইপগান। ঘনার বয়সী সবাই। মরা গাছের মতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখে পিকপিক হাসি। ভীমে অবাক হতেও ভুলে গিয়েছিল। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। খেয়াল হয়নি দেবদাস হাসতে হাসতে কখন ওর লাঠিটা কেড়ে নিল, খড়কুটোর মতো ছুঁড়ে দিল দূরে। খেয়াল হয়নি কখন আবুরাজ ওর

থুতনি নাড়িয়ে খিকখিকিয়ে হাসল, খেলা বোঝো না! ভেবিছো লাঠিতেই জেতপা! তার চে এইবেলা যা বলি তাই কর, মাতা গরম করিস নে —

কে শোনে কথা! ভীমে তো পাথর, নির্বাক। বড় বড় দুটো চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে বুঝি। লোকে বলে, কথা শুনলে ক্ষতি কি ছিল! পাগলামী করেই মরল। সত্যিই মরল। গাঙ্ পাড়ে মরা শিমুল ডালে সটান ঝুলে পড়ল। কি দুঃখ নিয়ে গেল কে জানে! নিজে তো মরলই, মেরে গেল সংসারটাকে।

শোনা যায়, অর্জুন এইসব বৃত্তান্ত শুনেও কাঁদেনি। চোখ পাথর-পাথর। দেখে লোক মুখ বেঁকায়, আহা কি পাষণ্ড ভাই! দাদা পুড়ছে শ্মশানে আর ভাই গাঙ্ পাড়ে একা বসে লাঠিতে হাত বুলোচ্ছে। দাদার জীবনের চাইতে কি লাঠি আপন হলো!

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বেশ। কালো থমথমে রাত। নদীর জলে নক্ষত্রের আলো পড়ে বাদামী রঙ ছড়ায়। চিতার কালো ধোঁয়া ভাটার ইটপোড়া ধোঁয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। ওখানে কোনো লড়াই নেই।

ভীমের ছেলেমেয়েরা কেঁদে-কেটে শান্ত হয়েছে। অর্জুনের পাশে গোল হয়ে বসে। শোনা যায়, এ সময় ভীমের ছোট ছেলেটা দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিল, ও শালোদের আমি দেকো নোব হাঁ —

শুনে অর্জুনের মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। ভীমে মবার পর এই প্রথম কান্না নয়, একফোঁটা দীর্ঘশ্বাস নয়, বিলাপ নয় — শুধু একচিলতে হাসি দেখা দিল। দেখে লোকের মনে সন্দেহের ঝড় ওঠে, তবে কি তলে তলে কোনো মতলব আঁটছে অর্জুন?

লোকে এ কথা বলার সুযোগ পায় কেন? সকালের ঘটনার পর থেকে লোকের মনে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে, সকালে আবুরাজ এসেছিল অর্জুনের কাছে। নদীর ধারে ডেকে নিয়ে বলেছিল, সব তো জানিস অর্জুন, কত করে বুঝিয়েছি ভীমেরে। বাগানটা এমনিতে যেতই, তবু বোঝে না। এমন পাগলামী কেউ করে!

অর্জুন নিরুত্তর। বোবা মুখে শুনছিল আবুরাজের কথা। আবুরাজ হাসেনি খিকখিক শব্দে। বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, দ্যাক্ আমিও তো চাকর-বাকর ছাড়া কিছু নই। তোদের ভালর জন্যিই বলতিছি অর্জুন, ছোটবাবুর কতায় রাজী হই যা, কি হবে আর ঝুট-ঝামেলা করে? ভাটায় কাজ কর, ট্যাকা লে — বল্ রাজী?

অর্জুন হ্যাঁ না কিছুই বলেনি। চুপ করে ছিল। লোকে ভাবল অন্য কিছু। নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে অর্জুনের মনে। নইলে আবুরাজের মাথায় লাঠি ভাঙার কথা যার, সে কিনা তার কথাতেই বিভোর হয়ে থাকল!

লোকের কথায় কি আসে যায়। অর্জুন আছে নিজের ভাবনায়। ছোট ভাইপোর ঐ প্রতিশোধ স্পৃহা, লোকের উসকে দেওয়া — সব কিছুই অর্জুনের হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। ওর চোখে নদীর পাড় জুড়ে পরপর ভাটার কংক্রীট চিমনী। লাঠিকি শক্তি, ওদের সঙ্গে লড়বে! লাঠি যেন সত্যিই পলকা, অসহায়। যারা অর্জুনের মনের খবর রাখে তারা জানে অর্জুনের ঐ হাসির অর্থ। ঐ কৌতুকমাখা জিজ্ঞাসু চোখের অর্থ। এক আবুরাজের মাথায় লাঠি মেরে কি হবে, আর এক আবুরাজ আসবে। এক করের জায়গায় অন্য কর বসবে। কিন্তু বেইমানীটা যাবে কিসে?

শোনা যায়, ভীমের দেহ পুড়তে তখনও বাকী। সেইসময় অর্জুন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। পা পা এগিয়ে যায় চিতার দিকে। লকলক শিখায় আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে ভীমের দেহ আর চেনা যায় না, কালো আংরা হয়ে গেছে। চিতার সামনে থমকে দাঁড়ায় অর্জুন। ভীমের লাঠিতে দু'বার হাত বুলোয়। তারপর সবাইকে ভীষণ চমকে দিয়ে লাঠিটা সজোরে ছুঁড়ে

দেয় আগুনে। লকলকে আগুন মুহূর্তেই লুফে নেয় ভীমের প্রাণপ্রিয় লাঠিটাকে। তিতুমীর, মজনু শেখের নামের লাঠি ছাই হতে বেশি সময় নিল না।

সকলের বিস্ময় ভাইপো ঘনার প্রশ্ন হয়ে ফালাফালা করে অর্জুনকে, কি করলে কাকা?

অর্জুন হাসে, লাঠি নে আর কি হবে! ওর দিন গেছে —

লোকে বলে, এখন তবে কিসের দিন?

অর্জুন চুপ। ভাইপো ঘনার হাত ধরে, চল্।

ঘনা অবাক, কোথায়?

— ছোটবাবুর কাছে।

শুনে তো লোকে ছ্যা-ছ্যা করে, অর্জুন তুই কিরে! যারা হরিনাথকে পাগল করল, যদুকে লোভ দেখিয়ে সর্বনাশ করল, ভীমেকে মারল — তুই কিনা তাদের দরজায় হাত পাতবি! ছ্যা-ছ্যা—

ঘনা ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়ায়। যেতে চায় না। দেখে অর্জুন ঘনার পিঠে হাত রেখে বলে, পিতিশোধ নিলি চলবে! চালাবি কি করে? ওদের সাথে লড়া অত সোজা নয় র‍্যা ঘনা, অন্য অস্তর চাই।

লোকে জানতে চায়, কি সেই অস্তর?

অর্জুন হেসে জবাব দেয়, সেটাই তো খুঁজতি হবে।

শোনা যায়, সে রাতে ভাটার অফিসঘরে আবুরাজ একা ছিল। হেরিকেনের নিভু-নিভু আলোয় হিসেব মেলাচ্ছিল। বাইরে ঝিঁ ঝিঁর ডাক। অন্ধকার ঘন চাদরের মতো ছেয়ে আছে চারদিকে।

সেই অন্ধকার ফুঁড়ে সহসা মিহিন গলায় আকুল ডাক ভেসে আসে, ছোটবাবু —

আবুরাজ চমকে ওঠে ভীষণ। ভয় পায়। এই আশঙ্কাই সে করছিল। অর্জুনদের বিশ্বাস নেই। লাঠি মেরে বসতে পারে। ছোটবাবু তো পিঠটান দিয়ে খালাস, চোট তো ওর ঘাড়ে পড়বে।

আবুরাজ সহসা ফুঁ দিয়ে হেরিকেন নেভায়। অন্ধকারে চুপটি করে বসে থাকে। বোঝার চেষ্টা করে, অর্জুন কি ওর প্রস্তাবে রাজী হলো? ওর গলার স্বরে কী আছে, সন্ধি না শত্রুতা?

বাইরে তখন মিহিন্ গলায় আকুল আহ্বান, ছোটবাবু দরজা খোলো —

অন্ধকার ঘরে আবুরাজ যেন শুনল, ছোটবাবু লড়বে চলো।

দরজায় যেন পাগলা কুকুর আঁচড়ায়, মাথা ঠোকে, কান্না গুমরে তোলা কথা ভেসে আসে, ছোটবাবু আমি রাজী, আমরা রাজী —

ঘরে আবুরাজ যেন শুনল, আমি বাজী, আমরা বাজী —

লোকে বলে, এই ছিল তবে অর্জুনের মনে! লোকের কথা থাক, যারা জানে এমনই জানে, এখানেই যুদ্ধের শেষ নয়, শুরু। শেষ কোথায় কে বলতে পারে!

জলোচ্ছ্বাস

অনুপ ভট্টাচার্য

ব্যাপারটা ঘটে গেল কালই। রাজধানী শহরের ক'জন লোক পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে মাটিব এবড়ো খেবড়ো পথ ধরে লাল মারুতি নিয়ে গাঁয়ে ঢুকল। ঢুকে প্রথমেই খোঁজ করল কোন বাড়িতে থাকেন অনিন্দ্যসুন্দর।

আর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল হরবচন। এই হরবচন এখন ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া সরকারি ছাতার আড়াল থেকে শক্তিধর হয়ে ওঠা গ্রামেরই এক যুবক। তার সম্ভ্রম মেশানো 'দাদু মশায় দাদু মশায়' ডাক শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন পঁয়ষট্টি ছুঁই ছুঁই অনিন্দ্যসুন্দর। দেখলেন, হরবচনের সংগে ক'জন লোক। কাপড় চোপড়ে বেশ সম্ভ্রান্ত। শহুরে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন প্রৌঢ়।

ওরা এগিয়ে কাছে এসে নমস্কার করতেই ভ্যাবাচেকা অনিন্দ্য যেন হুঁস ফিরে পেলেন। প্রতিনমস্কার করে ডেকে নিলেন ঘরে। পাটি পেতে মেঝেয় বসতে বললেন, আন্তরিক ভাবে।

মিটিং-এর মত গোল হয়ে বসলেন তারা। কথায় কথায় জানালেন, সবাই এরা শহরেব নামী দামি লোক। এসেছেন, অনিন্দ্যসুন্দরের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের সামান্য স্বীকৃতি জানাতে। মাস দেড়েক পরে সরকারের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যের দশজন সেরা গুণীকে রাজধানীর টাউনহলে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর রয়েছেন সর্বাগ্রে। তাদেব বক্তব্যে তাঁর নামটা এল বার বার ঘুরে ফিরে। একজন তো হরবচনদের লক্ষ্য করে রীতিমত বক্তৃতার ঢঙেই শুরু করলেন, কমরেডস, চেয়ে দেখুন এই মানুষটিকে। বহুকাল আগে উনি পার্টির কালচারেল ফ্রন্টের হয়ে কাজ করে গেছেন নীরবে। নিঃস্বার্থ ভাবে শুধু কাজই করে গেছেন। বিনিময়ে কোনো চাহিদা ছিল না জীবনে। কালচারেল ফ্রন্টের এই গণসংগীত শিল্পীর নামটাও বোধহয় আজকাল অনেকে জানেন না। তিনিও অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছেন গাঁয়ে। কিন্তু আমরা তো তার এতদিনকার গানের মধ্য দিয়ে জন জাগরণের সাফল্যকে খাটো করে দেখতে পারি না। আজকে পার্টির সাফল্য সরকারে আসা— সবই এইসব নিঃস্বার্থ প্রবীণ কমরেডদের জন্যে। তাই বছরের সেরা দশজন মানুষের মধ্যে উনি আজ পার্টির নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারাই নির্বাচিত। আসছে বর্ষপূর্তিতে শহরের টাউন হলে ইদানীংকার বিদ্বজন সমাবেশে এই বিশ্রুতপ্রায় কমরেড শিল্পীকে আমরা আমন্ত্রণ জানাতেই এসেছি।

এই মুহূর্তে কী রকম একটা লজ্জা-মিশ্রিত আনন্দে আপ্লুত হয়ে নতমস্তক হয়ে রয়েছেন অনিন্দ্যসুন্দর। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দেয়া নেমন্তন্ন পত্র হাতে নিতেও কেমন যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। হাত বাড়ালেন যখন, হাতটা তখন কাঁপছে রীতিমত। আনন্দে ডগমগ হয়েও অসীম বিনয় নিয়ে ভাবছেন, সত্যিই সম্বর্ধনা পাবার যোগ্য লোক কি তিনি ? কী এমন করেছেন জীবনে।

কাল বিকেল থেকেই এই তল্লাটে যেন কদর বেড়ে গেছে অনিন্দ্যসুন্দরের। একজন দু'জন করে লোক আসতে শুরু করেছে তাঁর কাছে। বুড়ো শিবতলায় দোকান-পাটে পার্টির অফিসে কেবল তাঁকে নিয়েই চর্চা। এদ্দিন বুড়ো লোক বলে যারা তাঁকে ফাল্‌তু ভেবেছে,

দেখেও দেখেনি তারাই কৌতূহলে বলাবলি করছে, আরে আমাদের গাঁয়ে এরকম একজন গুণী মানুষ রয়েছেন জানা ছিল না তো। একবাক্যে এখন সবারই মনোভাব, সত্যি — আমাদের সকলের গর্ব এই অনিন্দ্যসুন্দর।

হরবচন তো এখন সকাল সন্ধে দু'বার করে আসতে শুরু করেছে। তার চেলা ক্ষেপা নিতাই অনিন্দ্যকে ধরে আজ পার্টি অফিসে নিয়ে এল। গোল জমায়েতে বলল, আসছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাকেই দাঁড় করানোর প্রস্তাব রাখবে সে পার্টির কাছে। সম্বর্ধনা পর্ব চুকে গেলে অনিন্দ্যসুন্দরের এগেনস্টে অপজিশন পার্টি ক্যান্ডিডেট দিতে ভয় পাবে। মনে মনে হাসেন অনিন্দ্যসুন্দর। রাতারাতি তার যেন একটা পুনর্জন্ম হয়ে গেছে। আজকাল শ্যামলীরও একটা রূপান্তর লক্ষ্য করেন অনিন্দ্যসুন্দর। তার চালচলনে এক সশ্রদ্ধ বোধ।

এই মাত্র গোয়াল ঘর থেকে দুধ দুইয়ে দ্রুত গরম করে এক গ্লাস দুধ হাতে করে সামনে এসে দাঁড়াল শ্যামলী। মিষ্টি করে বলল, দুধ টুকু খেয়ে নিন বাবা। তারপর দীর্ঘদিন ধরে যা করেনি তাই করে বসল, কুশল সংবাদ জানতে চাইল সে, বাতের ব্যথাটা খানিকটা কমেছে কি বাবা? আজ আপনার ছেলে ফিরলে বলব ডাক্তারকে বলে মালিশ তেলটা যেন এনে দেয় আবার। হঠাৎই আবার অনুনয়ের গলায় বলে শ্যামলী, এই ক'দিন সন্ধ্যার দিকে আর বাইরে না-ই বা বেরোলেন বাবা। এই শেষ হেমন্তের বিকেলগুলোয় বাইরে কী রকম কুয়াশা পড়তে শুরু করে। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

সব কথাই বুঝতে পারেন অনিন্দ্যসুন্দর। তবু বড় ভাল লাগে। যে দিনগুলো বড্ড ফ্যাকাসে ক্লান্তিকর দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছিল এদ্দিন, এখন সেইগুলো যেন বড় বেশি বেশি উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেছে।

আমি সমঝে চলব। ভেবো না বৌমা। বিছানায় চোখ বুজে আরাম করে শুয়ে পড়লেন তিনি। দুমিনিট হবে বোধহয়। শ্যামলী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে মাত্র, হই হই করে ঘরে ঢুকল শঙ্খ। ঢুকেই দাদুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন। এখনও শুয়ে রয়েছ দাদু? পার্টি অফিসে যাবে না? হরবচনদা যে দু-দু'বার লোক পাঠিয়েছে। জবাব দিলেন না অনিন্দ্যসুন্দর। তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। এবার কাছে এসে শঙ্খ তার হাত ধরে টান দিল। চল দাদু, পার্টি আপিসে যাবার আগে রোজদিনকার মত কিছুটা বেড়িয়ে আসি।

সদ্য কলেজে পড়া এই একমাত্র নাতিটির প্রতি অনিন্দ্যসুন্দরের টান অপরিসীম। শঙ্খ রোজই দাদুকে নিয়ে পাকা রাস্তা ধরে খানিকটা বেড়িয়ে বেড়ায়। ছোট বেলা থেকে বিকেলে দাদুর সঙ্গে বেড়ানোটা তার অভ্যেস। এবং ছোট বেলা থেকেই সে দাদুর কাছে গল্প শোনার জন্যে পাগল।

অনিন্দ্যও তাকে নিজের বিগত জীবনের টুকরো টুকরো করে এক-একদিন এক-একটা গল্প শোনান। বলেন, যৌবনে কী করে বিপ্লবী পার্টিতে ঢুকে পড়েছিলেন। গানের গলা ভাল থাকায় কালচারেল ফ্রন্ট টেনে নিয়েছিল। তখন তো পার্টির দালান কোঠার অফিস ছিলনা। কারো বাড়ির খড়ের চালাঘরে বসতো অফিস বসত মিটিং। মিছিলের পুরোভাগে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে গান গেয়ে বেড়াতেন পথে পথে। গলায় গান বেঁধেই পার্টির নির্দেশে ছড়িয়ে পড়তেন জায়গায় জায়গায়। গ্রামে-গঞ্জে পথে-ঘাটে প্রকাশ্য দিবালোকে, হেজাকের আলোয় সেই সব শুনতে কতই না ভিড় হত সাধারণ মানুষের। উৎপল দত্ত খালেদ চৌধুরী পর্যন্ত অনিন্দ্যসুন্দরের গানের গলার বড় তারিফ করেছিলেন একসময়। যেখানেই মিটিং সেখানেই উদ্বোধনী গানটা অনিন্দ্যসুন্দরকে দিয়েই গাওয়ানো চাই। কলকাতা, আসাম কত জায়গায়ই না গান গাইতে গেছেন তিনি। নিজের বাঁধা গানে সুর জুড়তে পারতেনও নিজে।

বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দাদুর গল্প শুনে এক-একদিন ধন্ধে পড়ে যায় শঙ্খ। সন্দেহ প্রকাশ করে বসে, তুমি এতোটাই পার্টির জন্যে করেছিলে, তা আজ তোমাকে ডাকে

না কেন কেউ। গান গাইতে বলে না কেন কোনো জনসভায়? শঙ্খের প্রশ্নে আহত হন অনিন্দ্যসুন্দর। তবু হেসে বলেন, যা বলছি সত্য বলে মেনে নাও দাদুভাই। মিথ্যে বলে এই বয়সে কেন ফাঁকিতে জড়াই। অন্যদিন হয়তো প্রতিবাদ করে শঙ্খ, তুমি এতো বানিয়ে বলতে পার দাদু। বানাতে তোমার জুড়ি নেই। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েন অনিন্দ্যসুন্দর। মুখোমুখি চেয়ে বলেন, যা নয় তা বলে লাভ কি আমার। আর তুমিও তো ছোট্টটি নও দাদুভাই।

তাহলে গাও তো শুনি, তোমারই বাঁধা একখানা গান। যে গানে উতলা হত সে সব দিনকার জনসভা।

বাধ্য হয়ে গান ধরেন তিনি। কাঁপা-কাঁপা গলায় গান। শঙ্খের কাছে গায়কিটা অনেকটা সবিতাব্রত দত্তের সংগীত ধারার মত মনে হয়। তবে কথা ও সুরে ভেতরে কোথায় যেন একটা উদ্দীপনা জাগায়।

সুর উঁচু পর্দায় উঠতেই কাশির দলা উঠে আসে অনিন্দ্যসুন্দরের। বেগতিক বুঝে শঙ্খ মাঝ পথে তাকে থামায়। বুকে গলায় হাত মেজে দেয়। হাত ধরেই বাঁধের উপর বসায়। উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চায়, কষ্ট হচ্ছে দাদু? হার মানতে চান না অনিন্দ্যসুন্দর। কাশি আটকে যাওয়া ফ্যাসফ্যাসে গলায় জানতে চান, গান শুনে বিশ্বাস হল দাদু?

শঙ্খই এবার নিজে থেকে জয়ের মালা তার গলায় পরিয়ে দিয়ে এক গাঢ় বিপন্নতা থেকে বৃদ্ধকে বাঁচায়। সত্যি তুমি ভাল গাইতে দাদু। কথাগুলো কি অসাধারণ বাধতে পারতে তুমি।

পাকা রাস্তা ধরে এখন শঙ্খের হাত ধরে শ্লথ গতিতে হাঁটছেন অনিন্দ্যসুন্দর। দূরে, রাস্তার প্যারালাল বাঁধ। বাঁধ ছুঁতে গেলে একটু ঘুরিয়ে যেতে হয়। মাঝখানে মাঠ। এখন ধান কাটা হয়ে গেছে। ক্রমশ একটা মেঠো পথ বেরিয়ে পড়েছে। লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে বলে। মেঠো পথ দিয়ে গেলে পার্টি অফিস একদম কাছে। এখন অঘ্রাণ পড়েছে মাত্র। বিকেল তাই দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে যায়। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা নামে। ঝাপসা করে দেয় মাঠ পার্টি অফিস দূরের মন্দির। অনুষ্ঠানের দিন তুমি কি করে শুরু করবে দাদু? তোমাকে নিশ্চয়ই খানিকটা বলতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করে শঙ্খ।

চোখের চশমা খুলে কাপড়ের খুঁটে কাচ ঘষলেন অনিন্দ্যসুন্দর। চশমাটা না পরেই চারদিকে তাকালেন। চশমা ছাড়া সব কিছুই তার কাছে আজকাল বড় অস্পষ্ট। এই যেমন শঙ্খের মুখ। চশমাটা চোখে পরতেই নাতির মুখ স্পষ্ট হল আবার। বললেন, এসব মহড়া দিয়ে বলা যায় না। পরিস্থিতি বুঝে আপনা আপনি বলা যাবে।

তা ঠিক। হাঁটতে হাঁটতে মাথা নাড়ে শঙ্খ। থেমে তারপরে বলে, তোমার উপর আমার কেন জানি খানিকটা আস্থা ফিরে আসছে দাদু। শুনে ভাবলেন অনিন্দ্য, আজকালকার ছেলে ছোকরাগুলোর ধ্যান-ধারণা বড় ঠুনকো। সময় নেয় না মোটেই। সহসাই যেন গড়ে ওঠে। সহসাই ভেঙে যায়। যাচাই করার সময় লাগে না। অথচ তিনি নিজেই জানেন না, আজকালকার অনুষ্ঠানগুলো কেমন হয়। তাদের সময়ে অতো সাজ সজ্জা মাইক্রোফোনের ব্যবহার আর ঘড়ি ঘণ্টা ধরে চলা-বলা ছিল না কোনো মিটিং কিংবা উৎসবে। আলোয় ভাসানো মঞ্চকে তো তারা মিথ্যে মায়াজাল বিস্তার বলেই ভাবতেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ল শঙ্খ। আর এগিয়ে কাজ নেই। আঁধার নামছে। তুমি চোখেও ভাল দেখতে পাওনা দাদু। চল পার্টি অফিসের দিকেই যাই। হরবচনদা অপেক্ষা করছে।

আমার কি না গেলেই নয় রে শঙ্খ? ইতস্ততের ভাব করলেন অনিন্দ্যসুন্দর। না, না তোমাকে যেতেই হবে। আজ ক্রিটিক্যাল ব্যাপার নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে চলেছে। তোমার মতামত দেয়াটা জরুরী। কালই প্রথম হরবচনের মুখে ব্যাপারটা শুনেছেন তিনি। সব শুনে তার মনে

হয়েছে, ওসব স্পর্শকাতর ব্যাপারে মত দেয়াটা বড় কঠিন। তিনি ভেবেও দেখেছেন, পার্টি অফিসে গেলেও তাকে কথা বলতে হবে কেবল পার্টির স্বার্থে নয়, মানবিকতার দিকটাও লক্ষ্যে রেখে।

গাঁয়ে একটা রাস্তা হবে। বামুন পাড়া থেকে আদিবাসী বস্তি অবদি। আর জুনিয়র বেসিক স্কুলটার আপগ্রেডেশন নিয়েও আজই নাকি পাকা সিদ্ধান্ত হবার কথা।

রাস্তাটা গড়তে গেলেই খানিকটা জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে। অথচ যে সব জমিন রাস্তার আওতায় আসছে, তার বেশির ভাগের মালিকই সাধারণ চাষী পরিবার। সরকারকে ধরে কয়েই হচ্ছে রাস্তাটা। মন্ত্রীও এসে দেখে গেছেন। তবে ফ্যাসাদ বেধেছে কমপেনসেশন নিয়ে। সরকার সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ফাণ্ডে টাকা নেই। মালিকেরা স্বেচ্ছায় জায়গা ছাড়লে তবে রাস্তা হবে।

হরবচন ইঙ্গিত দিয়েছে, ওরা জমি না ছাড়লে সে পার্টির পোলাপান নামিয়ে দেবে। আর এতে অনিন্দ্যসুন্দরের মত প্রবীণ কমরেডদের আগাম সমর্থন চায়। তবে উনারা আগে চেষ্টা করে দেখুন, বুঝিয়ে সুঝিয়ে জমিব মালিকদের আগে পথে আনা যায় কিনা।

স্কুলটা নিয়েও আবার এক ঝামেলা। দত্তদের নিজেদের গড়া স্কুল। কিছুতেই সরকারের হাতে দিতে চান না তারা। পরিবেশ পড়াশুনো দুটোই নষ্ট হয়ে যাবে। কারো ডোনেশন নিয়ে স্কুলটা বড় করতেও তারা অনিচ্ছুক। কোথায় যেন বাধে। এখন অর্থ আর প্রতিপত্তির টান পড়লেও এককালে গাঁয়ে এরা একমাত্র ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবার। অপজিশন পার্টির লোক। হরবচনের রাগ এদের উপব এজন্যে খানিকটা বেশি। সরকারেব সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে সে স্কুলটাকে বাড়াতে চাইছে। শর্ত মত স্কুলটাও তখন চলে যাবে সরকারেরই হাতে। দলবল নিয়ে গ্রামবাসীদের বুঝিয়েছে হরবচন, এতে মঙ্গল হবে গাঁয়েরই দশ জনের। আজ মিটিংয়ে দত্তদের ডাকা হবে। সোজা কথায় না হলে নানাবিধ চাপ সৃষ্টি যে করতে হবে এদের উপর, খোলাখুলি অনিন্দ্যসুন্দরকে বলেছে হরবচন।

হাঁটতে হাঁটতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস লুকোলেন তিনি বুকের ভেতর। এবং এই মুহূর্তে যেন আরো বেশি বেশি সতর্ক হলেন, কোথায় যেন একটা রাজনীতির অন্ধ আক্রোশ লুকিয়ে আছে তলে তলে।

দু-দুটোই তো জনহিতকর কাজ। তবু মনে হয়, দুটোই যেন গাঢ়তর বিরোধের জলজ্যান্ত ইস্যু। না সিদ্ধান্ত নিলেন অনিন্দ্যসুন্দর, তিনি এখন পার্টি অফিস যাবেন না। এরকম সমাজ-কল্যাণ বা রাজনীতি তিনি করেননি, কোনোদিনও। যে নীতির সঙ্গে মানবতার বিরোধ পদে পদে তাকে আঁকড়ে ধরে লাভ কি। এজন্যেই বোধ হয় ধীরে ধীরে জনান্তিকে স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করেছিলেন তিনি। এই মূল্যহীনতার সঙ্গে তার পক্ষে মেলানো কঠিন।

কী হল, বাড়ির পথ ধরেছ কেন? পার্টি আফিসে যাবে না? বিরক্ত হয়ে ওঠে শঙ্খ। নারে দাদু ভাই। শরীরটা ভাল ঠেকছে না। তুই একাই যা। আমার শরীরের কথা বলিস ওদের। আর আজ যদি মিটিং-এ কোনো ডিসিশন না হয় হরবচনকে বলিস, কাল যেন সে একবার আমার কাছে আসে। ওর সঙ্গে কটি কথা আছে। বলেই শঙ্খের কোনো অভিব্যক্তি লক্ষ্য না করে হন হন করে ম্যাড়ম্যাড়ে জ্যোৎস্নায় সামনের দিকে হেঁটে গেলেন। কী যেন ভাবতে ভাবতে বিপরীতমুখী হল শঙ্খ।

বাঁশের গেটে শব্দ হতেই দরজা খুলে হ্যারিকেন হাতে দ্রুত বাইরে ছুটে এল শ্যামলী। হাত উঁচিয়ে আলো দেখাল। প্রশ্ন করল, একি, আপনি একা ফিরে এলেন যে। শঙ্খ কোথায়?

পার্টি অফিসে গেছে মা। অনিন্দ্যসুন্দর জবাব দিয়েই আগে আগে হেঁটে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। একটু দূরত্ব রেখে কী যেন ভাবতে ভাবতে পেছনে পেছনে শ্যামলীও।

ঘরে মাদুর পাতা। মাদুরের উপর হারমোনিয়াম। আর ডায়রীর মত একটা খাতা। চোখ ফেলে খানিকটা বিস্মিত হয়ে গেলেন অনিন্দ্যসুন্দর। হারমোনিযামের উপর হ্যারিকেনটা রাখতে রাখতে তার দিকে চেয়ে হাসল শ্যামলী। বলল, ফাংশনে আপনাকে গান গাইতে বলতে পারে। তাই গুছিয়ে রাখলাম। কদিন গাইলে আগের গলাটা ফিরে পাবেন।

কিরকম একটা মমতা-মাখা চোখে পুত্রবধূর দিকে তাকালেন অনিন্দ্যসুন্দর। তার এই আকস্মিক তৎপরতা যেন ভাল লাগে। নির্বাক তাকিয়ে দেখেন এক কালের ধুলোজমা পুরানো হারমোনিয়াম। আবার চোখ তুলে শ্যামলীর মুখ।

হঠাৎ শ্যামলী ব্যস্ত হয়ে উঠে বসল, এখন কাপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম করে নিন তো বাবা। আমি চা করে নিয়ে আসছি। চা টা খেয়ে না হয় হারমোনিয়ামে বসবেন। ওঘরে চলে গেল শ্যামলী। কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম নিতে বিছানায় টান টান শুয়ে পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দব। এখন তার যেন অবসর নেই। টানা ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়ছেন আবার। আবার কতদিন বাদে এই ব্যস্ততা ফিরে এল তার জীবনে? সুধার মৃত্যুর পর? চালের কড়িববগার দিকে তাকিয়ে হিসেব করতে থাকেন তিনি। সুধার জন্য কিছু করেননি অনিন্দ্যসুন্দর। তাকে দিতে পারেননি জীবনে সুখ শান্তি ঐশ্বর্যের ছিঁটেফোটাও। অথচ বিয়ের পর থেকে তার জন্য এক দাবীহীন পরিচর্যা জুগিয়ে গেছে সুধা। এক হাতে গেরস্থালী সামলে অনিন্দ্যসুন্দরকে তার মনোমত ভুবনে ঠেলে পাঠিয়েছে কেবল। বউভাতেব দিনই তো তিনি পার্টির মিটিং-এ গান গাইবেন বলে চলে গিয়েছিলেন সুদূর আসামে। আশ্চর্য, নতুন বউ হয়েও কোন অনুযোগ তোলেনি সুধা। দাবীহীন অথচ একটা আবেশময় সম্পর্ক কী রকম যে গড়ে নিতে পেরেছিল ভাবতে ভাবতে মনটা ভার হয়ে এল। ধীরে ধীরে বিষণ্ণতায় আবছা হয়ে গেল চোখের পাতা।

বাবা, আপনার চা। শ্যামলীর ডাকে অস্পষ্ট চাওয়া স্পষ্ট হল ধীরে ধীরে। উঠে বসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিলেন।

দাঁড়িয়ে রইল শ্যামলী।

একসময় প্রশ্ন করল, আপনি পার্টি অফিসে যাননি বাবা?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে জবাব দিলেন অনিন্দ্য, যেতে ভাল লাগল না মা।

সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু বলল না শ্যামলী। হারমোনিয়ামের উপর থেকে হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে টেবিলে রাখল। চেয়ারেব উপর ছেড়ে রাখা শ্বশুরের কাপড় ভাঁজ করতে করতে বারেক তার দিকে তাকাল। চোখাচোখি হল অনিন্দ্যসুন্দরের সঙ্গে। মনে হল তার, শ্যামলীর মুখটা আলো আঁধারিতে কেমন রহস্যে ঘেরা। কিছু একটা বলতে চেয়ে সে যেন খানিকটা প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কাপড় কুচিয়ে আলনায় রেখে এইমাত্র কাছে সরে এল সে। একদম বিছানার গা ঘেঁষে। ফিসফিসিয়ে বলল, পার্টি অফিসে যাওয়া আপনি ছাড়বেন না বাবা। শঙ্খ বলছিল, আপনি ঘন ঘন পার্টি অফিসে গেলে তার লাভ হবে। ও পার্টিতে ঢুকে যাবে। হরবচন নাকি ওকে বলেছে, আপনার নাতি বলে শঙ্খ যুবশাখার নেতা বনে খুব তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তখন আমাদের আর দুঃখ থাকবে না। আমাদের অভাব দূর হোক, আপনি তা চান না বাবা? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শ্যামলী।

কেঁপে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর। কই, সুধা তো কোনোদিন বলেনি, পঁচিশ বছর ঘর করছি তোমার পঁচিশটা মুহূর্ত ভেবেছ আমাদের জন্যে? পার্টি আর গান নিয়ে মত্ত থেকেছ চিবকাল। একবারও চিন্তা করেছ জীবনে, আমারও তো কিছু পাওনা আছে তোমার কাছে। আমারও কিছু স্বপ্ন আছে। তোমার পার্টি আর গান কেবল মহিমা ছড়িয়েছে তোমার। আমায় দিয়েছো কি?

না সুধা বলেনি। কোনো দিন বলেনি। অনিন্দ্যসুন্দর আবেগের মুহূর্তে ধরিয়ে দিলে কেমন যেন লজ্জা পেত। লাজুক হেসে বলত, কি বাজে বকছ তুমি।

কী বলবেন অনিন্দ্যসুন্দর, কী বলা উচিত শ্যামলীকে, ভেবে পাচ্ছেন না। কারো সার্টিফিকেট নিয়ে তো তিনি কম্যুনিস্ট পার্টি করেন নি। কারো পরিচয়ে তো ঝাঁপিয়ে পড়েননি আন্দোলনে। কোনো লাভের আশায় গান বাঁধেননি রাতের পর রাত জেগে। সুর চড়াননি গলায়।

এই মুহূর্তে তার চোখের সামনে বিক্রত মুহূর্তরা ভিড় করে এল। সেই—কারো পরিত্যক্ত চালাঘরে পার্টি অফিস। জীবন সমর্পিত কটি চোয়ালশক্ত যুবকের লুকিয়ে-চুরিয়ে মিটিং। অনেক মিছিল। মিছিলের সামনে রোদে জলে স্নান করে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে গান গাওয়া। লাঠি হাতে তেড়ে আসা পুলিস। টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটানোর শব্দ। ধরা পড়ার ভয়ে ক্ষুধাতেষ্টা নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো। দীর্ঘদিন পলাতক স্বামীর খোঁজ না পাওয়া সুধার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ। না, আর ভাবতে পারছেন না অনিন্দ্যসুন্দর। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শ্যামলী ভাবল, ঠিক আছে, এখন খানিকটা বিশ্রাম করে নিন উনি। শঙ্খের পাল্লায় পড়ে সন্ধ্যার দিকে বোধ হয় বেশি হাঁটা চলা হয়ে গেছে। এই বয়েসে ক্লান্তি নামা স্বাভাবিক। আলোটা কমিয়ে দিয়ে কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেল শ্যামলী।

পরপর কিছুদিন ব্যস্ততায় অনেকটা হাঁপিয়ে উঠেছেন অনিন্দ্যসুন্দর। খ্যাতি ছড়ানোটাও যে একটা বিড়ম্বনা বুঝতে পারছেন আজকাল। শঙ্খ হববচনরা তাকে ভাঙিয়ে অনেক কিছু করতে চায় এখনই। তাই খুব সতর্ক হয়ে চলতে হচ্ছে। এসবও ক্লান্তিকর ঠেকে। শ্যামলীর আদর যত্নের বহরও দিনকে দিন প্রকট হয়ে উঠছে। ঘবকন্নার শেষে সেও বসার ঘরে এসে আজকাল উপস্থিত জনতাকে সামলায়। হরবচন আব তার দলবল এলে তো কথাই নেই। জটলার মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে ছাড়ে। শ্বশুরেব বিগত জীবনের উজ্জ্বল সাক্ষব রাখার গল্পগুলি গল্পচ্ছলে শুনিয়ে দেয় মাঝে মাঝে বুদ্ধি করে। অনিন্দ্যসুন্দরের গান এবং সংগ্রামের গল্প শুনতে শুনতে হরবচনদের চোখের দৃষ্টি যখন বিস্ফারিত হয়ে যায়, গল্প গিলতে গিলতে মুখ হা-ফাঁক করে অনেকটাই ধ্যানস্থ তারা, শালী তখন চোখে-মুখে উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে সব কৃতিত্বের দাবীটা ছিনিয়ে নেয়।

অথচ কিছুদিন, এমন কি বৎসর কাল আগেও অনিন্দ্যসুন্দর নিজের জীবনের গল্প গল্পচ্ছলে শঙ্খকে যখন বলে শোনাতেন, শঙ্খ কেন, বিশ্বাস করত না শ্যামলীও। হাতের কাজ সেরে হলুদ মাখা হাত কাপড়ে মুছতে মুছতে কিংবা ঝাড়ু হাতে গলায় বিরক্তি টেনে তীব্র অনুযোগ জানাত, এসব গালগল্প ওর কাছে নাই বা করলেন বাবা। তার চে অঙ্কটা একটু দেখিয়ে দিলেও তো পারেন। সামনের মাধ্যমিকে কাজে আসবে। 'গাল গল্প' শব্দটা এখনোও মাঝে মাঝে কানে বাজে। ছ্যাৎ করে ওঠে বুক। শ্যামলীর উদ্যত বর্শাফলক সহসাই যেন ভেতরটা এফোঁড় ওফোঁড় করে।

তখনই মনে পড়ে সুধাকে। কী অগাধ বিশ্বাস ছিল তার স্বামীর উপর। কী অসীম আবেগ আর শ্রদ্ধা নিয়ে শুনেছে সে তার উত্থান পতনের গল্প। কখনো তো সন্দেহের সূঁচে হুল ফোটায় নি কোনো। অথচ তার এমন কোনো সাফল্যের বার্তা শুনে যেতে পারেনি সুধা। আজ সুধা বেঁচে থাকলে বড় ভাল হত। সাফল্যের আনন্দের ভাগ দিতে চেয়ে একজন নিঃস্বার্থ বিশ্বস্ত অংশীদার পাওয়া যেত। ভাবতে ভাবতে বুকটা খাঁ খাঁ করে ওঠে অনিন্দ্যসুন্দরের। বড় একা, বড় বেশি খালি খালি লাগে। না, গান আর গাওয়া হয়না। শ্যামলীর নিত্যদিনের মত রেখে যাওয়া হারমোনিয়ামের সামনে একান্ত বাধ্য ছাত্রের মত বসে থাকেন। কথায় সুর জড়াতে চান। ক্লান্তি আসে। শেষে মনকে বোঝান, সময় মত সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে। কেবল বর্ষপূর্তির দিনটা প্রতীক্ষা করেন। অলক্ষ্যে থেকে অপেক্ষা করছে সুধা। শ্যামলী আর শঙ্খকে ঐ দিনই চমকে দেবেন তিনি। মনে জোর টেনে এনে

ঠেলে দেন হারমোনিয়াম। জানালায় এসে দাঁড়ান। এই রাতে মধ্য গগনের চাঁদটাকে বড় বেশি ফর্সা ফর্সা লাগে।

অনিন্দ্যসুন্দরের উদ্বেগ উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার মাঝে দিন কাটাতে কাটাতে আগামী কালই বর্ষপূর্তি উৎসব পড়ছে। চতুর্দ্দিকের টানটান উত্তেজনায় তিনি অনেকটাই হতভম্ব। শ্যামলী আর শঙ্খের মধ্যে উদ্যোগপর্বের ব্যাপারটা তাকে থ বানিয়ে ছাড়ছে। তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি মত বিনিময় সন্ধিস্থাপন যন্ত্রবৎ ব্যস্ততা কী রকম অস্বস্তির জন্ম দিচ্ছে অনিন্দ্যসুন্দরের মাঝে। ভাবছেন, কালকের দিনটা কি ভাবে কখন আসে কে জানে।

সময়ের চলমান ঘূর্ণিতে আজই বর্ষপূর্তির ভোর। কাল রাতটা বড় উত্তেজনাময় কেটেছে অনিন্দ্যসুন্দরের। তাকে তাড়াতাড়ি শুতে পরামর্শ দিয়েছিল শ্যামলী। তাড়াতাডি রাতের খাবার খাইয়ে শুতে পাঠিয়েছিল বিছানায়। একটা নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনার মাঝে এপাশ ওপাশ করতে করতে চোখে নেমে এসেছিল পাতলা কুয়াশার মত ঘুম। ঘুমের মধ্যে ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন। স্বপ্ন কেটে যেতেই জেগে উঠেছিলেন আবার। বাইরে গেছেন তখন। এসে অন্ধকারেই বিড়ি ধরিয়েছেন। বিড়ি টানতে টানতে চাপা টেনশন ধোঁয়াব সাথে গিলতে চেষ্টা করেছেন গলায়। তাই বিড়িটা শেষ করেও কতক্ষণ জেগে পড়ে রইলেন বুঝতে পারেননি। অনুভাবনায় তখনই এক ঘন আনন্দ চেতনা দেখা দেয় তার, শঙ্খ আর শ্যামলীর কাছে কালই বিজয়ী হতে যাচ্ছেন তিনি। কতদিন থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অনিন্দ্যসুন্দর শঙ্খ যেন তাকে বিশ্বাস করে। সামান্য মর্যাদা দেয়। কিন্তু বার বার তার বক্তব্যের সারৎসার তার কাছেই ফিরে এসেছে। শঙ্খ নেয়নি। নীরবে থেকেও বুঝিয়ে দিয়েছে অনিন্দ্যসুন্দব তার সন্দেহের উর্দ্ধে নন। কিন্তু যেদিন গুণীজন সম্বর্ধনার চিঠিটা পেলেন, এরপর থেকে শঙ্খ অচানকই দাদুর প্রতি অবাক করা মনোযোগ খুঁজে পেয়েছে। দাদুর কাছে শোনা গল্পই শুনতে চায় আবার। চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারেন অনিন্দ্যসুন্দর প্রিয় নাতিটি তাকে খানিকটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে আজকাল। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে এক প্রত্যয়ী পুরুষ গভীর ঘুমে চৈতন্য হারিয়েছিলেন বুঝতে পারেন নি।

আজ মিছিলের 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে জেগে উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর। এই প্রথম তিনি পার্টি অফিসে দলীয ফ্লাগ তুলতে আমন্ত্রিত হয়েছেন। গেল কাল সন্ধ্যার দিকে হরবচন দলবল নিয়ে এসেছিল তাকে আমন্ত্রণ জানাতে। দক্ষ সেক্রেটারীর মত শ্যামলী তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে আটটার মিটিং শেষ হতে হতে দশটা এগারোটা বেজে যাবে দুপুরের আগেই নাওয়া খাওয়া করে শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন তিনি। শহরটা তো কম দূরের পথ নয়। বিকেলে বিকেলে পৌঁছে কোনো এক আত্মীয়ের বাড়িতে খানিকটা বিশ্রাম নেবেন অনিন্দ্যসুন্দর। সন্ধের আগেই পৌঁছে যেতে হবে টাউন হলে। ছ'টায় শুরু হবে গুণী বরণ আসর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যাপারটা মেনে নিতে হয়েছে হরবচনদের। নিজে থেকে কোনো কথায় জড়াননি তিনি।

তারপরও হরবচন আবদার করেছিল, তারা একটা জীপ ভাড়া করে নিয়ে আসবে। পার্টির ছেলেরাও চাইছে অনিন্দ্যসুন্দররে সংগে টাউন হলে যাবে বলে। কী জানি কী বুঝে বারণ করে দিল শ্যামলী। বলল, দত্তদের টেম্পোকে আগে থেকেই বলে রেখেছে শঙ্খ। বিশালগড় পৌঁছে দেবে। ওখান থেকে তো পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর বাস।

কিন্তু হরবচনের কথায় স্পষ্ট বোঝা গেল, সে যেভাবেই হোক টাউন হলে যেতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী আর রাজ্যপাল উপস্থিত থাকবেন। রাজ্যপাল নিজের হাতে দেবেন মানপত্র আর পট্টবস্ত্র। পার্টির অনেক নামী দামী লোক জড়ো হবে। টিভি ছবি নেবে। বেতাব সংগ্রহ করবে সংবাদ।

হরবচনকে বুঝে, সিদ্ধান্তে অটল থেকেই এবার খুব সুন্দর করে বলল শ্যামলী, তোমরা যাবে? বেশতো যাওনা। এ তো ভাল কথা। উনাকে অভিনন্দন দেয়া হচ্ছে এটা তো গাঁয়েরই গর্বের বিষয়। আলাদা ভাবে গেলেও টাউন হলে শঙ্খই তোমাদের খুঁজে নেবে। তোমরা সঙ্গে রয়েছ জানলে, এখানে আমিও স্বস্তিতে থাকব।

না, একদম চটল না হরবচন। শেষ পর্যন্ত বেশ হাসি মুখে মেনে নিল সিদ্ধান্তটা।

অনিন্দ্যসুন্দর দেখেছেন, হরবচন আজকাল শ্যামলীকে বেশ প্রাধান্য দেয়। দেবে না। অনিন্দ্য ছেলের জন্যে শহর থেকে পার্টি ঘেঁষা বউ এনেছেন। তায় সে আবার বি.এ. পাশ। স্বামী বিদেশে চাকরী করলেও ছেলে নিয়ে গাঁয়েই থেকে গেছে এই নির্বিবোধী মেয়েটা। তবে স্বামী এবং শ্বশুরের উপর একদম প্রভাব বিস্তাব না করতে পেরে একটা ক্ষোভও জন্মেছে সঙ্গোপনে। টের পান অনিন্দ্যসুন্দর। কিন্তু বিদ্রোহিনী হয়নি সে কোনোদিন। এখন আচমকা শ্বশুরের সূত্রে সে এক লাফেই বাইরে বেবিযে পড়ার একটা সুযোগ পেযে গেছে। লক্ষ্য করেছেন তিনি, কদিন আগেও যেসব লোকজন তাকে একটি সাধাবণ গাঁযেব বধূব বেশি মূল্য দিত না, তারাই তার সঙ্গে জটিল সমস্যা নিয়ে শলা-পরামর্শ করে। তার মতামতটার যথার্থ মর্যাদা দেয় আজকাল। সেই শ্যামলীই যখন শেষ সিদ্ধান্ত বেশ দৃঢভাবে উচ্চারণ করল, অনিন্দ্যসুন্দর শঙ্খের সঙ্গে আলাদা কবে যাবেন, একবাক্যে মেনে নিল সবাই।

অনিন্দ্যকে নিয়ে সাড়ে পাঁচটায় শঙ্খ যখন টাউন হলের সামনে পৌঁছল সন্ধ্যা তখন আবছার মত নামছে।

টাউন হলের বাইরে ভেতরে এখন এক চোখকাড়া আলোক সজ্জা। সামনেব লনেব একপাশে সার সার স্কুটার আর চকচকে মোটর গাড়ী। অগুন্তি লোকজন বাইরে ভেতরে। কী রকম বাহারি সাজ পোষাকওয়ালা যুবক যুবতীর ভিড়। কেমন যেন একটা আভিজাত্যের আবহাওয়ায় সহসাই এসে পড়েছেন অনিন্দ্যসুন্দর। ভাবলেন, এতো সুখী সুখী সম্ভ্রান্ত মানুষ সবই কি আজকাল কমরেড। প্রবীণদের চেহারা চরিত্র আদব কায়দাও অচেনা ঠেকেছে। খুব অস্বস্তির মত হচ্ছে। হবে না। আগে যখন পার্টির মিটিং কিংবা ফাংশন হত, তখন হত দুর্গাবাড়ি বা চিলড্রেনস পার্কের খোলা মঞ্চে। রবীন্দ্রভবন বা টাউনহলের চোখ ধাঁধানো ডায়েস অডিটোরিয়ামের সঙ্গে তার পরিচয় নেই কোনোদিন।

অস্বস্তিটা বাড়ছে অনিন্দ্যসুন্দরের। কথা ছিল, কর্মকর্তারা গেটেই অভ্যর্থনা জানাবেন। শঙ্খকে ফিসফিসিয়ে বললেন, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো।

শঙ্খও ভেতরে ভেতরে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছে। এরকম অনুষ্ঠানে সেও খুব একটা অভ্যস্ত নয়, তার চালচলনে স্পষ্ট ফুটে উঠল। সে খুঁজছিল, হরবচনদের। কাউকে না পেয়ে ভ্যাবলাকান্ত মুখ করে চারদিকে তাকচ্ছে।

এরই মধ্যে কর্মকর্তাদের একজন অনিন্দ্যসুন্দরকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলেন কাছে। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে পেছনে আরো ক'জন। নমস্কার জানিয়ে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন ভেতরে। বসিয়ে দিলেন একদম প্রথম সারির একখানা চেয়ারে। শঙ্খ বসতে পেল কয়েক সারি পেছনে।

আরো ক'জন গুণীর পাশাপাশি বসে আছেন অনিন্দ্যসুন্দর। দু একবার এঁদের দিকে তাকিয়ে নিজেকে কেন জানি বড় অকিঞ্চিতকর লাগছে। আর সঙ্গেই সঙ্গেই একটা ভয় — কী বলতে হবে তাকে এখন। কী-ই বা বলবেন তিনি, এই বিদগ্ধ জনতাকে সম্বোধন করে। গলাটা শুকিয়ে আসছে। একগ্লাস জল পেলে বড় ভাল হত। টাউনহলের এই অডিটরিয়াম এখন জনারণ্য। একটা চাপা গুঞ্জন হুম হুম আকারে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। পেছনে দৃষ্টি

ঘুরিয়ে শঙ্খকে খুঁজলেন অনিন্দ্যসুন্দর। যেন অবলম্বন খুঁজলেন। কিন্তু সহসা খুঁজে পাওয়া গেলনা তাকে।

হঠাৎই একটা হই চই ব্যস্ততা। উদ্যোক্তাদের ছুটোছুটি। ব্যাপারটা না বুঝে ভড়কে গেলেন অনিন্দ্যসুন্দর। পাশের গুণী ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

উনি দুপাশের দর্শকাসনের মধ্যে এক ফালি রাস্তাটায় তাকিয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে জবাব দিলেন, রাজ্যপাল আব মুখ্যমন্ত্রী এসে গেছেন বোধহয়। হ্যাঁ, দু'জন ভি-আই-পি এক ডজন লোকের ভিড়ে ভিড়ে মঞ্চে এসে উঠলেন, মাইকে তাদের আসার ব্যাপারটা ঘোষিত হল। এরপর কি কি ব্যাপার পরপর ঘটে গেল, অনিন্দ্যসুন্দব ঠিক বুঝতে পারেননি। একদম ভাল না লাগা থেকে একটা ভয় আর টেনশনে হাত পা অবশ হযে শরীরটা কেমন নির্ভার হয়ে গেছে যেন। ঐ আলোয় ঘেরা মঞ্চে উঠে তাকে কথা বলতে হবে, হয়তো গানও শোনাতে হতে পারে। কী গাইবেন তিনি, কী-ই-বা বলবেন কিছুই আসছে না মগজে ভাল মত। সহসাই ভাবলেন, তিনি কি চুপি চুপি পালিয়ে যাবেন?

কিন্তু তাহলে শঙ্খেব কাছে চূড়ান্ত হেরে যাবেন তিনি। সে হয়না। শঙ্খ তাকে চোখে চোখে রেখেছে। শ্যামলীও উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে বাড়িতে। আজ তাঁর চূড়ান্ত পরীক্ষার দিন।

ক'জন গুণীর সম্বর্ধনা হয়ে গেলে ঘোষক মাইকে অনিন্দ্যসুন্দরের নাম ঘোষণা করে তাকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ কবলেন। দু'জন যুবক দৌড়ে এসে হাত ধবে তাঁকে মঞ্চে নিয়ে গেল।

যেতে যেতে রীতিমত ঘামছেন অনিন্দ্যসুন্দব। কী করে যে রাজ্যপালের হাত থেকে পট্টবস্ত্র আব মানপত্র নিলেন যন্ত্রচালিতের মত, বলতে পাববেন না। মাইকে তখন তাঁব প্রশংসামূলক বায়োডাটা আবৃত্তির মত পাঠ কবা চলছে। একটা স্তব্ধতার পর কবতালিতে ভরে যাচ্ছে অডিটরিয়াম।

না, কোনো পুলক জাগছে না তার। উপভোগ কবার মত সত্যিই তাঁর মনেব অবস্থা নেই। দারুণ এক অস্বস্তির মধ্যে দর্শকাসনে ব্যাকুল ভাবে খুঁজছেন কেবল শঙ্খেব মুখ।

তাঁর এই ব্যাকুলতার মাঝেই পরিচালক ঘোষণা করলেন, এখন মাননীয় কমরেড শিল্পীকে অনুরোধ কবা হচ্ছে, তিনি যেন শ্রোতৃমণ্ডলীকে নিজের কর্মময় জীবন থেকে দু চারটি কথা বলেন।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে অনিন্দ্যসুন্দর এবার পুরোপুরি নার্ভাস হয়ে গেলেন। মনে হল, দেহটা পুরোপুরি অবশ হয়ে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন তিনি।

অধীর প্রতীক্ষায় নীরব অডিটরিয়াম। দু চারটে কথা বলতে উইংসের পাশ থেকে বার বার অনুরোধ আসছে, অনিন্দ্যবাবু বলুন। শুরু করুন। আপনার যেমন খুশি বলে ফেলুন। চেষ্টা তো কবছেন তিনি। বলতে চাইছেন। ঠোঁট কাঁপছে। কিন্তু স্বর ফুটছে না। অডিটরিয়ামে এবার গুঞ্জন উঠছে। উঠতে উঠতে বাড়ছে।

বেগতিক দেখে পরিচালক দৌড়ে এলেনে মাইক্রোফোনে। পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে মাউথপিসে মুখ এনে বিরক্ত জনতাকে অনুরোধ করলেন, আপনারা শান্ত হোন। ধৈর্য্য ধরুন। কমরেড রায় কোনো বক্তা নন। তিনি আমাদের কালচারেল ফ্রন্টের গণ সংগীত শিল্পী। বক্তব্য রাখতে বলে আমরা শ্রদ্ধেয় শিল্পীর প্রতি অবিচারই করেছি। জন জাগরণের গান গেয়ে একসময় লক্ষ লক্ষ ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়েছেন এই শিল্পী। তাই আজ আমরা তাঁকে তাঁরই রচিত এবং সুরারোপিত একখানা গান শোনানোর জন্যে অনুরোধ জানাতে পারি। অডিটোরিয়াম শান্ত হল মুহূর্তে।

বুকে ব্যাজ আঁটা কারা যেন ছুটে এল। মঞ্চে বসিয়ে দিয়ে গেল অনিন্দ্যসুন্দরকে। একজন নিয়ে এল একটা হারমোনিয়াম।

মাইক্রোফোনটার মাউথপিস নামিয়ে মুখের কাছে ফিট করে দিয়ে গেল কেউ। হারমোনিয়ামের চাবিগুলো খুলতে খুলতে অগুন্তি দর্শকমণ্ডলীর দিকে তাকাতেই এক করুণ দশা হয়ে গেল অনিন্দ্যসুন্দরের। মনে হল, মঞ্চ থেকে ওদের মাঝে এক বিরাট মাঠ নেমে এসেছে। মাঠ পেরিয়ে অত দূরে তার কাছে কিছুতেই তাঁর গলা পৌঁছতে পারবে না। হারমোনিয়ামের বাজনার সাথে সাথে বার কয়েক কাঁপল তার ঠোঁট। কিন্তু সুর বেরোল না। মনে হল, সবকিছু ভুলে গেছেন তিনি। কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? কী গাইবেন। না, মনে আসছে না কিছুই।

দেখতে দেখতে মনে হল, এই হাজারো শিক্ষিত রুচিবান দর্শকের সমুদ্রের যেন পিছনে ভেসে যাচ্ছেন অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁর শরীর কাঁপছে। তাঁর অস্তিত্বের শেকড় মাটির আকর্ষণ ছাড়িয়ে বাতাসে ভেসে অডিটবিযাম ছাড়িয়ে বাইরে মহাশূন্যে ভেসে যাবে একটু পরেই। একটু পরেই মহাশূন্যে ভাসতে থাকবেন তিনি। এই পৃথিবী, এই শ্রোতৃ মণ্ডলী, তার রচিত গান, আজীবন সংগ্রাম সব কিছু বর্ণহীন গন্ধহীন তুচ্ছ মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। অডিটরিযামের দর্শকরা এবার যথারীতি বিরক্ত। গুঞ্জন এখন হট্টগোলে বদলে গেছে। হাসিব হুল্লোড় উঠছে।

পরিচালকবর্গ তৎপরতায অডিটরিয়ামেব আলো নিবিযে দিলেন। মঞ্চেব আলোব বন্যায এখন এক বিপর্যস্ত অনিন্দ্যসুন্দব। মুহূর্তেই তাব সামনে এক ঢেউ খেলানো অন্ধকাব। অন্ধকারের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা। তবঙ্গমালা থেকে ছিটকে বেরিযে আসছে খিস্তি-খেউড, ঠোঙার কাগজের ঢিল, বাদামের খোসা। ব্যঙ্গভরা সিটি।

না উদ্যোক্তারা আর রিস্ক নিতে ভরসা পেলেন না। ঘোষক আবাব দৌড়ে এলেন মাইক্রোফোনে। বিপন্ন ভঙ্গিতে বললেন, শ্রোতৃমণ্ডলী আপনারা শান্ত হোন। দয়া কবে ধৈর্য্য ধরুন। এই মাত্র খবর পাওয়া গেল, মাননীয় অনিন্দ্যসুন্দর রায গুরুতর অসুস্থতা নিযেই তিনি আজ কেবলমাত্র আমাদের অনুরোধ রক্ষা করতেই এখানে এসে উপস্থিত হযেছেন। তাঁর শরীরের তাপাঙ্ক এখন যথেষ্ট উপরের দিকে। রক্তচাপও সারাদিন বেশি বেশি ছিল। তাঁর গান শোনার চেয়ে তাঁকে শুভ কামনা জানান। এখন তাঁকে আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে অসুস্থতার কারণেই বিদায় নিতে হচ্ছে।

এক দু সেকেন্ড থামলেন ঘোষক। পরিস্থিতি লক্ষ্য করলেন সতর্কে। এবং শুরু করলেন আবার। এক্ষুনি মঞ্চে আসছেন, কলকাতার বিখ্যাত গণ সংগীত শিল্পী শুভেন্দু চৌধুরী। তাঁর রচিত সংগ্রামী মানুষের গান আপনাদের চিত্ত ভরিয়ে দেবে বলে আশা রাখছি। অশান্ত অডিটরিয়াম শান্ত হল মুহূর্তে। কারা এসে অনিন্দ্যসুন্দরকে হাত ধরে মঞ্চের পাশে উইংসের আড়ালে নিয়ে বসাল। উইংসের আড়ালেই এক বুক অপমানের জ্বালা নিয়ে বসে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর। একাকী আবছা অন্ধকারে। উদ্যোক্তাদের, ভলান্টিয়ার্সদের কেউ একজনও এখন তাঁর কাছে নেই। পাঞ্জাবির হাতায় মুখের ঘাম মুছে চেয়ারে পিঠ হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইলেন অনিন্দ্যসুন্দর।

ক' মিনিট পরেই শঙ্খের তীক্ষ্ণ 'দাদু' ডাকে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন অনিন্দ্যসুন্দর। কখন সে অডিটরিয়ামের পাশ-বারান্দা দিয়ে মঞ্চের পেছনের দরজায়, ভেতরে এসে কাছে দাঁড়িয়েছে, একদম বুঝতে পারেননি। শঙ্খের হ্যাঁচকা টানেই উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। সারা শরীরে ঝিম ধরা ভাবটা ভালো করে কাটেনি তখনও।

হাত ধরে হুড়মুড় করে তাঁকে বাইরে নিয়ে এল শঙ্খ। বাইরে এসে শক্ত করে ধরে রাখা হাত ছেড়ে দিতেই খানিকটা হালকা বোধ করলেন তিনি। এখন কোনো কথা না বলে আগে

আগেই হেঁটে যাচ্ছে শঙ্খ। খানিকটা দূরত্বে পেছনে পেছনে অনিন্দ্যসুন্দর। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে শঙ্খ অপমানিত বিরক্ত ক্রুদ্ধ। খানিকটা হেঁটে গিয়ে পেছনে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো সে।

অনিন্দ্যসুন্দরকে আগাপাশতলা লক্ষ্য করে বলল, আজ কি হল দাদু, একেবারে আসর মাত করে ছাড়লে যে বড়?

তীক্ষ্ণ আক্রমণটা গায়ে না মেখে জবাব দিলেন অনিন্দ্যসুন্দর, আসলে আজ কী হয়ে গেল না শঙ্খ, কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে এটা কী সত্যি নয়, মানুষের গান মঞ্চে হয়, না। শেষ করে দম ফেলতে পারলেন না তিনি। গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে উঠল শঙ্খ, তুমি বললেই আমি বুঝব! একটা দু'টো কথা, দু এক লাইন গানও শোনাতে পারলেনা! ছি ছি, তোমাকে নিয়ে দর্শকরা যেরকম হাসাহাসি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করল, লজ্জায় মাথা কাটা গেছে আমার।

কিন্তু তুই বিশ্বাস কর শঙ্খ, সত্যিই আমি ভাল গাইতে পারতাম। আমার গান শুনে.. ..হন হন করে রাগে পা ফেলে এগোচ্ছিল শঙ্খ। দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। টেনে নিল বৃদ্ধের মুখের কথা। অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় অনিন্দ্যসুন্দরের গলা নকল করে শেষ করল তারই অসমাপ্ত বক্তব্য — আমার গান শুনে দর্শকরা একদিন পাথর বনে যেত। এই বলতে চাইছ তো?

অনুনয়ে ভেঙে পড়লেন অনিন্দ্যসুন্দর। সত্যিই হাজার মানুষের জটলায় গ্রামে-গঞ্জে, শহরের ময়দানে ঠায় দাঁড়িয়ে মানুষ আমার গান শুনত।

গর্জে উঠল শঙ্খ এবার, চুপ কর দাদু, চুপ কর। আর বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলো না। আজ যা ঘটে গেল, তার পরে তোমার মুখে আর যদি কোনো দিন.......

কে যেন চাবুক মারল অনিন্দ্যসুন্দরকে। মুহূর্তে তার ঝুঁকে পড়া শরীর ঋজু হয়ে দাঁড়াল। খপ করে এগিয়ে এসে ধরলেন শঙ্খের হাত। টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেলেন চিলড্রেন্সপার্কের মাঠটায়। জোর করে বসিয়ে দিলেন বিবেকানন্দ মূর্তিটার পদতলে। সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে বললেন, শুনবি আমার গান, তবে শোন। দেখ, আমি কী করকম গাইতে পারতাম। মঞ্চে নয়। খোলা মাঠে। ময়দানে। মানুষের গান।

গান ধরলেন অনিন্দ্যসুন্দর। সব আড়ষ্টতা যেন কেটে গেল ধীরে ধীরে। দিব্যি তার এক উদাত্ত কণ্ঠ।

শুনে ধীরে ধীরে অবাক হয়ে যায় শঙ্খ। বিশ্বাস হয় না যেন তার। কী সাবলীল কণ্ঠ। গলায় কী এক ঘুম ভাঙানোর আর্তি। যেন পঁচিশ ত্রিশ বছরের এক যুবকের দরাজ গলায় দাদুর কাশি জড়ানো ফ্যাসফ্যাসে গলার সুরটা ডুবে গেল। আরো অবাক হয়ে দেখল সে, দাদুর শরীরটা এখন, এই মুহূর্তে ঝুলে পড়া কুচকানো চামড়ায় মোড়া নয়। এক সাহসী দৃপ্ত যুবকের তেজোদীপ্ত গোটা অবয়ব।

কতক্ষণ সম্মোহিত হয়ে শঙ্খ গান শুনছিল বোঝে নি। হঠাৎ লক্ষ্যে পড়ল, তুলসীবতীর গেট, দুর্গাবাড়ির গেট, রবীন্দ্র ভবনের দিকের গেট দিয়ে একজন দু'জন করে পথচারী শ্রোতারা ঢুকে পড়ে ঘিরে রয়েছে দাদুকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছে তাঁর গান। দেখতে দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল আলো ছাড়া ঘেরা মাঠটায়। দাদু তখনও মাঝখানে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে গাইছেন। গাইছেন তো গাইছেনই —

দাগ

অমল মজুমদার

সকাল থেকেই বি ডি ও অফিসের সামনে ভীড় জমে উঠেছে। ভীড় জমার নানা কারণই সম্ভব — নতুন বীজ ধান, এককালীন অর্থ-সাহায্য কিংবা এগুলো না হওয়ার কারণে বিক্ষোভ-সমাবেশ। কিন্তু আজকের ভীড়ের কাবণ একটু ভিন্ন। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্বাধীন সরকার মশাই এসেছেন সরকারী তদন্ত কমিশনের প্রধান হয়ে। আজ তার প্রকাশ্য অধিবেশন। অভিযোগে প্রকাশ, গত মাসের প্রথম দিকে কালীগঞ্জ থানার পশ্চিমে সাতগাছি নামে কোনো নিম্ন চাষী-প্রধান অঞ্চলে পুলিশ তল্লাসির নাম কোরে জনসাধারণের উপরে নির্মম অত্যাচার চালায়। ফলতঃ দু'জন চাষী নিহত এবং বেশ কিছুসংখ্যক আহত হয়। পুলিশেব পক্ষ থেকে বলা হয় যে, কালী সর্দার নামে এক উগ্র কৃষক নেতা এই অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে এসে আশ্রয় নেয়। খবর পেয়ে পুলিশ তল্লাশীতে গেলে এই অঞ্চলেব চাষীবা বাধা দিতে আসে। লাঠি এবং তীর ধনুক ব্যবহৃত হয বলে পুলিশেব তরফ থেকে জানানো হয়েছে। আত্মরক্ষার তাগিদে পুলিশ দুই রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে এবং তাতে দু'জন চাষী নিহত হয়। পুলিশেব তবফেও বেশ কিছু আহত হয়েছে।

কিন্তু ঘটনার পব থেকেই উত্তেজনা বাড়তে থাকে। স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযোগ কবেন যে, পুলিশ বিনা প্রবোচনায় প্রচুব গুলি চালায় এবং যথেচ্ছ অত্যাচার করে।

আমরা সাংবাদিকরা এরকম অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগেব সাথে এত পবিচিত যে, এই রকম একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনায়, যাই হোক না কেন, খুব একটা উত্তেজিত বোধ কবি না। কিন্তু আজ উত্তেজনার কারণ অন্যত্র। গুলি চালানো এবং তাতে দু'জন চাষীব মৃত্যু — পাশবিকতার এই রূপকে আজকাল পশুরা খুব একটা লজ্জাব কারণ বলে মনে করে না, কিন্তু এর যে আর একটা চেহারা আছে, তাকে কিন্তু আজও পশু সমাজ লুকিয়ে রাখতে চায়। তাই মহুয়া নামে কোনো এক মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচাব চালানো হযেছে — এই অভিযোগ কালীগঞ্জ থানা ডিঙ্গিয়ে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার মুখে প্রকাশ পেলে, ঘটনাটি আমাদের, অর্থাৎ সাংবাদিকদেব, দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ গুলি চালানোর ঘটনাব চেয়ে এই নারী ধর্ষণের অভিযোগই বেশী গোলমেলে অবস্থাব সৃষ্টি করে। বিধানসভার বিরোধী সদস্য মন্মথ মণ্ডল কালীগঞ্জ থেকে নির্বাচিত। ফলে অভিযোগের গুরুত্ব বেশ বৃদ্ধি পায়। অবশেষে সরকার এক তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী স্বাধীন সরকারের নেতৃত্বে সরকারী তদন্ত কমিশন আজ কালীগঞ্জ বি ডি ও অফিসে প্রকাশ্য অধিবেশনে বসছেন। আর এখানেই সাক্ষ্য দেবে মহুয়া নাম্নী উক্ত মহিলা, যার উপর অত্যাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

যাই হোক, সকালবেলা আমরা একবার স্বাধীনবাবুব সাথে দেখা করলাম। উনি খুব স্বাভাবিক কারণেই তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কোনও মন্তব্য করতে রাজী নন। এক প্রশ্নের জবাবে শ্রী সরকার জানালেন, ইতিমধ্যেই তাঁর কমিশন, থানার দারোগা, উক্ত রাত্রে যে

পুলিশ অফিসার তল্লাশী পরিচালনা করেন এবং জেলাশাসকের প্রাথমিক সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শ্রী সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, তদন্তের আসল সাক্ষ্যই দেবে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা এবং সমস্ত অভিযোগের সত্যতা কার্যত নির্ধারিত হবে এদের সাক্ষ্যের উপর। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, অভিযোগের অবশ্যই গুরুত্ব আছে, এবং আছে বলেই সরকার নিজে তদন্ত না করে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন। জানা গেলো, মহুয়া দেবী আজ দুপুরের কিছু পরে সাক্ষ্য দিতে আসবেন বলে স্থানীয় এম এল এ শ্রীমণ্ডল জানিয়েছেন।

আমরা বেরিয়ে আসতেই কিছু জনতা, গ্রামের দিকে যাঁরা নিজেদের অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত মনে করে এবং তার প্রমাণ হিসাবে শহুরে ভদ্রলোকের সাথে গ্রামের সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলেন, সেই শ্রেণী আমাদের ঘিরে ধরলো। তাদের নানা প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো, তবু যা হোক কোরে বেরিয়ে আসা গেলো। কিন্তু একটা ব্যাপার আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো — এরা সবচেয়ে বেশী উৎসাহী মহুয়া দেবীর সাক্ষ্যে। তাই আমি এবং বন্ধু ফটোগ্রাফার মিলনবাবু প্রায় একই সঙ্গে ঠিক করলাম — সাতগাছি গিয়ে মহুয়া দেবীর সাথে দেখা করতে হবে।

কলকাতা থেকে হঠাৎ যারা গ্রামের পথে আসেন, পথে পথে ঘুরে বেড়াতে তাদের ভীষণ আনন্দ। পালক যেমন ঝোড়ো বাতাসে ঠিকানাহীনভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে, তেমন এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন পথ চলায় তারা হঠাৎ কোরে মুক্তির স্বাদ পেয়ে বসেন। বাঁশবনের বাণিজ্যিক মূল্যই হয়ত প্রধান, তবু শুকনো বাঁশপাতা মাড়িয়ে সাতগাছি অভিমুখে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রায়ই এদিক ওদিক চাইতে ইচ্ছে করছিলো। হাঁটুর উপর কাপড়ের অধিকাংশই কোমরে গুঁজে গ্রাম্যরমণী মাঠের কাদায় ছোট ধানের চারা বুনে চলেছে, আর বহুদূর থেকে ধুতি-শার্ট পরা ভদ্রলোক মাথায় ছাতা দিয়ে এগিয়ে আসছে, সবটাই ভারি ভালো লাগে। মিলনবাবুও বেশ উপভোগ করছিলেন। কিন্তু আমি মুখ ফুটে আমার ভালো লাগা প্রকাশ করতেই মুচকি হেসে তিনি বললেন — এ চোখের ব্যারাম! হবে হয়তো!

ঘণ্টা খানেক হাঁটার পরে সাতগাছি পৌঁছোলাম। প্রায় প্রত্যেকেই সন্দিগ্ধ চোখে চাইছে. আমাদের পরিচয় জানিয়ে আমরা আশ্বস্ত করছিলাম। ছোটো ছোটো মাটির বাড়ী। কালো কালো শিশুর দল, সবাই ন্যাংটো, সাত-আট বছর অবধি কারো পরনেই কিছু নেই। প্রত্যেকটি শিশুর উদর স্ফীত, পিলের ভারে। আমরা অল্পকালের মধ্যেই এদের দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে গেলাম। নাভির চারপাশে ধুলো লেগে, হাঁটু অবধি মাটি লেগে ধূসর, দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বিভিন্ন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নির্বাক মুখে অথচ বিস্ময়ে সরব চোখে আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। গ্রামের পথে সার্কাসের প্রাণীগুলোকেও সম্ভবত এরা এই চোখেই দেখে থাকে। মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে চাষী-রমণী ঘোমটার আড়ালে আমাদের লক্ষ্য করছিলো, সম্ভবত চোখে চোখ পড়তেই আড়াল হয়ে গেলো। গল্পের বইয়ে এমনটি জেনেছি, আগেও দু'একবার দেখেছি। কিন্তু একমাত্র শিশু ছাড়া আর সকলেরই মুখ বিমর্ষ এবং আতংকিত বলে মনে হলো।

একজন প্রধান গোছের আমাদের পরিচয় জানার পর, মৃত চাষীদের পরিবারে নিয়ে গেলেন। আমরা গেলাম। কান্নার আওয়াজও পেলাম, তবে মনে হলো, কান্নাটাও অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে, এই আশংকায় তা রুদ্ধ।

মহুয়া দেবীর বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম। ধারণা ছিলো, হয়তো প্রচুর লোকের সমাগম দেখব, হয়তো সমস্ত বাড়ীতে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধ ব্যস্ততা লক্ষ্য করবো। কিছুই না। কিন্তু এক অজানা অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা যেন সর্বত্র বিরাজ করছে।

আলাপ হলে বুঝলাম, দেবী বলার প্রয়োজন নেই। নেহাত ছোটো মেয়ে মহুয়া — কিশোরী। গায়ের রং কালো। আধময়লা লালচে শাড়ী পরে এসে বসলো। ভীত চোখে আমায় একবার দেখে চোখ নামিয়ে নিলো। বুঝলাম, চোখ তুলে চাইতেও বেচারীর কষ্ট হচ্ছে।

গভীর রাতে মাটির মেঝেয় মহুয়া ঘুমিয়ে ছিলো। বারান্দায় দাদা শোয় — বিছানায় বাপ। মা নেই, বহু আগে গত। গ্রামে এখনও মানুষকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। আলো বলতে সূর্যের আলো-কুপির আলো নেহাৎই নগণ্য। তাই বেশী রাত অবধি জেগে থাকাটা নিয়ম বিরুদ্ধ। হঠাৎ দাপাদাপি চীৎকারে মহুয়ার ঘুম ভেঙ্গে যায়। জেগে উঠে দেখে, বাপ-দাদা উঠে দরজা খুলে বাইরে — হাতে লাঠি।

আমি নোট করছিলাম দ্রুত। কেন না পুলিশের তরফ থেকে অভিযোগ ছিলো — অধিবাসীরা লাঠি এবং তীর ধনুক সহকারে বাধা দেয় পুলিশ বাহিনীকে। জিজ্ঞেস করলাম — লাঠি হাতে কেন?

— ভাবলাম কি, ডাকাত পইড়েছে বুঝি! আমিও তো কাঁচি লিইছিলাম!

— তারপর?

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তারা বুঝতে পারে, এ বাহিনী ডাকাতের চেয়ে বড়ো এবং সাংঘাতিক কিছু, কেন না বন্দুকের আওয়াজ পাওযা গেলো। এ আওয়াজ এদের অচেনা নয়।

বাপ-দাদাবা লাঠি হাতেই দৌড়ে গেলে, আমিও ওই দিকে যাবো কিনা বারান্দাব ওই খুঁটি ধবে দাঁইড়ে দাঁইড়ে ভাবতেছিলাম — মহুয়া আমায খুঁটিটা দেখায়।

আমি মহুয়ার মুখেব দিকেই চেযেছিলাম। মলিন, অথচ কী সুন্দর। আমি কথা বলতে যাচ্ছি আব মনে হচ্ছে — এই রমণীয অবস্থাকে বিধ্বস্ত কবতে চেযেছিলো যে বর্বর, সম্ভবত পৃথিবীর হিংস্রতম জন্তু সে?

খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ঘুম জড়ানো চোখে সে ওইদিকের অন্ধকাবে চেযেছিলো। আশংকা বাপ আর দাদাকে কেন্দ্র কোরে — কেননা গুলিব আওযাজ চীৎকার চেঁচামেচি সমস্ত কিছুর উৎস তখন সামনের ওই ভয়ানক অন্ধকাব। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে কে যেন তার কাঁচি ধবা হাতটাকে চেপে ধরে। হাত থেকে কাঁচিটা পড়ে যায় — মহুয়া চীৎকার কোরে ওঠে। কিন্তু সেই চীৎকার বৃহত্তর আওয়াজের কাছে পরাজয় স্বীকাব কোরে নেয।

সমস্ত বকমের প্রতিবাদকে আগ্রহ্য কোবে সেই শয়তান — মহুযা শয়তানের চেয়ে বড়ো গালি জানে না — সেই শয়তান তাকে টেনে হিঁচড়ে নিযে যায পাশের ওই জঙ্গলেব দিকে। দুটো থাবা — আর যেন বলতে পাবে না মহুয়া — দুটো থাবা তাকে বার বার আঘাত করতে থাকে। বুকের পাঁজর খুলে যাবে বলে মনে হতে থাকে। শকুনের ঠোঁটের মতো শয়তানটাব ঠোঁট তার সমস্ত মুখে চোখে ঠোকরাতে থাকে। খ্যাপা শেয়ালের মতো তাকে কাবু কোরে গিলে ফেলতে চায়। মহুয়া বলে, যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারছিলো যে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে তার প্রতিবাদ করার সমস্ত ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাবে, আত্মসমর্পণই হবে বেঁচে থাকার একমাত্র পথ — কিশোরী হলেও সে তখন পৃথিবীর নিকৃষ্টতম অপরাধের শিকার — আগুন দিয়ে ঝল্‌সে ঝল্‌সে তার মাংস খুবলে খুবলে খেতে চাইছে একটা শকুন — মহুয়া তখনই তার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিলো তার দাঁতে।

নরম ঠোঁটে মহুয়া বলে চলেছে তার কাহিনী। আমার কলমের নিব ঠিক সেই সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করায় একটু ছেদ পড়লো। মিলনবাবু এক গ্লাস জল চাইলেন পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা প্রধান গোছের লোকটার কাছে।

বাঁচবার তাগিদ তখন চরমে পৌঁছে গেছে। মহুয়া সমস্ত শক্তিতে সেই লোকটির, কাঁধে রাইফেল যার, রাইফেল উপেক্ষা কোরে থুতনিতে কামড় বসিয়ে দেয়।

এক কিশোরী পরিশ্রম কোরে তার রক্ত-মাংস গড়ে তুলেছে, আর সেই রক্তে-মাংসে পড়েছে সরাসরি আঘাত। কামড় তাই মরণ কামড়। শয়তানেরও যন্ত্রণা আছে। কিন্তু, নির্মম পরিহাস, শয়তানের চীৎকারও পৌঁছোতে পারে না তাব বন্ধুদের কানে। পৌঁছোলে কি হতো, তা মহুয়া জানে না। শুধু এইটুকু মনে আছে, তার কামড়ে থুতনির মাংস উঠে এসেছে সেই শকুনটার — রক্ত তার ঠোঁটে জিভে লেগেছে — কিন্তু লোকে যে বলে রক্তের স্বাদ নোনতা, তা সে বুঝতে পারেনি।

দৌড়ে পালিয়ে এসেছে মহুয়া। সে জানে ও দাগ সহজে ওঠার নয়। আমায় সে স্পষ্ট কোরেই জানালো — ওই দাগ দেখেই সে আসামীকে চিনতে পারবে। ওই দাগ তার আমৃত্যু বহন করবে এক কিশোরীর মর্ম-বেদনাকে।

দাগী আসামী! এ রমণীয় প্রতিবাদের ক্ষমতায় আমি মুগ্ধ।

*   *   *

আমার ধারণা ছিলো মহুয়া হয়তো মিছিল কোরে আসবে। শ্রীমণ্ডল আমায় তেমনই জানিয়েছিলেন। তাঁর দলের পক্ষ থেকেই ওই মিছিলের ব্যবস্থা। কিন্তু দুপুরবেলা মহুয়া যখন এলো — অনেকেই তখন জানতে পারেনি।

আমি দুপুরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম। আর ভাবছিলাম, হয়তো সেই দাগী পালিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের পাপের ছাপ থুতনিতে বহন কোরে। বাংলার রমণীব শৌর্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে স্থান পাবে এই কিশোরী।

আজ বিচারালয়ে প্রকাশ পাবে পাশবিকতার এই কুৎসিত উদাহরণ। বৃটিশ সরকার দুশো বছর ধরে এই পুলিশবাহিনীর অবলা-নিধন-যোগ্যতা গড়ে তুলেছে সম্ভবতঃ বাংলার এই মহুয়াদের বুকে। সেই শকুনটা রাতের অন্ধকারে যে মহুয়া চুরি করতে গিয়েছিলো মহুয়ার, ঠোঁটে থুতনিতে নিয়ে এসেছে সে দাগ — পাপের চিহ্ন!

আজ যখন প্রকাশ পাবে এ সংবাদ — সেই শয়তান কোথায় লুকোবে? কোন্ নির্জন বনে ঘুরে ঘুরে আপস করতে চাইবে শৃগাল-কুকুর বাহিনীর সাথে?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ধড়মড় কোরে উঠেই ছুটে যাই বি ডি ও অফিসে। দেরী হয়ে গেছে। সম্ভবত মহুয়ার সাক্ষ্যও শেষ। অবশ্য আমার তাতে কোনও ক্ষতি নেই। ক্ষতি নেই কেননা সবটাই আমি আগেই জেনে ফেলেছি। সেই দাগী শয়তানকে গ্রেপ্তার করতেই হবে — কেননা, প্রকাশ্য বিচারালয়ে এ সংবাদ প্রকাশ পেলে চেপে যাবার কোনও উপায় নেই।

আমার অনুমান ঠিকই। মহুয়ার সাক্ষ্য হয়ে গেছে। কিন্তু যে সংবাদের জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না, সে সংবাদ হলো — মহুয়া সাক্ষ্য দেয়নি।

দেয় নি! চমকে উঠলাম। কেন দেয় নি! কেউ ভয় দেখিয়েছে! লজ্জায় কাতর হয়ে পড়েছিলো! নাকি, স্বাভাবিক সংকোচ বোধ! কিংবা আরও জটিল কোনো ঘটনা, চক্রান্ত।

দেখলাম, এ প্রশ্নগুলো সবার মুখেই ঘুরছে। কেউই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না। স্বভাবতই আমার পক্ষে এটা ক্ষতিকারক হয়ে পড়লো। আমি সাংবাদিক, সমস্ত খবর ইতিমধ্যেই সংগ্রহ কোরে ফেলেছি — এই আত্মপ্রসাদ বিচারালয়ে উপস্থিতে থাকার ইচ্ছে আমার হলো না — এটাই ক্ষতিকারক।

শ্রী মন্মথ মণ্ডল, বিধানসভার সদস্যের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করলাম। জানতে চাইলাম, যাকে নিয়ে এত রৈ-রৈ, সাক্ষ্যের কাঠগড়ায় ওঠা সত্ত্বেও সাক্ষ্য দিতে সে বিমুখ হলো কেন? শ্রী মণ্ডলের মুখে শুনলাম — বুঝলাম, আমার আশংকাই সত্যি। কাঠগড়ায় উঠেও সে কথা বলতে পারে নি, নেমে গেছে। তাকে কেউ নিঃসন্দেহে ভয় দেখিয়েছে। কেন না, সংকোচ যদি হতো — হতেই পারে, নারীর চূড়ান্ত ক্ষতির সাথে লড়াই করতে হয়েছে মহুয়াকে — তা হলেও সে সাক্ষ্য দিতে পারতো। কারণ, বিচারকক্ষে সে যখন কথা বলতে পারলো না — সমস্ত দর্শককে বের কোরে দেওয়া হয়েছিলো। শ্রী মণ্ডল জানালেন সম্ভবত তাকে আগেই ভয় দেখানো হয়েছে।

একটা টেলিগ্রাম কোরে এসে মিলনবাবুকে বললাম রাতের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যেতে, আমি থেকে যাবো।

— কেন?

— কেননা, সাংবাদিক হিসাবে আমার কর্তব্য অর্ধ-সমাপ্ত। মহুয়ার সাক্ষ্য দিতে না পারাটা রহস্যজনক। পুরো ব্যাপারটা না জেনে আমি যেতে পারছি না।

সন্ধ্যের ট্রেনে মিলনবাবুকে তুলে দিয়ে আমি সাতগাছিতে পৌঁছলাম অন্ধকারে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। সব মিলিয়ে আমি ভাবছিলাম, এরকম কোনও অন্ধকার রাতেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিলো।

রাতে আমার স্পষ্ট পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিলো। কারণ সাতগাছি গাঁয়ের খবর — কমিশনের সাথে সবাই চলে গেছে। অতএব, আমার থেকে যাওয়াটা রহস্যজনক।

প্রধান গোছের লোকটা আমায় চিনতে পারলেন। কালো মোটা লোকটিকে এখন দৈত্য বলে মনে হচ্ছিলো। চোখ দুটো লাল, দেখেই বুঝলাম এদের রাত গভীর হয়েছে, যদিও ঘড়িতে আমার তখন আটটা বাজে মাত্র। মহুয়া কি ঘুমিয়ে পড়েছে? গিয়ে দেখি — না। একটা কাঁচিতে সে ধার দিচ্ছে কুপি জ্বালিয়ে, অর্থাৎ রাতেই ধার দেওয়াটা বিশেষ দরকার। আমার ভয় করছিলো — মেয়েদের কাস্তে ধার দিতে কখনও দেখিনি, এমনকি ছুরিও না। আমায় দেখে একটু হাসলো মহুয়া। ভয়টা কাটলো। জানতে চাইলাম — সাক্ষ্য দিলো না কেন সে?

—"কী হবে?" নির্লিপ্ত জবাব। তবে তো আমার আশংকা ভুল। মহুয়া স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছে। আমি বললাম — হয়তো তোমার হারানো সম্মান ফিরে পাওয়া যেতো না — কিন্তু দোষীর শাস্তি হতে পারতো। মহুয়া একটু চুপ কোরে রইলো। কিন্তু তারপর সে যা জবাব দিলো তার জন্য মোটেই তৈরী ছিলাম না। সাক্ষ্যের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মহুয়া সোজা বিচারকের দিকে চেয়ে দেখেছিলো — বিচারকের থুতনিতেও সেই একই দাগ। তারপর মহুয়া আর কী কোরে সাক্ষ্য দেয়?

অবস্থান

অশোক মুখোপাধ্যায়

না, ঘরে গ্যাস লিক করেনি, ইলেকট্রিকাল শর্টসার্কিট হয়নি বা জলন্ত স্টোভও উল্টে যায়নি বা এমন কিছু উপলক্ষ্যও নেই এখন যে আতসবাজি পুড়বে। তবু আগুন জ্বলছে। এবং বাড়িটা সেই আগুনের আওতায়।

প্রভাকরের আগমন, ঘোষণা এবং তার পেছনের কয়েক মাস-বছর-দিন.......

কথায় আছে, আগুনে ঘৃতাহুতি। এ বোধ হয় খানিকটা তেমনই। এখন সেই ঘৃতাহুতি প্রভাকর। প্রভাকর সেদিন সকলকে ডেকে ঘোষণা করেছে যে, সে চলে যাবে এবং আর ফিরবে না। বাড়িটা সেই-হেতু জ্বলার....ওপর আরো জ্বলছে।

কোথায় যাবে, কেন যাবে, কবে যাবে — সকল ব্যাপারে কিছুই ভাঙেনি প্রভাকর। সবায়ের তাই ভয়, আতঙ্ক......। অর্থাৎ যে কোনো সময়েই এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যেতে পারে। প্রভাকরের অবর্তমানে বাড়িতে সবাই নিজেদের ভেতর তর্কাতর্কি, বিবাদ জুড়ে দিয়েছে। একের অন্যের ওপর অবিশ্বাস, সন্দেহ, দোষারোপ চলছে তো চলছেই। প্রভাকর তার মা-দাদা-বোন সবাইকে এই সবকিছুর ব্যাপারে যে আসল কারণটা রয়েছে তার জন্যে আগে ঠিক যতটাই ঐক্যবদ্ধ দেখেছে ঠিক ততটাই এখন ঐক্যহীন লক্ষ্য করছে। বিগত ছ-মাস যাবৎ যতগুলো চিঠি পেয়েছে সে মুম্বাই-এ বসে সেগুলো ছিল যেন মা-দাদা-বোনের কনসার্ট। যাই হোক, ও নিয়ে আর বেশি মাথা-ব্যথা ঘটেনি তার।

প্রভাকর কয়েকদিন হলো বাড়ি এসেছে। তবে, আসার কারণ ওই একঘেঁয়ে, চিঠিগুলো নয়, কারণ অন্য। কিন্তু সবাই ভাবছে উল্টোটাই। তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই প্রভাকরের। কে কি ভাবছে — তাতে কিছুই যায় আসে না তার। এখন মুম্বাই-এ থাকে সে, চাকরি ওখানেই। বাবা মারা যাওয়ার আগের দিন অব্দি প্রভাকরের চাকরি পাওয়া নিয়ে মানসিক যন্ত্রণায় আকুলি-বিকুলি করেছেন। মাঝে মধ্যে এই নিয়ে প্রভাকরকে বাবার কাছ থেকে নানান অপমানজনক উক্তিও পেতে হয়েছে। সেই মানুষটা দুর্ভাগ্যবশত দেখে যেতে পারেননি প্রভাকরের বেকারত্ব ঘোচার অমোঘ মুহূর্তটুকু।

তারপর দাদার ঘাড়ে সংসার। বাবার সব সঞ্চয়টুকু উজাড় করে বোনের বিয়ে হয়েছে। বোন দু-বছর পরেই কোর্ট থেকে ডাইভোর্সি-সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে ফিরে এসেছে বাপের বাড়িতে।

সেই বোন কৃষ্ণা বাপের বাড়ি ফিরে এসে দাদা দিবাকরের কষ্ট দেখে বুক ফাটিয়েছে। দাদা আর মা-এর কানের ভেতর দিয়ে মন্ত্র চালান করতে করতে এক-সময় যা আর আদৌ কখনো ঘটতো কি না সন্দেহ, সেটাই ঘটিয়েছে। অর্থাৎ দিবাকরের বয়েস একটু বেড়ে গেলেও, বোনের ঐকান্তিক প্রয়াস একদিন বসিয়েছে তাকে বর-আসনে।

দাদার পাত্রী পছন্দের সময় বিভিন্ন ব্যাপারে ঝামেলা পাকিয়েছে প্রভাকরদের সকলের শুভাকাঙ্ক্ষিনী এই ডাইভোর্সি বোন কৃষ্ণাই। তারপর অনেক পাওনা-গণ্ডা বুঝে, চাওয়া-

পাওয়ার প্রশ্নে একেবারে নিখুঁত পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে অবশেষে দাদা দিবাকরের জন্যে এনেছে একটু অল্প-কালো মেয়ে। তবে তার সুন্দর দেহের গঠন; শিক্ষা আছে, গান জানে, নানান হাতের কাজে ডিপ্লোমাও রয়েছে তার।

এরপর মাধুরী নামটাই ক্রমশ গায়ে জ্বালা ধরিয়েছে বোন কৃষ্ণার। নিরন্তর মায়ের কাছে লাগান-ভাঙান করে নেশায় বুঁদ করে দিয়েছে মা-কে। নেশা মানে মাধুরী-নির্যাতনের নেশা। বিষ ছড়ানোর এখানেই শেষ ঘটেনি, দিবাকরকেও মন্ত্রমুগ্ধ করেছে কৃষ্ণা। অতএব, মাধুরীকে ক্ষত-বিক্ষত করতে দাদাকেও সঙ্গে পেতে অসুবিধা হয়নি বোনের। মুম্বাই চলে যাবার আগে পর্যন্ত এ-সব খুব তীক্ষ্ণ-চোখে লক্ষ্য করেছে প্রভাকর। কৃষ্ণা শুধু পারেনি তার ছোড়দা প্রভাকরকে কব্জা করতে। তাই ওদের প্রভাকরকে নিয়ে মনে মনে এত ভয়। একবছর পর প্রভাকর হঠাৎ বাড়ি আসাতে ওদের ভয় আরো বেড়ে গেছে। তার ওপর প্রভাকরের। এই ঘোষণা।

প্রভাকর এখন বাড়ি নেই।

লতিকাদেবী মেয়েকে বললেন, "তোর ছোড়দার কানে গেছে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা।" কৃষ্ণা হাসলো, "গেছে তো গেছে, তাতে আর কি হবে?"

"— সেই জন্যেই প্রভু এমন ঘোষণা করেছে।"

—"করেছে তো করেছে। তাতে-ই বা কি হবে?"

—"ওমা, সে কিরে, তোর ছোড়দা সারা জীবনের মতো চলে যাবে —!"

—"যাক।"

—"দেখ কৃষ্ণা, সবকিছু উড়িয়ে দেওয়া গেলেও এটা কখনো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর তুই মা হোসনি, বুঝবি কি?"

— "অতই যদি বোঝো, তাহলে যাও, দাদার বউকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে আবাব ঘরে নিয়ে এসো।"

—"তুই-ই যত নষ্টের গোড়া।"

:"ও, আমি যত নষ্টের গোড়া? আর তুমি যখন দাদার বৌ-ভাতের রাতেই বৌদিব প্রেজেন্টেশন থেকে দুটো সোনার দুল সরিয়ে রেখেছিলে?"

—"সে তোর জন্যেই তো। তোর যদি আবার বিয়ে হয়। তখন কি আর জানতাম হতভাগী তুই চিরকালের জন্যে এখানে রয়ে যাবি?"

—" দ্যাখো মা, বারবার ওই বলে খোঁটা দিও না। আমি কি সাধ করে এখানে এসেছি? আমার কি অপরাধ ছিল? আর তোমরা কি চাও আমি এখানে না থাকি? কিন্তু এখানে আমারও তো একটা অধিকার আছে?"

কৃষ্ণার গলার স্বর ভারি ও জলসিক্ত হলো। ভেতর থেকে একটা চাপা কান্নার ঢেউ আছড়ে পড়লো বাইরে। তা শুনে মা লতিকাদেবী বিচলিত হলেন, "আহা তুই কাঁদছিস কেন মা, আমি কি তোকে সে-কথা বলেছি?"

দিবাকর বোনের কান্নাভেজা গলার আওয়াজ পেয়ে পাশের ঘর থেকে এলো, "তোমরা যে কি করো মা? আজ হলিডে, কোথায় একটু রিল্যাক্স করবো —!"

লতিকাদেবী বললেন, "হ্যাঁরে দিবু, ছেলেটা সত্যিই যদি আর না ফেরে?" দিবাকর চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো, পিছু ফিরে বললো, "সত্যিই চিন্তার কথা।"

দিবাকরের অল্প টাক-বিশিষ্ট-মাথায় জানলা দিয়ে রোদের আলো এসে পড়েছে। চকচক করছে মাথার একাংশ। সেখানেই আঙুল ঘষতে ঘষতে সে আবার বললো, "কিন্তু প্রশ্নটা

হলো, কি কারণে সে ফের এভাবে চলে যাবে কেন?" কৃষ্ণা বললো, "সঠিক কারণটা তো আমরা কেউই বুঝতে পারছি না।"

কণ্ঠস্বর চড়িয়ে লতিকাদেবী জানালেন, "কারণ হচ্ছে, প্রতিবাদ, আমাদের বিরুদ্ধে একটা ছোট্ট অথচ বিশাল প্রতিবাদ। দেখছিস না, ছেলেটা আসার পর থেকেই কেমন গুম মেরে আছে। ব্যাপারটা ও কোনো-না-কোনো সূত্রে জানতে পেরেছে।"

—"কোন ব্যাপারটা?" দিবাকর জিজ্ঞেস করলো।

— "এতদিনের সবচেয়ে মারাত্মক যে ব্যাপারটা, ওই যে বৌমা যেদিন রাত বারোটায় বাথরুমে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দিয়েছিল। ওঃ। আমি না দেখলে কি যে ঘটতো!"

— "তাতে প্রভুর কি? মাধুরী তো আমার বউ। ওর ভালো-মন্দের দায়ভাগ তো আমার।" দিবাকর চিৎকার করে বললো। কৃষ্ণা স্বতোৎসাহে যোগ করলে, "আমারও একই কথা। ছোড়-দার এতে ইণ্টারেষ্ট কিসের?"

দিবাকর ভ্রু সংকুচিত করে বললো, "তবে কি এর ভেতর আলাদা কোনো রহস্য আছে? যদি থাকে, তা উন্মোচিত করতেই হবে। দেখি, প্রভু আসুক। উত্তেজিত হলো দিবাকর।

লতিকাদেবী ভয় পেলেন। দিবাকরের হাত ধরে বললেন, "না না, তা হবে কেন? তুই মিছিমিছি এ নিয়ে ভাবছিস! ছেলেটা ও-রকমই, বড্ড চাপা, কারুকে কিছু বলে না। দোহাই দিবু, তুই আবার ওর সঙ্গে কিছু বাঁধাস না। তাহলে ও আরো বেঁকে বসবে।"

লতিকাদেবী কি চক্রব্যূহে?

ভাবনা, ভাবনা, ভাবনা — কুরে কুরে খাচ্ছে লতিকাদেবীকে। বাড়ির আপাতত একমাত্র বউটি নেই। চলে গ্যাছে! তবু ভালো, চলে গ্যাছে শুধু, আর কিছু ঘটায়নি। সেই রাতে সত্যিই যদি কিছু ঘটতো? আগে পুলিশ এসে তার হাতেই হাতকড়া পরাতো। এত্ত নচ্ছার মেয়ে-মানুষ, শাশুড়ীকে জব্দ করতে চাওয়া? ছ্যা-ছ্যা, কেমন তার মা-বাপ? আমার এমন সুখের সংসারে আগুন জ্বালাতে এসেছে? ব্যাটাদের সর্বনাশ হোক, সর্বনাশ হোক।

ওইসব গালি-গালাজ আর অভিশাপের ধাপ পেরিয়ে দিবাকরের সামনে এসে দাঁড়ালেন লতিকাদেবী। "আমি ভাবছি দিবু, বৌমার চিঠি পেয়ে প্রভু এখানে আসেনি তো?"

—"আঃ মা, তুমি বার-বার কেন প্রভুর সম্পর্কে আমার ধারণাকে জট পাকিয়ে দিচ্ছো বলোতো? ওকে আমি অন্য চোখে দেখি।" দিবাকর রেগে জানালো।

— "সে তো ভালো কথা। তবে ওর দোষের কথা কিছু কি আমি বলছি? আসলে বৌমাই যদি ওর কাছে —!"

— "তুমি যাও মা, যাও। খালি বৌমা, বৌমা, বৌমা। আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না।"

— "অত চটছিস কেন? আচ্ছা দিবু, বৌমা ওই ঘটনার পর থানায় গিয়েছিল কিনা জানিস?"

—"জানি না।"

—"সেদিন যা শাসাচ্ছিল!"

—"যাক না থানায়। ওখানে আমি ম্যানেজ করে এসেছি।"

—"বেশ গুছিয়ে বলেছিস তো বৌমার অত্যাচারের কথা? আমাকে মারতে এসেছিল একদিন।"

—"আমি ওখানে কিছু বলিনি। বলেছি লোকাল পার্টির লোকদের কাছে। ওরা আজকাল এ-সবও দেখাশুনা করছে। এর জন্যে চাঁদাটা একটু বেশীই দিতে হলো যদিও।"

—"বাঃ বাঃ, এটা ভালো কাজ করেছিস। একদিকে নিশ্চিন্ত হওয়া গ্যালো। আর এই দিকটাও যদি জানা যেতো!"

—"কোন্ দিকটা?"

—"ছেলেটা চলে গেলে আর ফিরবে না বলেছে।"

—"জাহান্নামে যাক ও-ছেলে। মা, তুমি শুধু তোমার ছেলের চলে যাওয়ার কথাই ভাবছো। আর বাড়ির একমাত্র বৌ যে সারা জীবনের জন্যে যাচ্ছে, বলে গ্যালো, তার জন্যে কি একটুও ভাবনা হয় না তোমার?"

দিবাকরের মুখে অকস্মাৎ উল্টো-সুর শুনে হতচকিত হয়ে গেলেন লতিকাদেবী। তাঁর ভাবনা ক্রমশঃ আতঙ্কে পর্যবসিত হতে লাগলো। তার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগলো, দিবু ওই যাদের কাছে 'সব বলেছি' বলে জানালো, তাদের কাছে এমনই উল্টো-সুরে গায়নি তো সবকিছু?

কৃষ্ণার নিজস্ব ক্যানভাস

দাদার বিবাহের উদ্দেশ্যে যিনি ঘটকালি করেছিলেন তিনিই কৃষ্ণাকে নানান স্বপ্ন দেখতে প্ররোচিত করেছেন। যেমন, সে রাণীর সিংহাসনে বসেছে একদিন। অবশ্য জমি প্রস্তুত ছিল; যার পশ্চাদপট, কৃষ্ণার নিজের স্বামীর দ্বারা প্রত্যাখাত হওয়ার ঘটনা। যাই হোক, সেই স্বপ্নে পাওয়া রাজ্য কৃষ্ণাকে পাগল করে তুলেছে। মাধুরীর বাবা যে ফ্ল্যাট কেনাব টাকা দেবে, সেই বিরাট ফ্ল্যাটে থাকবে তারা. সেখানে ভি. সি. পি, ভি. সি. আর। ঘটক আবো বলেছে। মাধুবী যথেষ্ট লেখাপড়া জানা, চাকরি পেতে অসুবিধা হবে না। কৃষ্ণা আর তার মা-কে দেখভাল করবে সে চাকরির পয়সায়, নিজের থাকার খরচও তারই, দাদার চাকরিব পয়সাটা কিছুটা জমানোর জনো ও কিছুটা তাদের বিনোদনের জন্যে। অতএব মাধুরীর উদ্দেশ্যে ফতোয়া, যাও যে-ভাবে হোক উপায় করে এনে এ-বাড়িতে থাকো।

দিবাকরের বিয়ের মাস খানেক পর থেকেই কৃষ্ণা ওই স্বপ্নের অঙ্কটা মেলানোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। দিবাকর এলো কৃষ্ণার কাছে, "কৃষ্ণা, তুই একটা মেয়ে তো?"

—"আমার দেহের গঠন সেই কথাই বলে। তা হঠাৎ এ প্রশ্ন?"

—"না ভাবছি, একটা মেয়ে আর একটা মেয়েকে কি-ভাবে মেন্টালি এ্যাসল্ট করতে পারে?"

কৃষ্ণা চোখ পাকালো, "ও, তা-হলে আর বুঝতে অসুবিধা নেই যে ছোড়-দার কানে কি-ভাবে ব্যাপারটা গ্যাছে!"

ভয়ঙ্কর চিৎকারে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো দিবাকর।

—"না, তা নয়।"

—"আহা অত রাগের কি আছে? সত্যি বলেছি, তাই?"

—"আবার বলছি কৃষ্ণা, তোর অভিযোগ মিথ্যা।"

—"তবে?"

—"তবে আর কি? বেশ উল্টো চাপ দিতে শিখেছিস।"

—"এতে চাপের কি আছে? কই, আগে এ-সব কথা বলোনিতো? তোমার সম্মতি না থাকলে আমি এমন করবো কেন? আজ তোমার হঠাৎ এমন কি ঘটলো যে—?"

—"আমার কি ঘটলো, সে তুই বুঝবি না।"

—"ঘটেছে তো আমারও।"

—"কি ঘটেছে তোর?"

—"আহা তুমি কিছু জানো না যেন। আমার শাশুড়ী ননদরাও আমাকে এ-রকম জ্বালিয়েছে, অত্যাচার করেছে আমার ওপর, মারধোর করেছে আমাকেও। করেনি? তোমরা কিছু প্রতিকার করতে পেরেছিলে?" রাগে-দুঃখে-উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলো কৃষ্ণা।

—"আমাদের কি-ই বা করার ছিল?" এবার শান্ত গলায় বললো দিবাকর।

—"ঠিকই তো, কিছু করার ছিল না। আমার অদৃষ্ট। তাই তো তোমাদের ডাইভোর্সি বোন কৃষ্ণা-আজ তোমাদের কাছে বার্ডেন।"

—"কে বলেছে তোকে?"

—"বলতে হয় না, বোঝা যায়।"

—"তোর ওপর এ-রকম হয়েছে বলেই তো তুই মেয়েদের এই ব্যাপারটা আরো বেশী করে ফিল করবি। তুই এমন করবি কেন?"

—"কেন করবো না? বরং আরও বেশী করে করবো। আমিও যে রক্তমাংসের মানুষ দাদা।"

—"সেইজন্যেই তো সকলের কথা ভাবা দরকার আমাদের।"

—"কই সে তো ভাবেনি আমার কথা। বললো ওয়াইফ-এর থেকে মা-বোনেরা নাকি অনেক আগে।" এবার কেঁদে ফেল্‌লো কৃষ্ণা।

—"কে, তোর এক্স-হাজব্যাণ্ড অনিমেষ? ওটা একটা রাবিশ্‌।"

দিবাকর কি পা তুলবে নৌকো থেকে?

"রাবিশ কি দিবাকর নিজেও হয়ে যায়নি? তাই যত সহজেই অনিমেষকে রাবিশ বলছে সে, তত সহজেই কি কথাটা হজম করা সম্ভব নিজের বিষয়ে ভাবলে? দিবাকব নিন্দিত হলো মনে মনে নিজের দ্বারাই।

দিবাকর একলা কিছুক্ষণ বসে আছে নিজের ঘরে। প্রভুর এই ঘোষণার সত্যিকার কারণ অনুসন্ধানের জন্যে মনের সমুদ্রে চলছে তার উদ্দাম আলোড়ন। কিন্তু ছোট ভাইকে ঘিরে যে-সব কথা কখনো স্থান পায়নি তার মনে, এখন মায়ের কথাবার্তায় কেন যে সে-সব দানা বেঁধে উঠলো তার ভেতরে, তা ভাবতে গিয়েই তার খারাপ লাগছে।

প্রভুকে এতকাল জেনেছে দিবাকর, একজন প্রকৃতই আদর্শবান ছেলে হিসাবে। যার জন্যে প্রভুর সঙ্গে বর্তমান জগতের অনেককিছুই মেলে না; এমন অনেক প্রমাণও পেয়েছে সে। তবু সেই প্রভুর সম্পর্কে তার এই ভাবনা? ব্যাপারটা তাকে মনে মনে আরো একবার ছোট করে তুলছে, যেমন কয়েকদিনের আগের ওই ঘটনাটা তাকে ছোট করে তুলেছিল। অর্থাৎ সেদিন মাধুরীর গায়ে হাত দেওয়া। ওর গায়ে হাত না দিলেই ভালো করতো সে। কিন্তু এর পেছনেও সেই বোনের ভূমিকা। সামান্য একটা বিষয়কে কৃষ্ণা এমন জটিল পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে আর স্থির থাকতে পারেনি দিবাকর। যদিও কৃষ্ণার মতো একদা এক অতি সহজ সরল মেয়ে কেন এখানে এ-ভাবে ক্রমশ গরল ছড়াচ্ছে তা এখন বোঝে দিবাকর পরিষ্কার।

মা দিবাকরের সামনের টেবিলে চা-এর কাপ বসিয়ে রেখে গ্যাছেন। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়াল নেই দিবাকরের। তার মনে পড়ছে কৃষ্ণাকে বলা কথা, "আমার কি ঘটলো, সে তুই বুঝবি না" ভাবতে ভাবতেই একসময় ঠাণ্ডা চা-এর কাপটা হাতে তুলে নিলো দিবাকর। তার আসন্ন সন্তান মাধুরীর কাছে জমা। সে কি সত্যিকার তার ভালোবাসার ফসল? নাকি এ স্রেফ একটা প্রাকৃতিক কর্ম? কিন্তু তখন তো মাধুরীকে দিবাকর মন থেকেই

কাছে টানতো তারপর কখন যে হারিয়ে গ্যাছে মাধুরী। তাদের চারপাশে ক্রমশঃ রচিত হয়েছে একটা কৌলুষের দীর্ঘতর ছায়ামূর্তি।

কৃষ্ণা এ-খবর জানে না নিশ্চয়। যখন জানবে তখন আবার মাধুরীকে মিথ্যে অপবাদে জড়াবে না তো? যার তীর আসলে দিবাকরের বুকে এসেই বিঁধবে? ওরা বলবে না তো আসন্ন সন্তানটা দিবাকরের নয়? প্রশ্নটা উঁকি দিতেই ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে দিবাকর, "না।" চা-এর কাপটা তার হাত থেকে মেঝেতে পড়ে সশব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। লতিকাদেবী দৌড়ে আসেন বড় ছেলের ঘরে। দিবাকর মা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই নরম গলায় বলে, "কাপটা অসাবধানে হাত থেকে পড়ে গ্যালো।"

দিবাকর ক্রমশঃ বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। সে আর খাতির করবে না কারুকে। নিজে আগের অনেক কথাবার্তা মেনে নিলেও, তার আসন্ন সন্তানের প্রশ্নে কোনো বদনাম সে সইবে না। মাধুরী আবার ফিরে আসুক এ বাড়ি, সে চায়। কিন্তু কিভাবে সম্ভব? মাধুরী তো নিজের থেকে কোনো দিন তাদের এ-ঘর ভাঙতে চায়নি। উল্টে সে তার মা, বোন — সবাই মিলে ভেঙে দিয়েছে মাধুরীর ঘর, ভেঙে দিয়েছে মাধুরীর প্রাক-বিবাহকালীন স্বপ্ন। মাধুরী প্রাণপণে শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও এ ঘর জোড়া রাখতে লড়াই চালিয়ে গ্যাছে। দিবাকর ভাবছে, এতখানিই যখন লড়াই চালিয়ে গ্যাছে মাধুরী তখন আর একটু লড়াই চালাতে পারতো। সেদিন কাগজে লিখে দিতে পারতো সে ওই কথাগুলো, তা-হলে আর ও-রকম বিরাট কাণ্ড ঘটতো না। কি এক দরকারে মাধুরী বাপের বাড়ি যাচ্ছিল। কৃষ্ণা এসে বললো, যাচ্ছো যাও বৌদি, কিন্তু যাবার আগে লিখে দিয়ে যাও, তোমার এখানে কোনো গয়না পড়ে থাকলো না। সব তুমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছো।" মাধুরী অস্বীকার করলো লিখতে। কারণ আসল ঘটনা তা নয়।

লতিকাদেবী আলনায় জামা-কাপড় গোছাচ্ছিলেন। দিবাকর ঘরে ঢুকলো। —"মা এটা কি ঠিক?"

— "কোনটা?"

—"মাধুরীর ওই সামান্য গয়নার ওপর তোমাদের এত লোভ?"

লতিকাদেবী গর্জে উঠলেন। "আমার মেয়ের থেকেও তার ননদেরা এ-রকম লিখিয়ে নিয়েছিল, তুই কি এ-কথা ভুলে গেছিস দিবু? তুই-ই তো কষ্ট করে, ধার-দেনা করে, বোনকে বিয়েতে ওই গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলি।"

—"আমার সব মনে আছে মা। কিন্তু তার জন্যে মাধুরীকে শিকার হতে হবে কেন?"

—"এটাই সংসারের নিয়ম।"

—"না, এটা নিয়ম নয় মা।"

আরো একটি ঘোষণা ও প্রভাকর

প্রভাকর এখন বাড়িতে। সে কি ভাবছে? অনেক কিছুই। একটু আগেই সে সকলকে ডেকে আরো একটা ঘোষণা করে নিজের ঘরে এসে বসেছে। তার আগের ঘোষণার ও-রকম ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার কথা সে জানে না। জানার প্রয়োজনও বোধ করেনি কখনো। তবে কৃষ্ণারা যে ভাবলেও ভাবতে পারে তাদের বৌদির চিঠি পেয়েই হঠাৎ সে এখানে এসেছে — এটা একবার মনে হয়েছে প্রভাকরের। সে তারপর লক্ষ্যও করেছে — এক ধরনের অস্বস্তিময় হাঁটা-চলা-কথা বলা ওদের। কিন্তু ওই লক্ষ্য করাতেই থেমেছে প্রভাকর, আর এগোয়নি। এগোয়নি এই ভেবে যে, ও-সব ওদের ব্যাপার, ওরা যে যা-খুশী করুক বা ভাবুক তাতে প্রভাকরের কিছু যায়-আসে না। তার তো এখানে আসার কারণটাই একেবারে আলাদা। সেই কারণটাই প্রভাকর দ্বিতীয় ঘোষণায় রেখেছে।

এবারের ঘোষণার পর প্রভাকর দেখেছে, প্রথমে সকলের মধ্যে কেমন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস-ফেলা ভাব। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আরো ডিটেইলস শুনেই ওদের প্রচণ্ড আঁতকে ওঠা। এই ব্যাপারটা ঠিক আছে। কিন্তু প্রথমের ব্যাপারটা, অর্থাৎ ওই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা ওদের? না, এবারেও আর ভাববে না প্রভাকর। তার ও-সব ইন্টারেস্ট নেই। তার ভাবনা অন্য।

তার বেকার-দশা চলাকালীন বাবার সঙ্গে সংঘাতের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে প্রভাকরের। বাবার সঙ্গে নীতির সংঘাত, আদর্শের সংঘাত। আদর্শ-নীতি বাঁচাতে গিয়ে বাবার অনেক বাক্যবাণে জর্জরিত হয়েছে সে ওই সময়। সইতে হয়েছে অনেক শব্দের জ্বালা। বাবা চেয়েছিল আদর্শ-টাদর্শ গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে যে-ভাবে হোক বেকারত্ব ঘোচাতে। আর প্রভাকর চেয়েছিল নীতি-আদর্শ আঁকড়ে থাকতে। আর্থিক অস্বচ্ছলতায় ভুগতে ভুগতে বাবা হয়তো ওরকম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রভাকরের জিজ্ঞাসা, বাবা তাকে অনেক, অনেক অর্থ উপার্জন করে একদিন প্রভূত সম্পদশালী হবার স্বপ্ন ক্রমাগত দেখাতো কেন? বাবা নিজে যা পারেনি নিজের ছেলের ভেতর দিয়ে সেই স্বপ্ন-পূরণের বাসনাই কি তাকে এই আচরণে উদ্বুদ্ধ করতো? আর প্রভাকরের মধ্যে এর বৈপরীত্য থাকার দরুণই কি তাকে শোনাতো নানান কটু-কথা?

আজ প্রভাকরের সত্যিকারই অন্য জীবন, জীবনের অন্য বাঁক — যা তার বাবা একান্ত-ভাবেই চেয়েছিল একদিন। এইভাবেই মৃত বাবার ওপর প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়েছে প্রভাকর। এই দ্বিতীয় ঘোষণা তারই সাক্ষ্য বহন করছে। মুম্বাই এ থাকতে থাকতে সে আণ্ডার-ওয়ার্ল্ডের সংস্রবে এসেছে, জড়িয়ে পড়েছে সেই জগতে। বিনিময়ে প্রভূত টাকা। বাড়ির কেউ কিছুই জানে না। মুম্বাই এর পুলিশ তাঁকে খুঁজছে। তাই সে পালিয়ে এখানে হঠাৎ।

আবার পালানোর ঘোষণা এখান থেকে। যে কোনো সময়ে পুলিশ এখানেও হানা দিতে পারে। আর সে একবার পুলিশের হাতে ধরা পড়লে আর এ বাড়িতে ফিরবে না কোনোদিনই — এমন সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছে প্রভাকর। মা-দাদা বোনদের দেখারও এটা শেষ সুযোগ হিসেবে ধরে নিয়েছে সে। সুতরাং এমন ঘোষণা। ওদের কাছে এ ঘোষণার অন্য মানে হয়ে দাঁড়ালে প্রভাকরের কিছু করার নেই। এইমাত্র সে সবকিছুই সকলকে ক্লিয়ার করে বলে নিজের ঘরে এসে বসেছে। বাইরে কুহু-কুহু কোকিলের ডাক। প্রভাকর হাসে। আনন্দ পায়। ছেলেবেলার কথা ভাবে। কোকিল খেলার দিনগুলো স্বপ্নের মতো উঁকি মারে মনের ভেতর।

খোঁজা, আগুন ও জল

বিশিষ্ট সাইকিয়াট্রিষ্ট ডঃ প্রসন্ন কুমারকে তাঁর নিজের মারুতি গাড়ি অব্দি এগিয়ে দিয়ে এসেছে দিবাকর। মা এবং বোনকে সাইকিয়াট্রিষ্ট দেখানোর আইডিয়া তার মাথায় প্রথম আসে যেদিন তার মা তাকে ঘরে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, "বৌমা থানায় গিয়েছিল নাকি দিবু?"

স্বভাবতই এসে পড়েছে আইন-আদালতের প্রশ্ন। মনের ভেতর এ-সব প্রশ্ন কুরে কুরে খেয়েছে দিবাকরকে। অতএব, জেগেছে নিজেকে আর মা এবং বোনকে বাঁচানোর তাগিদ? তাদের বাড়ির সম্মান বাঁচানোর তাগিদ। আর সেই তাগিদ মেটানোরা মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে সাইকিয়াট্রিষ্ট ডাকা ছাড়া অন্য পথ খোলা ছিল না দিবাকরের সামনে।

প্রথমে মা কিংবা বোন, কেউই রাজী ছিল্ল না সাইকিয়াট্রিষ্টের মুখোমুখি হতে। পরে দিবাকর অনেক বোঝায়, শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা ডঃ প্রসন্ন কুমারের আওতায় আসে। নিশ্চিন্ত হয়েছে দিবাকর, তার মনে শক্তি ফিরে এসেছে এই ভেবে যে কিছু ঘটলে অন্তত

লড়া যাবে। আইনের কাছে সে মা-বোনকে সাময়িক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা রুগী হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টার ক্রটি রাখবে না।

ডঃ প্রসন্নকুমার কিন্তু মাধুরীর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার নেপথ্যের এতখানি ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আর জানাবেই বা কেন দিবাকর? তিনি যথারীতি দিবাকরের কাছ থেকে শোনা কেসহিস্ট্রিই তাঁর ডায়েরীতে নোট করেছেন এবং দু-জনেরই ব্রেন-স্ক্যানের জন্য প্রেসক্রাইব করে গ্যাছেন।

ডঃ প্রসন্নকুমার চলে যাবার পর দিবাকর ঘরে এসে বসলো। পরমুহূর্তেই ছোটভাই প্রভুর দ্বিতীয় ঘোষণার কথা মনে পড়তেই আঁতকে উঠলো। তার শিরা-উপশিরা দিয়ে হিমস্রোত যেন বয়ে গ্যালো। কি যে হলো? কেন যে হলো এই কাণ্ড?

পাশাপাশি আইন-থানা-পুলিশের ছবিটাও দিবাকরের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। একটা অসহনীয় অবস্থা। প্রভুর ওই ঘোষণার কথা সে বিশ্বাসই করতে পারছে না, ভাবতেই পারছে না। তার হিসাব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই মেলাতে পারছে না নিজেদের আগের জীবনের সঙ্গে। প্রভুর আদর্শ পরায়ণতার কত উজ্জ্বল স্মৃতি। তাদের ছোটবেলা-কৈশোর-যৌবনের মা, তার স্নেহময় ভালোবাসার নিষ্পাপ মূর্তি, বোন কৃষ্ণার একদা সেই সরল-সহজ প্রাণোচ্ছল রূপ — এ-সব কিছুই দিবাকর এখন মনের ভেতর খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাকে সে-সব কিছুতেই খুঁজে পেতে দিচ্ছে না একটা ভয়ংকর অগ্নিশিখা। যে অগ্নিশিখায় জ্বলছে তাদের গোটা বাড়িটা।

যতবারই দিবাকর সেইসব স্মৃতি হাতড়ে খুঁজে পেতে চাইছে তার আগের মা-বোন-ভাইকে এবং নিজেকেও, ততবারই সেই অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে চোখের সামনে ভেসে ওঠা ছবিগুলোকে। হঠাৎ সে পাশের ঘর থেকে মায়ের ডুকরে ওঠা কান্না শুনতে পায়। এবং এই প্রথম দেখতে পায় কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।

মোরগ লড়াই

অমিতাভ পাল

কথায় কথায় হয়তো বলেছিলাম, তাই বলে সত্যিই এসে হাজির হবে ভাবিনি কোনোদিন। ঘাড় হেঁট করে একটা মস্ত পেন্নাম ঠুকে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল একজোড়া মরা তিতির। এক মুখে হেসে বলল, শুকনিবাসার সরার বাঁধে বাবুর নাম করে গেঁথেছি। তাই দিতে এলাম। কচি তিতির, মাংস খুব নরম। আগুনে ঝলসে নুন-মরিচ ছড়িয়ে খেতে দারুণ।

— তা গাঁথলে কী করে?

— নলা দিয়ে। বাবু, নলা জানেন তো?

আমার মুখ দেখে বিষহরি কী বুঝল, জানি না। উঠে গিয়ে নিয়ে এল এক বোঝা লাঠি। লাঠির বোঝাটি সে বোধহয় বাইরে নামিয়ে এসেছিল। লম্বা সরু বাঁশের লাঠি। একটার মাথায় আর একটা জুড়ে বিশ-পঁচিশ, কী তিরিশ হাত লম্বা করা যায়। সবচেয়ে ডাগর যেটি, তার মাথায় থাকে ইস্পাতের ছুঁচোলো হুল। এরই নাম নলা।

সেই নলা গেঁথে মাঝপুকুর থেকে টেনে তোলা যায় জলের পাখি। গাছের মগডাল থেকে পেড়ে নামানো যায় গাছের পাখিও। পাখি ছাড়া ছোটোখাটো জীবজন্তুও শিকার করা চলে নলা দিয়ে।

— হুলে বিষ নেই?

— থাকবে না কেন, খুব আছে। বিষের জ্বালায় শিকার ঘায়েল হয় চটপট। গায়ের জোরে খুলে পালাতে পারে না।

আমি সভয়ে বললাম, 'তবে?'

সে বলল, 'কোনো ভয় নেই বাবু, আগুন তো সব্বভুক। তেনার ছোঁয়ায় সব কিছু হজম হয়ে যায়, বিষও বিষ থাকে না। আমার জেতের লোকেরা তো আস্ত চাঁদিবোড়া সাপ পুড়িয়ে খায়। কিচ্ছু হয় না।'

চাঁদিবোড়া সাপ পুড়িয়ে খাবার যুক্তিতেও আমি ভরসা পাই না। সে চলে যেতেই আমি টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিই মরা তিতির জোড়া।

বিষহরি ওস্তাদ। জাতিতে সর্পবৈদ্য। সাপ ধরে, সাপ খেলায়, গলায় জ্যান্ত সাপ ঝুলিয়ে গেরস্তের দরজায় দরজায় ভিখ্ মেগে বেড়ায়। তাকে একদিন দেখলাম, ধবনীর ফাঁকা মাঠে। পাবড়া পাহাড়ির জঙ্গল থেকে হাত তিনেক লম্বা একটা দুধ খরিশ সাপ তাড়িয়ে এনে ধবনীর ফাঁকা মাঠে খপ করে ধরে ফেলতে। শুকনো ডাঙায় কই মাছ ধরার মতো অনায়াসে। একটা রহস্যময় হাসি হেসে সে বলল, 'এ হল লাগ ভেল্‌কির খেলা। তুক্-তাক্ আর ফুস মন্তরের জোর। তুক্-তাকে বিষাক্ত সাপ বশ মানে, ডবকা ছুঁড়িও বশ মানে।'

বিষধর সাপ বশ মানার প্রমাণ তো হাতেনাতে, সাপিনীর মতো ফোঁস করা ডবকা ছুঁড়ি বশ মানার কথাটা জানাজানি হল কদিন পরে।

একদিন সকালে পিছনে এক দঙ্গল ছেলে জুটিয়ে বিষহরি এল। সে এল আমার বাসায় সাপ খেলাতে। ভেঁপু বাজিয়ে সাপ খেলানো শুরু করতেই সুর করে বেহুলা ভাসানোর গান ধরল একটি মেয়ে। মেয়েটির কাঁচা বয়স, ডাঁসা পেয়ারার মতো টসটসে। চাপা রং, যেন তাতেই সে বেশি মানানসই। আর সবচেয়ে আশ্চর্য তার চোখ, ধারালো চাউনি। সেই চাউনি কোনো পুরুষের চোখে পড়লে সাপের ছোবলের মতো বিষ-কাঁপুনি ধরে যায় বুকের মধ্যে। মেয়েটি কে? — জিজ্ঞেস করার আগেই বিষহরি একমুখ হেসে বল্ল 'বউ'। তারপর স্বেচ্ছায় একটা কাল কেউটের মুখের কাছে নিজের মুখটা বাড়িয়ে দিল। উদ্ধত ক্ষোভে ফোঁস করে ছোবল মারল সাপটা। উঁচু সুরেলা পর্দায় গান ধরল তার বউ, 'তোরে খাইল কাল নিদ্দা, মোরে খাইল কী!'

বয়সে ও চেহারায় বউর সাথে বিষহরির কোনো মিল নেই। বউর ডাঁসা চেহারার পাশে তার চেহারাটা পুরোনো গাছের শিকড়ের মতো পাকানো। নিতান্ত বেমানান। কালো রং, খসখসে খড়ি ওঠা গা। চোয়াড়ে মুখ, গোল গোল ভাঁটার মতো লালচে চোখ। সেই চোখে চোখ পড়লে বিষধর সাপ ফণা নামিয়ে নেয়। কে জানে, তুক-তাকের কথাটা হয়তো বাড়িয়ে বলা। ডবকা ছুঁড়িকে বশ করার 'গুন' আছে হয়তো তার সেই চোখের দৃষ্টিতে।

সাপের মাথায় দুটো থাবড়া মেরে বিষহরি বলল, 'মা বেউলার কির্‌পা, বাপ লখিন্দরের কির্‌পা, কানি বুড়ির কির্‌পা — যা ভালুয়া, যা। বাবুকে একটা পেন্নাম ঠুকে আয়।'

দিব্যি পোষ মেনেছে সাপটা। হিস হিস করে তেড়ে এল আমার দিকে। আমি সভয়ে বললাম, 'আমি বামুন-কায়েত নই, মাহিষ্য সন্তান। সর্পরাজের পেন্নাম আমার নিতে নেই, বিষহরি। তাছাড়া পেন্নাম তো দূর থেকেও কবা যায়, যায় কিনা।' সাপের লেজটা খপ করে হাতের মুঠোয় নিয়ে সে বলল, 'তালে কানি বুড়ির পেন্নামি দেন পাঁচটা টাকা।'

টাকা পাঁচটি পেয়ে সে সাপের ঝাঁপি বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে তার বউও। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চোখে চোখ পড়তেই একটা তীব্র কটাক্ষ হানল। ঠোঁটের ডগায় একটা বিচিত্র হাসি ছড়িয়ে বলল, 'সাপ খেলিয়ে পাওনা পেল বেদে। সুর খেলিয়ে গান শোনাল বেদেনী। তার পাওনা কোথায়, বাবুজি?'

থতমত খেয়ে আমি বললাম, 'ওই তো, ওই তো দিলাম একসাথে।'

খিল খিল করে হেসে উঠল সে। কী এক রহস্যময় ইঙ্গিত খেলছে তার দু চোখে। হয়তো এই হাসি ও ইঙ্গিতের কোনো জুতসই জবাব হয়, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। আমাকে অসহায় দেখে বিষহরি বলল, 'এবারটির মতো ছেড়ে দে, তোর গানের দাম নিস নে, বউ। তোর কাছে ঋণী থাকলেন, ঋণী হয়ে বাবু চিরডাকাল তোর হাতেব মুঠোয় রইলেন।'

সাপের মতো পোষ মেনেছে এই নারী। সে যেমন খেলায় তেমনি খেলে। ছিপছিপে সাপের মতো দুলে দুলে উঠল তার গোটা শরীর। হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে বলল, 'পাঁচ টাকায় পুরুষ বান্দা, আর লাখ টাকায় মেয়ে বাঁদি। বুঝলেন, বুঝলেন তো বাবুজি?'

সাপের ঝাঁপি, সাঁপুড়িয়ার ভেঁপু ও বউকে নিয়ে সেদিনের মতো বিদায় হল বিষহরি। কিন্তু যাবার আগে একটা ভালো খবর দিয়ে গেল, 'সামনের চোত্ সংক্রান্তিতে পালগাঁয় মুরগাপরব। আমার মুরগা জিতলে বাবুর পায়ে বরাদ্দ রইল হারা মুরগার ধড়টা।'

মাহাতো, রুইদাস ও সর্দারদের ছোটো গ্রাম। কিন্তু ঠাটে-ঠমকে, সুখ্যাতি-কুখ্যাতিতে পালগাঁর মুরগা-পরবটা বড়ো। মাঠের মাঝখানে বসেছে মেলা। অঘ্রানে যে মাঠে ধান থই থই করে, সেই মাঠে এখন দোকান-পাট, লোকজন থই থই করছে। লড়াইয়ের জন্য মোরগ এসেছে কাছেপিঠের গাঁ-গঞ্জ থেকে, এসেছে দূর-দূরান্ত থেকেও। মোরগ এসেছে লক্ষ্মণপুর,

লধুড়কা, কাশিপুর, আদ্রা, পুঞ্চা, বিশপুরিয়া, রখেড়া থেকেও। প্রতিযোগিরা কেউ এসেছে গোরুর গাড়িতে, কেউ এসেছে বাসে চেপে, কেউবা পায়ে হেঁটে। সঙ্গে যে যার লড়াকু মোরগ। মাঠের মাঝখানে লড়াইয়ের আসর।

বিচালিখড়ের দড়ি দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে বাজছে গোটা পাঁচেক জয়ঢাক। তার গুম গুম আওয়াজে সারাটা মেলা গম গম করছে। পালগাঁর দুজন ষণ্ডা জোয়ান তেলে পাকানো লাঠি হাতে ঘোরাঘুরি করছে। তারাই আজকের আসরের সর্দার ঘাটওয়াল। লড়াইয়ের নিয়মকানুন বাতলাবে ও গোলমাল সামলাবে। পয়সা-কড়ি নয়, এর বদলে তারা পাবে হারা মোরগের এক-একটা টেংরি।

জয়ঢাকের গুড় গুড় শব্দ, জনতার হই চই চিৎকার ও সর্দার ঘাটওয়ালের হাঁকডাক দিয়ে লড়াই শুরু হল। জোড়ায় জোড়ায় মোরগ লড়তে শুরু করল। কেউ জিতল, কেউবা হারল। যাদের হারল, তারা মুখ চুন করে সুড় সুড় করে কেটে পড়ল মেলা থেকে। যাদের জিতল, তারা বুক ফুলিয়ে মেলা দাপিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সব লড়াই শেষ হলে তারা ফিরবে ঘরে, ধুতির খুঁটে নুন-মরিচ-গরম মশলা বেঁধে হারা মোরগের ধড়টা হাতে ঝুলিয়ে খুশি মনে।

মেলার ভিড়ে একবার চোখাচোখি হল বিষহরির সঙ্গে। সে একা নয়, সঙ্গে বউও এসেছে। ঘাড় ঝুঁকিয়ে পেন্নাম করতেই শুধালাম, মোরগ আছে নাকি?'

— আছে একটা লাল ষাঁড়া।

কল কর করে ঝরনার মতো হেসে উঠল তার বউ, 'ষাঁড়া নয় গো, মাদি।'

বুকের কাছের আঁচল সরিয়ে দেখাল মাঝারি আকারের বাড়-বাড়ন্ত একটা লাল রঙের মোরগ। মুরগির মতো মাথার ঝুঁটি অপুষ্ট। সোহাগভরে সেই ঝুঁটি নাড়া দিয়ে বলল, 'যেমন বেদে, তার তেমনি ষাঁড়া।'

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, বিষহরির মুখে গোঁফ দাড়ি গজায়নি। সেই মুখে একমুখ হাসি ফুটিয়ে সে বলল, 'উঁহু, তার চেয়ে বল, যেমন বেদে, তার তেমনি বাঁদি।' বলেই সে ঢলে পড়ল বউর গায়ে। বউ মুখ ঝামটা দিয়ে সরে গেল তফাতে।

'বুঝলেন বাবু,' বিষহরি বলল, 'মাদি মোরগের কোনো মান-সম্মান নেই। ইজ্জৎ গেলেও মুখোমুখি রুখে দাঁড়ায় না। কিন্তু ষাঁড়া তা নয়, রুখে দাঁড়ায়। যতক্ষণ ধড়ে আছে জান, ততক্ষণ লড়ে যায়। মেয়ে মান্ষেরও ওই এক স্বভাব।'

মেয়ে মানুষের স্বভাবের নিন্দায় বিষহরির বউ কিন্তু ঝাঁঝিয়ে উঠল না। তার বদলে ঠোঁটে ছড়াল অনাবিল হাসি। হেসে বলল, 'আর পুরুষ মান্ষের ওই এক স্বভাব, যখন তখন মেয়ে মান্ষের দোষ ধরা।'

প্রতিবাদ করে বিষহরি কী যেন বলতে যাচ্ছিল, থামিয়ে দিল তার বউ। মোরগের পেটে হাত বুলিয়ে বলল, 'দিনভর মেয়ে মান্ষের সাথে কাজিয়া করলে হবে, নাকি ষাঁড়াটাকে কিছু খেতে-টেতে দেবে? ভুখা মোরগ লড়তে নেমে পিছু হটলে পুরুষ মানুষের ইজ্জতের বড়াই রইবে তো?' — 'পুরুষ মানুষের ইজ্জতের বড়াই না রইলে মেয়ে মান্ষেরও ইজ্জৎ রয় না, বুঝলে বউ? এক আঁজলা মউলের রসে চাট্টি বুট ভিজিয়ে তার সাথে তোর দু ফোঁটা মিশিয়ে খেতে দে। এই খাইয়ে সব লড়াই জিতেছি, এ লড়াইও জিতব।'

লাজ পেয়ে বুকের আঁচল টেনে দিল বিষহরির বউ। তারপর চোখের দৃষ্টিতে একটা কড়া ধমক হেনে সরে গেল সামনে থেকে। আমি সবিস্ময়ে শুধালাম, 'মহুয়ার মদে ভিজানো ছোলা খেয়ে তোমার মোরগ লড়বে, নেশা হবে না?'

তার চোখের জোরালো দৃষ্টি সার্চ লাইটের মতো আমার মুখের উপর খেলে গেল। তারপর একটু থেমে একটা বাঁকা হাসি হেসে আমাকে পালটা প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা বাবু, লড়তে নেমে জান কবুল করে মুরগা লড়ে কেন?'

— তাই তো, কেন লড়ে?

সে জবাব দিল, 'নেশার ঘোরে।'

— সবাই কি লড়াইয়ের আগে মোরগকে মহুয়ার রস ও মানুষের দুধ খেতে দেয়?

— লধুড়কার তোফা আনসারির গুহ্য বিদ্যা এটা। সবাই পাবে কোথায়? মরার আগে তোফা সাহেব আরও অনেক বিদ্যার মতো এই বিদ্যাও আমার কাছে গচ্ছিত করে গেছে।

কথা ফুরোতেই বউর সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে।

একজোড়া বাচ্চা মোরগ কিছুতেই লড়তে চাইছিল না। মনিবদের বার বার উস্কানিতে বার কয়েক ঝাপটা ঝাপটি করে দু দিকে মুখ ফিরিয়ে পিছু হটল। সর্দার ঘাটওয়াল হুংকার ছাড়ল, ডর্-র্-র্-অ।

কার মোরগ আগে পিছু হটেছে, এই নিয়ে কাজিয়া বেঁধে গেল। এ বলল, ওর মোরগ। ও বলল, এর।

গোলমাল পাকিয়ে উঠল। সেই গোলমালের আঁচ লাগল দর্শকদেরও। দর্শকদের একদল এ পক্ষকে, অন্যদল ও পক্ষকে সমর্থন করল। চিৎকার, চেঁচামেচি ও হই চই বেঁধে গেল। সর্দার ঘাটওয়াল দুজন চুপ করে মজা দেখছিল। হই চই থেকে হাতাহাতি হবার উপক্রম হতেই লাঠি হাতে তেড়ে এল। মাটিতে লাঠি ঠুকে হাঁকাড় দিল, 'ডর্-র্-র্-র্-অ। বেশি চিল্লামিল্লি করলে ঠেঙিয়ে লাশ ফেলে দেব, হুম্!' সর্দার ঘাটওয়ালদের হাঁকাড়ে কাজ হল। চুপ করল সবাই। মালিক দুজন যে যার মোরগ বগলদাবা করে বেরিয়ে গেল, আসর ছেড়ে দিল অন্যকে।

পর পর কয়েক জুটি লড়ার পর আসরে নামল বিষহরি। পিছু পিছু তার বউ। বুকের কাছে সপাটে ধরা লাল ষাঁড়া। তারা এসে আসরে দাঁড়াতেই গুড় গুড় করে বেজে উঠল জয়ঢাক। লড়াইয়ের আসরে বিষহরিকে চেনে সবাই। তার মোরগকে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো আসরে হারতে দেখেনি। সবাই জানে, তার মোরগের সাথে যে লড়বে তাকে আর কোনোদিন বুট-মুশুর খুঁটে খেতে হবে না। ঝুঁটি ফুলিয়ে কোঁক্কড়-কোঁ ডাকতে হবে না। লড়াইয়ের শেষে টেংরি দুটো সর্দার ঘাটওয়ালকে জিম্মা করে ধড়টা সঁপে দিতে হবে বিষহরিকে।

বউয়ের কোল থেকে লাল ষাঁড়া ঘাড় তুলে ঝুঁটি ফুলিয়ে ডেকে উঠল, কোঁক্কড়-কোঁ।

সমবেত দর্শকের দিকে তাকিয়ে বিষহরি বলল, 'কার মুরগার কটা ঠ্যাং, আয় দেখি লড়বি আয় আমার লাল ষাঁড়ার সঙ্গে।'

তার গলায় উদ্ধত চ্যালেঞ্জ। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কেউ এগিয়ে এল না। পুনরায় সে হাঁকাড় দিল, 'আমার ষাঁড়ার মহড়া নিতে মদ্দা নেই কি একটাও? সব শালা কি মাদি নিয়ে লড়তে এসেছ পালগাঁয়?'

সবাই চুপ। গোটা আসর থমথমে। এ তাকায় ওর দিকে, ও তাকায় তার দিকে। সগর্ব ভঙ্গিতে বিষহরির বউও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে চারদিক। মুখ খিস্তি করে পুনরায় একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে যাচ্ছিল, থেমে গেল। দেখতে পেল, দর্শকের ভিড় ঠেলে আসরে নামছে একটা লোক। তার একমাথা ঝাঁকড়া চুল। তাগড়াই চেহারা। হাঁটুর উপর খাটো ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা। কপালে তেরছা করে তেল-সিঁদুরের লম্বা টিপ। করমচার মতো চোখ দুটো লাল, নেশায় ঢুলুঢুলু। মুখ দিয়ে ভুক্ ভুক্ গন্ধ ছাড়ছে দিশি মালের। হাতে একটা কালো

মোরগ। আসরে পা দিয়েই বিষহরিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এত হাঁকডাক কীসের, বিষেবেদের লাল ষাঁড়ার কি পাঁচটা ঠ্যাং গজিয়েছে?'

তার কথার ঝাঁঝে একটু থতমত খেল বিষহরি। মোরগ লড়াইয়ের আসরে এ গাঁ, ও গাঁ, পাঁচ গাঁয়ের লোক তাকে এক ডাকে চেনে। এমন ঠেস্ দিয়ে কথা বলার সাহস নেই কারও। তার মোরগ লড়ে গায়ের জোরে নয়, তুক্-তাকের জোরে। লড়াইয়ের আসরে বেদের কথার উপর কথা চড়িয়ে বলতে তার বউও কখনও শোনেনি। তাই একটু অবাক হল সেও।

বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে দেখল লোকটিকে, একটা কৌতূহল মেশানো অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

বিষহরির চোখেও ধরেছে লাল রং, পেটে আগুন হয়ে জ্বলছে পানু শেখের ভাঁটিখানার পচুই মদ। লোকটিকে চিনতে পারল সে। মতিপুরের ভুজঙ্গ ওস্তাদের দ্বিতীয় পক্ষের বখাটে ছেলে কানাই। ভুজঙ্গ ওস্তাদ সবৎসা গাভির দুধের পালান মন্ত্র ফুঁকে শুকিয়ে দিতে পারত। ফলবান গাছে বাণ মেরে কচি ফল ঝরিয়ে দিতে পারত। মন্ত্র পড়ে সাপ খেলাত। সম্মোহন ও বশীকরণের তুক্ জানত সে। তাই তাকে সমীহ করত বিষহরি। কিন্তু সে আর বেঁচে নেই। পাবড়া পাহাড়ির খয়রাত আলি সড়কি মেরে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছে। সেই ভুজঙ্গ ওস্তাদের ছেলে কানাই। কানাই ওস্তাদ। ওস্তাদ বাপের কানাকড়ি এলেম নেই তার পেটে। একটা কুড়াল ঘাড়ে করে দিনভর বনে-বাদাড়ে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। কদিন আগেও তার বাড়ির পাশে ঝোপে ঝাড়ে ছোঁক্ ছোঁক্ করে তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে বিষহরি। মুখোমুখি হতে কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করায় জবাব দিয়েছিল, খুঁড়বেলের কন্দ খুঁজছে। পুঞ্চাডিহির কোন্ কোব্‌রেজ নাকি মতলব দিয়েছে, কুঁড়বেলের কন্দ থেকে গোদের ওষুধ হয়। দুজনে মিলে ওষুধের ফলাও কারবার ফাঁদবে। বিষহরির বউ কিন্তু বলেছিল অন্যকথা। কুঁড়বেলের কন্দ খুঁজতে এসে লোকটা নাকি সুযোগ পেলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। চোখ দিয়ে দেখে নয় তো, যেন জিব দিয়ে চাটে। রাগে বিষহরির মাথায় জ্বলেছিল আগুন। তাকে ডেকে বলেছিল, 'ওস্তাদের পো, বিষেবেদের ঘরের আনাচে কানাচে কুঁড়বেলের কন্দ নেই। মা মনসা ঝাড়ে বংশে বাসা বেঁধেছেন বেদের ঘরে। ঘরের আনাচে-কানাচে ফের যদি ছোঁক্ ছোঁক্ করে ঘুরে বেড়াতে দেখি, তো ফোঁস্ মন্তর পড়ে সাঁঝের বেলা দুধ খরিশ সাপ লেলিয়ে দেব। রাত পোয়ানোর আগেই কুঁড়বেলের কন্দ খোঁজার সাধ মিটে যাবে জন্মের মতো। এরপর আর কোনোদিন বাড়ির ধারেকাছে পা মাড়ায়নি কানাই ওস্তাদ।

ভয়ে, সে বলেছিল তার বউকে, বাপের বিদ্যে পেটে থাকলে, আর যা হোক অন্তত সাপের ভয়ে ওস্তাদের পো পিছ্‌পা হত না।

সেই কানাই ওস্তাদ এসেছে পালগাঁয়ে মোরগ লড়াতে। তাও অন্য কারও সাথে নয় বিষেবেদের লাল ষাঁড়ার সাথে। হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল।

খোঁচা মেরে বিষহরি বলল, 'ওস্তাদের পো, কটা লড়াই জিতেছ যে পালগাঁয় এসেছ বিষে বেদের সাথে লড়াতে? দশ-বিশটা গাঁয়ে বিষে বেদের মুরগার সাথে মুরগা লড়াতে ভয় পায় সকলে, তা জানো?'

— ভয় কী, জানে না কানাই ওস্তাদ। বুকের পাটা থাকে, বিষেবেদের লাল ষাঁড়া লড়াই করে জিতে নিক কানাই ওস্তাদের কালা ষাঁড়াকে। আর না থাকে, ষাঁড়া কবুল করে আসর ছেড়ে দিক অন্যকে।

— বটে বটে, তোর ষাঁড়ার ঝুঁটিতে কি শিং গজাল যে বিষেবেদে বিনা লড়াইয়ে আসর ছেড়ে দেবে?

— ঝুঁটিতে শিং নয়, ঘাড়ে কেশর গজিয়েছে। আমার কালা ষাঁড়ার উপর এই রইল বাজি। কাপড়ের ট্যাঁক থেকে ফস্ করে একটা রুপোর হাঁসুলি বার করে শূন্যে দোলাতে দোলাতে সে আস্ফালন করল, 'আমার বউর গলার রুপোর হাঁসুলি। পারিস তো জিতে নে।' কারও মুখে কোনো রা নেই। কান পেতে সবাই শুনছে তার আস্ফালন। লোকটা মদের নেশায় চুর হয়ে আছে, বুঝতে কারও বাকি নেই।

বিষহরির দু চোখে ছুটছে আগুন। বিস্ময়ে 'থ' মেরে তার বউ। বিষহরি বলল, 'ওস্তাদের বউর ইজ্জতের দাম নেই কি কানাকড়ি যে মরা বউর গলার হাঁসুলি বাজি রেখে লড়তে এসেছ পালগাঁয়?'

কানাই ওস্তাদের গলাতেও ফুটল ঝাঁঝ, মরা বউর চেয়ে জ্যান্ত মরদের ইজ্জতের দাম বেশি। সাহস থাকে তো আমার মরা বউর গলার হাঁসুলির উপর ধর না বাজি তোর জ্যান্ত বউর গলার হাঁসুলি। আর সাহস না থাকে, সরে দাঁড়া আসর ছেড়ে। অন্য কার বুকের পাটা আছে দেখি, জিতে নিক রুপোর হাঁসুলি।

—আমার বউর গলায় রুপোর হাঁসুলি নেই, থাকলে ওস্তাদের তড়পানির জবাব দিতাম মুখে মুখে, থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিতাম।

— বউর গলায় রুপোর হাঁসুলি না থাক, বউ তো আছে। বলে উঠল কানাই ওস্তাদ।

বিষহরির বউ এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। চুপ করে শুনছিল সে। বউ বাজি রাখার কথা উঠতেই সাপিনীর মতো হিস্ হিস্ করে উঠল 'গেলাস দুই মদ গিলে ওস্তাদ কি সাপের পাঁচ পা দেখতে শুরু করেছ? বেদের ষাঁড়া আস্তাকুঁড়ের দানা খুঁটে খেয়ে লড়ে না, লড়ে সাপের দুধ খেয়ে। সে খবর রাখো কি?'

মেয়ে মানুষের খোঁচা খেয়ে জ্বলে উঠল কানাই ওস্তাদ। গলা চড়িয়ে বলল, 'সাপের দুধ খায়। বেশ তো তবে ডরায় কেন তোর মরদ? গলার লড়াই ছেড়ে আসল লড়াই শুরু করতে বল না তোর মরদকে।'

বউ চুপ করল। বেদের মুখে কোনো 'রা' নেই। কঠিন একটা দৃষ্টি হেনে বউর কোল থেকে ছিনিয়ে নিল মোরগটা। একটু উঁচু করে তুলে ধরল। তারপর নামিয়ে রাখল মাটিতে। তার দেখাদেখি কানাই ওস্তাদও তার মোরগটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল মাটিতে। দুটো লড়াক্কু মোরগ গলার পালক ফুলিয়ে পাঁয়তাড়া কষার ভঙ্গিতে পরস্পরের মুখোমুখি হল। পাঁচ-পাঁচটা জয়ঢাক বেজে উছল গুড় গুড় করে। দুটো মোরগের বাঁ পায়ে ইস্পাতের ধারালো 'কাত' শক্ত করে বাঁধা।

লড়াই শুরু হল।

রুদ্ধশ্বাসে সবাই তাকিয়ে আছে, সবাই দেখছে বিষহরি সর্পবৈদ্য ও কানাই ওস্তাদের মুরগা লড়াই। আসরের সেরা লড়াই। পালগাঁয়ের সবচেয়ে জব্বর লড়াই। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ। প্রতিটি মুহূর্ত যেন ফেটে পড়ছে উত্তেজনায়। বজ্র-দৃষ্টিতে স্থির হয়ে আছে তিন জোড়া চোখ। মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে বিষহরির বউ উৎসাহ দিচ্ছে লাল ষাঁড়াকে। প্রথমে বিষেবেদের লাল ষাঁড়া কানাই ওস্তাদের কালো ষাঁড়ার ডানায় বসিয়ে দিল ইস্পাতের ধারালো 'কাত'। ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছের ডালের মতো লটকে পড়ল কালো ষাঁড়ার একটা ডানা। লাল ষাঁড়াও খোঁড়াচ্ছে। বোধহয় চোট পেয়েছে ঠ্যাং-এ। তবুও বিরাম নেই। লড়াই চলল। মরনপণ লড়াই। ইজ্জতের লড়াই। লড়াক্কু মোরগের ধড়ে যতক্ষণ জান, ততক্ষণ লড়াই। ধড়ে জান থাকতে ইজ্জত দেবে না কেউ।

চরম উত্তেজনায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখ থমথমে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিষেবেদে ও কানাই ওস্তাদ। তীব্র বিদ্বেষে ফেটে পড়বে যেন দু জোড়া চোখের মণি। বিষহরির বউর চোখে বিদ্বেষ নেই।

আছে স্থির আত্মবিশ্বাস। সহসা সেই স্থির বিশ্বাস প্রচণ্ড উত্তেজনায় কেঁপে উঠল থির্ থির্ করে। বিষেবেদের লাল ষাঁড়া ভালো লড়াই দিল। ঝাঁপিয়ে পড়ে কালো ষাঁড়ার ঝুঁটি কামড়ে ধরল। ঝটাপটি করতে লাগল দুটি মোরগ। সহসা যেন মরিয়া হয়ে পালটা আক্রমণ করল কানাই ওস্তাদের কালো ষাঁড়া। ভাঙা ডানাটা লট্‌পট্ করতে লাগল। বিষেবেদের লাল ষাঁড়া কাত হয়ে পড়ল। বার কযেক লেজের ঝাপটা মাবল মাটিতে। তারপর স্থির হয়ে গেল। কানাই ওস্তাদের কালো ষাঁড়া ঝুঁটি দুলিয়ে গলা ফুলিয়ে ডেকে উঠল — কোঁক্কড়-কোঁ!

সোল্লাসে বেজে ডঠল জয়ঢাক। হই হই করে উঠল জনতা। বিষেবেদের ঘাড় হেঁট, মাথা ঝুঁকে পড়ল বুকের উপর। বউর চোখ থেকে স্থির আত্মবিশ্বাসেব ভাবটা কেটে গিয়ে ফুটে উঠল আতঙ্ক।

কানাই ওস্তাদের কালো ষাঁড়া বিষেবেদের লাল ষাঁড়ার বুকে আমূল বসিয়ে দিয়েছে ইস্পাতের ধারালো 'কাত'।

লড়াই শেষ।

হিংস্র উল্লাসে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল কানাই ওস্তাদ। বিষহরির বউব মাথা হেঁট। সেই দিকে লক্ষ করে কানাই ওস্তাদ খোঁচা দিল, 'আস্তাকুঁড়ের দানা নয়, সাপের দুধ খেয়েও বেদের ষাঁড়া জিতল না কেন? বেদেনী কি সাপের দুধে জল মিশিয়ে ছিল?'

জবাব তো দূরের কথা, বেদেনী লজ্জা ও অপমানে ঘাড় তুলতে পারল না। এমনটা যে হতে পারে বিষহরি স্বপ্নেও ভাবেনি। সে হতচকিত, তার মুখে কোনো কথা জোগাল না।

এখনও অনেক জুটির লড়াই বাকি। বিষহরি সর্পবৈদ্য ও কানাই ওস্তাদের মোরগ লড়াই শেষ। তবুও কেউ আসর ছাড়ছে না দেখে লাঠি হাতে তেড়ে এল সর্দার ঘাটওয়াল, 'মুরগা হঠাও, জলদি হটাও।'

— বাজি জিতেছি, পাওনা বুঝে পেলেই আসর ছেড়ে দেব।

— বাজি!

— আমার মরা বউর গলার রুপোর হাঁসুলির উপর বাজি ছিল বিষেবেদের জ্যান্ত বউ।

শুনে সবাই থ। মুহূর্তের মধ্যে আসরে নেমে এল থমথমে ভাব। ঝড়ের আভাস ঘনিয়ে উঠল। শুধু কেউ বুঝতে পারছে না, ঝড়টা কোন্‌দিকে উঠবে। জয়ঢাকে কাঠি পড়া বন্ধ। সর্দার ঘাটওয়াল কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কানাই ওস্তাদ ঝুঁকে পড়ে একহাতে মাটি থেকে তুলে নিল নিজের আহত কালো ষাঁড়া, অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল বিষহরির বউর দিকে।

একটা চাপা গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে। বিষহরির বউ ভয় পেয়ে দু পা পিছিয়ে গেল। পরাজয়ের গ্লানিতে বিষহরির উঁচু শির ঝুঁকে পড়েছে মাটির দিকে, কিন্তু জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো জ্বলছে তার চোখ দুটো। সেদিকে কোনো হুশ নেই কানাই ওস্তাদের —

লড়াইয়ে-হার-জিত আছে। হারলে ইজ্জত যায় না, কথায় খেলাপ করলে ইজ্জৎ যায় মরদের।

সহসা ঝনাৎ করে বিষহরির পায়ের কাছে এসে পড়ল কানাই ওস্তাদের মরা বউর বুকের হাঁসুলি। চমকে উঠে একসাথে ঘাড় ফেরাল সে ও তার বউ।

খেলছে কানাই ওস্তাদ। জঙ্গলের দুধ খরিশ সাপের মতো বেপরোয়া। তীব্র হলাহল উগরে দিল জিবের ডগায়, 'হেরে গিয়ে বাজি দিতে না পারিস, তো এই নে, আমার বউর বুকের হাঁসুলি। এমনি দিলাম। পরাস তোর জ্যান্ত বউকে। সুন্দর মানাবে।'

হারা মোরগটা পাওনা বিজয়ীর। বিষহরির রক্তাক্ত মোরগ পড়ে রইল আসরে। কানাই ওস্তাদ আসরের বাইরে পা বাড়াল।

একজন সর্দার ঘাটওয়াল এগিয়ে এসে ছোঁ মেরে মাটি থেকে তুলে নিল মোরগটা। হ্যাঁচকা টানে ঠেংরি দুটো ফরাৎ করে ছিঁড়ে নিয়ে ধড়টা বাড়িয়ে দিল বিষহরির দিকে। বলল — ওস্তাদের পাওনা। দিয়ে দিস।

অবশ হাতটা বাড়িয়ে বিষহরি মোরগটা নিল। তারপর ঘাড় হেঁট করে পা বাড়াল আসরের বাইরে। আসর ছাড়ার আগে তার বউ অসহায়ভাবে একবার তাকিয়ে দেখল চারিদিক। পায়ের কাছে বিষাক্ত সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে কানাই ওস্তাদের রুপোর হাঁসুলি। বেদেনীর সহসা যে কী খেয়াল হল, বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘৃণাভরে মাটি থেকে তুলে নিল হাঁসুলিটা। তারপর নিজের গলায় পরতে পরতে বেদের পিছু ধরল। কেউ লক্ষ করল না, বেদেনীর দু চোখে টলমল করছে রুপোর হাঁসুলির চেয়ে দামি, নিটোল মুক্তার মতো দু ফোঁটা জল।

বেবেতো

অমিতাভ সমাজপতি

বাবা, তারাগুলো এত ছোট কেন?

অনেক উঁচুতে তো........।

পড়ে যায় না কেন?

ওদের ইচ্ছে হয় না তাই।

কেন ইচ্ছে হয় না?

বিরক্ত কোর না বেবেতো।

বল না।

আচ্ছা ধর ইচ্ছে হল। তারপর দুম করে পড়ে গেলে পৃথিবীর ব্যথা লাগবে না?

বাঃ! শব্দটা একটু জোরে বেরিয়ে আসতেই লজ্জা পেয়ে একছুটে ইন্দ্রাণী চলে আসে সামনের ব্যালকনিতে। সেখানে মেঝের দিকে মুখ নামিয়ে বসে আছে সৌমেন। সিগারেট টানছে। আলো চলে গেলে ফ্ল্যাটের এই ব্যালকনিটার প্রাধান্য বেড়ে যায় অনেক। দুই সদস্যের এই সংসার, এখানে বসে থাকে চুপ করে।

ইন্দ্রাণী রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়ায়। একটু আগের ঘন অন্ধকার আস্তে আস্তে সয়ে আসছে চোখে। আশপাশের বাড়িগুলোর আবছা জ্যামিতি ক্রমশ দৃশ্যমান। আজ বোধহয় অমাবস্যা। অন্ধকার আকাশে ঝিকমিক করছে তারার দল। বড়-ছোট, লালচে-নীল। দেখতে দেখতে এক সময় নিজের অজান্তেই বলে ওঠে ইন্দ্রাণী — আচ্ছা ওই যে তারাগুলো, ওগুলো পড়ে যায় না কেন?

সৌমেন যেন শুনতেই পায় না প্রশ্নটা। ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বলে...... একটু চা খাওয়াবে?

মোমবাতি হাতে ইন্দ্রাণী চলে আসে রান্নাঘরে। রান্নাঘরের জানলা থেকে পাশের ফ্ল্যাটের বারান্দার একটা অংশ দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে এখনও চলছে পিতা-পুত্রের বাক্যালাপ। আবার উৎকর্ণ হয় ইন্দ্রাণী। এই ক' দিনে এটা একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার।

ওটা কী?

ওটা ধ্রুবতারা।

সেটা কী?

সেটা একটা তারা।

তারা কী?

তারা হল নক্ষত্র।

নক্ষত্র কী?

খানিকক্ষণ নীরবতা। পাঁচ সেকেন্ড, দশ সেকেন্ড..... ইন্দ্রাণীর চায়ের জল ফুটছে ভুড় ভুড় শব্দে। সেদিকে তার দৃষ্টি নেই। মুখে একটা মজার হাসি ছড়িয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। নক্ষত্র কি? এটা একটা দারুণ প্রশ্ন। উত্তরটা কি হয় দেখা যাক........।

নক্ষত্র.......কী বলব.......মানে..........ইটস অ্যা.........

এবার শব্দ করে হেসে ফেলে ইন্দ্রাণী। দারুণ প্রশ্ন! নক্ষত্র কী? সত্যিই তো নক্ষত্র কী?

ইয়েস নক্ষত্র। স্টারস। একটা আলোর বল বলা যেতে পারে। আলোর ঝুলন্ত বল। ঝুলে থাকা যার কাজ.........।

বাঃ বাঃ! শব্দটা এবার পর পর দুবার মনের মধ্যে ঢেউ তোলে ইন্দ্রাণীর। কি আশ্চর্য উত্তর! মুহূর্তে উত্তরদাতা এবং প্রশ্নকর্তার মুখ দুটো মনে পড়ে তার। ভদ্রলোক টল, ডার্ক — বাচ্চাটা ফরসা। চোখ দুটো বড় বড়। লালচে লালচে চুল........। ভীষণ মিষ্টি! সারাদিন কী সুন্দর যে কথা বলে........কত যে তার জিজ্ঞাসা.........কতবার যে শব্দ করে হাসে — ওই তো, এখনও হাসছে। পিতা-পুত্রের সঙ্গে মায়ের যোগদান। তিনজনের মিলিত হাসিতে উত্তাল হয়ে উঠছে ওপারের দেওয়াল।

ইন্দ্রাণী চা রাখল মেঝেতে। কাপের শব্দে মুখ তুলল সৌমেন।

বিস্কুট দেব?

না।

চায়ে চুমুক দিয়েই ইন্দ্রাণী আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎই আবার প্রশ্ন করে ফেলল, এই যে আকাশের তারাগুলো, এরা আসলে কী?

সৌমেন সবে চুমুক দিতে যাচ্ছিল চায়ে। প্রশ্নটা শুনে কাপটা রেখে সেও আকাশের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড কেটে যেতে চুমুক দিল ফের। তারপর পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে সিগারেট না পেয়ে বলল, সিগারেটের প্যাকেটটা বোধহয় ডাইনিং টেবিলে, একটু দেবে........।

ইন্দ্রাণী আবার উঠল। ডাইনিং রুমের টেবলে প্যাকেটটা খুঁজল — পেল না। মোমবাতিটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। বাথরুমের সেলফ-এর উপর মাঝেমধ্যেই ভুল করে প্যাকেট রেখে আসে সৌমেন। ইন্দ্রাণী সিগারেটের প্যাকেট নিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার........

বেবেতো তোর গ্রিপিং-এ গণ্ডগোল হচ্ছে।

কে বলল?

এই তো মা বলছে, তোর কোচ নাকি বলেছে.......।

বলেছেই তো........। বলেছে, ওর ফোর-ফিংগারটা সবসময় ব্যাটের ব্লেডে আড়াআড়িভাবে থাকছে.........।

নেভার।

আমি মিথ্যে বলছি?

আ-হা-হা দাঁড়াও না। দেখি তোর ব্যাটটা নিয়ে আয় তো।

এই অন্ধকারে তুমি ওর গ্রিপিং দেখবে।

যথেষ্ট আলো আছে। তুই নিয়ে আয় তো, আমি দেখছি।

তুমি বুঝবে? ওর কোচ বলছে হাজারবার বলেও এটা ঠিক হচ্ছে না ওর। দুটো স্ট্রোক করার পরই আঙুলটা লম্বালম্বি.......

দাঁড়াও দাঁড়াও। আমি তো খানিকটা বুঝি, নাকি? ইউনিভার্সিটির-'ব্লু' ছিলাম ভাই, আই হ্যাভ গট মোর দ্যান টেন সেঞ্চুরিস অ্যান্ড ফর দ্যাট তুমি আমাকে চিঠি দিয়েছিলে.......।

কী হচ্ছে কী! বেবেতো আসছে! ছাড়ো..........

গলা মোম আঙুলে ঝরে পড়তেই, দুম করে মোমবাতিটি মেঝেতে ছেড়ে দেয় ইন্দ্রাণী। নিভে যাওয়া মোমবাতিটা ফেলে রেখেই চোরের মতো পালিয়ে আসে বারান্দায়। সৌমেনকে সিগারেট দিয়ে চুপ করে বসে থাকে অপরাধীর মতো।

সৌমেন সিগারেট ধরিয়ে একটু সোজা হয়ে গুছিয়ে বসে। বলে, তুমি যেন কী বলছিলে — তারা। তাই না? দেখ, এই যে আকাশ — একটা বিশাল শূন্যতা। এর মধ্যে গ্যালাক্সির

পর গ্যালাক্সি। তার মধ্যে ওই যে তারাগুলো দেখছ, ওগুলোকে যদি সঠিকভাবে বলতে হয়, তাহলে বলা উচিত, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ক্রিপ্টন, জেনন, আরগন, র‍্যাডন ইত্যাদি গ্যাসের এক একটি আধার। প্লাজমা স্টেটে রয়েছে এরা। যাই হোক, এদের নিউক্লিয়াসে অনবরত ফিউশন হয়ে চলেছে। তার ফলে এমিট করছে প্রচণ্ড শক্তি। ক্রমাগত তাপ বিকিরণ। ক্রমে ক্রমে তাপমাত্রা........

ইন্দ্রাণী আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। মুখ না নামিয়েই বলল, ইউনিভার্সিটির 'ব্লু' কাকে বলে জান?

সৌমেন চুপ করে গেল একেবারে। সোজা হয়ে বসার ভঙ্গিমায় যেন টান পড়ল ঝপ করে। ফের ভেঙেচুরে খানিকটা গুটিয়ে গিয়ে বলল, তোমার ভাল লাগছে না? তুমিই তো জিজ্ঞেস করলে......

কী জিজ্ঞাসা করলাম?

ওই যে, তারাগুলো আসলে কী?

ও তো ঝুলন্ত আলোর বল। জানি তো আমি। আলো ভরা বল। ঝুলে থাকা যাদের কাজ. .....

সৌমেন মাথাটা আরও নিচু করে অস্ফুট স্বরে বলল, 'তাই তো'।

উনিশশো চুরাশি সালের কোন এক বর্ষাব রাতে ইন্দ্রাণী ওই লোকটাকে প্রথম ঠিক এইভাবে 'তাই তো' বলতে শুনেছিল। তখন তার কালো চুলে কিছুটা ঢেউ ছিল। ফরসা মুখে কিছুটা ঔজ্জ্বল্য ছিল। 'সময়' সেই ঔজ্জ্বল্য কেড়ে নিয়ে সেখানে একটিস্থায়ী কালো ছোপ এঁকে রেখেছে। চুলের ঢেউ শান্ত হয়ে পাতলা হয়ে মাথার পিছনে বিকট একটা টাক সৃষ্টি করে.......

ইন্দ্রাণী আবার আকাশের দিকে তাকায়। কালো ক্যানভাসে যেন ঝকমক করছে তারাগুলো। অন্ধকারে কেমন সেজে-গুজে বসে আছে। স্পন্দন রয়েছে, চলন নেই। ঠিক তার এই ছোট্ট সংসারটির মতো। কথা আছে, বার্তা নেই। অথচ এমন সংসার তো হবার কথা ছিল না তার। তার বাড়িটা হওয়ার কথা ছিল সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের ফাঁকে সাপের মতো জলের ধারা। বিকেলের লাল আলোয় সেই জল চকচক করছে। কথা ছিল, চৈত্র মাসের পাতাঝরা সন্ধ্যায় অলকেশ বিকেলের ট্রেন থেকে নেমে টাঙায় করে ফিরে আসবে। ইন্দ্রাণী একটা চেয়ারে বসে সূর্যাস্ত দেখবে। হঠাৎ দূর থেকে টাঙার শব্দ পেয়েই একেবারে দৌড়ে চলে আসবে সে। অলকেশের এক হাতে একটা ব্যাগ, আর এক হাতে চামড়ার খাপে টেনিস র‍্যাকেট। সেটা দেখেই হেসে উঠবে ইন্দ্রাণী, ওটা দিয়ে কি করবে এখানে? খেলবে কার সঙ্গে?

তোমার সঙ্গে।

আমার সঙ্গে।

ইয়েস। তোমার জন্যেও একটা নতুন র‍্যাকেট কিনেছি। কাল সকালে সামনের ওই লনটা সাফ করে কোর্ট বানাব। তোমাব কস্টিউমও কিনে এনেছি।

কস্টিউম! আমার! হা হা!

ইন্দ্রাণী মনে মনে হাসতে হাসতে চমকে ওঠে হইহই শব্দে। সামনের দৃশ্যপটের সমস্ত বাড়িগুলোর আলো জ্বলে উঠছে পটাপট। আকাশের ঘন অন্ধকার ঘোলাটে হয়ে উঠেছে মুহূর্তে। সৌমেন অস্ফুটে বলে ওঠে...... এসেছে!

ইন্দ্রাণী তবু মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থাকে একভাবে। এখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলো যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকছে। সৌমেনও উঠে যাচ্ছে নিজের জায়গায়। অর্থাৎ সেই দশ বাই আট মাপের ছোট্ট ঘরটায়। পারতপক্ষে সেখানে ঢোকে না ইন্দ্রাণী। ফিজিক্স, অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এইসবের মোটা-সরু বই, খাতা, জারনাল......। অধ্যাপক এখন খাতা দেখবেন।

ব্যালকনি ছেড়ে বেডরুমে ঢুকে লাইট নিবিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় ইন্দ্রাণী। এ ঘর, ও ঘর, বারান্দা। বারান্দা, ও ঘর, এ ঘর। শুধু খাওয়ার পর শোয়া, শোয়ার পর রাঁধা, রাঁধার পর খাওয়া.......।

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে........

কে গান গাইছে? অন্ধকারে বালিশের থেকে মুখ তোলে ইন্দ্রাণী। জানলার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, গান গাইছে পাশের ফ্ল্যাটের বেবেতো-র মা।

চুপ করে বসে থাকে ইন্দ্রাণী। চার দেওয়ালের যাবতীয় অন্ধকার ভেদ করে সমস্ত শরীরে, রোমকূপের সহস্র ছিদ্র দিয়ে যেন অন্তরাত্মায় ঢুকে পড়ছে শব্দ, ছন্দ......।

কেন তারার মালা গাঁথা? কেন ফুলের আসন পাতা.....

কি হল, থামলে যে।

গানের খাতাটা বেবেতো ধরেছিল বিকেলে......।

মুখস্থ নেই? গান মুখস্থ কর না কেন?

যা বোঝ না, কথা বোলো না তো! স্বরলিপি থেকে গানটা তুলছিলাম —।

বেবেতো! এক্ষুনি বের করবি তুই।

আমি জানি না।

মিথ্যে কথা বলো না বেবেতো। বের করে দাও। দুষ্টুমি করো না......।

বাবা তুমি আমাকে গাড়ি কিনে দেবে বলেছিলে —

আচ্ছা কাল এনে দেব।

তাহলে চোখ বোজ। মা তুমিও চোখ বোজ। একদম চোখ খুলবে না। হাত দিয়ে ঢেকে রাখ.......।

ওরা দুজনে হাসছে। বেবেতো গানের খাতা বের করতে গেছে। গান আটকে আছে মাঝপথে। হারমোনিয়ামের রিড-এ ধরা সুর, নিপুণ হাতে খেলা করছে। ইন্দ্রাণী হঠাৎ নিজের অজান্তেই অস্ফুট স্বরে গেয়ে ওঠে.........., তবে বাতাস কেন........

মুহূর্তে ওদের হাসাহাসি বন্ধ হয়ে যায়। ইন্দ্রাণী অপ্রস্তুত হযে এক দৌড়ে বিছানায় এসে বসে। ছিঃ ছিঃ! কী মনে করল ওরা! অন্ধকারে ঘুরেফিরে একটা মুখ চোখের সামনে আসে ইন্দ্রাণীর। এখন বেবেতো তার মায়ের সঙ্গে একই সুরে গান গাইছে, সরু গলায় চিৎকার করে, স্কেলে মিলছে না দুজনের —

কেন তারার মালা গাঁথা, কেন ফুলের আসন পাতা......

দুষ্টু-মিষ্টি একটা ছেলে —

আমাদের ছেলে হবেই। ইয়েস, হবেই। অনেকটা তোমার মতোই দেখতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল হবে। হবেই। ওটা তো জিন ফ্যাক্টর। ভাল টেনিস খেলবে।—

মায়ের কিছু পাবে না?

পাবে। মার কাছ থেকেই তো শিখবে —।

কী শিখবে?

সেন্স অব লাভ, সেন্স অব প্যাশান......।

অলকেশের কথা শুনতে শুনতে আবেগ ঘনীভূত হয়ে উঠত ইন্দ্রাণীর গলায়। আবেগে আপ্লুত হলেই জিজ্ঞাসা করত। কী নাম হবে?

সেটা বলব না। আমি ঠিক করে ফেলেছি। বাট ইটস অ্যা সারপ্রাইজ —।

— আমি বলছি, ভুতু বা পুচু —

— নো, নো, অ্যা নেম স্যুড হ্যাভ আ ডেফিনিট মিনিং। বুঝেছ।

নামটা কি বলবে তো।

বললাম তো বলব না। দ্যাটস আ সারপ্রাইজ.......।

বেবেতো! বেবেতো। মানে কি এর? অন্ধকারে শব্দটা তিন-চার বার উচ্চারণ করে ইন্দ্রাণী। শব্দটা ঘুরেফিরে সারা শরীর ছাড়িয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ইন্দ্রাণীকে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয় সোজাভাবে।

দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে আলো জ্বেলে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় ইন্দ্রাণী। একটি একটি করে সমস্ত আভরণ খুলে নগ্ন হয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিজেকে। নারীত্বের সমস্ত উপকরণ দিয়ে সাজানো একটি শরীর.....একে ভেঙেচুরে একটু একটু করে আর একটা শরীর গড়ে নেয়নি কেউ! খিদেয় চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে এই বুকে মুখ লুকিয়ে শান্ত হয়নি। আবদার করেনি। দুষ্টুমি করে গানের খাতা লুকিয়ে রাখেনি। একই সঙ্গে গেয়ে ওঠেনি — যদি প্রেম দিলে না প্রাণে......। ইন্দ্রাণী অস্ফুটে যেন কেঁপে ওঠে।

গায়ের কাপড়টা কোনওরকমে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসে ইন্দ্রাণী। পাশের ঘরের টেবিল ল্যাম্পের আলোয় একমনে খাতা দেখছে সৌমেন। ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। আচমকা চিৎকার করে বলে — তুমি বেবেতো কথাটার মানে জান?

সৌমেন চমকে ওঠে — কিছু বলছ?

তুমি বেবেতোর মানে জান?

কী বলছ?

বলছি বেবেতো, বেবেতো। এই শব্দটার মানে জান?

কী সেটা?

একটা শব্দ। একটা নাম। এর মানে জান!

না।

কেন জান না? একটা নাম, তার তো মানে থাকতে হয়! হয় না?

তাই তো।

তাহলে বেবেতো কথাটার মানে কী?

জানি না তো।

কেন জান না!

সৌমেন বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ইন্দ্রাণীর দিকে। যন্ত্রণা আর আক্রোশের ভয়ঙ্কর দুটো চোখ। মাথা নুইয়ে বলে, আমার একটা বই পাচ্ছি না, তুমি দেখেছ........?

ইন্দ্রাণী কথাটার উত্তর না দিয়ে একবার ঘরের বইগুলোর দিকে তাকায়। তারপর ছিটকে চলে আসে আলমারির কাছে। র‍্যাক থেকে চার পাঁচটা বই তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মেঝেতে। সৌমেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। — এইসব বইয়ে কোথাও লেখা নেই মানেটা? একটা নামের মানে জান না! অ্যা নেম স্যুড হ্যাভ অ্যা ডেফিনিট মিনিং......

তাই তো।

শ্যাট্-আপ উইথ দ্যাট ব্লাডি ওয়ার্ড 'তাই তো'।

ভয়ানক চিৎকার করে ডুকরে কেঁদে ওঠে ইন্দ্রাণী —।

তোমার নাম কী?

আই অ্যাম বেবেতো।

বেবেতো কী?

বেবেতো কিছু না।

তোমার ভাল নাম কী?

বেবেতোই তো ভাল নাম। আর একটা বিচ্ছিরি নাম আছে স্কুলে। দ্যাট আই ডোন্ট লাইক। বেবেতো তো খুব ভাল নাম। বেবেতো ফুটবল খেলে। ব্রাজিলের প্লেয়ার —।

তুমি ফুটবল খেল?

না। আমি ক্রিকেট খেলি। ব্যাটসম্যান। তোমার নাম কী?

ইন্দ্রাণী গ্রিল আঁকড়ে মুখটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে বলে, আমার নাম ইন্দ্রাণী।

ভাল নাম কী?

এটাই তো ভাল নাম।

এটা বিচ্ছিরি নাম। এটা তোমার স্কুলের নাম। ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যানাদার ওয়ান —।

ইন্দ্রাণী ফিক্ করে হেসে ফেলে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ও মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে — আমার নাম বুকু।

বুকু!

নামটা কেমন?

গুড। ইউ লাভ টু রিড বুক্স?

ইন্দ্রাণী হি হি করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে গ্রিলটা চেপে ধরে কুঁজো হয়ে যায়। ওইটুকু বাচ্চার চিন্তাশক্তি দেখে তার হাসি ক্রমশ থেমে যায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। লালচে চুল। ধবধবে ফরসা। ঠোঁট দুটোতে যেন আলতা মাখানো। গ্রিলটা ধরে একটু ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। ইন্দ্রাণী ওইভাবে হেসে ওঠায় লজ্জা পেয়ে বেবেতো বলে, তুমি হাসলে কেন?

ওই যে তুমি বললে আমি বই পড়তে ভালবাসি। আসলে আমি একটুও ভালবাসি না।

সত্যি!

ইন্দ্রাণী মাথা নাড়তে উৎসাহে বেবেতো একেবারে যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে। আবার জিজ্ঞাসা করে — সত্যি!

হ্যাঁ।

দেন হোয়াই আর ইউ বুকু?

তুমি তো ক্রিকেট খেল, তবে তোমার নাম কেন বেবেতো? বেবেতো তো ফুটবল খেলে।

বেবেতো বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে — রাইট, রাইট। মাথাটা এমনভাবে নাড়তে থাকে যেন অনেকদিনের একটু ভুল করার অপরাধ বুঝতে পেরেছে সে।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করে — তোমার নামটা কে রেখেছে? বাবা?

— না মামা। হি প্লেজ ফুটবল।

ইন্দ্রাণী হাসল। বলল আমারও তাই। আমার নামটা রেখেছিলেন আমার দাদু। খুব বই পড়তে ভালবাসতেন তো —

বেবেতো লাজুক লাজুক দুষ্টু হেসে বলল, তুমি খেলতে ভালবাস?

খু-উ-ব।

কী খেল?

এখন তো আর খেলি না। তবে আমার প্রিয় খেলা হল টেনিস।

খেলতে পার?

ইন্দ্রাণী মাথা ঝাঁকায়, না। খেলার কথা ছিল, তবে আমাকে যে খেলা শেখাবে বলেছিল, সে তো দূরে চলে গেছে। অনেক দূরে —

আর আসবে না?

না। আমাকে হয়তো ভুলেই গেছে সে —।

দুষ্টু, ভেরি ভেরি নটি। কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত।

ইন্দ্রাণী হি হি করে হেসে ফেলল। তারপর গ্রিলের কঠিন চৌখোপগুলোতে মুখ চেপে ধরে নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে আকাশের দিকে চোখ উঠে গেল তার। জুন মাসের

আকাশ। স্বচ্ছ নীল রঙের মাঝে টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে চলেছে। দুপুরের নির্জনতায় তার এতদিনকার সাথী ওরা। আজ বোধহয় খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছে। মেঘেরাই যেন হাত নেড়ে চলে যেতে যেতে বলছে, একটুকরো মেঘের থেকে একটি শিশু অনেক বেশি সুন্দর —।

আকাশ থেকে চোখ সরাতেই তার মনটা উদাস হয়ে যায় আরও — বেবেতো নেই। হঠাৎ অন্যমনস্কতায় আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল ইন্দ্রাণী। এই ফাঁকেই কখন ঢুকে গেছে ঘরে। আরও খানিকক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যালকনি ছেড়ে যাওয়ার সময় একেবারে বেবেতোর মতো করে আপনমনে বলে ওঠে ইন্দ্রাণী — ভেরি ভেরি নটি বয়। কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। উচিতই তো —।

এই ফ্ল্যাটবাড়ির সোজাসুজি একটা পার্ক। ইন্দ্রাণী বিকেলে প্রায়ই যায় পার্কে। বাচ্চাকাচ্চার কিচির-মিচির। একটু দূরে তাদের মায়েরা গোল বয়ে বসে আড্ডায়। ইন্দ্রাণী কাছে যায় না কোনওদিন। ফাঁকা বেঞ্চে বসে বসে বাচ্চাদের দেখাই অভ্যেস। আজ আর ভাল লাগে না পার্কে যেতে। বেবেতোর কথাগুলো যেন এখনও এই বারান্দায় গ্রিলের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরে। লালচে লালচে চুল, চোখের নীচে লাজুক হাসি — বুকু মিনস্ হু লাভস্ টু রিড বুক্স......।

উল্টো দিকের ব্যালকনিতে বসে থাকতে থাকতেই কখন যে সন্ধে নেমে আসে টের পায় না ইন্দ্রাণী। কী লাভ টের পেয়ে? কী হয় সন্ধে হলে?

সন্ধে হল একটা ট্র্যানজিশন পিরিয়ড। একটি দিন ট্র্যানজিট করছে রাতের দিকে। এভরি ওয়ান ইজ অন হিজ ওয়ে ব্যাক। যেমন ধরো একটা পাখি, একটা গরু, একটা কর্মব্যস্ত লোক..... অলকেশ শিশুর মতো উচ্ছল হয়ে বলত. ..... সন্ধে হলেই সেজেগুজে থাকবে।

কেন?

একজন পরিশ্রমী লোক ফিরে আসছে। ফিরে আসছে তার প্রিয়ার কাছে। সেই প্রিয়া তখন রেডি থাকছে উইথ অল সর্ট অব অ্যালিগ্যান্স।

পারব না। তার থেকে খানিকটা ওডিকোলন কিনে রেখ। ঠাণ্ডা প্রলেপ পেয়ে যাবে.......।

ডোর বেলের কর্কশ আওয়াজে ঘোর ভাঙে ইন্দ্রাণীর। দরজা খুলে দেয় অলসভাবে। সৌমেন একগাদা বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালো ফ্রেমের মোটা কাঁচের চশমায় ক্লান্তি। সৌমেন একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। তারপর পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে যায় নিশ্চুপে। গত তিন চার দিন ধরে এই রকমই চলছে........ চলুক। লোকটাকে অনেক সহ্য করেছে ইন্দ্রাণী। বইপত্র, খাতা-পেন্সিল আর গাদাগাদা ম্যাগাজিনের মধ্যে যে জগৎ সৃষ্টি করেছে সে, তার মধ্যেই থাকুক। প্রত্যেকটি মানুষের অন্তত একজন সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে জন্মানো উচিত। না হলে এ জগৎসংসারে তার কোনও দাম নেই। তার ক্লান্তির, তার প্রেমের কোনও মূল্য নেই। কোনও সমীহ আদায় করা তার উচিত নয়। কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই যন্ত্রচালিতের মতো রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায় ইন্দ্রাণী। নিয়মমাফিক চায়ের জল চাপায়। সৌমেন কলেজ ফেরত ছাত্র পড়ায়। প্রায়ই দেরি হয়। আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছে। ঘরে ঢুকেই চা দরকার তার......।

রান্নাঘরের জানলাটা হাট করে খুলে উঁকি মেরে দেখল ইন্দ্রাণী। বেবেতোদের ফ্ল্যাট থেকে সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। নেই বোধহয়। রান্নাঘর থেকে বারান্দায় এল। উঁকি দিল। নেই। চা করে ডাইনিং টেবিলে রেখে গম্ভীর গলায় বলল 'চা'। সৌমেন বেডরুম থেকে বেরিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে গেছে ততক্ষণে। ইন্দ্রাণী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সামনের ব্যালকনিতে এসে বসল। নীচে ঝলমল করে একটা শহর। সেজেগুজে উঠছে.....।

এখন সন্ধে। একটা অদ্ভুত গন্ধ....... বিকেল হলে রোজ সেজে থাকবে। আমি ডোরবেলে আঙুল দিতেই আমাদের ছেলেমেয়েরা হই হই করে উঠবে।

চোখের নীচে গাল বেয়ে নোনতা জল ঠোঁটে এসে ঠেকে ইন্দ্রাণীর। শহর ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে চোখে.......

তোমার সঙ্গে আড়ি।

কেন? কী করলাম আমি?

তুমি কাল আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলে কেন? আমি কতবার ডাকলাম.......।

ও তাই বুঝি?

তুমি আকাশ ভালবাস?

হ্যাঁ।

অ্যান্ড্রোমিডা চেন?

না তো? সেটা কি?

এ মা! জান না? দিস ইজ আ গ্যালাক্সি। অনেক অনেক তারারা সেখানে একসঙ্গে থাকে। এটা আমাদের 'নেবার'। আমাদের গ্যালাক্সির নাম 'মিল্কিওয়ে......।

অনেক দুধ থাকে বুঝি 'মিল্কি ওয়ে'তে?

ধ্যাত বোকা! 'মিল্কি ওয়ে' হল তারার জঙ্গল।

কে বলেছে?

মাই ড্যাড। হি ইজ অ্যা গুড ক্রিকেটার। দাঁড়াও তোমাকে আমার ব্যাটটা দেখাই। তুমি কিন্তু চলে যাবে না। আকাশের দিকে তাকাবে না, রাইট! ইউ ওয়েট......।

একছুটে ঘরে ঢুকে ব্যাটটা নিয়ে লাফিয়ে চলে এল বেবেতো। তারপর ব্যাটটা ধরে ঠক ঠক করে মেঝেতে ঠুকতে ঠুকতে বলল, এই ব্যাটটা কোন কাঠ, জান?

ইন্দ্রাণী মাথা নাড়ল, না।

এটা হল উইলো। ইটস অ্যা ট্রি। তুমি কিন্তু এটা এখানে পাবে না।

কে বলেছে?

মাই ড্যাড। হি নোজ এভরিথিং......।

ব্যাটটা ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ মাথা নিচু করে যেন একটা অদৃশ্য বল খেলে দাঁড়িয়ে রইল বেবেতো। বলল দিজ ইজ ডিফেন্স। তোমার ডিফেন্স যদি ভাল না হয় তুমি খেলতেই পারবে না।

আর অফেন্স?

ডোন্ট টক। আমি তোমার কোচ। ইউ লিসন, হোয়েন ইয়োর কোচ সেজ।

ইন্দ্রাণী হাসি চাপতে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বলল, ও-কে কোচমশাই।

বেবেতো এবার ডান পা পেছনে এনে ব্যাটটাকে আড়াআড়ি চালিয়ে দিল — লুক, দিজ ইজ কাট্।

কেটে গেল!

ওঃ ইটস্ অ্যা শট!

শর্ট কাট?

ওঃ ইউ আর ক্রেজি ক্রেজি ক্রেজি.....

ইন্দ্রাণী মিটি মিটি হেসে বলল, কিন্তু কোচমশাই আপনার গ্রিপিং-এ যে গণ্ডগোল। ডান হাতের ফোর ফিংগারটা যে ব্যাটের ব্লেডের ওপর থাকছে........

বেবেতো আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর লাজুক হেসে বলল, তুমি ক্রিকেট খেলা জান?

ইন্দ্রাণী কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু মুচকি মুচকি হাসে। দিন পাঁচেক আগে ওর বাবা-মার কথাবার্তায় যে সংবাদটা জেনে ফেলেছিল, সেটা বলে এখন দারুণ চমকে দিয়েছে বেবেতোকে।

ইউ নো দ্যাট?

আই হ্যাভ জাস্ট অবজার্ভড ইউ ডুয়িং দ্যাট মিঃ কোচ।

বেবেতো আশ্চর্য হয়ে বলে, দেন ইউ নো অ্যান্ড্রোমিডা অলসো? ইউ নো হোয়াট অ্যা স্টার ইজ?

তারা হল আলোর বল। আকাশে ঝুলে থাকা যাদের কাজ......।

রাইট! রাইট! বেবেতোর কটা চোখ দুটো যেন চক্‌চক্‌ করে ওঠে.....তুমি জান?

ইন্দ্রাণী গ্রিলের ফোঁকরগুলোতে তার মুখটা আর একটু বাড়িয়ে বলল, তা হলে বেবেতো, তোমার বন্ধু মানছ তো আমাকে?

অফকোর্স! জান তো স্কুলে আমার তিনজন বন্ধু আছে। ওয়ান ইজ নীল, অ্যানাদার ইজ সৌমাল্য, অ্যানাদর ইজ গৌরব।

তা হলে দ্য ফোর্থ ওয়ান ইজ.......

বুকু!

বেবেতো খিলখিল করে হেসে উঠতে ইন্দ্রাণী গ্রিলের একটা বড় ফাঁকে মাথাটা প্রায় বের করে হাত নাড়ে। বেবেতো উৎসাহে ব্যাটটাকে দু চারবার শূন্যে চালিয়ে গ্রিলের রেলিং-এ একটা পা তুলে দিয়ে লম্বালম্বিভাবে প্রায় শুয়ে পড়ে বলে, বুকু ডাজ নট লাইক বুকস.......।

ইন্দ্রাণী বেবেতোর দুঃসাহস দেখে চমকে উঠে জোর ধমক দেয়....... নেমে যাও! বেবেতো! পা নামিয়ে নাও! বেবেতো হাসি হাসি মুখে ইন্দ্রাণীকে আর একটু ভয় দেখাবার জন্য মাথাটা একটু ঝোঁকাতেই, ইন্দ্রাণী প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, বেবেতো পা নামিয়ে নাও! বেবেতো!

বেবেতো খিল খিল করে হাসতে হাসতে আর এক পা তুলে ইন্দ্রাণীকে আরও ভয় দেখায়। ইন্দ্রাণী এবার বেশ জোরে চিৎকার করে ওঠে, বেবেতো! কথা শোন! বেবেতো!

বেবেতো! কী করছিস ওখানে?

ঘরের ভেতর থেকে বেবেতোর মার গলা পেয়ে একলাফে ঘরে ঢুকে যায় বেবেতো।

গ্রিলটা চেপে ধরে ইন্দ্রাণী একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

শরীরের মধ্যে আবার একটা অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। এঘর ওঘর করতে শুরু করে ইন্দ্রাণী। রাগে, দুঃখে, অপমানে একছুটে সৌমেনের পড়ার ঘরে ঢুকে টান মেরে বইপত্র সব ফেলে দেয় নীচে।

ধীরে পায়ে হেঁটে বাইরের ঘরে এসে বসে ইন্দ্রাণী। এই ঘর। দুদিকের বারান্দা। সেই রান্নাঘর। ক্লান্তিকর শোবার ঘর। সেই লোকটা। ফিজিক্স অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স মিলেমিশে প্রাচীন প্রাণহীন এক সৌধ। সেই সৌধের এক কোনায় অসীম এক শয্যায় যেন নিয়ম করে নিজের শরীরটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে এলিয়ে দেয় ইন্দ্রাণী.........

বুকু .... বুকু.........বুকু - উ - উ।

চাপা চিৎকারে চমকে উঠে একদৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় ইন্দ্রাণী। চারপাশের আলোতে কেমন যেন নিস্তেজ ভাব। তবু সেই ঠাণ্ডা আলোয় জ্বলজ্বল করছে বেবেতোর মুখ।

তুমি আসনি কেন? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। ডাকতেও পারছি না তো। মা জেগে উঠবে না?

মাকে লুকিয়ে এসেছ? দুষ্টু ছেলে.......

আমার মাও দুষ্টু.........।

ছি। ওসব বলতে নেই।

কেন বলতে নেই?

মাকে ওরকম কথা বলতে নেই। মা তো ঠাকুর।

বেবেতো ফিক্ করে হেসে ফেলে। ইন্দ্রাণী বলে — হাসলে কেন?

ধ্যাৎ বোকা। মা ঠাকুর নাকি? ঠাকুরের কি পেট কেটে বাচ্চা হয়?

ইন্দ্রাণী চোখ ঢেকে হো হো করে হেসে ফেলে। তারপর চাপা গলায় বলে, কার পেট কেটে বাচ্চা হয়েছে?

কেন আমার মায়ের।

কে বলল?

বাবা বলেছে। দো আই ডোন্ট বিলিভ ইট। লুক আই অ্যাম অ্যা টল ম্যান, ব্যাটসম্যান। আমার মার পেটটা দেখেছ তো? ওর মধ্যে আমি থাকতে পারি? তুমিই বল?

ইন্দ্রাণী এবার হাসবে না কাঁদবে ঠিক করতে পারে না। ভয়ঙ্কর প্রসঙ্গটা পাল্টাতে বলে, তোমার ব্যাটটা কোথায়? শেখাবে না?

বেবেতোর চোখ দুটো যেন চকচক করে ওঠে তুমি শিখবে?

হ্যাঁ, তাই তো এসেছি......।

ও গড! বলবে তো।

দৌড়ে গিয়ে ব্যাটটা নিয়ে আসে বেবেতো। তারপর ধাঁ করে মাথার উপর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে বলে, লুক, দিস ইজ হুক....।

ব্যাটটা সজোরে গ্রিলে বাড়ি খেয়ে ঘটাং করে শব্দ হয়। শব্দ হতেই জিভ কামড়ে বসে পড়ে বেবেতো — চুপ। দ্যাট ক্রুয়েল লেডি —।

ইন্দ্রাণী চোখ বড়বড় করে ধমক লাগায়, বেবেতো, মাকে ওইভাবে বলতে হয় ছি ছি।

যদিও মনের ভেতরে কোথায় যেন একটা আনন্দ টের পায় ইন্দ্রাণী। বেবেতোর মা হেরে যাচ্ছে তার কাছে। তবু মুখে কপট রাগ দেখিয়ে বলে, আর বলো না কেমন?

মুখ ভার করে ব্যাটটা রেলিং-এ হেলিয়ে রেখে দেয় বেবেতো। রেলিং-এ থুতনি ঠেকিয়ে তাকিয়ে থাকে অন্য দিকে। যেন অগ্রাহ্য করে ইন্দ্রাণীকে। ইন্দ্রাণী বুঝতে পেরে বলে....... কোথায়, শুরু কর! হুকটা তো শিখলাম। এরপর কি? কুক?

বেবেতো কথা যেন শুনতেই পায়নি এমন ভান করে প্রথম। তারপর রেলিং-এ ঝুলে জিভ ভেঙায়। ইন্দ্রাণী হেসে ফেলে......রাগ হয়েছে? বেবেতো উত্তর না দিয়ে মাথাটাকে এবার রেলিং-এর উপর তুলে দিতেই ইন্দ্রাণীর হাসি থেমে যায়.....বেবেতো পা নামিয়ে নাও! বেবেতো!

বেবেতো ইন্দ্রাণীকে একেবারে পাত্তা না দিয়ে ইচ্ছে করে পা-টা ঝুলিয়ে দোলাতে থাকে। বেবেতো সরে যাও। নেমে যাও বেবেতো..... ইন্দ্রাণী প্রায় চিৎকার করে উঠতেই বেবেতো মজা পায়। খিলখিল করে হাসতে হাসতে অন্য পা-টা তুলতে চেষ্টা করতেই ইন্দ্রাণী আর্তনাদ করে ওঠে। পড়ে যাবে! বেবেতো, পা তুলে নাও বেবেতো! সোনা, লক্ষ্মী ছেলে। প্লিজ বেবেতো। আচ্ছা আমি মানছি তোমার মা......। বেবেতো!

বেবেতো যেন আরও মজা পায়। আবার পা তুলতে চেষ্টা করতে গিয়েই..... ও কী দেখছে ইন্দ্রাণী!! আতঙ্কে বিকট চিৎকারটা গলা থেকে বেরিয়েই গলাতেই আটকে যায় ইন্দ্রাণীর। গ্রিলের ওপারের দৃশ্যটা দেখে মুহূর্তে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে যায়। বাঁ পা-টা তুলে মজা করতে গিয়ে শরীরের ব্যালান্স হারিয়ে চারতলার রেলিংটা ধরে ঝুলছে বেবেতো। চাপা ভয়ার্ত একটা আওয়াজ বেরচ্ছে ওর মুখ থেকে......বুকু, আমি পড়ে যাচ্ছি.....।

ইন্দ্রাণী এক লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, বেবেতোদের সিঁড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে উপরে উঠতে উঠতে চিৎকার করে.....বেবেতো! ধরে থাক। শক্ত করে ধরে থাক। ভয় পাস না বেবেতো। চিৎকার করতে করতেই বেবেতোদের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে জোর ধাক্কা

দেয়.....দরজা খুলুন। দরজা খুলুন..........। দু হাত দিয়ে এলোপাথাড়ি ঘুসি মারে দরজায়.......দরজা খুলুন। ছেলেটা ঝুলছে, দরজা খুলুন......।

দরজা খুলে বেবেতোর মা ঘুম ঘুম চোখে কথা বলতে যেতেই, ইন্দ্রাণী তাকে ঠেলে সরিয়ে একদৌড়ে ব্যালকনিতে এসে রেলিং-এ ঝুঁকে দেখে, বেবেতো প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে গ্রিলটা। আতঙ্কে চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে....বুকু আমি পড়ে যাচ্ছি.......।

ইন্দ্রাণী এক লাফ দিয়ে রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে। আসুরিক শক্তিতে বেবেতোর একটা হাত ধরে প্রাণপণে উপরের দিকে টেনে তোলে। রেলিং টপকে ওর শরীরটাকে বারান্দার ভেতরে নিয়ে আসতেই উল্টে পড়ে যায় বারান্দায়। বেবেতো আতঙ্কে ইন্দ্রাণীকে জাপটে ধরে। মুখটাকে ওর বুকের ভেতর চেপে রেখে সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরে থাকে। ততক্ষণে গোটা ঘটনা বুঝতে পেরে কাঁদতে শুরু করেছেন বেবেতোর মা। অন্যান্য ফ্ল্যাটের লোকজন জড়ো হচ্ছে এক এক করে.....।

ইন্দ্রাণী বেবেতোকে জাপটে ধরে থাকে একইভাবে। ধীরে ধীরে একসময় হাত শিথিল করে দেয় সে। বেবেতোর মা বেবেতোকে তুলতে চেষ্টা করেও পারে না। বেবেতো যেন আরও জোরে আঁকড়ে ধরছে ইন্দ্রাণীকে। ইন্দ্রাণী বুঝতে পারে তার সমস্ত শরীর সেই বাঁধনে যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে....বুকের শিরায় শিরায়, গ্রন্থিতে কে যেন আকুল হয়ে ঝাঁপ দিয়েছে — কামহীন, শর্তহীন এক আশ্রয়ের সন্ধানে।

কাম অন বেবেতো। আরও জোরে চেপে ধরে থাক। আমার নিশ্বাস প্রশ্বাস, আমার অস্তিত্ব, আমার শৈশব, অতীত, বর্তমান সব শেষ করে তুই তোর আশ্রয় খুঁজে নে। এই অর্থহীন স্তন, নিষ্কর্মা উরুসন্ধি, অলস পেটের গহ্বর, সুবর্ণরেখা নদী, টেনিস কোর্ট, ছবির মতো বাংলো, ফিজিক্স, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স.....কাম অন কাম অন......

জ্ঞান হারাতে হারাতে বেবেতোর মার কান্না শুনতে পাচ্ছে ইন্দ্রাণী। বেবেতো ততক্ষণে যেন ঢুকে পড়েছে ইন্দ্রাণী শরীরে। লীন হয়ে যাচ্ছে দুটো দেহ। বেবেতোর মা হাহাকার করে উঠছেন — ছেড়ে দিন ওকে, ছেড়ে দে বেবেতো!

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে ইন্দ্রাণী। ঘন রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে একটানা শোঁ শোঁ ফ্যানের শব্দ। বুকের মধ্যে অসহ্য একটা ব্যথা। কে যেন এখনও চেপে আছে তার বুকটা। কার শব্দ পাচ্ছে এখনও কানে...... ছেড়ে দিন ওকে......।

অন্ধকার হাতড়ে খাট থেকে নেমে আসে ইন্দ্রাণী। বাইরে ল্যাম্প পোস্ট থেকে আলোর একটা ক্ষীণ রেখা এসে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের একাংশে। সেই আলোয় চোখ ধাতস্থ হয় খানিকটা। ইন্দ্রাণী এক-পা এক-পা করে বাইরে বেরিয়ে সেই বারান্দায় এসেই থমকে দাঁড়ায়। বেবেতোদের ফ্ল্যাটের নীল আলো জ্বলছে। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সে আলোর একটা সত্তা ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত ঘরে। রেলিং-এর যে জায়গায় বেবেতোকে ঝুলতে দেখেছে একটু আগে, সেই জায়গাটা আরও ভাল করে দেখার জন্য রেলিং-এর একটা বড় ফোঁকরে মুখ বাড়িয়ে দেয় ইন্দ্রাণী।

ক্রমশ একটা স্বস্তির নিশ্বাস যেন বুকটাকে হালকা করে দেয় একটু একটু করে। পাশের চেয়ারটায় বসে, কিছুক্ষণ আগের দেখা স্বপ্নটা ভাবতে ভাবতে শরীরে অদ্ভুত এক আবেশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে আবার। স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝামাঝি একটা জায়গায় যেন এই মুহূর্তে আটকে আছে ইন্দ্রাণী। বেবেতো নীল আলোয়, নরম বিছানায় বাবা-মার কোলে ঘুমোচ্ছে নির্বিঘ্নে। ওর মুখটা একবার মনে করার চেষ্টা করে ইন্দ্রাণী। কিন্তু একটু আগের দেখা তার সেই আতঙ্কিত মুখটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বারবার। শিউরে ওঠে ইন্দ্রাণী। নিজের শরীরের মধ্যে বেবেতোর ঢুকে পড়ার দৃশ্যটা স্বপ্নে দারুণ উপভোগ করেছিল ইন্দ্রাণী। এখন সে দৃশ্য ক্রমশ নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। তার থেকে এই তো ভাল।

কে কাঁদছে না? ইন্দ্রাণী কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করে। একেবারে নবজাত শিশুর কান্না। চঞ্চল হয়ে উঠেছে মন। ওর মা কি শুনতে পাচ্ছে না? ঘুমচ্ছে এত অঘোরে? ইন্দ্রাণীর মনে হয় নীচে নেমে গিয়ে দরজায় টোকা দিয়ে বলে......শুনছেন, আপনার বাচ্চা কাঁদছে। খিদে পেয়েছে ওর.......।

— কে?

— আমি চারতলার বেবেতোর মা বলছি......

জলতেষ্টা পেয়েছে। ইন্দ্রাণী চেয়ারটা ছেড়ে ডাইনিং হলের জলের পাত্রটা নিতে লাইট জ্বালাতেই থমকে দাঁড়ায়! সৌমেনের খেয়ে যাওয়া থালায় অর্ধেক ভাত পড়ে আছে। একেবারে শিশুদের মতো খেয়ে উঠেছে। অর্ধেক খেয়েছে অর্ধেক ছড়িয়েছে। ইন্দ্রাণী দাঁড়িয়ে দেখে খানিকক্ষণ। কখনও বলে না, 'আর একটু দাও।' ইন্দ্রাণীকেই বুঝে নিতে হয়। খাওয়ার পর বলতে হয় জল খাও। মুখ ধোয়ার পর বলতে হয় মুখ মোছ। তারপর ওষুধটা হাতে দিতে হয়......।

ইন্দ্রাণী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আরও কতক্ষণ। অবিন্যস্ত খাওয়ার টেবিলটায় যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার গত সাত দিনের অশ্রদ্ধা, অবহেলা, অবজ্ঞা.....। জল খাওয়া হয় না ইন্দ্রাণীর। চলে আসে পড়ার ঘরে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। বইপত্রগুলো এই সাত দিনে আরও অগোছালো করে রেখেছে। টেবিলে স্তূপাকৃতি বই। ইন্দ্রাণীর ফেলে দেওয়া বইগুলো আলমারি আর টেবিলের নীচে পড়ে আছে আজও.......

ইন্দ্রাণী যত্ন করে সময় নিয়ে গুছিয়ে দেয় সব। তারপর বেডরুমে এসে নীল আলোটা জ্বলতেই চমকে ওঠে। খাটের একেবারে কিনারায় এসে শিশুর মতো ঘুমোচ্ছে সৌমেন। পড়ে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। একছুটে বিছানায় এসে খুব সন্তর্পণে ওকে সরিয়ে দেয় ইন্দ্রাণী। চশমাটা চোখেই রয়েছে, পাঞ্জাবিটা খোলেনি। প্রথমে চোখ থেকে চশমাটা খুলে নেয় আলতো করে। পাঞ্জাবির ভেতরে গেঞ্জি সমেত গা একেবারে ঘামে ভিজে জ্যাবজ্যাব করছে। ইন্দ্রাণী পাঞ্জাবিটা ধীরে ধীরে টান মারতে, সৌমেন ঘুমের মধ্যেই শিশুর মতো দু হাত তুলে ধরে। গেঞ্জিটাও খুলে নেয় ইন্দ্রাণী.....আঁচল দিয়ে গা মুছিয়ে দেয়। তারপর সৌমেনের মাথার তলায় বালিশ দিতে গিয়ে কখন নিজের অজান্তেই তাকে কোলে তুলে নেয় আলতো করে। সেখানে আদরের আভাস পেয়ে ঘুমের মধ্যেই তৃপ্তি আর অভিমান মিশ্রিত একটা গোঙানি ওঠে সৌমেনের গলা দিয়ে। সৌমেনের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ইন্দ্রাণী অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, বেবেতো, বেবেতো......।

হাতঘড়ি

অরিন্দম বসু

খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহিত জওহরলালের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী কথোপকথন হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা ও অ্যাডভান্সের ছবি দুটিতে জওহরলালকে শ্রোতারূপে দেখা যায়। ভারতবর্ষের সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী মনস্বীর সহিত কংগ্রেস অধিনায়কের কী কথা হইয়াছিল, জানিতে শুধু যে অলস ও বৃথা কৌতূহল হয় তাহা নহে, জানিতে পারিলে সর্বসাধারণ উপকৃত হইবেন।

গোলপার্কের কাছে পুরোনো বই এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হাতে একখানা বাঁধানো প্রবাসী। কার্তিক চৈত্র। ১৩৪৩। অগ্রাণ সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলালের কথোপকথন। আরও অনেক কিছুই রয়েছে। যেমন, কার্তিক সংখ্যায় রাজা রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন, ইন্দ্রভূষণ গুপ্তর আঁকা ছবি। মাঘে বেঙ্গল ইনশিয়োরেন্স ও রিয়াল প্রপার্টি কোম্পানির বিজ্ঞাপন। পৌষে সংখ্যায় ব্রহ্মে বাঙালির মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা। চৈত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রদানী।

বই এর পাতায় কয়েকশো ফুটো। ওরই একটা থেকে একটা উইপোকা আড়মোড়া ভেঙে উঠে আসার চেষ্টা করছিল। ও আমায় দেখতে পাচ্ছে না নিশ্চয়ই। টোকা মারতেই পড়ল ফুটপাথে। সেই সঙ্গে আরও কাগজের গুঁড়ো ঝরে গেল। সময়ের হতে পারে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এত মিহি।

এই দোকানে আরও তিনখানা বাঁধা প্রবাসী রয়েছে। তার মধ্যেও উইপোকা রয়েছে। তা থাক। বইওয়ালা একটা টুলে বসে অন্যদিকে তাকিয়ে। আমি এখানে আসি মাঝেমধ্যে। একে চিনি। নাম রমাপ্রসাদ। এবার উঠে দাঁড়িয়ে সে তিনটে প্রবাসীর একটা আর একটার উপর চাপাল শব্দ করে। এর মানে হল   দামটা বলুন।

রবীন্দ্রনাথকে আমি চিনি। জওহরলাল নেহেরুকেও। দুজনের কেউই নেই। সেই সময় যারা সর্বসাধারণ ছিলেন তারাও বুড়ো হয়েছেন। অনেকে মারাও গিয়েছেন হয়তো। বই-এর স্পাইন চামড়ায় বাঁধানো। তাতে সোনা রঙে লেখা বি রায়। একে আমি চিনি না। সেরকম কথাও নয়। তবে তার বইগুলো কিনতে পারলে আমি উপকৃত হতাম। বললাম, দাম ঠিক করে বলুন। এক একটা ষাট টাকা, বেশি হয়ে যাচ্ছে।

— যা বলেছি ওই ঠিক আছে। এসব বই-এর দাম হিসেবে আমি কমই বলেছি।

— এরপর যে উই মারতে ওষুধ লাগবে তার দাম কে দেবে, আপনি?

সে আমি জানি না। — বলে রমাপ্রসাদ আমার হাত থেকে প্রবাসী নিয়ে নিল।

আমার যে অপমান লাগল বা খুব রাগ হল তা নয়। একেকদিন হয় এরকম। চেনা দোকানির সঙ্গে অনেকক্ষণ রগড়ালে তবে দাম কমে। ওর দামে দুশো চল্লিশ। আমি দিতে পারব দেড়শো। কথা জমিয়ে তুলতে পারলেই হয়। অন্য দোকানের দিকে চলে যাচ্ছিলাম।

খুবই পুরোনো কায়দা। ওকে বোঝাতে হবে যে আমি চলে যাইনি। টাকা তোমার সামনেই ঘুরঘুর করছে। একসময় রফা হবে।

পাশের গলিটাকে স্টোনচিপ দিয়ে পিচমোড়া করা হচ্ছে। ওদিক দিয়েই হেঁটে হেঁটে এসেছি আমি। পিচ আর স্টোনচিপ একসঙ্গে মাড়িয়ে ফেলায় আমার চামড়ার চটি নাগবাই হয়ে মচমচ আওয়াজ তুলছে। এখানে উল্টোদিকের হোটেল থেকে মোগলাই রান্নার খুশবু। এতসব বই-এর গা ঘেঁষে বড়ো রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে গাড়ি। হেঁটে যাচ্ছে মানুষ। দুপুরের আকাশে আষাঢ়ে মেঘ বৃষ্টির পাঁয়তারা কষছে অনেকক্ষণ ধরে। নামাতে পারেনি এক ফোঁটাও। নীচে আমিও বই কেনার পাঁয়তারা কষছি। ঝোলায তুলতে পারিনি একটাও। সব মিলিয়ে ঝকমারি যাকে বলে।

একটু দূরে আর একটা বই-এর দোকানেব সামনে গিয়ে দাঁড়াই। একটা বড়ো বাড়ির পাঁচিলের লাগোযা। সবই ইংরেজি ম্যাগাজিন, নভেল। বললাম, বাংলা আছে কিছু?

বাংলা? হ্যাঁ, হবে। বলে দোকানি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেয়ালে হেলান দেওযা থাক থাক বই-এর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। সাদা কাগজের মলাট গায়ে দেওয়া একটা চটি বই বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

পাতা উলটে হাসি পেয়ে গেল আমার। কয়েকটা পাতায় পরপর রঙিন ছবি। অন্য সব লালচে পাতায় লেখা, বাংলাতেই লেখা বটে। যৌবন রহস্য।

আমার পাশে রোগাভোগা একটা লোকের হাতে এইরকম চটি বই। সে আড়চোখে আমার হাতে ধরা বই-এর ছবি দেখছে। ফিরিযে দিলাম।

—কী হল! চলবে না? আরও আছে। ইংলিশ আছে। শুধু ছবি চলবে?

— কত এসব?

— চল্লিশ। পড়ে ফেরত দিলে দশ ফেরত।

আমি হাত নেড়ে সরে আসছিলাম।

বইওয়ালা গলা তুলে বলল, তিরিশ দেবেন?

দূরে এসে পকেট থেকে সিগারেট বের করি। এই রে, দেশলাই ভুলেছি। বমাপ্রসাদকে টুলে দেখছি না। ফুটপাথে কয়েকজন তাস পিটছে। সেদিকে এগোলাম।

'আমার পাস' —

'আমি নেই' —

'হাত ফেলে দিলাম ভাই' —

টোয়েন্টি নাইন কী ব্রে খেলছে বোধহয়। এইসময় তাসুড়েদের ডাকলে বিবক্ত হয়। সবাই এমন মুখ করে বসে আছে যেন হাতে তাস নয় ময়ূরের পেখম। তারই মধ্যে একজন উরু চুলকোচ্ছিল। বললাম, দাদা, দেশলাই আছে? কেউ চোখ তুলল না। আমার মনে হল, কোনো ফাঁকা মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি। একটিমাত্র বটগাছের ছায়ায় বসে এরা তাস খেলছে। আমি কেউ নই। তবু বললাম আবার, দেশলাই হবে নাকি দাদা কারও কাছে?

একজন হাত তুলে বলল, হবে না। নেই।

ডানদিকে বসে যে দুজন, তাদের একজন তখন বুকপকেট থেকে বিড়ি বের করল। দেশলাইও। হাতের তাস কোলের উপর রেখে বিড়ি ঝোলাল ঠোঁটে। তারপর ফস করে দেশলাই জ্বালাল।

আমি এতসময় দাঁড়িয়েই। এবার কাঠি থেকে আগুন নেব বলে উবু হয়ে বসলাম। কাঠি কাঠি আঙুলে আগুন আড়াল করে সে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে। এখানে থ্যাঙ্ক ইউ বা ধন্যবাদ চলবে না। ভদ্রতার নাম হাসি। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমসিপানা

মুখ। রোগা চোয়ালে কয়েক চাবড়া দাড়ি। চোখের কোলে ময়লা না কালি কে জানে। কান ছাড়িয়ে নেমেছে চুল। চ্যাটচ্যাটে লালচে।

আমার ঠোঁটে ভদ্রতা আর সিগারেট একসঙ্গে ঝুলছে। সে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। ঠিক তখনই উঠে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল — লোকটার মুখটা খুব চেনা লাগছে। কোথাও দেখেছি ধরনের কিছু নয়। এ মুখ আমি চিনি।

একটা প্রাইভেট টিভি চ্যানেলে কাজ করি। সেখানে আমি — শিমুল সরকার, ভিশন মিক্সার। গালভরা নাম আছে তার আরও একটা। অন লাইন এডিটব। তিনটে কী চারটে ক্যামেরা স্টুডিয়োয় একসঙ্গে চলে। তার থেকে একটার ছবি ছেঁকে নিতে হয় আমাকে। আমিই বলে দিই কাব কোন্ প্রোফাইল থাকবে। কোন্‌টা ছাঁটা হবে। ক্যামেরার সামনে, মনিটরে রোজ অনেক মুখ। বাইরেও মুখ দেখলে আমাব মনেব ক্যামেবা তাব ছবি বাছাই করতে থাকে।

লোকটা আর আমার দিকে তাকাচ্ছে না। আমি দূবে দাঁড়িযে তার মুখেব বাঁ পাশ দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি তার রোগা কাঁধের হ্যাঙাবে ঝোলানো হলদেটে জামা। ফ্যাকাশে, পুরোনো। পিঠের জায়গায় মাংস নেই। সে আসনপিঁড়ি হযে ফুটপাথে বসেছে অন্য তিনজনের মতোই। এসবই আমার চোখের সামনে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যেতে শুরু করল। আর মাথার ভিতরে চুনকাম মুছে যাওয়া, পলেস্তারা খসে যাওয়া দেয়াল নিয়ে একটা একতলা বাড়ি ভেসে উঠতে লাগল।

সে বাড়ির এজমালি উঠোনের চারপাশে খুপবি কতগুলো। ইট সিমেন্টে তৈবি। তবে বরাদ্দ জানলা ও দরজা একটি করে। মাথায় কোনোটার অ্যাসবেস্টস, কোনোটার বা টালি। উঠোনের এক কোণে একটি টাইমকল। সেখানে কিংবা কলঘরে পৌঁছোতে যে যাব ঘরের সামনে থেকে কয়েকটি কবে ইট পেতে সেতুবন্ধন করেছে। বর্ষা ফুবিয়ে গেলেও সেগুলো পড়ে রয়েছে হোঁচট খাওয়ার সুবিধার জন্য।

হাফপ্যান্ট পরা তেরো-চোদ্দো বছরের একটা ছেলে অন্ধকার উঠোন পেরিয়ে কলঘবের দিকে যাচ্ছিল। পড়তে বসে পেচ্ছাপ চেপেছে শিমুলের। তাদেব ঘবের হলুদ ডুমেব আলো দেয়ালে গাঁথা সিমেন্টের জাফরির নকশা বড়ো করে ছড়িয়ে রেখেছে মাটিতে। শিমুল রোজ দেখে।

আজও তাকাল।

ভাড়াবাড়ির হাট করা দরজা দিয়ে চারপাঁচজন তখন হুড়মুড় করে ঢুকছে। একজন হোঁচট খেল ইটে। অন্য একজন চাপা গলায় বলল, অ্যাই শোন — এ বাড়িতেই রবিন থাকে তো?

হ্যাঁ, ওই তো, ওই ঘর —। হাত তুলে ধরে সে উঠোনের পুবকোণের দিকে।

দলটা বেড়াল-পায়ে এগোতে থাকে। তারপব সেই ঘরের দরজা আগলে জোরে হাঁক দেয় — রবিন বেরিয়ে আয়, অ্যাই রবিন —

আমি ফুটপাথ বদল করলাম। উলটোদিক থেকেও তাসেব দলটাকে দেখা যাচ্ছে। আগুন যে ধার দিয়েছিল তার চোখ নামানো তাসের দিকে। চিনেছি ঠিক। আরও রোগা, আরও কালো হয়ে গিয়েছে — তবু এই রবিনদা। ভুল হচ্ছে না। ও কি আমায় চিনতে পারেনি? সিগারেট ধরাবার সময় তাকিয়েছিল অনেকক্ষণ। চিনতে পেরেও কথা বলল না?

সেদিন বেধড়ক ধোলাই খেয়েছিল রবিনদা। তাকে বাড়ির ভিতর থেকে টানতে টানতে ওরা রাস্তায় নিয়ে গেল। এই দলের ভিতরে রবিনের এক বন্ধুও আছে। তার বাড়ি থেকেই নাকি ট্রানজিস্টার হাওয়া করে দিয়েছে রবিন।

তোকে বন্ধু ভেবে রাতে থাকতে দিলাম, আমাদেরই খেলি, আবার আমাদের জিনিস চুরি করলি। গলার শির ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছিল বঙ্কু। তারপরই ঠাস করে এক চড় রবিনের গালে। পরপর আরও কয়েকটা পড়ল।

কী করেছিস রেডিয়ো? বের কর। কাল সকাল থেকে সংগীতসবিতার একটা গানও শুনতে পাচ্ছি না। বের কর হারামি। এবার ঠোঁটের কোণায় ঘুষি পড়ল রবিনের।

কে যেন হাঁটুর পিছনে পা দিয়ে মারতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে।

সঙ্গে সঙ্গে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল জ্যোৎস্না কাকিমা রবিনদার মা। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় জমাট ভিড়ের অনেক ছায়া রাস্তায়। দূরে দাঁড়িয়ে রবিনদার দুই বোন। আরও দুই ভাই। ওদের বাবার বাড়ি ফেরার সময় হয়নি এই রাত ন টায়।

শিমুলের বাবা এগিয়ে এসে রবিনের পাশে দাঁড়াল। আদুল গা। সাদা একখানা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা। তুই রেডিয়ো নিয়েছিস রবিন? দিয়ে দে নিয়ে থাকলে —

চোখ তুলে তাকায় রবিন। ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত নামছে। কিন্তু খুব সহজ গলায় বলল, কী করে দেব কাকা। সে তো বিক্রি করে দিয়েছি।

সিগারেটের শেষটা পা দিয়ে মাটিতে ঠেসে তাস পার্টির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

সোজাসোজি বললাম — এই যে, তুমি রবিনদা না? আমায় চিনতে পারোনি?

চারজনই একসঙ্গে মুখ তুলে তাকাল। যা বাব্বা! এখানে সকলের নামই রবিন নাকি। তা তো হতে পারে না। হেসে আবার বললাম, আমি শিমুল। চিনতে পারছ না।

সে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে। আমায় বলছেন? আমি তো রবিন নই।

হাসি মিলিয়ে গেল আমার। তুমি রবিনদা নও। কী বলছ। এতদিন বাদে — ফ্যাসফ্যাসে, খারাপ হয়ে যাওয়া ট্রানজিস্টারের গলায় সে বলল, কীসের এতদিন বাদে, অ্যা। বলছি তো রবিন নই আমি।

খেলুড়েদের একজন বলল, সেই থেকে দেখছি ঘুরঘুর করছেন। ও রবিন হলে বলত না। যান তো যান। হাও খুব খারাপ পড়েছে একে। ফালতু বকাবেন না।

— কী ব্যাপার রবিনদা, এরকম করছ কেন?

সামনের লোকটাকে যেন সর্বনাশ মানছে, এমনভাবে সে বলল এ তো আচ্ছা পাবলিক। রবিন নই আমি। এরপর কিন্তু ঝামেলা হবে। তুমি যাও তো ভাই। কাটো।

আমি আবার রমাপ্রসাদের দোকানে ফিরে এলাম। আর একখানা প্রবাসী হাতে নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছি। মনটা তেতো লাগছে। রবিনদা আমায় চিনতে চাইছে না কেন? কী ভাবছে, এতদিন বাদে আমি বাবার হাতঘড়িটা ফেরত চাইব?

প্রবাসীতে পাতাজোড়া চায়ের বিজ্ঞাপন। একদম উপরে লেখা -- চৌষট্টি শিল্পকলার একটি। মাঝখানে চায়ের কাপ, প্লেট, চামচের আঁকা ছবি। একেবারে নীচে লেখা — দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয় ভারতীয় চা। পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি বছর আগের বিজ্ঞাপন। তখন সংসার দশজনের হত। রবিনদাকে দেখলাম পনেরো ষোলো বছর পর। আমার চৌত্রিশ হলে ওর এখন চল্লিশ। তা চল্লিশ বছর আগে রবিনদার বাবা, আমাদের জগন্নাথ কাকা, এই বিজ্ঞাপনের থেকে কিছু পিছিয়ে ছিলেন না। সব মিলিয়ে তার সংসারে সাতজন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড়ো ওই রবিন।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম আমি। ফুটপাথে রবিনদা এখন উইপোকার ভূমিকায়। আমি দেখতে পাচ্ছি। ও পাচ্ছে না। তবে আমি টোকাও দিয়েছি, কিন্তু ও পড়ে যায়নি।

প্রবাসীর লালচে হয়ে আসা পাতা এরপর আমার সামনে সতেরো আঠারো বছর আগের একটা ফুটবল মাঠ হয়ে যেতে লাগল। সে মাঠের চাঁদিতে ঘাস থাকলেও, কয়েক জায়গায় টাক

পড়ে যাওয়ার মতো মাটিও রয়েছে। একপাশে ইটখোলা। অন্যপাশে পুকুর। ইঁটের পাঁজায়, পুকুরের ধারে মাঠ ঘিরে হইহই লোক। অমিয়ভূষণ স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শিল্ডের ফাইনাল চলছে। পল্লীবাসী ক্লাবের স্ট্রাইকার শিমুলের পায়ে বল। সে দৌড়োচ্ছে শক্তিসংঘের গোলের দিকে। মাঝমাঠ পেরিয়ে থ্রু বাড়াল একটা। তারপর আবার পায়ে বল জমিয়ে নিল। এক গোলে জিতছে পল্লীবাসী। শিমুলই দিয়েছে। আর একটা হলে মাঠের বাইরে, এককোণে বাখা শিল্ড তাদের ক্লাবঘরে ঢুকতে পারে। মাঠের চারপাশ থেকে ভেসে আসা চিৎকার আর অন্য খেলুড়েদের একইসঙ্গে যেন কাটিয়ে যাচ্ছিল শিমুল। ধাক্কা খেল শক্তিসংঘের ব্যাক তাপসের সঙ্গে।

ধাক্কা নয় ঠিক। গোল বাঁচাতে তাপস সোজা এসে ঢুঁ মারল শিমুলের পেটে। তারপর তাকে গুঁতিয়ে ফেলে দিল মাঠের পাশে কালকাসুন্দির ঝোপে। শক্তিসংঘের ছেলেরা রীতিমতো শক্তিমান। পল্লীবাসীর মতো নরম সরম নয়।

খেলা থমকে গিয়েছে। ফু র র র . করে বেজে উঠল রেফারির বাঁশি। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শিমুল দেখতে পেল — তাপস গুমড়ি খেয়ে পড়ল। আর তার পিঠের উপর চেপে বসেছে রবিনদা।

আমাদের স্ট্রাইকারকে কেন মারলি বল ' মারলি কেন আমাদের প্লেয়ারকে? বলতে বলতে এলোপাথাড়ি হাত চালাচ্ছিল রবিন ' লজ্জা করে না তোর ! ও তোর চেয়ে ছোটো না!

হাসি পেয়ে গেল শিমুলের। খেলার মাঠে ছোটো বড়ো কেউ মানে। ততক্ষণে রবিনের হাত ছাড়িয়ে তাপস মাঠের বাইরে, তার পিছনে রবিন। তারও পিছনে রেফারিও দৌড়োচ্ছিল। হঠাৎ কী মনে হতে সে থমকে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে মাঠে কী যেন খুঁজতে লাগল।

তাপস পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। রবিন ফেরত এল রেফারির সামনে। পাড়ারই ছেলে শান্তনু।

— এই শান্ত, কী খুঁজছিস রে?

দড়িতে বাঁধা বাঁশি বুকে ঝুলছে। শান্তনু মাথা না তুলেই বলল, এক মিনিট দাঁড়িয়ে যা।

গোটা মাঠ এদিকে তাকিয়ে। রবিন আবার বলল, কী খুঁজছিসটা কী।

এই যে পেয়েছি। ঝুঁকে পড়ে মাটি থেকে লাল রং এর সিগারেটের প্যাকেটের চাপটানো বাক্সো তুলল রেফারি। মুখে বাঁশি। ফু র র র ..।

রবিন কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। ও! রেডকার্ড! দোষ করল তাপস, আর তুই আমায় রেডকার্ড দেখাচ্ছিস! নিকুচি করেছে তোর –। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা কেড়ে নিল সে। তারপর কুচি কুচি করে ছিঁড়েই দৌড় তাপসের দিকে।

তোকে ছাড়াছাড়ি নেই। আমাদের প্লেয়ারকে মারলি কেন তুই —।

সামনেই পুকুর। হকচকিয়ে গিয়ে তাপস দৌড়োতে দৌড়োতে নেমে গেল সেদিকে। রবিন থামল না। সোজা জলে — ঝপাং –।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। গম্ভীর মুখে জল টসটসে মেঘেরা পায়চারি করছে সেখানে। তবে কারওরই খুব একটা তাড়া নেই। যে-কোনো সময় কলকাতাকে ভাসিয়ে দিলেই হল যেন। সতেরো-আঠারো বছর আগে যেসব মেঘ খেলার মাঠের উপর ভেসেছিল তারা এখন কোথায়? ওরা তো অনায়াসে চেহারা পালটাতে পারে। সেভাবে কয়েকশো বছরও টিকে যাওয়া কী এমন ব্যাপার! ছদ্মবেশে কেউ যদি এই ফুটপাথের উপরের আকাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে সেও নিশ্চয়ই চিনতে পারবে রবিনদাকে।

কিন্তু রবিনদা আমাকে কেন চিনতে চাইছে না! আমার বাবার হাতঘড়িটার কথা ওর মনে আছে?

গড়িয়াহাটে এখন ওভারব্রিজ তৈরির কাজ চলছে। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে — রাস্তার মাঝবরাবর খোঁড়া গর্ত টিন দিয়ে ঘেরা। মাটি ফুঁড়ে ঢালাইয়ের লোহার রড উঠে এসেছে। ক্রেনও দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা। ওইসব জায়গায় যে দোকানপাট ছিল তা কবেই লোপাট। এদিকে বই-এর স্টলগুলোও থাকবে না বেশিদিন হয়তো। কয়েকটা তো উঠেই গিয়েছে। কিন্তু রমাপ্রসাদরা কী বই-এর ব্যবসা ছাড়া কিছু করতে পারবে? অন্য জায়গায় গিয়ে বসতে হবে। আমাদের কাজ হবে তাদের খুঁজে বের করা।

তাসের খেলায় ইনটারভ্যাল হল মনে হচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়েছে ওরা। রবিনদাও। আমি তাড়াতাড়ি ওর পাশে চলে এলাম।

কী রে রবিনদা, খেলা শেষ, নাকি আবার বসবি? এভাবেই আর একবার চেষ্টা করতে চাইছিলাম। গোড়ায় তুমি বলেছি বটে, কিন্তু আসলে তো আমাদের তুই-তোকারিই ছিল। যদিও কাজ হল না।

রবিনদা চোয়াল শক্ত করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। এই — কী ব্যাপার ভাই, তুই বলছ কাকে। বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

আমি থামলাম না। শোনো রবিনদা, আমার কথাটা শোনো। এড়িয়ে যাচ্ছ কেন আমায? তোমাদের ফ্যামিলির কারও সঙ্গেই তো দেখা হয় না আর। তুমি কোথায় থাক এখন?

সে মুখ খিঁচিয়ে বলল, বলব না। তারপর আঙুল তুলে ধরল আমার দিকে। আমার পিছনে লাগতে এসো না। বহুত্ ডেঞ্জার লোক আছি। রবিন-ফবিনকে চাটতে হয় অন্য জায়গায় যাও। আমি রবিন নই।

আমি হাসলাম। কী হচ্ছে কী রবিনদা! ইয়ার্কি মেরে লাভ আছে কোনো?

সে একেবারে আমার নাকের ডগায় এসে দাঁড়াল। চিনতে আমার ভুল হয়নি। নির্ঘাত রবিনদা। জগন্নাথ দাসের বড়ো ছেলে।

ততক্ষণে একটা হাত একটু উপরে তুলে ফেলেছে সে। গড়িয়াহাট না হলে দি — তাম এক —। বলেই উলটোমুখে ফিরে রবিনদা হনহন করে হাঁটতে শুরু করে দিল।

পাগল হয়ে গেল নাকি-রে বাবা লোকটা! নাঃ, হতে পারে না। পাগলরা আর যা-ই করুক তাস্ খেলতে পারে না। আমি অন্তত দেখিনি।

হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যেন চলে গেল রবিনদা। ওই গলিটার দিকে কী? একটু এগিয়ে ডানদিকে ঘুরলেই একটা রাস্তা পড়ে সল্টলেকে চলে যাওয়ার। আগে সেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থাকতেন। আমি আর একটা সিগারেট ধরালাম। মনে পড়ছে — রবিনদার বাবা ছিল তাসুড়ে। পাড়ায় অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো উঁচু বেদি। তার উপর বসত তাসের আসর। মাঝে মাঝে আমার বাবাও যেত। তখন সবাই বসত বেদির আড়াল রেখে মাটিতে। কেন না, তাসের আড্ডায় বাবাকে দেখলেই মা অশান্তি করত ঘরে। আমাদের ভাড়াবাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে তাকালেই দূরে দেখা যেত গাছটা।

আমাদের একটিমাত্র ঘর। রবিনদাদেরও তাই। ওদের ঘরে ডুম জ্বলছে। ঝুলছে ঝুল দেয়ালের কোনা-ঘুপচিতে। ইট দিয়ে উঁচু করা ঘরজোড়া তক্তপোশের উপর জগন্নাথ কাকার ফ্যামিলি। দরমা দিয়ে ঘেরা বারান্দামতো জায়গায় রান্না চাপিয়েছে জ্যোৎস্না কাকিমা। মাটির উনুনে রুটি সেঁকা হচ্ছে। একটু আগেই দেখেছি এক কড়াই কুমড়োর তরকারি নামাতে। তেল-মশলা তেমন না থাকায় কেমন ভাতের ফ্যানের মতো গন্ধ।

আমার বাবা ফিল্ম স্টুডিয়োয় কাজ করে। ক্যামেরাম্যানের অ্যাসিস্ট্যান্ট। খুব যে বেশি কিছু হয় তা নয়। কিন্তু এই সেদিন বোনের জন্মদিনে পায়েস হয়েছিল। লুচি, আলুরদম। রবিনদার দুই বোন হাসি আর মঞ্জু, ভাই বিল্টু আর টোটনের নেমন্তন্ন ছিল। টোটন আমার

থেকে ছোটো কিন্তু খুব বন্ধু। উঠোনে একটা টিউবওয়েলের লোহার পাইপ মাটি থেকে আড়াআড়ি রাখা আছে বেলগাছের উঁচু ডালে। স্কুলে যাওয়ার আগে আমি সেই পাইপ বেয়ে উঠি আর নামি। টোটনও থাকে। কিন্তু ওর স্কুল নেই। বিল্টু এখন পড়ছে, তবে ওকেও আর যেতে হবে না কয়েকদিন পরেই।

অম্বলমতো হয়েছে বলে বাবা রাতে ফিরে লুচি-আলুরদম খেল না। লুচি গোল করে মুড়ে পায়েস তুলে নিচ্ছিল। মা-কে বলল, এদের যে কী হবে কে জানে শ্যামলী। রবিনটা ইলেভেনের পর আর পড়তে পারল না। বাকিগুলোর কথা তো ছেড়েই দাও। কাজের চেষ্টা না করে যত চোর-ছ্যাঁচড়দের সঙ্গে মিশছে রবিন। তার মধ্যে জগন্নাথদাকে দ্যাখো! কারখানা বন্ধ হতে চলেছে, খাওয়া জুটবে কিনা ঠিক নেই, নিজেরটি ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে।

এই চালিয়ে যাওয়া যে কী, তা দেখতাম এক-একদিন। শুকনো নিমডালের চেহারার জগন্নাথ দাস নেশার ঝোঁক সামলাতে না পেরে বাড়ির দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্না কাকিমা চেঁচাচ্ছে — শুঁড়িখানা থেকে বাড়ি অবধি আসতে পারলে, আর হেঁটে ঘরে ঢুকতে পারছ না! ওখানেই পড়ে থাকো তাহলে। মরে গেলে কেউ ছোঁবেও না। অ্যাই টোটন — খবরদার যাবি না।

টোটন বলল, আমার সঙ্গে আয় না শিমুল। বাবা হেভি ভারী হয়ে যায়, খালি গায়ের উপর পড়ে —।

শিমুল যায়। বাড়ির সদর দরজার পরে একফালি গলি ভিতরদিকে যাওয়ার। সেই গলিতে অন্ধকারের সঙ্গে চাক বেঁধে রয়েছে দিশি মদের গন্ধ। জগন্নাথ দু পা এগিয়ে উঠোনের একপাশে উবু হয়ে বসে পড়ে। তারপর ঠেলে উঠে আসে বমি।

আমি সিগারেট ফেলে দিয়ে রমাপ্রসাদের দোকানের দিকে যাচ্ছিলাম। তখনই দেখলাম — উলটোদিকের গলিতে একটা বাড়ির আড়াল থেকে রবিনদা ডাকছে আমায় হাত নেড়ে।

শিমুল, এদিকে আয়, শোন না —।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। এমনভাবে ডাকছে যেন ছেলেবেলার লুকোচুরি খেলা। সামনে গেলেই পিঠে থাবড়া দিয়ে বলবে — ধাপ্পা। এতক্ষণ ধরে তাহলে সকলের সামনে আমায় কচলাচ্ছিল কেন? ব্যাপারটা কী?

এইবার আমার রাগই হল খানিকটা। লম্বা পায়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর মুখোমুখি। কী, চোরের মতো ডাকছ কেন এখন? আমি যে তোমায় রবিনদা ডেকে হেদিয়ে গেলাম তখন!

রবিনদা একটা হাত দিয়ে নিজের লম্বা চুল পিছন দিকে কীরকম ঝুঁটি পাকিয়ে ধরল। সিগারেট আছে আর তোর কাছে? দে না। রাগ করিস না ভাই, এখানে কেউ আমায় ও নামে চেনে না। আমি চেনাতেও চাই না। এখানে বন্ধু সেজে কত হারামি আমার শত্রু জানিস।

কেন, শত্রু কেন? আমি সিগারেট দিলাম ওর হাতে।

আরে, মানুষ ভালো হতে চাইলেও — মুখ ভর্তি ধোঁয়া হাওয়ায় ছাড়ল রবিনদা — অনেকে হতে দেবে না, বুঝলি না!

— সত্যিই বুঝলাম না।

সে অনেক কিসসা-কাহানি। এদিকটায় আয় —। বলে রবিনদা খানিকটা হেঁটে একটা ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

খুবই পুরোনো বাড়ি। বড়ো বড়ো দরজা-জানালা সব বন্ধ। লোহার গেটের ওপারে আগাছা, ঘাস। একটা পামগাছ জড়িয়ে অচেনা লতা উঠেছে। ভিতরে নাইন্টিন সিক্সটি সেভেনের মডেলের স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড থাকতেও পারত, ফাটা টায়ার নিয়ে ধুলো গায়ে আর জঙ্গল মেখে। তার বদলে রবিনদাকে খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছে না বাইরে।

— আবে আমি তো গ্যাং ছেড়ে দিয়েছি — অন্য কাজ-কাববাব কবছি। কিন্তু দল ভাঙলেও অনেকে তো লাইন ছাড়েনি না। তাবা আমাব কথা জানতে পাবলে —। এখানে আমি ববিন নই, অজয।

— কীসেব গ্যাং তোমাদেব?

— গ্যাং আবাব কীসেব হয। আমি যখন ঢুকলাম তখন ছিল ছিনতাই। পবে হয়ে গেল ডাকাতি। শাজাহান ছিল লিডাব। সোনাবপুরে এক পেট্রলপাম্প মালিকেব বাড়িতে ঢুকেছিলাম। সবই হল, বেবিয়ে আসাব সময তাড়া খেলাম পাবলিকেব। হেভি বাঁড ছিল শাজাহানেব। হলে কী হবে, গণধোলাই তো। মবেই গেল। আমি লুকিয়েছিলাম পানাপুকুরে সাবা বাত। সকালে পুলিশ এসে তুলল।

— কতদিন আগে হয়েছে এসব?

— পাঁচ ছ-বছব হবে। সাড়ে তিন বছব তো জেলেই ছিলাম।

আমি দেখতে পাচ্ছিলাম — পুবোনো বাড়িটাব বাগান থেকে একটা ফড়িং লোহাব গেটেব ফাক গলে ববিনদাব কাধে এসে বসেছে।

— যাবা মাল নিয়ে পালিয়েছিল তাদেব কিন্তু ট্যামনা পুলিশ খুঁজে পেল না খুঁজলি। সেই বানচোতদেব মধ্যে দুজন আমাকে খোঁজে পেয়ে গুলি কবে দিল।

— গুলি কবল!

ববিনদা সিগাবেট ফেলে দিয়েছে। হাসছে ওব পান চিবানো খাওয়ায মুখটা কেমন ছুঁচলো হয়ে গিয়েছে হাসাব সময। গুলি আমাব গায়ে লাগাতে পাবেনি। একটা কোথায গেল কে জানে। আব একটা লাগল দেয়ালে। ছাড় ফালতু কথা। আমাদেব বাড়িব খবব কিছু জানিস?

কোন্ একটা সায়েন্স ম্যাগাজিনে সেদিন পড়ছিলাম ব্রেনেব যেসব জাযগা ইমোশন কন্ট্রোল কবে, ক্রিমিনালদেব নাকি সেখানে গোলমাল থাকে। তাব সঙ্গে কাজ কবে জিন। পবিবেশটা খুব বড়ো ব্যাপাব নয। মস্তিষ্কেব সামনেব আব বাইবেব দিকেব কাজ কম জোবে হয়ে গেলে মানুষ ক্রিমিনাল হতেও পাবে। আমি ববিনদাব মুখেব দিকে তাকাতে গিয়ে মাথাব দিকে তাকিয়ে বইলাম। তাহলে কি অনেকদিন থেকেই ওব মাথাব ভেতবে গোলমাল?

বললাম বাড়িব খবব মানে কী জানতে চাইছ? আমবা তো অনেকদিন সেই ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়েছি। তাবপব শুনেছি তোমাদেবও সবাই ওখান থেকে চলে গিয়েছিল সবশুনাব দিকে না কোথায। তোমাব বাবা কিন্তু ওই বাড়িতেই মাবা গিয়েছিল, সে খবব বাখো?

— ভাইয়েব সঙ্গে তোব দেখা হয না?

-- কী কবে হবে। আমবা যে নতুন পাড়ায উঠে গেলাম সেখানকাব একটা দোকান থেকে আমাব নাম কবে একটা ভিসিপি নিয়ে চলে গেল। বলেছিল আমি নাকি ভাড়া নিতে পাঠিয়েছি। তাবপবেব খববও জানি। মুসলিম হয়ে একটা মুসলিম মেয়েকে বিয়ে কবেছে। মেটিয়াবুরুজে খোঁজ নিয়ে দেখতে পাবো। ওখানেই থাকে মনে হয। তোমাব বোনদেব খবব, জ্যোৎস্না কাকিমাব খবব জানি না।

— তোরা ভালো আছিস বে?

আছি তো। এইটুকুই বললাম আমি। আমাব বাবা এখন নামকবা ক্যামেবাম্যান। সবকাবি পুবস্কাবও পেয়েছে একটা ফিল্মেব জন্য। ফিল্ম সোসাইটিতে গিয়ে বক্তৃতা দিতে হয বাবাকে অনেকসময। নিজেব জন্মদিনে বোন আসে শ্বশুববাড়ি থেকে। এখনও মা পায়েস

করে ওই দিনটাতে। এসব কথা রবিনদাকে বলে কী হবে। তার বদলে যদি জিজ্ঞেস করি — আমার বাবার ঘড়িটা কি তুমিই সরিয়েছিলে রবিনদা? — কেমন হয় তাহলে!

মনে তো আছে সেই ঘড়িটার কথা আমার। মা কলঘরে। বাবাকে কে যেন বাইরে ডেকেছিল কথা বলতে। বোন ছিল রবিনদাদের ঘরে। হাসি, মঞ্জুর সঙ্গে খেলছিল হবে। ও রবিনদাকে ঢুকতে দেখেছে আমাদের ঘরে। আমি ছিলাম না সেই সন্ধেবেলায়। মা বলল, রবিনই নিয়েছে। বাবা কিছু বলল না। আমরা কেউই ওদের ঘরে ঢুকে সেদিন বলতে পারিনি কিছু। আজও আমি পারলাম না। রবিনদা হয়তো ঘড়িটা বেচে দিয়েছিল। নয়তো ও নেয়ইনি। আমার হাতে এখন দামি ঘড়ি। বাবার হাতেও। তবু — তখন আমাদের ঘরে ছিল ওই একটাই ঘড়ি। হয়তো দরকার নেই, তবু এক একদিন ছুটে গিয়ে বাবার কবজিতে বাঁধা ঘড়িটার সামনে দাঁড়াতাম। ওটা চুরি যাওয়ার পর বাবা অনেকদিন কোনো ঘড়ি কিনে উঠতে পারেনি। আমি রবিনদার হাতে তাকালাম। ওর কবজিতে সময়ের কোনো দাগ নেই।

— তুই আমায় চিনলি কী করে বলতো শিমুল? আমায় কিন্তু কেউ চিনতে পারে না।

চুপ করে রইলাম। চেনা কিংবা ভুলে যাওয়া সোজা না কঠিন কে জানে। ওভারব্রিজ তৈরির পর গাছ কেটে ফেলার পর গড়িয়াহাটকে কি চিনতে পারব? তোমার সঙ্গে কি চেনা কারও দেখা হয়েছে এর মধ্যে?

রবিনদা মাথা নাড়ল। আমি বললাম, তাহলে আর বলে লাভ কী? — বলতে বলতে থমকে গেলাম। সত্যিই তো -- ওকে আমি চিনলাম কী করে? কোথাও একটা আভাস ছিল তবে। মুখচোখ তো পুরোপুরি পাল্টায় না মানুষের।

- তুই কি আমার বউ-বাচ্চার খবর কিছু জানিস?

আমি বললাম, বই-এর দোকানে বই দেখে রেখে এসেছি। কিনতে হবে। ওদিকটায় যাবে কি।

চল যাচ্ছি। বলেই রবিনদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বাচ্চাটা কি স্কুলে পড়ে নাকি?

হেসে ফেললাম আমি। রবিনদা সময় গুলিয়ে ফেলেছে। পনেরো-ষোলো বছর আগে যাকে ফেলে চলে এসেছিল সে কি এখনও শিশু আছে।

পাশে পাশে হাঁটছে রবিনদা। আমি তার বছর পঁচিশের চেহারাটা মনে করতে চাইলেও কিছুতেই হল না। তার বদলে আবার ভেসে উঠল সেই ভাড়াবাড়ির উঠোন। সেখানে দাঁড়িয়ে এক আধবুড়ো লোক। নাকটা খাড়া হয়ে ঠোঁটের দিকে বেঁকে নেমে এসেছে। মোটা ভুরু। চিবুকটা যেন আঙুল দিয়ে কেউ ঠেলে বসিয়ে দিয়েছে। গালে খেউরি হয়নি কয়েকদিন। সব মিলিয়ে মুখে কাঁদো কাঁদো ভাব। পাশেই তার মেয়ে। কালো পাড় সবুজ শাড়ি। রোগা ছোটখাটো গড়ন। তার শ্যামলা মুখের ছায়া দুপুর বারোটার উঠোনে। মাথা নিচু করে সে দাঁড়িয়ে।

তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আরও অনেক মেয়ে-বউ এ বাড়ির। আধবুড়ো লোকটা জ্যোৎস্না কাকিমার দিকে তাকিয়ে বলল, তিনদিন হয়ে গেল, জানেন! তারপর আপনাদের এখানে এলাম।

— আমাদের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। আপনার মেয়েকে বিয়ে করে বাড়ি ছেড়েছিল। তারপর আর আসেনি।

শিমুল আর তার বোন মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছিল — এরা রবিনদার শ্বশুর আর বউ। সেই লোকটা তখন কয়েকবার বলা কথা আবার বলছিল — বলল, সাইকেলটা দিন। খারাপ হয়ে গিয়েছে, সারিয়ে আনি। সেই সঙ্গে বাজারের থলি আর পঞ্চাশটা টাকাও নিল। নিয়ে যে সেই গেল আর তো —। মেয়েটাকে নিয়ে আমি এখন কী করি বলুন তো। এক বছরের বাচ্চা রয়েছে, সেটাও একবার ভাবল না!

আমি হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রবিনদাও। ভালো করে দেখতে চাইছিলাম ওর মুখটা। এই লোকটা সাইকেল নিয়ে সেই যে পালিয়ে গিয়েছিল, তারপর এত বছরের সময় তো দিব্যি সাইকেল ছাড়াই পেরিয়ে চলে এসেছে! ছেলে বড়ো হয়েছে। বউও ভালোই আছে। আমি জানি। জানি না তারা এখনও রবিনদাকে কতটা মনে রেখেছে।

— তোমার ওই তাসের বন্ধুদের সামনে স্বীকার করলে না কেন তুমিই রবিন? ওরা তো তোমার চেনা-পরিচিত।

বই-এর দোকানগুলোর কাছে এসে পড়েছি আবার। ফুটপাথটা দেখাও যাচ্ছে। রবিনদা আমার কনুই ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

বিড়বিড় করে বলছিল, তুই আমায় কী করে চিনলি শিমুল! মাঝেমাঝে নিজেকে রবিন রবিন লাগে, জানিস। তারপরেই আবার মনে হয়, আমি বোধহয় রবিন নই।

— তুমি এখন কী কর বলো তো?

দারোয়ানের কাজ করি এক বাড়িতে। এই তো, মৌচাকের পাশ দিয়ে গিয়ে বাঁদিকে ঘুরবি — তিনতলা একটা বড়ো বাড়ি আছে সাদা রং-এর। তুই কি বই কিনবি এখন?

— হ্যাঁ, কেন বলো তো?

— তুই যা, ওদের সামনে একবার বলেছি আমি রবিন নই, এখন ওরা দেখলে আমায় ধরবে। ওই যে উলটোদিকের দেয়ালটা দেখছিস —

আমরা যে বাড়িটার গায়ে দাঁড়িয়ে তার উলটো দিকের ফুটপাথেই বই-এর দোকান। একটা বাড়ির চুনকাম খসে যাওয়া দেয়াল দেখা যাচ্ছে।

— ওই দেয়ালেই গুলিটা লেগেছিল, জানিস! জেল থেকে বেরিয়ে আমি দাগটা খুঁজেছিলাম। পাইনি। অতদিন থাকে না। তোর কাছে পঞ্চাশটা টাকা হবে?

পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিলে প্ররাসী আর আজ আমার ঝোলায় উঠবে না। কী করি? বলে দিলেই হয়, নেই। কেনই বা দেব?

— তুই তো আসিস এখানে। পরে একদিন এসে ওখানে আমার খোঁজ করিস, ওই তাসের প্লেয়াররাই বাড়িটা দেখিয়ে দেবে, যেখানে আমি কাজ করি। ফেরত নিয়ে যাস টাকাটা। হবে না?

পার্সে দুটো একশো টাকার নোট। একটা দশ টাকার। বললাম, খুচরো তো হবে না।

— দে না, খুচরোর জন্য চিন্তা করছিস! এখানে সব দোকান আমার চেনা। তুই বই-এর দোকানে গিয়ে দাঁড়া।

রবিনদা আমার হাত থেকে একশো টাকার নোটটা নিয়ে হনহন করে চলে গেল। আমিও খানিকটা হেঁটে রমাপ্রসাদের দোকানের সামনে গিয়েই দাঁড়ালাম।

— কী হল? বইগুলো কি নেবেন? নিলে দাম যা হোক বলুন একটা।

আমি প্রবাসী তুলে নিয়েও চুপ করে রইলাম। কিনব কী করে? টাকা খসেছে যে।

ফুটপাথে আবার তাসের দলের জমায়েত হচ্ছে। একজন ঠোঁটে বিড়ি চেপে এসে দাঁড়াল। অন্যজন খবরের কাগজ বিছোচ্ছে এমনভাবে — যেন সতরঞ্চি। এখনই সামনে কোনো ফাংশন শুরু হবে। আমি সেখানে গায়ে দাঁড়ালাম।

— আপনাদের বন্ধুকে আমার চেনা একজনের মতো লেগেছিল তখন। তাই রবিনদা বলে ভেবেছি। ওর নাম তো অজয়, না?

চারজনই আমার হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে। যার হাতে তাসের বাণ্ডিল সে এবার বলল, কে অজয় কে রবিন? ওই লোকটার কথা বলছেন? সে গেল কোথায়।

— আপনারা ওকে চেনেন না?

— চিনতে যাব কেন! দু-চারজন দাঁড়িয়ে খেলা দেখে। ও-ও দেখছিল। একজন প্লেয়ার উঠে যাওয়ায় ও বলল, খেলব এক হাত? আমরা খেলায় নিইছি। আপনিই তো এসে ওর পিছনে লাগলেন দেখলাম।

আমি সরে এলাম। রবিনদা তাব মানে আসবে না। যে বাড়িতে কাজ করে বলেছে সেখানে গিয়েও কোনো লাভ নেই তাহলে। রবিন কিংবা অজয় নামের কোনো দাবোয়ান সেখানে নেই।

প্রবাসীর গায়ে হাত বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। এখন কিছু টাকা জমা কবে দিয়ে যাই। বাকিটা দিয়ে পরে নেব বইগুলো। ভারী মলাট বন্ধ করতেই আবার কীসেব গুঁড়ো উড়ে গেল হাওয়ায়। সময়েরই হবে। কখনও ফুটপাথে ঝবে পড়ে, কখনও হাওযায ওড়ে। শুধু বাবার সেই হাতঘড়িটার কথা জানা হল না। রবিনদা কি আমাদের ঘর থেকে ওটা সরিযেছিল? চেনা লোকের জিনিসই তো বরাবর পছন্দ ছিল ওর।

মেডেল

আশুতোষ দেবনাথ

'অন্ধকে দয়া করে রাস্তাটা যদি পার করে দেন।' — কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তার আগে লাল বাতিটা নিভে গেছে। হলুদ বাতিটাও দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। ট্রাফিক-এ সবুজ সংকেত। পথ চলতি ব্যস্ততায় হঠাৎ স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে অসংখ্য নির্বাক নিশ্চল মূর্তি।

ঠিক চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যুর মুখটায়। এসপ্ল্যানেড-এর ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে মনে হলো গলার স্বরটা —

এই অন্ধ বুড়োকে দয়া করে রাস্তাটা যদি পার করে দেন. দু'হাত ছড়িয়ে শরীরটা কাঁপাতে কাঁপাতে যে মানুষটা এগিয়ে এলো সে আমার পরিচিত ব্যানার্জীবাবু। লোকটার চেহারা ঠিক আগের মত নেই। মুখভরা দাড়ি গোঁফ। গায়ে ছেড়া তালিমারা সার্ট। একটা ময়লা পাজামা পরনে। রোগা চেহারা। চোখে একেবারে দেখতে পায় না। হাত বাড়িয়ে তার হাতখানা ধরতেই সে যেন খানিকটা নিরাপত্তা বোধ করল। বলল ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

আমি উত্তর দিলাম না। রাস্তায় অসংখ্য চলমান যান। ট্রাফিক সংকেতে লাল বাতিটা মাঝে মাঝে দপ করে জ্বলে উঠছে। রাস্তাটা পার হ'লাম।

বছর দুয়েক আগে, আমি তখন গোয়েঙ্কা কলেজে সন্ধ্যায় ক্লাশ করি। দিনে, একটা প্রেসে কম্পোজিং। লোনাধরা পাঁচিল, স্যাঁতসেতে মেঝে। ষাট পাওয়ারের ম্লান আলো জীবনটাকে নিভিয়ে দিতে চাচ্ছিল। আমরা ছিলাম ছাপাখানার ভূত। শিষের টাইপ, লেড রক্তে বিষের ক্রিয়া ঘটায়।

আমাদের ফ্যান লাইটে যান্ত্রিক গোলযোগ হ'লে খবর দেয়া হ'তো তাকে। খবর দেওয়ার কিছু সময়ের মধ্যে এসে যেত এই অদ্ভুত মানুষটা। হাতে চামড়ার ব্যাগ। মুখ ভর্তি লম্বা দাড়ি। সূতীর জামা গায়, পাজামা পরা। কাজ করতে এসে ব্যানার্জী আমাদের মজার মজার গল্প শোনাত। মানুষটাও ছিল বেশ মজার। হঠাৎ হঠাৎ সে কলকাতা ছেড়ে উধাও হয়ে যেত। আমাদের ফ্যান লাইট অকেজো হয়ে পড়ে থাকতো। আবার হঠাৎ-ই একদিন যন্ত্রপাতির ব্যাগ হাতে ঢুকত লোকটা। আমরা আনন্দে হৈ হৈ করে উঠতাম, ওই যে ব্যানার্জীবাবু এসেছেন!

জিজ্ঞেস করতাম, বানার্জীবাবু এতদিন কোথায় ছিলেন?

ব্যানার্জীর চোখে-মুখে দেখা দিত এক রহস্যের হাসি। ধীরে ধীরে সে হাসি সারা মুখে উচ্চগ্রামে ছড়িয়ে পড়ত।....... আমার কথা আর বলেন কেন? একা মানুষ। ভাবনা কি। তাই বেরিয়ে পড়ি 'তারা মা' যখন যেখানে ডাকে।......মা তারাই তো ভরসা। কখনও ভেংচি কাটতো, নাক সিটকাতো। বুঝতাম না কোনটা তার হাসি, কোনটা তার কান্না, আর কোনটা স্রেফ ভণ্ডামির ইঙ্গিত। বুঝতাম না, সে কি বলতে চায় আর কি বলতে চায় না।

আপনার কেউ নেই? জিজ্ঞেস করতাম।

না।

ছেলে, মেয়ে, বৌ?

আছে আবার নেই। মা তারা, তারা মা-ই আমার সব। শেষে যন্ত্রপাতি বের করে কাজ করতে করতে বলত, এবার গেছিলাম, সুন্দরবন — আমার মেয়ের বাড়ী।

মেয়ে! এই বললেন কেউ নেই!

ধর্ম মেয়ে। জামাই ফরেস্ট-এ চাকরি করে। আরে বাপ! সে কি খাওয়া — মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, মাখন। ....কাজ করতে করতে ব্যানার্জী বলে যেত, বাঘ, হরিণ, কুমির সুন্দরবনের গল্প।

আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতাম। মানুষটার গল্প বলার ক্ষমতাও ছিল। কাজ শেষ হয়ে গেলে যন্ত্রপাতি গোটাতে লাগলে আমরা ফের তাগাদা মারতাম, ব্যানার্জীবাবু আরেকটা গল্প বলুন আরেকটা.....ব্যানার্জী হাসত। গর্বের হাসি, সুখের হাসি, তৃপ্তির হাসি। ব্যানার্জী যন্ত্রপাতি গোটাতে লাগলে আমরা কোনদিন তার স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লাস সরিয়ে রাখতাম, দু'তিন দিন বাদে ব্যানার্জী সেগুলো ফেরৎ চাইতে এলে আমরা তার কাছ থেকে আরেকটা গল্প শুনে নিতাম।

এক সময়ে দেখা গেল ব্যানার্জীর ইলেকট্রিসিয়ান বিদ্যা ধোপে টিকছে না। আজ মেরামতির কাজ করে দিয়ে গেলে কাল আবার বিগড়ে যেতে লাগল লাইট-ফ্যান।

মালিক বললেন, ওসব হাতুড়ে মিস্ত্রি দিয়ে কাজ হবে না। ব্যানার্জী চোখে দেখে না। বুড়ো অথর্ব কত আর পারে! তারপর নতুন ইলেকট্রিসিযান এলো।

পরপর ব্যানার্জীও দু'তিন দিন ঘুরে গেল। আমাদের লাইট জ্বলছে, ফ্যান ঘুরছে। ব্যাপারটা ব্যানার্জী বুঝতে পারল। প্রথমদিন সে এককাপ চা খেয়ে চলে গেল। পরের দিন দুটো হাসি ঠাট্টায় বিদায়। তারপর ব্যানার্জী যথারীতি যন্ত্রপাতির ব্যাগ হাতে ঢুকে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে কারু সঙ্গে কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ধীর পায়ে চলে গেল। যাবার সময় চৌকাঠে হোচট খেয়ে নিজেকে সামলে নিল। আর আমাদের থেকে কে যেন মন্তব্য করল, ব্যাটা বাতেলাবাজ, গুল্‌ফে।

রাস্তা পেরিয়ে কার্জন পার্কের ধারে চলে এসছি। খেয়াল নেই ব্যানার্জী তখনও আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলছে আর ভিখ্ মাঙছে। পথচলতি মানুষজন দশ পাঁচ পযসা দিচ্ছে।

ব্যানার্জী যে ভিখ্ মাঙছে সেটা খেয়াল করতে পারিনি। ব্যানার্জীবাবু বলে ডাকতেই কেঁপে উঠল সে। আমার গলা শুনে চিনতে পারল। হাত থেকে খুচরো পয়সাগুলো পড়ে গেল ঝনঝনিয়ে। কথাটা বলেই আমারও চমক ভাঙল। ব্যানার্জী হেসে উঠে বলল, তাপসবাবু, আপনি! চাকরি পেয়েছেন, লিখছেন?

আমি নীচু হয়ে পয়সাগুলো কুড়িয়ে তুলে ব্যানার্জীর পকেটে দিলাম। কার্জন পার্কে ঢুকে দু'জনে পাশাপাশি বসলাম। এ কথায় সে কথায় বললাম, চাকরি একটা পেয়েছি যেমন তেমন — তার চেয়ে বড় কথা গল্প লিখে মেডেল পেয়েছি, সোনার মেডেল!

তাই নাকি তাপসবাবু! কি গল্প, কোথায় লিখেছেন বৃত্তান্ত জানতে চাইলো।

আমি বললাম গল্পটা আপনার মুখেই শোনা। সেই যে একটা ট্রেন ডাকাতির গল্প বলেছিলেন।

সাব্বাস তাপসবাবু। ব্যানার্জী আমার পিঠ চাপড়ে হেসে উঠল। হো-হো-হো, তাপসবাবু। তবে কি জানেন ওটা মিথ্যে গল্প। আপনাদের যা বলেছি সব মিথ্যে।

আঁতকে উঠলাম। মানুষটা পাগল হয়ে যায় নি তো!

ব্যানার্জী হাসি থামিয়ে চুপ হয়ে গেল। ফুটো বেলুনের মত আমার ভেতরের সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল।

দুপুরের রোদ পড়ে গেছে। পার্কে ভীড় জমেছে। বাচ্চারা ছুটছে। বাদামওয়ালা, ফলওয়ালা হাঁকাহাঁকি করে যাচ্ছে। ব্যানার্জী মনমরা চুপচাপ।

হঠাৎ সে বলে উঠলো, সত্যি গল্পটা শুনুন তা হ'লে। গল্প বলার আগ্রহে বুড়োর চোখমুখ ঝিকমিকিয়ে উঠলো।

আমার ইচ্ছে নেই। তবু না করতে পারলাম না। ব্যানার্জী কি মনে করেন। বরং আমার জানতে ইচ্ছে করছিল ব্যানার্জী এখন কোথায় থাকে, ধর্মমেয়ের কাছে গেলে তারা কি একটু জায়গা দিত না। সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। গল্প বলার তাগাদায় বুড়োর তখন চোখেমুখে হাসি আনন্দ ঝিকমিকিয়ে উঠছে। আচ্ছা বলুন সত্যি গল্পটা আপনার মুখে শুনি।

ব্যানার্জীবাবু এবার দমে গেলেন বললেন, কি-ই বা বলব বলুন, আপনারা আজকাল গল্প লিখে মেডেল পান। তবে আমারও একটা সোনার মেডেল পাবার কথা ছিল।

দারুণ ইন্টারেষ্টিং। গল্প শোনার জন্য তৈরী হতে থাকি। ব্যানার্জীকে ফের বার দু'য়েক তাগাদাও মারি।

শুনবেন......। হো-হো-হো করে হেসে উঠলো ব্যানার্জী। ব্যানার্জী হাসে আমার গা কাঁপে, ভয় ভয় করে। এই মানুষটা এমনভাবে হাসতে পারে! শেষ হাসি থমকিয়ে বলল, সে দারুন গল্প।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। গল্প বলার পূর্ব মুহূর্তে ব্যানার্জী কেমন যেন হয়ে যায়। আমিও ভুলে যাই কলকাতার এই পার্কে বসে আছি। এক রহস্যঘন আবরণের আচ্ছাদন ঢেকে দিল আমাদের

ব্যানার্জী বলতে শুরু করল।

আজ থেকে বারো বছর আগের কথা। আমি তখন একটা প্রাইভেট ফার্মে ইলেকট্রিসিয়ানের কাজ করি। বিয়ে করেছি। একটা ছেলেও হয়েছে। আমি কলকাতায় থাকি। বৌ-ছেলেমেয়ে গাঁয়ের বাড়িতে মা-বাবার কাছে থাকে। হুগলী জেলায় আমাদের বাড়ি। তা — সেবার বৌ এসেছিল কলকাতায় দুর্গাপুজো দেখতে। কলকাতায় ঠাকুর দেখে, আত্মীয়-বন্ধুদেব সঙ্গে বিজয়ার প্রণাম সেরে কোজাগরী পূর্ণিমার আগের দিন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি লাস্ট ট্রেনে। বলে থামলো ব্যানার্জী।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমি অপেক্ষা করে থাকি। ব্যানার্জী কিছুক্ষণ দম নিতে লাগলো। কাশলো খক্‌খক্ করে। শেষে ফের বলতে লাগলো ঃ

তখন সবে ইলেকট্রিক ট্রেন চলতে শুরু করেছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন। খুব বেশী একটা ভীড় নেই। ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে আমার মত আরো অনেকে চলেছে দেশের বাড়িতে। বাইরে ধবধবে জ্যোৎস্না। কখনো ধানের ক্ষেতে, কখনো মাঠ বিলে দিব্যি দিনের মতো চাঁদের আলো। ট্রেন ছুটছে মাঠ, বিল আর শহর গ্রামের বুক চিরে। হঠাৎ প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে থেকে চার-পাঁচটি ছেলে উঠে দাঁড়াল। মুখে কাপড় বাঁধা। চোখের পলকে ভোজালি, ছুরি, পিস্তর বের করে ধরল। কামরার যাত্রীদের উদ্দেশ্যে হুকুম করল, যার যা আছে — ঘড়ি আংটি, গলার হার, বালা-চুড়ি, টাকা পয়সা দিয়ে দাও। মোটেই দেরী করবে না।

জোয়ান বয়স, স্বাস্থ্যবান যুবক আমি। উঠে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখি গোটা কামরাটা ভয়ে কাঁপছে। বাচ্চারা চীৎকার করছে, মেয়েরা কাঁদছে, ট্রেন চলছে। যে যার ঘড়ি আংটি খুলছে, টাকা পয়সা বের করছে —।

আমার দিকে ছুরি হাতে ছেলেটি এগিয়ে আসে। দেরী হচ্ছে কেন? শীগ্‌গীর খুলে দাও।

খুলে দিতে হবে কেন?

ছুরির ধারালো ফলাটা এগিয়ে এলো আমার গলার কাছে। ঘড়িটা না খুলে হাতটা বাড়িয়ে ধরলাম। বৌ তো ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করেছে।

হঠাৎ কি যেন হলো আমার বুঝতে পারলাম না। একটা পা দিলাম চালিয়ে। ছুরি হাতে ছোড়াটা পড়ে গেল। অস্ত্রটা ছিটকে গেল দূরে। পিস্তলটা ছিল খেলনা পিস্তল। চীৎকার করে বললাম মারো, মারো, ধরো সব। ধ্বস্তাধ্বস্তি হুড়োহুড়ি। ট্রেনটা থেমে যাচ্ছে। আমার মাথায় কে যেন মারল। আমিও কষে ঝাড়লাম তিন-চারটে লাথি। তারপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। — বলে থামলো ব্যানার্জী।

পলকহীন চোখে নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ হাঁফিয়ে দম নিয়ে ব্যানার্জী বলল, আমার জ্ঞান ফিরল হাসপাতালে — তিন-চার দিন পরে। মাথায় সেলাই পড়েছে চার পাঁচটা। পেটে সেলাই। ব্লিডিং হয়েছে। স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার বলছেন রিস্ক্ আছে। যমে-মানুষে টানাটানি চলল কিছুদিন। কোথাও কোথাও খবর রটে গেল আমার মৃত্যু হয়েছে — ডাকাতের সঙ্গে সংঘর্ষে। ডাকাতও মরেছে তিনজন। ....কিন্তু আমি আর সেরে উঠতে পারলাম না। শিরদাড়া ভেঙ্গেছে। মাথায় চোট লেগেছে, চোখে কম দেখি। বাড়ি পৌঁছে খবর পেলাম বৌ-ছেলে নেই — তারাও সেদিন ট্রেনের কামরায় শেষ। পঙ্গু অথর্ব হয়ে গেলাম। চাকরিতে ফিরে যেতে পারলাম না। অসুস্থ বলে আগেই বরখাস্ত হয়েছি। — তারপর কয়েক বছর ধরে শুনলাম আমার বীরত্বের কাহিনী। ডাকাত পিটিয়ে মেরেছি। শুনলাম নাগরিক কমিটির তরফ থেকে আমাকে সম্বর্ধনা জানানো হবে — বুঝলেন তাপসবাবু। বলা শেষ করে হাসলো ব্যানার্জী।

কিছু সময় চুপচাপ বসে থাকলাম। শেষে জিজ্ঞেস করলাম, মেডেলটা কি করেছেন?

হারিয়ে গেছে। সেটাই তো এখন খুঁজে বেড়াচ্ছি। বলে উঠে চলে গেল ব্যানার্জীবাবু। ....কিছুদূর গিয়ে হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, অন্ধ, বুড়ো লাচারকে দু'চার পয়সা সাহায্য দেবেন বাবু।

একদা যা ঘটেছিল

আশীষ বর্মন

বিশু মুখ ধুয়ে এসে বসলে মা ঠকাস করে লিকাবের গেলাস এগিয়ে দিলেন। উঠতে উঠতে বললেন, 'বাবার হাপ খুব বেড়েছে।'

'হুঁ।'

'বুকে ব্যথা — সারা রাত ঘুমোননি।'

বিশু কিছু বলেনি। নিশ্চুপ। লিকারে চুমুক দেয়। তার কিছু অজানা নয়। রাতে বার বার টের পেয়েছে বাবাব টান, ঘড়ঘড়ানি। বসে বসে কাতবানো, অস্ফুট গোঙানি। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চিলতে দাওয়ায় কাটিয়েছিল বহুক্ষণ। কী কববে ভেবেছে অপার অন্ধকারে। ভোরে ইচ্ছে করেই ওঠেনি, মটকা মেরে পড়েছিল। অবসাদে, হতাশায় নিজেকে পঙ্গু অথব লাগে। ইচ্ছে হয় মাদুরে-বালিশে চোখ বন্ধ কবে শুয়ে থাকতে থাকতে শূন্যে মিলিয়ে যেতে।

মুখ ধুতে ধুতে, ঠাণ্ডা জলের ঝাপটায়, সে খানিক ধাতস্থ হয়। একটু তাজা লাগে। ক্ষীণ একটা আশা জাগে ভিতবে ভিতরে। লিকাব চুমুকে সে আশা জাপটে ধবে, নিকভব।

মা বাসন ধুতে ধুতে অস্ফুট স্বরে বলেন, 'কিছু একটা কব বিশু।'

'দেখি।'

'ডাক্তারবাবুকে আনতে পারলে ভালো হয়।' বিশু কিছু বলতে পারে না। ভিতবে ভিতবে জমাট হয়ে যায়। ভাবে শুধু ডাক্তার নয়, চাল ডাল তেল ওষুধ পথ্য সবই চাই, সবই প্রকাণ্ড হাঁ মেলে বসে আছে, প্রত্যাশায়। সে গেলাস রেখে উঠে পড়ে।

মা তাকান, অলক্ষ্যে। বলেন 'কোথায় চললি?'

'ছাত্রের বাড়ি।'

'ছাত্র?'

'অনির্বাণ।'

'সুবিধে হলে ডাক্তারবাবুকে ধরে আনিস।'

'আনব।'

বিশু একবার সন্তর্পণে ঘরে যায়। তক্তপোশের দিকে তাকায না। সে দিক থেকে হাপরের কাতরানি ভেসে আসে। চিটচিটে, ছিন্ন তোশকে সেঁটে আছেন বাবা, কিংবা মোড়া ধরে বসে বসে হাঁপ নিচ্ছেন তিনি। শীর্ণ, ঝিলঝিলে, শুধু দৃষ্টি জ্বলজ্বলে। সে দিকে তাকায় না বিশু, জানালায় লটকানো জামাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। গায়ে দিয়ে চটি গলায় পায়ে।

মা বলেন 'চাল-ডাল জোগাড় হয়েছে........ভাবিস নে।'

'কোথায় পেলে .... সকাল-সকাল?'

'লক্ষ্মী দিয়ে গেছে....ধার।'

'ভালো।'

বাইরে বেরিয়ে এসে বিশ্বনাথ নিশ্বাস নেয়। হঠাৎ ভাবে এ-ভাবেই তারা বেঁচে যাচ্ছে, আশ্চর্য। অন্তত টিমটিম করে শ্বাস-প্রশ্বাস এখনও নিচ্ছে, হাত-পা নাড়ছে, কথা বলছে। হোক তা বুভুক্ষার ঠিক কানা ঘেঁষে, অনুক্ষণ অনিশ্চিতির মধ্যে। গ্লানি ও ছোট ছোট অপমানে পরিকীর্ণ জীবন, তবু তারা নিশ্বাস নিচ্ছে। লক্ষ্মীমাসি, অনন্তবাবু, বিকাশ, তন্ময় অন্য বন্ধু-বান্ধব....কুয়াশার মতো কিংবা বাতাস যেমন অগোচর, তেমনি জড়িয়ে আছে তাদের সহৃদয়তায়। ছোটখাট সাহায্য তাদের ভাসিয়ে রেখেছে, এখনও ডুবতে দেয়নি। অথচ এক অনুক্ত, চাপা ভয় তার চেতনার তলায় আড়ি পেতে থাকে। রাতে ঘুম ভেঙে যায় মারাত্মক স্বপ্নে। সারা শরীর তার তখন ঘর্মাক্ত, স্নায়ুতে ভীতির কম্পন আর বুক ধড়ফড় করতে থাকে। অথচ স্বপ্ন সঠিক মনে পড়ে না, জেগে জেগে শুধু সে টের পায় যে একটা সমূহ বিপদে বা সর্বনাশের ছায়ায় তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছিল। সে গোঙাচ্ছিল এক কোণে।

মা হঠাৎ জেগে ওঠেন 'কী হল, বিশু?'

'কিছু না।' বিশু ওঠে 'জল খাব।'

'দিচ্ছি।'

'না-না।' বিশু উঠে পড়ে 'আমি নিচ্ছি।'

ইদানীং ব্যাপারটা আরও বেড়েছে। স্কুলের নতুন সেশান শুরু হবে, টিউশানগুলো শেষ হয়েছে। নতুন ছাত্র কে হবে না হবে স্থির নেই। স্থায়ী কোনও কাজ পাওয়া মরীচিকাতুল্য, কেবল হেঁটে হেঁটে কাছে যায় আর তা মেলায়।

অনির্বাণ এখন আর তার ছাত্র নয়। সে এখন কলেজে ঢুকেছে, নিজে টিউশান করে। কিন্তু সদা স্মিত, সাধ্যমতো মাস্টারমশাইয়ের সহায়ক। নিজের চেষ্টায় পড়াশুনো চালায় বলেই হয়তো সে মাস্টারমশাইয়ের বিক্ষত চেহারাটা অনায়াসে বোঝে। বিশ্বনাথ ইতস্তত করলেও সে স্বতঃই এগিয়ে আসে। বলে 'রাখুন তো ও সব কথা। আমার বিপদে আপনি পাশে থাকবেন।'

'চেষ্টা করব....ক্ষমতা থাকলে।'

'হবে।'

'কী হবে?'

'ক্ষমতা। এভাবে দিন যায় না, মাস্টার মশাই।'

'আশা করি।'

'তবে? এ-টাকাটা আমি এখন দিতে পারি.......... নিন্ প্লিজ।'

'থ্যাংকস।'

ভাবতে ভাবতে, অনির্বাণের মেসের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, বিশ্বনাথের মুখে হাসি আসে। মনের চাপ, গুমোট ভাব ঈষৎ হালকা হতে থাকে। আশ্বাস জাগে ভিতরে ভিতরে: হোক তা ক্ষীণ, নিভু-নিভু প্রচ্ছন্ন ও সুদূর। তবু সব অন্ধকার মসীময় নয়।

লড়াইয়ের প্রেরণা, বাধাবিঘ্ন উত্তরণের সংকল্প ও প্রয়াস, রাস্তা চলতে চলতে বিশু ভাবে, সম্ভবত মানুষ পায় এ-হেন টুকিটাকি আলোক বিন্দুতেই। যা জোনাকির মতো জ্বলে-নেবে অথচ দিশা দিয়ে যায়। দিশা না হোক, দিশা হয় তো বড় কথা, অন্তত ক্ষণিক ভরসা। আর তার মতো অবস্থায় ভরসা বড় প্রিয়। তা তাৎক্ষণিক হলেও একান্ত কাম্য।

অথচ অনির্বাণের মেসে পৌঁছে যখন সে জানল যে অনি গেছে পুরীতে বেড়াতে, দিন সাতেকের জন্যে, অনেকে মিলে দল বেঁধে, তখন তার ভিতরটা পাথর হয়ে গেল। দু' একটি খুচরো শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া তার গলায় কোনও কথা ফুটল না। ঝপ করে সব কেমন অর্থহীন, রুদ্ধ, বৈরী হয়ে যায়। অন্ধকার ছেয়ে আসে, রোদের তাপও বিশ্বনাথ টের পায় না।

স্খলিত পায়ে সে ফুটপাতে নেমে যায়। মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম করে, পদক্ষেপ অল্প এলোমেলো হয়। আচমকা মাথা ঘুরলে, পাক দিলে, সে দেওয়ালে হাত রাখে। সেটা নিমেষ কয় মাত্র, কারও চোখে পড়ার আগেই সে সামলাতে পারে। আস্তে এগোয়। হঠাৎ মনে হয় সম্ভবত খালি পেটে এতটা হেঁটে এসে তার মাথাটা পাক খেল। কিন্তু অভুক্ত অবস্থা তার নতুন নয়, চা গিলে খিদে মারা তার নিত্যকার অভ্যেস। হয়তো তা ভিতরে ভিতরে তাকে, ক্রমে, নিঃসাড়ে কাহিল করছে।

পানের দোকানের অদূরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশুর মনে হয় একটা সিগারেট ধরাতে পারলে বেঁচে যায়। কিন্তু পকেটে খুচরো এত কম যে সে সাহস পায় না। সিগারেটের দোকানটার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। ভুলে যেতে চেষ্টা করে যে ও দিকে কী আছে, স্তরে স্তরে রিজেন্ট, চারমিনার, উইলস, ক্ল্যাসিক-এর সমারোহ। সামনে, দড়িতে ঝুলছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। কিছুতেই কী এ-সব তার মন থেকে যায় না, কেবলই হাতছানি দেয় আয় আয়। অথচ সে তাকিয়ে আছে সামনে, রাস্তার গাড়িঘোড়া ধাবমান কোনও দাগ না কেটে।

হঠাৎ একটা মোটর সামনে এগিয়ে ঘ্যাঁচ করে থামে, কে গম্ভীর গলায় ডাকে 'বিশু, অ্যাই বিশ্বনাথ!'

বিশু চমকে তাকায়। দেখে বড় মেসো, ভবানীবাবু, মুখ বের করে হাতের ইশারায় ডাকছেন। তার ঘোর কেটে যায়। সে এগিয়ে আসে। ভবানীবাবু সিটে সরে যেতে যেতে বলেন 'আয়......উঠে বস্‌......।'

'এখন?'

'কথা আছে।' উনি দরজা খুলে দেন, বলেন 'গার্ল ফ্রেন্ডের অপেক্ষা করছিস নাকি?'

'না-না।'

'অমন হ্যাঁদার মতো দাঁড়িয়েছিলি কেন?'

'এমনি....ভাবছিলুম।'

'কী?'

'আকাশ পাতাল।'

'তাতেই হবে? কাজ-টাজ কিছু পেলি।'

'কই আর।'

'সরলা কেমন আছে?'

'ওই......আছে।'

'তোর কথা একজনকে বলেছি......, একটা বায়োডাটা দিয়ে যাস তো আমায়...... তোর।'

'আচ্ছা।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব.......কালই।'

'বেশ।'

'এবার আমি ডান দিকে যাব........ডাল্‌হৌসি.......... তুই কোথায় নামবি?'

'এখানেই......।'

গাড়ি থামলে বিশু নেমে পড়ল। উনি গাঢ় গলায় বললেন, 'কথাটা খেয়াল থাকে যেন।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

মোটর হুস করে চলে যায়। মসৃণ তার গতি। বিশুর তখনই মনে হল যে সে আরও মাইল দুয়েক দূরে এসে পড়েছে, বাড়ি থেকে। পেট চোঁ-চো করছে, হেটে ফেরা মুশকিল। বাস-ট্রাম কিছু লাগবে। তবু সে টের পায় তার উপলব্ধির কেন্দ্রে এক অধরা আভা। নিজেকে

তেমন নিস্তেজ, উদ্দেশ্যহীন ও ভঙ্গুর মনে হয় না। আচ্ছন্ন, বিবশ অনুভূতি ঈষৎ সজাগ ও হাল্কা হতে থাকে। একটু একটু যেন দিশা পায়, দিশা কিংবা সুপ্ত ভরসা। যে বস্তু কায়াহীন, বিমূর্ত হলেও সে কাঙালির মতো খোঁজে, এবং এতকাল যা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েও শেষাবধি মিলিয়ে গেছে। অবশিষ্ট থেকে যায় মর্মমূল ব্যেপে হতাশা, অবসাদ। বড় মেসোই এ-যাবৎ বহুবার বিমুখ করেছেন, বায়োডাটা কাজে লাগেনি। তবু সে আজ আবার ঈষৎ চনমনে বোধ করে। খিদে হাঁ-হাঁ করে অথচ যোঝার শক্তি পায়। হাঁটতে থাকে। কোন উদ্দেশ্যে ঠিক বোঝে না। মনে মনে ভাবে বৃথা? হয়তো। কিন্তু বড় মেসোর কথাটা তাকে সাপ্টে থাকে, ভুলতে পারে না। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রাগ-অভিমান মিলেমিশে চৈতন্যে বয়ে যায়। হঠাৎ মনে হয় তাকে মাঝ মাঝপথে, বাড়ি থেকে অনেক দূরে এনে, নামিয়ে দেওয়া অর্থহীন, হৃদয়হীন চাল। তেমন টান থাকলে কিংবা সাহায্য করার বাসনা, অনায়াসে তাকে অফিসে নিয়ে গিয়ে বায়োডাটা লিখিয়ে নিতে পারতেন ভবানীবাবু। শুধু লেখানো কেন, অফিসে টাইপ করিয়ে নিতে পারতেন। চাই কী, টাইপ করা তারও আসে, প্রয়োজনে সে নিজেই হাত লাগাত। শালা, সব ভড়কিবাজি, আচমকা দবদ উথ্‌লে উঠেছিল!

কিন্তু তাই-ই বা কেন, বিশু ভাবে। বড় মেসো অনায়াসে, মসৃণ স্রোতে, হুস করে বেরিয়ে যেতে পারতেন। সে টেরও পেত না কোন স্রোতে কে মিশে যাচ্ছে। গাড়ির বহতা তো লেগেছিল, এখনও আছে, অবিরল। এমন কী বস্তুত, ওঁর মোটর তো বিশুর অগোচরে বেরিয়েই গেছিল, বেরিয়ে গিয়েই খ্যাচ করে থামে। উনি থামান, তাকে ডাকেন। কথাটা খেয়াল হতেই বিশুর কানের পাশে দপদপ করে চাপা উত্তেজনায়। আশায়। বড় মেসো সম্ভবত, তার আচমকা খেয়াল হয়, সোজা অফিসে যাচ্ছিলেন না। যাচ্ছিলেন অন্যত্র, ভিন্ন কাজে। কত রকমই তো ধান্দা ওঁর! এটা মনে হতেই বিশু থমকে দাঁড়ায়। খেয়াল করে সে হাঁটতে হাঁটতে, হয় তো অবচেতনের টানে, মনোহরপুকুরের কাছে চলে এসেছে। এ পাড়াতেই তার ভূতপূর্ব ছাত্র, কিশোরের বাড়ি।

কিশোরের কথায় ওর মনটা আরও হালকা, সজীব হয়ে ওঠে। ওর মতো মনোহারী, হাস্যময় ছাত্র বিশ্বনাথের কপালে কমই জুটেছিল। বড় অনুভূতিপ্রবণ ছেলেটি, মাস্টার মশাইয়ের অনেক খুচরো সহায়তায় সে স্বতঃই হাত বাড়িয়েছে। আজও হয়তো দাদ পাওয়া যাবে, যদিচ সে আর তার ছাত্র নয়।

ভাবতে ভাবতে গিয়ে বিশু বেল বাজায়। দরজা খোলে পুরোনো কাজের লোক শ্রীহরি। এক মুখ হেসে বলে

'আসুন আসুন, মাস্টারমশাই... অনেক দিন পরে এলেন।'

'হ্যাঁ। তুমি ভালো তো?'

'আজ্ঞে.... চলুন পড়ার ঘরে বসবেন........... খোকাকে খবর দিচ্ছি।'

'আছে.......বাড়ি?'

'আছে....... বসুন।'

শ্রীহরি পাখা খুলে দিয়ে যায়। এ-ঘরটা বড় পরিচিত এবং মনোরম। বইয়ে ঠাসা। কিশোর নিজে, বাবা-মা-দাদা সবাই বইয়ের পোকা। এ ঘরেই বিশু পড়াত। সে র‍্যাক থেকে নিয়ে বই ঘাঁটতে থাকে। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, মার্কসবাদ, বিজ্ঞান ইত্যাদির দিকে চোখ বুলিয়ে সে সরে যায়। অন্য দিকে ক্লাসিক্স......সেই একই রকম যত্নে রাখা আছে। কোনাকুনি রয়েছে ভার্জিনিয়া উলফ, জায়েস, উড্ডাম লুইস, প্রুস্ত, এলিয়ট, স্পেন্ডার, অডেন এবং পরবর্তীরা। বাঁ দেওয়াল ভর্তি বাংলা বই, হুতোম থেকে বঙ্কিম, দীনবন্ধু রবীন্দ্রনাথ এবং

আধুনিকরা। সে দিক থেকে সতীনাথ ভাদুড়ির বই নিয়ে চেয়ারে ফিরে এলো। এটা বৃহৎ সমগ্রের এক খণ্ড। কিশোর স্নান করছে শ্রীহরি বলেছিল। আসতে একটু সময় লাগবে। ওরা থাকে দোতলায়। নীচেটায় বসার ঘর, লাইব্রেরি, খাবার ঘর, রান্নার জায়গা এবং গেস্ট রুম। রান্নার জায়গা থেকে একটা মনোহারী গন্ধ পায় বিশ্বনাথ। আর তার খালি পেট কোঁ-কোঁ ডাকে, মোচড় দেয়। নিজেকে অন্যমনস্ক করার প্রয়াসে বিশু বই ওলটায়। কিন্তু মন লাগে না আদৌ। বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ গোটা কয় নোট মাটিতে পড়ে যায়। বিশু এক সেকেন্ড হক্‌চকিয়ে থাকে, তারপর নিমেষে দরজার দিকে দেখে নিয়ে সেগুলো কুড়োয়। একটা তখনও মাটিতে, এমন সময় আওয়াজ পায়। সে কিছু না ভেবেই সেটা চটির তলায় চেপে রাখে, বই বন্ধ করে। ঘরে সরবত নিয়ে শ্রীহরি ঢোকে, বলে, 'মা পাঠিয়ে দিলেন....একটু ঠাণ্ডা হন আগে।'

'হুঁ।'

'খোকা এলো বলে.....চা-টা এক সঙ্গে খাবেন।'

'হাঁ।'

শ্রীহরি চলে যায়। বিশু আড়ষ্ট হয়ে থাকে সরবত হাতে। তার কেমন অপরাধী, চোর-চোর লাগে নিজেকে। বোকা এবং জড়ভরত। অযথা। সে কিছু অন্যায় বা কারচুপি করেনি। টাকাটা কেউ গুজে রেখে ভুলে গেছে। হয়তো লুকিয়েছিল। স্বাচ্ছন্দ্যের সংসারে, খেলাচ্ছলেও, এহেন লুকোচুরি ঘটতে পারে। অথবা নিছক ভুল, টাকা রেখে খুঁজে পায়নি। সেটা তার পদস্খলন নয়, সে কিছু গোপন করেনি। তখনই বিশ্বনাথের মনে পড়ল চটি চাপা নোটের কথা। সে গেলাস রেখে, এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে, পা সরিয়ে নোটটা কুড়োয়। দশটাকার, কাদা লেগে গেছে এবং ময়লা। এটা সে দ্রুত পকেটে রেখে দেয়, নতুন নোটের সঙ্গে রাখা অসম্ভব। কাদা-ময়লার জবাবদিহি দিতে হবে বইয়ে রাখলে। মুখে কেউ প্রশ্ন না করলেও মনে মনে, অর্থাৎ চিন্তায়, ব্যাপারটা গরমিল ঠেকতে বাধ্য। কথাগুলো ও পরিস্থিতিটা ভাবতে ভাবতে বিশুর কপালে বিড়বিড়ে ঘাম ফোটে। সে বুক পকেট থেকে নোটটা বের করে পাশের পকেটে গুঁজে দেয়। সরবতটা খেয়ে নেয়। খেয়ে এক ঠাণ্ডা শান্তি বোধ করে। পিপাসা মেটে। মেটে না, কমে। ঠিক তখনই, পর্দা সরিয়ে সদ্য স্নাত, সহাস, স্নিগ্ধ কিশোর ঘরে ঢোকে 'স্যার আপনি!'

'হঠাৎ চলে এলুম.......অসময়ে।'

'রাবিশ! আপনার কথা সবাই বলেন....... আপনি আর আসেনই না।'

'বড় বিপদে আছি কিশোর...... সময় পাই না।'

'কী হল, এখন?'

'বাবার হাঁপানিটা ভীষণ বেড়েছে..... এ দিকে আমার তো ছাত্রটাত্র এখন নেই। নতুন সেশান আরম্ভ হবে.....।'

'দাঁড়ান।' কিশোর মোলায়েম হাসে, বলে 'আগে খাওয়া যাক.......মা ডালপুরী ভাজছেন।'

'তারই গন্ধ?'

'আপনি বরং একটু ফ্রেশ হয়ে নিন।' কিশোর লাগোয়া বাথরুমটা ইঙ্গিত করে বলে 'সাবান তোয়ালে সব আছে.... আগের মতোই।'

'সেই ভালো।' বিশু উঠে পড়ে, বলে 'সরবতটা চাঙ্গা করেছে।'

যখন হাত-মুখ ধুয়ে, ঘাড়ে-রগে জল থুপ্‌থুপিয়ে, চাঙ্গা হয়ে বাথরুম থেকে বেরোয়, তখন তার চোখে পড়ে সতীনাথ সমগ্র। কিশোর স্মিত মুখে বন্ধ করে রাখল। টেবিলে ইঙ্গিত করে বলে 'খানা আ গিয়া, স্যার।'

'বাঃ!' বিশু আর কিছু বলতে পারে না। সে রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করে। কিশোর সহাস চাউনিতে হাতে বই সরিয়ে রাখল, দ্বিরুক্তি করল না। এমন কি খাওয়ায় হাত লাগাল। এ-সব লক্ষ করে ওর টানাপোড়েন হ্রাস পাওয়ায় বদলে বাড়ল। বিশু ভেবে পায় না তারই কিছু বলা এখন যথাযথ হবে না ঈষৎ উদ্ভট শোনাবে। গোড়াতেই সে কিছু বলেনি বরং তার আবিষ্কার চেপে গেছিল। সুতরাং নীরবতাই শ্রেয়।

সে বসতে বসতে খাবারের গন্ধে পেট আবার মুচড়ে ওঠে।

'আঃ!' গন্ধ!'

'মার ডালপুরি ফার্স্ট ক্লাস.... হাত লাগান।'

'এ-যে লাঞ্চ হয়ে যাবে।'

'হোক।' কিশোর হাসে 'আমি বলেই দিয়েছি, আজ নো ভাত।'

'অসম্ভব!'

একগাদা ডালপুরী, আলু ছেঁচকি, আচার খাওয়ার পর মিষ্টি খেয়ে জল খেয়ে বিশু আশ্চর্য গভীর এক সুখানুভব করল। ঢেঁকুর তুলে বলল 'ওরিব্বাস!'

'ভালো হয়েছে?'

'স্বর্গীয়.....!'

'আরও নিন না।'

'মাথা খারাপ! এখন গড়াতে ইচ্ছে করবে।'

'তা চলুন. .. ও ঘরে বিশ্রাম করবেন।'

'না কিশোর....... আমায় বায়োডাটা টাইপ করতে হবে।'

'ফাইন। ওই তো টাইপ রাইটার... .. বসে যান।'

শ্রীহরি বাসনপত্র নিয়ে যায়। কিশোর স্যারকে কাগজ-পত্র বের করে দিয়ে বলে 'আমি আসছি।' বিশু টাইপ নিয়ে বসে। টাইপ করতে করতে একবার ভাবে উঠে গিয়ে বইটা খুলে দেখে আসে। কিন্তু টাইপের আওয়াজ বন্ধ করতে দ্বিধা বোধ করে, ভরসা পায় না। বাঁধা গত ফটাফট সেরে ফেলে। চোখ বুলিয়ে নিয়ে খামে পুরতে পুবতে কিশোর ঘরে ঢোকে। নীরবে সে আর একটা খাম নিয়ে বইয়ের কাছে যায়। তার পিঠের আড়াল পড়ে, তবু বিশুর বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সে বই থেকে খামে টাকা ঢোকায়।

'কী করছ, কিশোর?'

'কিছু না। স্যার, এক'শ পাঁচ টাকায় আপনার হবে, আপাতত?'

'তার মানে?'

'ধার দিচ্ছি..... দাদার টাকা।'

'বইয়ে!'

'ও লুকিয়ে রাখে।' কিশোর হাসে, বলে 'বইয়ে, তোশকের তলায়, নিজের প্যান্ট-জামা চাপা দিয়ে...... ভুলেও যায়।'

'কেন?'

'মা ওর অপচয় বন্ধ করার চেষ্টা করেন, বড্ড খরচে হাত..... ও যতটা পারে লুকোয়।

'ওর তো খুব ভালো চাকরি।'

'হ্যাঁ..... মা বলেন কিছু জমা........ ও লুকোয়.....।' কিশোর অনাবিল হাসতে থাকে। বিশুও মজা পায়, তবু সে বলে 'কিন্তু ওর টাকা..... না জানিয়ে.....।'

'ওর টাকা হয় আমি মারি নয় মা..... ও প্রায়ই টের পায় না, ভুলে যায়।'

'তবু!'

'রাখুন তো!' কিশোর ওর বুক পকেটে খামটা গুঁজে দেয়, বলে 'মাকে আমি বলেছি। দাদার অপচয় কমানো দরকার।'

এরপর বিশু আর কিছু বলতে পারেনি। তার আপত্তি জানাবার কোনও-উপায় ছিল না। এ সব ভব্যতা সম্ভব হয় দারিদ্র্য সীমার ঊর্ধ্বে। হাহাকারের সময় তা অসম্ভব। বিশুর যুগপৎ খারাপ লাগে, আবার স্বস্তি জাগে। সে শুধু অস্ফুট স্বরে, কিশোরের সহজ চাউনি এড়িয়ে বলে 'থ্যাংকস, কিশোর।'

'প্লেজার ইজ মাইন স্যার ..... আবার আসবেন কিন্তু।'

'আসব।'

বেরিয়ে এসে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে, বিশুর মন হালকা ফুরফুরে হয়ে যায়। গলায় গান আসে। গায় না কিন্তু মৃদু শিস দেয়। ভাবে আজ তার ভাগ্য প্রসন্ন। ভরা পেট, শরীর সজীব, পকেটে টাকা, হাতে বায়োডাটা। বড মেসোকে আজই সে পরচাটা পৌঁছে দেবে, গ্রহ-নক্ষত্রের যে রকম যোগাযোগ, তাতে তার, তাদের সংসারের কপাল হয় তো ফেরার মুখে। বিলম্বে শুভক্ষণ অপচয় করতে সে একেবারেই গররাজি। তা ছাড়া দিনের বেলায় বাবার হাঁপানি হ্রাস পায়, অনেক সময় তাঁকে দেখায় স্বাভাবিক। স্যালবুটামল ইনহেলার তো আছেই হাতের কাছে। তেমন কিছু বাড়াবাড়ি হলে, এক্ষণে, এই দ্বিপ্রহরে, তার বন্ধুরা কেউ বা অনন্ত কাকা, ডাক্তার ডেকে ইনজেকশান দিইয়েছেন। এখন আর তার বাড়িতে করণীয় কিছু নেই। মা নিশ্চয়ই ভাতে ভাত খেয়ে নিয়েছেন। তারটা সে রাত্রে খাবে। নো প্রবলেম! আপাতত সমস্ত চিন্তাই তার স্বস্তিতে প্রসন্ন।

সাজানো অফিসে পৌঁছে সে রিসেপশানে শুনলো বড় মেসো একটু আগে বেরিয়ে গেছেন। ফিরবেন কাজ সেরে। বড় মেসোর খাস বেয়ারা তাকে নিয়ে গিয়ে মানী লোকের ওয়েটিং রুমে বসিয়ে গেল। চা বা ঠাণ্ডা কিছু আনবে কিনা জানতে চাইল। বিশু হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে না করে। আরাম কেদারায় ম্যাগাজিন হাতে বসে। ঘর খালি, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঠাণ্ডা আরামে ভরা। বেয়ারা চলে গেলে সুখের আবেশে বিশু এলিয়ে বসে। পত্রিকায় চোখ বোলায়। ক্রমে তন্দ্রায় হাত থেকে তার ম্যাগাজিন পড়ে যায়। একবার দু'বার ঝাঁকানি দিয়ে সে নিজেকে সজাগ করে, পত্রিকাটা তুলে নেয়। কিন্তু চোখ আর খুলে রাখতে পারে না। এক সময়, আধো চৈতন্যের মধ্যে, সে কাগজটা কেদারার পাশে গুঁজে চটি খুলে, পা তুলে সুখানুভবে সম্পূর্ণ এলিয়ে পড়ে প্রগাঢ় ঘুমে।

ঘুম ভাঙল তার বটকেষ্টর ঝাঁকানিতে, ডাকে। ধড়মড়িয়ে চোখ মেলে সে দেখল ঘরে আলো জ্বলছে। বিস্তীর্ণ কাঁচের জানালায় ভারী পর্দা টানা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সে উঠে লক্ষ্য করল আরাম কেদারায় তার পায়ের ধুলো-ময়লা লেপ্টে গেছে। সে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে, নোংরা রুমাল বের করে, দ্রুত কেদারা ঝাড়ে।

বটু বলে 'ছাড়ুন....ছাড়ুন.......আমি দেখছি।'

'ধুলো লেগে গেছে।'

'ঠিক আছে, ঝেড়ে দিচ্ছি....... সাহেব ডাকছেন, যান।'

'কতক্ষণ?' কখন এলেন বড় মেসো?'

'এই তো..... মিনিট দশেক।' ততক্ষণে একপাটি চটি পায়ে অন্যটা আঁতিপাতি খোঁজে বিশু। অস্ফুট বলে 'চটিটা......।'

'দাঁড়ান দেখি।' বটু উবু হয়ে, হামা দিয়ে কেদারার তলা থেকে অন্য পাটি চটিটা বের করে এগিয়ে দিতে দিতে বলে 'এবার এটা বিদায় দিন, দাদাবাবু।'

'দেব দেব..... অচল!' বিশু অপ্রস্তুতভাবে, দ্রুত পায়ে চটি গলিয়ে, আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে যেতে গিয়ে থম্‌কায়, পকেটে হাত দিয়ে প্রায় আর্ত স্বরে বলে 'চিঠিটা!'

'চিঠি?'

'আমার পকেটে একটা চিঠি ছিল..... জরুরি।'

'ওটা নয় তো.... কেদারায় ওই খাম?'

'কই? হ্যাঁ-হ্যাঁ ওটাই.... বাঁচালে বটু!' বিক্ষত, আধ খামচা চটি সামলে পাশের বড় ঘরে, ছিম্‌ছাম আদত অফিস রুমে যখন বিশু ঢুকল, তখন দেখল বড় মেসো পি. সি.-তে কাজ করছেন। সেখান থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন, 'সরি, আমার ফিরতে দেরি হল, বস।'

'কটা বাজে?' কথাটা হঠাৎ ওর মুখ থেকে বেরোয়। নিজের কানেই তা আশ্চর্য বেখাপ্পা, অর্থহীন শোনায়। বিশু আরও বিস্রস্ত হয়ে পড়ে ভিতরে ভিতরে। বড় মেসো কিন্তু পি সি. থেকে চোখ সরান না। কী বোর্ড টেপাটিপি করতে করতেই বলেন, 'প্রায় আটটা....ঘুম হল?'

'ছি ছি, আমি টেরই পাইনি........ হুঁশ ছিল না।'

'তোর বিশ্রাম দরকার ছিল..... নাউ ইউ লুক ফ্রেশ।'

'আমি বায়োডাটাটা এনেছি।'

'গুড! এখানে রেখে যা।'

'কিছু হবে.......কাজটাজ?'

'হোপফুলি।' এবার বড় মেসো হাতের কাজ সাঙ্গ করেন, ওর দিকে ফিরতে ফিরতে বলেন 'চেষ্টা তো করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'কিছুই মুফতে হয় না।'

'না।'

'নে, কফি খা।'

'হুঁ।'

'বাড়ির খবর সব ঠিকঠাক আছে তো?'

'আছে।'

'এবার তোর একটা হিল্লে হতে পাবে।'

'উঃ বেঁচে যাই তাহলে .... সবাই।'

'ডোন্ট গিভ ইন টু ডিপ্রেশান।'

'না।'

'লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা এবার আয়..... বাইরে লোক অপেক্ষা করছে।'

'আসি।'

'অল দ্য বেস্ট।'

'ধন্যবাদ।'

বাইরে পা ফেলে হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায়, বিশ্বনাথ ঈষৎ থমকে দাঁড়ায়। তখনই তার আচমকা মনে হয় যে বড় মেসোর সঙ্গে আলাপটা কেমন কাঠ-কাঠ, নৈর্ব্যক্তিক হয়ে গেল। ওঁর উষ্ণতা কী উধাও হল? কেমন বড়সাহেব বড়সাহেব ভাবসাব। নাকি, এটা তারই বিভ্রম! ভাঙা মাজার অলীক কল্পনা। ইদানীং, চোট পেয়ে পেয়ে, সে সম্ভবত অহেতুক স্পর্শকাতর হয়ে গেছে। অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয় নড়বড় করছে, অথবা তা নিত্যকারের

অনিশ্চিতিতে, হাভাতেপনায়, হারিয়ে শেষ। নইলে এমন কথা মনে হয় কেন? কাজের মধ্যে, ব্যস্ত বড় মেসো অন্য চিন্তায় মগ্ন যে, সে কী তাকে কোলে বসিয়ে কথা বলত? ভাবিস কী শালা নিজেকে! ফ্যা ফ্যা করে তো দিন যায়, আবার নাকের পাটা ফোলানো, অসম্মানবোধ! ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, বিশু ভাবে, তার একটু খটকা লেগেছিল মাত্র। আসলে বোধ হয় কিশোরের টাকা পকেটে, ডালপুরি রাজভোগ সেঁটে, এয়ারকন্ডিশানড আরামে নিদ্রা দিয়ে, সে সম্ভবত ঈষৎ ফেঁপে গেছে। এখন হাঁটতে হাঁটতে আবার তার খিদে উঁকি মারে, পেটে ঠোঁস দিচ্ছে। সে ঝট করে পাঁচটা সিগারেট-দেশলাই কিনে, ধরিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, ফের ধাতস্থ হয়। বাস-ট্রামের ভিড় দেখে স্থির করে আপাতত বাড়িমুখো হাঁটবে, যতটা পারে।

হাঁটতে হাঁটতে এসে মিন্টো পার্কে সে ঢুকে পড়ে। ঝালমুড়ি কিনে, ঠোঙা হাতে বেঞ্চে বসে। জল ছুঁয়ে ফুরফুরে হাওয়া আসে, ঘাম শুকোয়, বেশ লাগে। অন্যমনস্ক বসে থাকে বিশু। বাড়ির দুশ্চিন্তা তাকে ঘিরে আসে। মন ক্রমশ দমে যেতে থাকে। পায়ের চটিটা এমনিতেই ফাদরা-ফাই, অধিকন্তু পেরেক খিঁচোচ্ছে। পায়ে লাগে। সে উবু হয়ে, হাতড়ে টুকরো ইট পায়। সেটা দিয়ে পেরেক ঠোকে। ঠোকা-ঠুকি করে বেঞ্চে বসতেই তার চোখে যায় ঘনিষ্ঠ হওয়া প্রেমিক-প্রেমিকা কিংবা বাজারি সংরাগ। মন বিরস বক্র হয়ে যায়। দৃশ্যটায় সংবেদ্য মাধুর্য নেই, আছে হাই-হাই ভাব। সে মনে মনে তিক্ত উচ্চারণ করে, ধুস্ শালা। তারপর হন হন করে বাইরে বেরিয়ে আসে। সোজা ল্যান্সডাউন রোড, অথবা এখনকার শরৎ বসু রোড ধরে পা চালায়। হাঁটতে হাঁটতে খিদেটা জেল্লা দিয়ে ওঠে। হতভাগা পেট বটে, কেবল খাই-খাই! অথচ সে লিভ্ ফিপ্‌টি টু খায় না, হাজমোলার বিজ্ঞাপনই দেখেছে। তাতেও খিদে পায় আর ততোধিক ঘাম ঝরে টপ্‌টপ্ কর। সে নাজেহাল অবস্থায় ক্ষুদে তেকোনা পার্কটায় সেঁধিয়ে যায়। পোড়া ঘাসে থপ্ করে বসে পড়ে জিরোয়, ঘাম শুকোয়। ফস্ করে সিগারেট ধরিয়ে দেখে সামনে, রাস্তার ওপাশে, বিয়েবাড়ির টুনি বাল্‌ব ঝিকমিকোয়, সানাই বাজে। আলোয় আলোকময় পরিবেশ, সাজাগোজা মানুষের ভিড় ও আনাগোনা। হঠাৎ সে ঠিক করে ফেলে, আজ, সে বাসি ডালভাত খাবে না। খাবে বিয়েবাড়ির ভোজ।

আরও খানিক জিরিয়ে নিয়ে, সিগারেটটা ফুঁকে শেষ করে, রাস্তার কলে মুখ-ঘাড় ধুয়ে রুমালে মুছে, মনোবল জড়ো করে নিয়ে, বিশু শেষাবধি হন হন করে আমন্ত্রিতদের জটলায় সেঁধিয়ে যায়। আপ্যায়নের শব্দে উঠে যায় উপরে। তখনই একটা ব্যাচ, জুতো, পাম্প শু, কাব্‌লি, চটি খুলে রেখে আহারের দিকে এগোয়। বিশুও দ্বিধাহীন।

সতৃপ্ত ভোজ সেরে, পান হাতে মহা সুখে বিশ্বনাথ যখন জুতো-পাম্প শু-কাব্‌লির মেলায় এসে দাঁড়াল, তখন তার চটিটা চোখে পড়ল না। হয় তো মেশামেশি হয়ে গেছে, কিংবা কেউ লাথি মেরে বিদায় দিয়েছে। বিশু এক সেকেন্ড থম্‌কে, অম্লানবদনে নতুন জুতোয় পা গলায়। বেশ ফিট করে। সে সেটা পরে অনায়াসে নেমে আসে। দু'একজন তাকায়, হয়তো, জুতোর জন্যে নয়, সম্ভবত তার অবিন্যস্ত চেহারায়, জামা-পাজামায়। ভাবে হয়তো ক্যাটারারের লোক বা অন্য কাজের। কেউ কিছু বলে না। বিশু বেরিয়ে যায় রাস্তায় কোনও বিঘ্ন বিনা।

কিছুটা এগিয়ে সে, প্রায় হাজরার মোড় বরাবর, নীরবে, ভিতরে ভিতরে হুর-রে হাঁক ছাড়ে। দৌড়ে গিয়ে সামনের বাসটা ধরে, সেলিমপুর। তার গন্তব্যস্থল। সেলিমপুরের স্টপেজে নেমে, সংকীর্ণ পথ, গলি, বাদাড় পেরিয়ে, মিনিট পনেরো পা চালিয়ে তবে নিজেদের পাড়া।

অল্প দূর থেকেই তার চোখে পড়ে তাদের দীন, প্রায় পোড়ো আস্তানার সামনে লোকজনের জটলা। দেখেই তার বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে ওঠে। সে এক সেকেন্ড কেমন থমকে যায়,

কিছু বুঝে উঠতে পারে না। বিমূঢ় ভাবটা কাটার আগেই সে আবার দ্রুত পা চালায়। দরজার সামনেই বিকাশ বলে 'যাক্, এসে গেছিস....!'

'কী ব্যাপার?'

'ভালো নয়..... আয়।'

'আগে বল বাবা কেমন আছেন?'

'চল ভিতরে, বলছি।'

'না-না!'

'হি হ্যাড অ্যান হার্ট অ্যাটাক ..... দুপুরে.....।'

'য়্যাঁ?

'কিছু করা যায় নি....শ্মশানে যেতে হবে..... তোরই অপেক্ষায় আছে সবাই।'

বিশু আর কিছু বলতে পারেনি। ভিতরটা স্থির, অসাড়। সে যন্ত্রবৎ দু'পা ভিতরে গিয়ে দেখতে পায় স্তব্ধ, অনড়, প্রাণহীন মূর্তির মতো মা-কে ঘিরে আছেন প্রতিবেশী মহিলারা। মার চোখে খরা, বিন্দুমাত্র জলের আভাস নেই।

তমসাবৃতা

ঋতা বসু

মহুয়ার ভাসুরঝি জিজা, তার স্বামী দিব্য ও তাদের দেড় বছরের মেয়ে এসে পড়বে আর চার-পাঁচদিনের মধ্যে। মহুয়ার তাই নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। জিজা অবশ্য দিল্লিতে চার-পাঁচদিন থেকে চলে যাবে বারাসতে মা-বাবার কাছে। তাঁরা উন্মুখ হয়ে আছে মেয়ে এবং নাতনির জন্য। জামাইও গেলে সোনায় সোহাগা হত, কিন্তু দিব্যর গবেষণার একটা ছোট অংশের জন্য দিল্লিতে কয়েকদিনের কাজ আছে। সেজন্য দিব্য মহুয়া রজতের কাছে দিল্লিতেই থেকে যাবে। পরে যদি সময় পায় তো বারাসতে যাবে। নয়তো জিজা আবার ফিরে আসবে দিল্লি — এখান থেকেই চলে যাবে আমেরিকা।

মহুয়ার ভাসুর অত্যন্ত ব্যস্ত ডাক্তার। বছরের এই সময়ে দু-তিন দিনের বেশি ছুটি নেওয়া সম্ভবই নয়। আর মহুয়ার জা স্পন্ডেলাইটিসে এত কাবু হয়ে পড়েছেন যে দিল্লি পর্যন্ত একা আসার ধকল নিতে রাজি হলেন না। তা ছাড়া বাড়ি খালি রেখে তারও বেশিদিন বাইরে থাকা মুশকিল। মহুয়া অবশ্য বলেছিল — যে ক'দিন জিজারা আছে আপনারাও দিল্লিতে চলে আসুন। তা হলে আর জিজাকে ছোট বাচ্চা নিয়ে এদিক-ওদিক করতে হয় না। কিন্তু সবার সুবিধের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত এটাই ঠিক হয়েছে।

জিজা সেই যে বিয়ের পর হিউস্টনে চলে গিয়েছিল — গত চার বছরে আর আসেনি। মেয়ে নিয়ে তারপর এই প্রথম আসছে।

জিজাদের ঘরটা ঠিকঠাক করতে করতে মহুয়া ভাবছিল জিজাটা বাচ্চা সামলে ঠিক করে সংসার করতে শিখেছে কি? প্রথম দিকে দিব্যর সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময়ে জিজার সাংসারিক কাজ করার অনিচ্ছা নিয়ে হাসিঠাট্টা করলেও পরে যেন দিব্যকে কখনও কখনও একটু বিরক্ত বলে মনে হয়েছিল। মহুয়া ভেবেছিল জিজা যতই আহ্লাদি হোক না কেন আমেরিকায় গিয়ে ঘাড়ে পড়লে কাজ করতে বাধ্য হবে। সেখানে জলহাওয়ার গুণে যে যায় সেই তো দশভুজা হয়ে দাঁড়ায় — এমনটাই তো দেখে এসেছে। জিজা অবশ্য বলে তার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। মেয়ে ছোট বলে আপাতত কাজটা ছাড়তে হয়েছে সেই জন্য একটু ক্ষুব্ধও মনে হয়েছিল।

জানালার কাচগুলো বোতলভরা সাবানজল স্প্রে করে পরিষ্কার করতে করতে মহুয়া স্নেহের হাসি হাসল। জিজা আর বড় হবে না। তার যখন বিয়ে হয় রজত তখন কলকাতাতেই চাকরি করত। জিজা সেই সময়ে দশ-এগারো বছরের। দেরি করে হবার জন্য জা ভাসুরের আদরে বায়নাবাজ এক মেয়ে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে জিজা প্রথম থেকেই মহুয়ার বেশ ন্যাওটা হয়ে উঠল। হয়তো বয়ঃসন্ধির সেই কোমল স্পর্শকাতর মুহূর্তে নববধূর সাজসজ্জা, আত্মীয়স্বজনের অতিরিক্ত মনোযোগ তাকে মহুয়ার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সময়ে অসময়ে মহুয়ার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করত। কোথাও বেড়াতে

যাবার সময়ে মহুয়াই সাজিয়ে দিত। সাজিয়ে দেওয়া, স্কুলে যাবার সময়ে টিফিন ভরে দেওয়া কিছুই পছন্দ হত না মহুয়া না করে দিলে। মহুয়ার কাছেই তিস্তা পড়তে বসত।

এ পর্যন্ত ভালই লাগত। মহুয়া স্বভাবতই স্নেহপ্রবণ। মানুষজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে সে ভালই বাসে। জা-ও মেয়েকে মহুয়ার হাতে সমর্পণ করে হাঁপ ছেড়েছিলেন। শুধু মহুয়া বিরক্ত হত যখন তার ও রজতের নিভৃত সময়ের ওপর তিস্তা হামলা করত তখন। সে ও রজত ছুটির দিন কোথাও একা বেড়াতে গেলে তিস্তার মুখভার হয়ে যেত। তাই বাধ্য হয়ে তারা তিস্তাকেও কখনও কখনও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। পরের মেয়েকে আদর করা যায় শাসন নয়।

তারপর রজত ধাপে ধাপে উন্নতি করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই কোম্পানিটার পদস্থ কর্মচারী হয়ে দিল্লি চলে এসেছে সে-ও পনেরো বছর হয়ে গেল। ছেলে কিটুর তখন তিন বছর বয়স। সেই কিটু এখন গোয়ালিয়রে বোর্ডিং স্কুলে থেকে স্কুলের শেষ পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। তিস্তা স্কুল পাস করে দিল্লিতে কাকা-কাকিমার কাছে থেকে গ্র্যাজুয়েট হল যে বছর তার দু'বছর বাদে দিব্যর সঙ্গে বিয়ে হয়ে চলে গেল আমেরিকা। গ্র্যাজুয়েশনের পরে জাপানি ভাষা ও কম্পিউটার শিখবার দৌলতে বিদেশে চাকরি জোটাতে তিস্তার কোনই অসুবিধে হয়নি।

জানালার ঝকঝকে কাচগুলোর দিকে তাকিয়ে মহুয়ার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। মহুয়া জানে তার কাজের হাতটি ভাল। যে কাজটাই করুক না কেন নিখুঁতভাবে করতে পারে। মুখে না বললেও কাছেপিঠের জনেদের হাবেভাবে মহুয়ার প্রতি আস্থা প্রকাশ পায়।

এবার ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা। সেটার ঘসামাজা শেষ হলে একটু দূর থেকে দেখে নিয়ে চকচকে ভাবটা নিজেই তারিফ করল মনে মনে। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। মুখের চামড়ায় যেন তেল পিছলে যাচ্ছে। গালে চিরস্থায়ী রক্তাভা। তীক্ষ্ণ নাকে হীরের বিন্দু নাকছাবিটা হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে উঠছে। দীর্ঘ সুঠাম দেহে জয়পুরি কুর্তার সূক্ষ্ম কারুকাজ। এতক্ষণে কায়িক পরিশ্রমের জন্য কপালে স্বেদবিন্দু।

চুয়াল্লিশ বছর বয়স হল তার। কবে পেরিয়ে গেল এতগুলো বছর? এই টান টান যুবতী শরীরের ভেতর কিশোরী হৃদয়টি তেমনই অক্ষত অটুট আছে বলে মনে হয়। নির্জন ঘরে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল মহুয়া; তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে সরে গেল। জীবনে কতবার কতভাবে যে লোকে তার রূপের প্রশংসা করেছে। দিব্যই তো বিয়ের পরদিন একঘর লোকের সামনে বলেছিল — ছবিতে আপনাকে যেমন দেখায় আপনি তার থেকে আরও অনেক বেশি সুন্দর।

মহুয়া মনে মনে খুশি হলেও নতুন জামাইয়ের এহেন মন্তব্যে একটু বিব্রতও বোধ করেছিল। তার পরে দিব্যর বাচনভঙ্গির সঙ্গে ধীরে ধীরে তাদের সবারই পরিচয় হয়েছিল। বিদেশে আবাল্য কাটানোর ফলে দিব্যর চিন্তাধারা এবং তার প্রকাশ মাঝেমাঝেই অন্য গ্রহের বাসিন্দার মতো মনে হয়। তবে তা এত সরল এবং অকপট যে তা শুধু দিব্যকেই মানায়। সেইজন্য আমেরিকা ফিরে যাবার আগে সবার সামনেই দিব্য যখন মহুয়াকে বলেছিল, আমি অত আপনি আজ্ঞে করতে পারব না। তুমি আমার থেকে মাত্র তেরো বছরের বড়। আমি তোমাকে কাকিমা বলেও ডাকছি না — তখন কিছু বেমানান বলে বোধ হয়নি।

মহুয়াও হাসতে হাসতে বলেছিল — তা হলে আমেরিকান কায়দায় নাম করেই ডেকো। তোমাদের ওখানে তো বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দাদুর বয়সিদেরও নাম ধরে ডাকে।

—নাম ধরেই ডাকব। কিন্তু তোমাকে সবাই মউয়া বলে ডাকে। আমি তার থেকে মউ বলব।

মহুয়া ভেবেছিল দিব্য এমনি ঠাট্টা করছে। সত্যি সত্যি কি তেরো বছরের বড় খুড়িশাশুড়িকে কেউ নাম ধরে ডাকতে পারে? কিন্তু মহুয়াকে অবাক করে দিব্য মউ বলেই ডেকেছে। আপনি আজ্ঞে তার আসে না বলে নিজের শ্বশুর শাশুড়িকেই বলে না। অন্যাদের তো প্রশ্নই ওঠে না।

রজতের সঙ্গেও দিব্যর বেশ ভাল বোঝাপড়া আছে। দিব্যর মা-বাবা বিদেশবাসী তবে দেশে যাতায়াতের পথে দিল্লি ছুঁয়ে যেতে হয় বলে রজত ও মহুয়ার সঙ্গেই দিব্যদের বেশি অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে।

বিয়ের পর দিব্যর মা-বাবা কলকাতার পাঁচতারা হোটেলে জমকালো পার্টি দিয়ে আমেরিকা ফিরে যান। দিব্য ও জিজা রাজস্থান ঘুরে কয়েকদিন পর গিয়েছিল। জিজারা রাজস্থান যাবার সময়ে এবং ফেরার পরেও মহুয়া রজতের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে গিয়েছে।

প্রায় প্রতিটি সন্ধেতেই জিজা তার পুরনো বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও দিব্য, রজত ও মহুয়ার সঙ্গে বসে জমিয়ে আড্ডা দিয়েছে। সমবয়সী বন্ধুর আলাপচারিতার স্বাদ ছিল সেইসব আড্ডায়। রজত মনের মতো সঙ্গী পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিল। মহুয়াকে বলেছিল — জিজার লাক ভাল। দিব্য ছেলেটি অত্যন্ত ম্যাচিওর — নানা বিষয়ে কদিন ধরে কথা বলে দেখলাম।

— সে তো আমিও লক্ষ করেছি। এখন জিজা মানিয়ে-গুছিয়ে থাকতে পারলে হয়। তোমাদের আদরে ও কিন্তু বেশ জেদি হয়ে উঠেছে। অন্য কারওটা তেমন বুঝতে চায় না।

রজত সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলে — আশা করি জিজাটা ওর সঙ্গে থেকে একটু মানুষ হবে।

নিয়ম করে দিব্য ও জিজা প্রত্যেক সপ্তাহে টেলিফোন করে। দিব্য মাঝে মাঝে নিয়ম ভেঙে অসময়ে আচমকাও ফোন করে। দেশের অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি খবরেও তার বিশেষ আগ্রহ। মহুয়া 'বিল উঠছে' বলে ধমকালেও দিব্য কথা শোনে না।

দিবার মুখে মউ ডাকটা মহুয়ার যখন বেশ অভ্যেস হয়ে এসেছে তখন রজত একদিন দিব্যর সঙ্গে কথা বলার পর ফোন নামিয়ে মহুয়াকে বলেছিল — কপাল বটে তোমার। এই বয়সেও হাঁটুর বয়সি জামাইয়ের কাছ থেকে কমপ্লিমেন্ট পাচ্ছ।

মহুয়া ছেলের কাছে পাঠাবে বলে খুব মন দিয়ে একটা চকলেট কেক তৈরি করছিল। বলল — তা ঠিক, কমপ্লিমেন্ট আমি একটু বেশিই পাই। আজ আবার দিব্য কী বলল?

— না সেরকম কিছু না — তুমি ফোন ধরলে না বলে ওকে একটু নিরাশ বলে মনে হল।

আহা, সে তো হতেই পারে। তুমি তো আর আমার মতো মুখরোচক খবরগুলো শোনাতে পার না।

রজত আর কিছু বলেনি। পরে আবার কী কথা প্রসঙ্গে বলেছিল; বিদেশে জন্মকর্ম হলে তাদের চালচলন সবসময়ে ঠিক আমাদের সঙ্গে খাপ খায় না। কিছু কিছু ব্যাপার খুবই বিসদৃশ লাগে।

মহুয়া আর কথা বাড়ায়নি। তবে ঠিক করেছে এবার দিব্য এলে ও জোর করেই কাকিমা ডাকাবে। রজতকে যদি কাকু বলে ডাকতে পারে তবে তাকেই বা কাকিমা বলবে না কেন? সত্যিই তো দিব্যর মুখে মউ ডাকটা খুবই বেমানান।

এয়ারপোর্টে জিজাকে দেখে অবাক হয়ে গেল মহুয়া। চার বছরে কী পরিবর্তন। আমেরিকায় সুখাদ্যের ছড়াছড়ি শুনেছিল — জিজা যে তার সব কটিরই আস্বাদ গ্রহণ করেছে তাতে ভুল নেই। জিজা মহুয়াকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলে — কাকি, তুমি একই রকম আছ। একটুও বদলাওনি। আরও সুন্দর হয়েছ।

— তুই কি করে এত মোটা হলি?

— আর বোল না — তিতলি হবার পর বাড়িতে বসে খেয়ে এত মুটিয়ে গেলাম।

রজত আর দিব্য মিলে গাড়িতে মালপত্র তোলে। দিব্যকে দাড়ি রেখে অন্যরকম দেখাচ্ছে। চেহারাটা আরও পরিণত হয়েছে — মানুষটাও বুঝিবা। যদিও ঠোঁটে মৃদু হাসি লেগে আছে — চোখ দুটো গম্ভীর ও অন্যমনস্ক।

দেড় বছরের তিতলি মায়ের থেকে বাবারই বেশি ন্যাওটা বলে মনে হল। জিজার তুলনায় দিবাই মেয়ের দেখাশোনা বেশি করছে। রজত জিজাকে ঠাট্টা করে বলে — কী রে জিজিবুড়ি কায়দা করে মেয়েকে বেশ দিব্যর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিস তো?

— আর মেয়ের জন্য চাকরিটা যে ছাড়লাম।

দিব্য বলে — সেই দুঃখটাই ও আর ভুলতে পারছে না। দিনের মধ্যে দশবার ও আমাকে মনে করায়।

— দুঃখ থাকলেও মেয়ের দেখাশোনাটা তো আমাকেই করতে হয়, তাই না?

দিব্য আস্তে করে বলে —কী রকম যে দেখ তা আর এদের বললাম না।

জিজা অগ্রাহ্য করার ভঙ্গিতে বলে — ভালই তো—। দেখিই না যখন ফিরে গিয়েই কাজে জয়েন করব।

পরদিন বন্ধুদের সঙ্গে জিজা বেরোল দিল্লির নতুন-হওয়া দোকানবাজার দেখতে। মহুয়া নিজেদের রান্নার জোগাড় করে তিতলির সুপ ফলের রস করছে ছুটোছুটি কবে। দিব্য এল সাহায্য করতে। মহুয়া এক ধমক দিয়ে বলে — চুপ করে বস তো খাবার টেবিলে। গল্প কর আমার সঙ্গে। সারা বছরই তো ওখানে খাটাখাটনি করছ — এই কটা দিন আরাম কর।

দিব্য খাবার টেবিলের কাছে একটা চেয়ার টেনে তার ওপর পা তুলে আরাম করে বসল। মহুয়া হাতের কাজটা গুছিয়ে নিয়ে দিব্যকে কফি করে দিল। রান্নাঘর ও খাবার টেবিলে ছোটাছুটির ফাঁকে মহুয়া লক্ষ করে দিব্য নীরবে তাকে লক্ষ করছে। মহুয়া অস্বস্তি কাটাতে জিজ্ঞেস করে — দিব্য, বাংলা কবিতা শুনবে?

দিব্য পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসে বলে — শোনাও।

মহুয়া কবিতার ক্যাসেটটা চালিয়ে আবার রান্নাঘরে ঢোকে। জিজার ফরমাশ মতো কিমামটর করছে। হাত দিয়ে টিপে গন্ধ শুঁকে বুঝবার চেষ্টা করল কতটা বাকি। তারপরে কড়াতে ঢাকা চাপা দিয়ে রান্নাঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। দিব্য তাকিয়ে আছে। কিছু শুনছে বলে মনে হয় না।

মহুয়া জিজ্ঞেস করে, তোমার ভাল লাগছে না — না? ঠিক বুঝতে পারছ না বোধহয় কথাগুলো।

দিব্য বলে — আমেরিকায় বড় হলেও এখানকার প্রবাসী বাঙালিদের থেকে আমি অন্তত বেশি বাংলা জানি। মা আমাকে খুব যত্ন করেই বাংলা শিখিয়েছেন। আর তোমার সঙ্গে ফোনে গান নিয়ে কবিতা নিয়ে এত যে কথা হল চার বছরে — সে তো ভাল লাগে বলেই।

— তবে এখন শুনছ না কেন?

দিব্য অকপট দুটো চোখ তুলে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে — আমি তোমাকে দেখছিলাম।

মহুয়ার হৃদস্পন্দন এক মুহূর্তের জন্য যেন থেমে গেল। শরীরের রক্তস্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'গালের মধ্যে। দিব্যর দু'চোখে অচেনা একটা আলো। সে বলে চলেছে — তোমার এই কাজ নিয়ে ব্যস্ত চেহারাটা আমার ভারি ভাল লাগে। ওখানেও যখন মাঝে-মাঝে মায়ের কাছে যাই রান্নাঘরেই গল্প করে আড্ডা দিয়ে সময় কেটে যায়।

মহুয়া ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে — সে তো সব মেয়েরাই তাদের নিজের নিজের সংসারে কাজ করে। এর মধ্যে স্পেশালিটি কোথায়?

— আছে আছে। কাজ করার একটা স্টাইল আছে। তুমি যখন কাজ কর তোমার মুখে একটা আনন্দ ফুটে ওঠে। খুব সাধারণ কাজও মন দিয়ে নিখুঁত করে কর। আমি বিয়ের সময়েই লক্ষ করেছিলাম।

— বাবা — সংসারের এলেবেলে সব কাজ — তুমি আবার তার বিশ্লেষণ করেছ।

— তুমি জান না মউ — এগুলো মোটেই এলেবেলে নয়। এর মধ্যে দিয়ে একটা মানুষের ধৈর্য স্বভাব সব বোঝা যায়। জিজাকে যদি দেখ কীভাবে ও কাজ করে তা হলে বুঝতে পারবে তোমার সঙ্গে কোথায় তফাত।

মহুয়ার অস্পষ্টভাবে মনে হল জিজার সঙ্গে তার তুলনাটা বোধহয় ঠিক হল না, কিন্তু মনের মধ্যে সম্পূর্ণ অচেনা একটা তার রিন রিন করে উঠল। বিয়ের সময়ে দিব্য কতটুকু তাকে দেখেছে। সেই ব্যস্ততার মধ্যেও এমন করে মহুয়াকে লক্ষ করেছে। আগে তো তাকে কেউ এভাবে বলেনি। চারপাশের জন তাকে দায়িত্ব দেয় — সে সেটা পালন করে। তার মধ্যে যে এত বিশেষত্ব ছিল তা কখনও বুঝতে পারেনি। সে নিজেও তো নিজেকে নিয়ে কখনও এমন করে ভাবেনি।

মহুয়া নিজের ভাবনাতেই মগ্ন হয়েছিল। তবু অনুভব করছিল দিব্যর দু'চোখ তাকেই নিরীক্ষণ করছে — সেই চোখে মুগ্ধতা।

মহুয়া কাজের অছিলায় উঠে পড়ল। আবৃত্তিকারের কণ্ঠে নাবামনের অবদমিত বাসনা মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় মহুয়ার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সন্ধেবেলা বারান্দায় সবাই মিলে বসে খোশগল্প করছিল। তিতলি আপনমনে বারান্দার রেলিং ধরে রাস্তা দেখছে। কখনও নিজের ছড়ানো খেলনায় মনোযোগ দিচ্ছে। মার্চের শেষে দিল্লি বড়ই মনোরম। তীব্র শীতের দাপট নেই — ভয়ঙ্কর গরমটা পড়তেও মাসখানেক দেরি আছে। এই সময়ে জিজার বন্ধু শালিনী এসে হাজির। শালিনীর পরনে টাইট জিনস এবং ওপরে শরীর আঁকড়ানো শাড়ির ব্লাউজের মতো ছোট টপ। হাত নেড়ে কথা বলার সময়ে কোমর ও পেটের খানিকটা অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ছে।

শালিনী আসাতে আড্ডার বিষয় বদলে গেল। সে বিজ্ঞাপন জগতে মোটামুটি নামকরা মডেল। তাই সেই জগৎ, বর্তমান ফ্যাশন, কোথায় কী ভাল পাওয়া যায় তার নখদর্পণে। শরীর চর্চা বিষয়ে জিজাকে জ্ঞানদান করে সে যখন বিদায় নিল জিজা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল — কাকি শালিনীর চেহারাটা দেখেছ? কী সুন্দর রেখেছে। কে বলবে আমরা এক বয়সি?

মহুয়া কিছু বলবার আগেই দিব্য বলে — স্লিম থাকার ব্যাপারটা বাদ দিলে বলতে পারি আমার এ ধরনের চেহারা ভাল লাগে না।

রজতও বলল — বড্ড হাড় বার করা কাকলাসের মতো। তা ছাড়া অত আর্টিফিশিয়াল ভাবভঙ্গি আমারও ভাল লাগে না।

দিব্য রজতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল — ঠিক বলেছ স্বতঃস্ফূর্ত ভাব না থাকলে ভাল লাগে? আসল কথা হচ্ছে লাইফ। কেউ কেউ আছে ঘরে ঢোকামাত্রই সব কিছু ব্রাইট হয়ে যায়। এটা শুধু সাজগোজ দিয়ে হয় না।

জিজা বলে এবার শুরু করে দাও তোমার সেই প্রিয় টপিক — দায়িত্ব কর্তব্য দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গেলে মানুষের সৌন্দর্যে যে মাত্রা যোগ হয় তার সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না — এটসেটেরা, এটসেটেরা।

দিব্য হতাশ গলায় বলে — আর কবে আমার কথা বুঝবে জিজা?

— কী করে বুঝব? তোমার মতো গভীরতা কোথায় আমার?

রজত বলে — আচ্ছা, আচ্ছা ঝগড়াঝাটি থাক। এবার খেতে চল।

খাবার টেবিলে প্রতিটা জিনিস দিব্য মন দিয়ে খুঁটে খুঁটে খায়। কম খেলেও এত উপভোগ করে খায় যে মহুয়ার মনে হল তার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। দিব্য এক একটি রান্না মুখে দেয় আর তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জুড়ে হাতের একটি বিশেষ মুদ্রা করে চোখ নাচিয়ে বলে — দারুণ হয়েছে।

মহুয়া রাগের ভান করে বলে — বাড়াবাড়ি কোরো না তো। রজত রোজই আমার রান্না খাচ্ছে — কিছু তো বলেনি কখনও।

— ওই রোজ খায় বলেই এর ইউনিকনেসটা ধরতে পারছে না — ইউ আর টেকেন ফর গ্রান্টেড।

জিজা হঠাৎ টেবিল থেকে তিতলিকে নিয়ে — আমি উঠছি। ঘুম পাচ্ছে। বলে উঠে পড়ে।

কেমন যেন সুর কেটে যায়। মহুয়া আস্তে করে বলে — ওমা রসমালাই খেল না — ভালবাসে বলে করেছিলাম।

—তুমি আর খাইয়ো না ওকে। মিষ্টি ওর না খাওয়াই উচিত। জিজার জন্য রাখা বাটিটা টেনে নিয়ে দিব্য বলে — ওর শেয়ারটা আমিই খেয়ে নিলাম।

মহুয়া জিজার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে ভাবল এবার ঠিক করে রেখেছিল — দিব্যকে মউ বলে ডাকতে বারণ করবে। এর মধ্যে কতবার ডেকে ফেলল। একবার শুরু হয়ে গেলে মাঝখানে কি থামিয়ে দেওয়া যায়? বারণ করবার উপযুক্ত সময় খুঁজতে খুঁজতে সময় গড়িয়ে যায়।

জিজা নিয়ম করে তিতলিকে নিয়ে রজত যখন অফিস যায় তখনই বেরিয়ে পড়ে। বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, পুরনো সব জায়গায় একবার করে ঢুঁ মারা, এসব সেরে বিকেল নাগাদ বাড়ি ফেরে।

দিব্য কখনও ওদের সঙ্গে বেরোয় কখনও আর একটু দেরি করে। ফিরে আসে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিয়ে। কোনওদিন মহুয়ার সঙ্গে দুপুরের খাওয়ায় যোগ দেয়। কোনওদিন বা সেই পর্ব সেরে গড়ানো বেলায় বাড়ি ফেরে। তবে কখনওই সন্ধে গড়িয়ে নয়।

জিজা চলে যাবার আগের দিন দিব্য ফিরল তিনটে নাগাদ। খেয়ে এসেছে কোথা থেকে। মহুয়া দু কাপ কফি বানিয়ে জিজাদের ঘরে ঢুকে দেখল দিব্য তার ল্যাপটপে কাগজপত্র মেলে কী সব টাইপ করছে। মহুয়াকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে — ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিলাম মনে মনে কিন্তু কাজটা ছড়িয়ে রেখে উঠতে পারছিলাম না।

— আমাকে বলনি কেন?

— ফরমাস তো খুব একটা করি না কারুকে। এরপর দিব্য কফিতে চুমুক দিয়ে বলে — গ্রেট — কী করে বুঝলে বল তো এটাই চাইছিলাম?

মহুয়া বলে— বাড়াবাড়ি কোরো না তো? ছোট ছোট জিনিসগুলো নিয়ে এমন কর না তুমি!

— আমার ছোট ব্যাপারই ভাল লাগে। মানুষের আচারব্যবহারই তো আমার গবেষণার বিষয়, তাই তার ছোটখাটো জেশ্চারগুলোই আমার কাছে বেশি ইমপরট্যান্ট।

কী অপূর্ব ভাল লাগায় মন ভরে ওঠে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চলমান জীবন দেখতে দেখতে মহুয়ার মনে হল এমন করেই কি রঙ লাগে বনে বনে? ঢেউ জাগে সমীরণে?

পরদিন সকালেই জিজার উড়ান বলে রাত্রিবেলা সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রাখছিল জিজা। মহুয়া দাঁড়িয়ে। দু-চারটে পরামর্শ দিয়ে দিব্যর পাশে ঘুমন্ত তিতলিকে আদর করে ঘরে ফিরবে বলে যেই মুখটা নামিয়েছে অমনি লোডশেডিং হয়ে গেল। চারিদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। মহুয়া মুখ তুলতেই দিব্যর বুকে ধাক্কা খেল। অচেনা বিদেশি সৌরভে ভারী উষ্ণ নিশ্বাস মহুয়ার মুখের ওপর — হতচকিত সম্মোহিত গোপন কয়েকটি মুহূর্ত।

এমার্জেন্সি আলোর রেখা এসে পড়ল অন্ধকার দরজার সামনে, তার সঙ্গে রজতের গলাও পাওয়া গেল — কেউ নড় না আমি আলো নিয়ে আসছি। একমুহূর্তে সম্মোহন ভেঙে গেল। মহুয়া উঠে দাঁড়াল আলোর সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে গেল মায়াবী জগৎ। দিল্লির জল বিদ্যুতের দুরবস্থা নিয়ে কলকল শুরু হয়ে গেল। শুধু মহুয়া আলো এসে যাবার পরও সে-রাতে বিনিদ্র রইল অনেকক্ষণ।

রজতের জরুরি মিটিং থাকায় জিজাকে কলকাতার প্লেনে তুলে দিতে মহুয়া একাই এসেছিল দিব্যর সঙ্গে। জিজা সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকবার আগে দিব্য বলল — শুধু মার্কেটিং আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডায় মেতে যেও না। তিতলির দিকেও একটু নজর দিও।

জিজা ঝাঁঝিয়ে ওঠে — সারাক্ষণ বড়দার মতো জ্ঞান দিও না তো। জান কাকি, ওকে দেখতেই ইয়াং আসলে ও তোমাদের জেনারেশনের লোক।

জিজা চলে যাবার পর এয়ারপোর্টের কফি কর্নারে দাঁড়িয়ে দিব্য ও মহুয়া কফি খেতে লাগল ছুটির আমেজে। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই, কাজও বিশেষ কিছু নেই। চারিদিকের ব্যস্ততার মাঝে দুজন তাদের চারিদিকে বলয় রচনা করে মগ্ন হয়ে রইল।

একসময়ে মহুয়া বলল — জিজা এমন করে বলল তোমাদের জেনারেশন, যেন আমরা কোনও প্রাচীন যুগের মানুষ — ফসিল হয়ে গিয়েছি।

— জিজার মতো মেয়েরা কী করে বুঝবে প্রাচীন যুগের বিউটি?

বিউটি — শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে দিব্যর চোখে মুখে আবার সেই মুগ্ধতা ফুটে ওঠে যেটা মহুয়া এবার প্রতি মুহূর্তে লক্ষ করছে।

মহুয়া কথা ঘুরিয়ে বলে — তোমার খাওয়া দাওয়া রুচি কথাবার্তা দেখে কেউ বলবে না তুমি সাহেবদের দেশে বড় হয়েছ।

— তোমাকে তো কতবার বলেছি মা-বাবা ওদেশে সেট্‌ল্ করেছেন বলে দেশের কালচার খুব বেশি করে আঁকড়ে ধরেছিলেন আর আমিও ছোটবেলা থেকেই প্রত্যেক বছর আসতাম। মামার বাড়ি, কাকা পিসিদের বাড়ি আদরে-আহ্লাদে কাটিয়ে যেতাম। আমার কখনও দেশে এসে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হয়নি।

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে রাস্তা পার হবার সময়ে দিব্য অসংকোচে মহুয়ার হাত ধরে রগড় করে গেয়ে ওঠে — এই পথ যদি না শেষ হয়। মহুয়ার সমস্ত শরীর সিরসির করে ওঠে। ছোটবেলায় দেখা সেই চিরন্তন প্রেমের দৃশ্য মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে আনে মহুয়া। বড় অস্থির লাগে। কী করলে যে আত্মস্থ হবে বুঝতে পারে না। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল — মেমসাব কি মার্কেট হয়ে যাবেন? কাজের কথা মনে পড়ায় মহুয়া যেন বেঁচে গেল। একটা কোনও কাজই সে খুঁজছিল প্রাণপণে। দিব্যর সঙ্গে এক্ষুনি বাড়িতে একলা হবার থেকে বাজারের জনারণ্যই ভাল।

বাজারে দিব্য এটা খাব ওটা খাব বলে আবদারও জানাল। মহুয়া বলল — তোমার কলকাতা না যাবার দুঃখ আমি ঘুচিয়ে দেব। এখন দিল্লির এই বাজারে কলকাতার সব কিছু পাওয়া যায়।

— আমি কলকাতা যেতে চাই কে বলল তোমাকে? আমার কাজের জন্য যতটুকু দরকার বাইরে যাব — নয়তো তোমার পেছনে ঘুরঘুর করে কাটিয়ে দেব বাকিটা সময়।

যেন খুব একটা ঠাট্টার কথা শুনল —এইভাবে মহুয়া হেসে উঠলেও মনের সাতপুরু আস্তরণের নীচের মনটা বলল — এর মধ্যে সত্যিও কি নেই কোথাও? জিজাও তো বলেছিল যাবার আগে — দিব্য তোমার যেরকম ফ্যান দেখ কাজের ছুতোয় আর হয়তো গেলই না কলকাতা।

দিব্যর মতো ছেলে তাকে যে সবার থেকে আলাদা করে একটু বেশি পছন্দ করে এতে চাপা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে মহুয়া। গত চার বছরে সে আর দিব্য আত্মীয়তার বেড়া ডিঙিয়ে সহমর্মী বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। স্বামী ছেলে ও সংসারের বাইরে মহুয়ার এতদিন কোনও বন্ধু ছিল না। নিজস্ব কোনও কর্মক্ষেত্রও নেই যেখানে সংসারের বাইরে কিছুটা সময় কাটানো যায়। রজত এতই ব্যস্ত থাকে তার কর্মজগৎ নিয়ে যে বিশেষ কোনও ঘটনা না ঘটলে তার সঙ্গে কথাই হয় না। উনিশ বছরের দাম্পত্য জীবন যথানিয়মে যতটা যান্ত্রিক হবার তাই হয়েছে। তা নিয়ে অবশ্য মহুয়ার কোনও ক্ষোভ ছিল না। এটাকেই স্বাভাবিক জেনে মহুয়া দিব্যি ছিল তার সংসার, গান শোনা, বই পড়া নিয়ে। মাঝে মাঝে রজতের স্ত্রী হিসেবে সামাজিকতার দায় মেটানো ছাড়া রজতের তরফেও বিশেষ কোনও চাহিদা নেই আর।

এখন দিব্যর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মহুয়া বুঝতে পারে তার যে ভেতরে এত কথা জমে ছিল সে জানত না। সে যে এমন করে ভাবতে পারত তা-ও বোঝেনি আগে।

বাড়ি ফিরে মহুযার সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে বাজার গুছিয়ে রাখল দিব্য। মহুয়া ছদ্ম ভয়ে তার পদ্মপলাশের মতো চোখ বড় বড় করে বলে — দিদি যদি দেখে তার আদরের জামাইটিকে আমি এমনভাবে খাটাচ্ছি — তবে কি হবে?

— তোমাদের এখানে জামাইরা শ্বশুরবাড়িতে এসে পট হয়ে বসে থাকে। আমাদের ওখানে যেখানেই যাই কাজ করতে হয়। ওটাই অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

দিব্য নিখুঁত করে সবজির ট্রে মুছে কাঁচা আনাজপাতি গুছিয়ে রাখতে লাগল। মহুয়াকে জোর করে বসিয়ে রাখল — বলল — মহারানির মতো বসে থাক আর দেখ সব কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা।

মহুয়ার বসে থাকতে থাকতে অদ্ভুত লাগছিল। এটা কি তারই সংসার? এই ঘর বারান্দা জানালা, দেয়াল দিয়ে বেঁধে রাখা এই চৌহদ্দির মধ্যে কেটে গিয়েছে উনিশ বছর। দিন শুরু হয়েছে দিনের মনে, রাত এসেছে যথানিয়মে, তারপরে আরও একটা দিন, আরও একটা রাত এভাবেই — এভাবেই? মহুয়া যান্ত্রিকভাবে প্রাত্যহিক কর্ম করে গিয়েছে কিন্তু আজ যখন দিব্য তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডিম মাছ তরকারি গুছিয়ে রাখছিল তখন এই তুচ্ছ কাজগুলোই কী অসাধারণ হয়ে উঠল। এইসব কাজগুলো চিরকাল সে একাই করে এসেছে আর কেউ যে এই অকিঞ্চিৎকর কাজে তার সঙ্গে সহযোগিতা করবে এমন দুরাশা সে কখনও পোষণ করেনি। কোনও অভিমানও ছিল না। তবে কি ক্লান্তি এসেছিল? নয়তো দিব্য আসার আগে বোঝেনি কেন এত আনন্দ লুকিয়েছিল এই দৈনন্দিন কাজগুলোর মধ্যে?

মহুয়া ঘরে এসে বাইরের পোশাক বদলাতে গিয়ে দেয়ালজোড়া আয়নায় নিজেকে দেখল। অল্প মেদ জমেছে কোমরে তলপেটে। শাড়ির উপর দিয়ে অবশ্য বোঝাই যায় না। ক্ষীণ কটি সুগঠিত শরীরের অধিকারিণী বলেই মনে হয়। আয়নার ওপরে লাগানো আলোর রং চোখে মুখে এসে পড়েছে। মহুয়ার নিজেকে কেমন অচেনা মনে হচ্ছে। বুকের ওপর হাত রেখে সে অনুভব করার চেষ্টা করল বয়ঃসন্ধির কিশোরী হৃদয়। আর কেন জানি না সেই

কবে ফেলে আসা সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণী শরীরটার জন্যও বুকের মধ্যে থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে এল।

রজত অফিসে বেরোন পর্যন্ত মহুয়ার নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। তার কাজের সহকারিণীরা আসে, শখের গাছগুলোর মালি আসে। দিব্য ও রজত একসঙ্গেই বেরিয়ে যায়। দিব্য ফিরে আসে বিকেল নাগাদ। তার পরে ঘরে বসে ল্যাপটপে দিনের কাজকর্ম গুছিয়ে রাখে। প্রতিদিনই এই সময়ে মহুয়া কফি নিয়ে এসে বসে দিব্যর পাশটিতে। তার কাজের বিষয়ে খোঁজখবর করে। উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে দিব্যও তার জ্ঞান উজাড় করে দেয়।

ভুলে যাওয়া লোকাচার দিব্যর গবেষণার বিষয়। এই কাজের জন্য সে কয়েকটি মানবগোষ্ঠী নির্বাচন করেছে এবং সেই বাবদে ভ্রমণ করেছে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ। বিস্তর পড়াশুনা করেছে। গভীরভাবে মিশেছে নানা মানুষের সঙ্গে। মহুয়া মুগ্ধ হয়ে সেসব কথা শোনে। তার ক্ষুদ্র সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে অজানা পৃথিবীর বর্ণ গন্ধ ভেসে আসে।

এইরকমই এক ঝিমঝিমে বিকেলে মহুয়া তার সহকারিণীর সাহায্যে টবের চারপাশে ছড়ানো মাটি আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করছিল। দিব্য বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ থেকেই তাদের কাজকর্ম লক্ষ করছিল। হঠাৎ দিব্য ডাকল — মউ একটু বসবে এখানে?

মহুয়া মাটি মাখা হাতেই দিব্যর পাশে রাখা বেতের চেয়ারে এসে বসল। দিব্য বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে মহুয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। দিব্যর দৃষ্টিতে কী ছিল মহুয়া জানে না, তার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল। দুজনেই চুপ করে বসে রইল কতক্ষণ। তারপর দিব্য গভীর ভালবাসার সঙ্গে উচ্চারণ করল — তুমি কি জান একেবারে প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকে আমি তোমায় ভালবাসি?

অর্ধোস্ফুট স্বরে মহুয়া বলে — কেন দিব্য?

— জানি না। এ এক আশ্চর্য কেমিস্ট্রি। হয়তো আমার মনের মধ্যে পরিপূর্ণ নারীর যে রূপ, তুমি তার সঙ্গে একেবারে মিলে গিয়েছ তাই — আমি জানি না। জানতেও চাই না।

মহুয়ার গলা বুজে আসে — বলো না এসব কথা। আর কখনও না —।

দিব্য অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে — কেন?

— এ পাপ, অন্যায় — আমার শুনতে নেই।

— কে ঠিক করেছে ন্যায়অন্যায়? — মানুষই তো। হাজার বছর আগে ন্যায়অন্যায়ের ধারণা ছিল অন্যরকম। আবার হাজার বছর পরে মানুষের ধ্যানধারণাও বদলে যাবে। আজকের অন্যায়ও কাল তুচ্ছ হয়ে যাবে।

— সে কালকের কথা। আজ এই মুহূর্তে যা অন্যায় তা অন্যায়। — মহুয়া প্রাণপণে প্রতিরোধ তৈরি করে — তুমি আমি দুজনেই বিবাহিত — আবেগে উত্তেজনায় মহুয়ার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

দিব্য আশ্চর্য হয়ে বলে — তাতে কী। বিবাহিত বলে কি কাউকে ভালবাসা যায় না? আমার ফিলিংটা আমি তোমাকে বললাম। না বলে পারছিলাম না তাই। তুমিও ভালবাস আমাকে — অস্বীকার করতে পার?

মহুয়ার বুকে যেন কীসের ধাক্কা লাগল। সে প্রায় দৌড়েই নিজের শোবার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ছি ছি কী লজ্জা। তার মুখেই ফুটে উঠেছে নাকি মনের কথা?

খুলে যাওয়া ঝরনার উৎসমুখে মহুয়া প্রাণপণে পাথর চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাচ্ছিল আচমকা। এইরকম অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা তার পায়ের তলার মাটি টলিয়ে দিয়েছে। জোর করে রজতের কথা ভাবার চেষ্টা করল মহুয়া। কোনও

অন্যায় সে করেনি। স্বামী হিসেবে কোনও ঘাটতিই নেই তার। স্বামী মদ্যপ নয়, অত্যাচারী নয়। কর্তব্যকর্মে কোনও গাফিলতি নেই। প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস অনুপস্থিত বলেই ভালবাসা মরে গিয়েছে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। শুধু পুরুষের স্তুতি পাবার গোপন আকাঙ্ক্ষা থেকে এই দুর্বলতার জন্ম। মহুয়া উঠে চোখেমুখে জল দিয়ে ধুলো ঝেড়ে ফেলার মতো সমস্ত দুর্বলতা দূর করে মনকে স্ববশে আনবার চেষ্টা করল। রজতকে ফোন করে অকিঞ্চিৎকর দুটো-চারটে কথা বলল। মহুয়া আন্তরিকভাবে চাইছিল রজত তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলুক।

রজতের কণ্ঠস্বর অদৃশ্য শিরা-উপশিরায় মৃত্তিকাবাহিত হয়ে মহুয়ার কাছে এসে পৌঁছয়। মহুয়া প্রাণপণে কণ্ঠস্বরটিকেই আলিঙ্গন করতে চায়। খড়কুটো আঁকড়ে ধরার ব্যাকুলতা নিয়ে জিজ্ঞেস করে — তুমি কখন আসবে?

— দেখি — রজত কাজ করতে করতেই মহুয়ার সঙ্গে হুঁ হাঁ করে দায়সারাভাবে কথা শেষ করল। তীব্র অভিমানে মহুয়ার দীর্ঘ আঁখিপল্লব ভিজে ওঠে। সে ভুলে যায় রজত কোনওকালেই অফিস থেকে খোশগল্প করতে পারে না এবং তা উচিতও নয়। দিব্য বাইরে থেকে ডাকে — মউ দরজা খোল। কী হয়েছে আমাকে বলবে না?

কী বলবে মহুয়া তার থেকে তেরো বছর বাদে পৃথিবীতে আসা সম্পর্কে প্রায় সন্তানতুল্য এই মানুষটাকে। তার বুক ছাপিয়ে কান্না উঠে আসে। দরজা খুলে দিব্যর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে আবার দিব্যর ওপরেই অসহ্য ক্রোধে শরীরটা জ্বালা করে ওঠে। দিব্যর ওই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকা, এই মউ ডাক — তুমি করে বলা — এসব যদি না হত — দিব্য যদি যথাযোগ্য দূরত্ব রচনা করে থাকত মহুয়ার জগৎও এমনভাবে আলোড়িত হত না।

বন্ধ ঘরে মহুয়া আকুল হয়ে কাঁদে। এমন হবার তো কথা ছিল না। তার চিরকালের সংস্কার বিশ্বাস তাকে যেভাবে ভাবিয়েছে আজ মন তার থেকে বিপরীত দিকে দৌড়চ্ছে কেন। কী করবে মহুয়া এখন? তার চারদিকের পৃথিবী মানুষজন যাদের নিয়ে সে এতদিন পরিপূর্ণ ছিল — এরাই চরম প্রাপ্তি মনে হয়েছিল — সে সবকিছুই জোলো বিস্বাদ লাগছে কেন — ওষ্ঠে লাগে না আর কোনও প্রিয় স্বাদ।

কিটুকে আসতে বলবে নাকি হস্টেল থেকে? হয়তো কিটুকে দেখলে তার মন শান্ত হবে। কিন্তু কিটুর সামনে পরীক্ষা। হঠাৎ কেনই বা আসতে বলবে তাকে? অসহায়ের মতো মহুয়া তীব্র মাদকতাময় এক ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

জিজা আসা পর্যন্ত কয়েকটা দিন মহুয়া প্রবল চেষ্টায় দিব্যর থেকে একটু দূরে দূরে রইল। দিব্য তা লক্ষ করেই বোধহয় নিজের কাজ নিয়ে বাড়িতে যতক্ষণ রইল বেশিটা সময় ঘরবন্দি রইল। একবারই শুধু মহুয়াকে বলেছিল — আমার কাছ থেকে এমন করে পালিয়ে কেন বেড়াচ্ছে মউ? শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ভয় পাবে — এ আমি চাইনি।

মহুয়া শীর্ণ হেসে সরে গিয়েছে। সে কেমন করে বলবে আমি নিজেকেই ভয় পাচ্ছি দিব্য। তাই পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

মহুয়া স্বভাবতই চুপচাপ বলে তার মৃদু পরিবর্তন কারও চোখে পড়ল না। দিব্য কিন্তু স্বাভাবিক আচরণ করেছে সকলের সামনেই। সবার সামনেই মহুয়ার রূপের প্রশংসা করে বলেছে — সৌন্দর্য কমপ্লিটই হয় না পরিণতি না পেলে। তখন চামড়ার সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতার সৌন্দর্য মেশে। তার জন্য একটু বুড়ো হতে হয় — যেমন তুমি হয়েছ।

মহুয়া চমকে তাকিয়েছে। রজত ও জিজার সামনেও কথাগুলো বলেছে দিব্য। মহুয়ার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়েছে। ওরা নিশ্চয় বুঝে গিয়েছে দিব্যর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ।

রজত ও জিজ্জার ভাবভঙ্গিতে অবশ্য কোনও পরিবর্তন ধরা পড়ল না। দিব্যর অকপট সত্য ভাষণে সবাই অভ্যস্ত।

মহুয়াই ভয়ে লজ্জায় এক দিকে সিঁটিয়ে ওঠে। অন্য দিকে তীব্র সুখে সমস্ত শরীরে পদ্মকাঁটা ফুটে ওঠে। কেন এমন হয়? স্তুতিবাক্য জীবনে কিছু কম শোনেনি মহুয়া। যৌবনের সেই অহঙ্কারী দিনগুলোতে যেখানেই যেত স্তাবক জুটে যেত দু-চারজন। কখনও তো এমন মনে হয়নি।

দিব্যর সামনে এসে দাঁড়ালে এই প্রথম নিজেকে একজন অসাধারণ রমণী বলে মনে হয় মহুয়ার। দিব্যব জন্য নিজেকে নিজের থেকে বড় করে তুলতে সাধ হয়।

জিজ্জারা চলে যাবার আগে ঝড়ের মতো কেটে গেল কয়েকটা দিন। মাঝে তিতলির শরীর খারাপ হল একটু। মহুয়ার আর নিশ্বাস ফেলার সময় রইল না।

জিজ্জারা চলে যাবার আগের দিন রজত জিজ্জাকে নিয়ে কোনও দোকান থেকে কী আনতে হবে বলে বেরিয়েছে, তিতলি ঘুমোচ্ছে। মহুয়ার সহকারিণীরা বিদায় নিয়েছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। দিব্য মহুয়ার ঘরের দরজায় এসে দাড়াল। ঘরের আবছায়ায় মহুয়াকে রাজ্যপাট হারানো নিরাভরণা দরিদ্র রাজেন্দ্রাণীর মতো দেখাচ্ছে। দিব্য এগিয়ে আসে — মউ কাল চলে যাব — প্লিজ একবার — তার স্বরে কাতরতা ফুটে ওঠে।

মহুয়া প্রবল মাধ্যাকর্ষণ উপেক্ষা করে পিছু হটবার চেষ্টা করলেও তার সমস্ত শরীর দিব্যর ডাকে সাড়া দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। যেন কত জন্মজন্মান্তর ধরে দিব্য তাকে ডেকেই চলেছে। দুজনের মধ্যে তীব্র চৌম্বকক্ষেত্র।

কলিং বেলের তীক্ষ্ণ আওয়াজে বিস্ফোরণ ঘটে গেল — ভেঙে গেল সম্মোহন। গভীর অতল খাদের কিনারা থেকে সরে গেল দুজন।

রজত ও জিজ্জা দুজনেই বিরক্ত হয়ে ফিরে এসেছে। কোনও কাজই হয়নি।

সেদিন রাতে রজত যখন ঠাট্টা করে বলে — অদ্যই শেষ রজনী — মহুয়ার বুকে তীরের মতো বিঁধে যায় কথাটা। গভীর রাতে বিনিদ্র মহুয়ার বুকের মধ্যে দিব্য চমকাতে থাকে। গভীর সুখের মতো ব্যথা ছড়িয়ে যায় মনের মধ্যে। পাপ জেনেও মনে মনে আলিঙ্গন করে দিব্যকে। তার সমস্ত শরীর দলিত মথিত হতে চায় দিব্যর দু হাতের আবেষ্টনীর মধ্যে। বিদেশি অচেনা একটা সৌরভ তীব্র অ্যালকোহলের মতো তার মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। সে যেন আপন গন্ধে পাগল নির্জন বনভূমি উথালপাথাল করে দয়িতের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো এক কস্তুরী মৃগ।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে ততোধিক অন্ধকারে হৃদয়ের একেবারে গোপন প্রকোষ্ঠে মহুয়ার প্রেম হিরের মতো জ্বলতে লাগল। গোপন এবং অবরুদ্ধ বলেই তা এত দ্যুতিময়।

সংরক্ষিত এলাকার বাইরে জিজ্জা মহুয়া রজতকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে আদর করে বিদায় নেয়। দিব্যও মহুয়ার গালে গাল রাখে। কয়েক মুহূর্ত বেশি সময় নেয় দিব্য। মহুয়া চোখ বন্ধ করে চিরস্থায়ী করে রাখতে চাইল মুহূর্তটাকে — একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে।

ওরা চলে গিয়েছে। সবাই তো যাবার জন্যই বিমানবন্দরে এসেছে। কতজন কতজনকে বিদায় জানাচ্ছে। মহুয়ার মনে হল শুধু একজনই যাচ্ছে। এই জনাকীর্ণ দিল্লি শহর শ্মশান করে, মরুভূমি করে শুধু একটি মানুষ চলে গেল।

শীত শেষের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর সিরসির করে ওঠে। হঠাৎ দমকা বাতাসে আঁচল এলোমেলো হয়ে গেল। মহুয়া চোখ বুজে আঁচল সামলাতে গিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য রজতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সেই হাত আশ্রয় হিসেবে পাশের শূন্যতাকেই আঁকড়ে ধরল — রজত সেখানে ছিল না। সে তখন এগিয়ে গিয়েছে গাড়ির দিকে।

পুতলির তক্তি

এষা দে

"তোমার নাম কী খুকুমণি?"

"আমাকে খুকুমণি বলছ কেন? আমার নাম তো পুতলি। তোমার নাম কি?"

"আমার নাম নেই।"

"তবে কী বলে তোমায় আমি ডাকব?"

"বেশ তো তুমিই না হয় একটা নাম দাও।"

"আচ্ছা। তুমি.......তুমি......তুমি হলে নামনেইদা।"

"হাঃ হাঃ হাঃ"

এ বাড়ির জানালার আলসেতে বসে পুতলি দেখে ওদিকের বাড়ির জানালার ধারে একটি বিছানা। খানদুই বালিশ উঁচু করে হেলান দেওয়া ফর্সা এক মুখ, লম্বা ধাঁচের, চোখা নাক চিবুক, পাতলা ঠোঁট — অনেকটা পুতলির মামু আর দাদুর মত। তবে এর কপাল অনেক চওড়া। আর বড় বড় চোখের দুধারে ঘন কালি। যেন মায়ের বাক্সবন্দি না-মাজা তামার পুজোর বাসন।

"তা পুতলি, তুমি দুপুর বেলা একলাটি জানালায় বসে কেন? ইস্কুল ছুটি বুঝি?"

"আমি তো স্কুলেই যাই না।"

"সে কি! কেন?"

"একটা ইস্কুলে মা ভর্তি করে দিয়েছিল। সকাল সাড়ে সাতটায় বাস নিয়ে যেত আর ফিরতাম বিকেল পাঁচটায়। আমার খুব জ্বর হল। বাবা বলল এরকম রাক্ষুসে ইস্কুল করে দরকার নেই। আমি তো ফুলের মতো কোমল।"

"ও বাবা, ফুলের মতো কোমল! তুমি তো খুব কথা বলতে পার।"

"বাঃ পারবই তো। আমি যে অনেকদিন ধরে কথা বলছি। পুরো সাত বছর ধরে।"

"তুমি কার কাছ থেকে এত কথা শেখ?"

"কেন, নিজে নিজেই। জান, আমার যখন তিন বছর বয়স তখন ফড়িয়াপুকুরের নীতু কাকারা একদিন খুব ধরেছিল আমাকে ওদের বাড়িতে থাকতে। আমি বলেছিলাম, না, মোটেই থাকব না। তোমাদের বাড়িতে যে দক্ষিণের ঝিরঝিরে হাওয়া নেই।"

"হাঃ হাঃ হাঃ। দক্ষিণের ঝিরঝিরে হাওয়া! তা তোমার নীতুকাকারা কি বলল?"

"ওরা সবাই বললো, এতো হবেই। আমগাছে তো আমড়া ফলে না। সাহিত্যিকের মেয়ের তো দক্ষিণের ঝিরঝিরে হাওয়াই চাই।"

"ও, তোমার বাবা সাহিত্যিক বুঝি?

"হ্যাঁ। বাবা লেখে আর পড়ে। আমাদের বাড়িতে অনেক অনেক বই আছে। তাই তো বাবা ইস্কুল বন্ধ করে দিয়ে বলল বাড়িতে যে সব বই আছে তা পড়লেই আমার যথেষ্ট পড়াশুনা হবে। তাছাড়া, আমার তো মাস্টারমশাই আসেন। রোজ সকালে আমি তার কাছে পড়ি। আর তুমি কী পড়?"

"আমি তো অনেক বড়। আমার পড়াশুনা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি তোমার মতো বাড়িতে থাকি।"

"তুমি সব সময় শুয়ে থাক কেন?"

"আমার যে কাশির অসুখ।"

"আচ্ছা নামনেইদা, তুমি তোমার জানালা থেকে পাখির বাসা দেখতে পাও? এই যে পেয়ারা গাছটা তাতে দুটো কাক বাসা বেঁধেছে।"

"আমার জানালার দিকে তো পেয়ারা গাছ নেই, শিউলি গাছ আছে, খালি ফুল ফোটায়।"

পুতলির খেয়াল হয়, তাই তো, ওটা শিউলি গাছ, ফল ধবে না কোনো। কতদিন ভোরে তলায় বিছিয়ে থাকা শিউলি ফুল সেই তো কোঁচড়ে করে তুলে আনে। পুতলিদের আর নামনেইদাদের দু বাড়ির দুটো খিড়কি গলির মধ্যে একটা সরু শান বাঁধানো রাস্তা ভেতরের দিকে চলে গেছে নরেশদের বাড়ি পর্যন্ত, তাদেরই পথ। সামনে বড়ো গেট, সব সময় খোলাই থাকে। সব তলায় ভাড়াটে, কে বন্ধ করবে? ভেতরে দু'ধাবে পাতাবাহার আর দু'চারটে সাদা লিলি ফুলের ছোপ। দুটো মোটে বড়ো গাছ, একটা শিউলি, যার বেশির ভাগ ফুল ঝরে নামনেইদার বাড়ির গলিতেই। অন্যটা পেয়ারা, একেবাবে পুতলিদের গলি ঘেঁসে তার একটা ডাল প্রায় মাথা গলিয়ে দিয়েছে দোতলার ঘরের জানালায়। এটা আসলে বাবাব পড়ার ঘরের জানালা। পুতলিই অবশ্য এখানে বেশির ভাগ সময় বসে থাকে। এ ঘরে চারিদিকে আলমারিতে ঠাসা বই আর বই। বাংলা, ইংরিজি। মাঝখানে একটা বড়ো সড়ো টেবিল আর হাতলওয়ালা চেয়ার। চেয়ারে একটা গদি আছে, মা সেদিন তার জন্য খয়েরি রঙের ঢাকনা সেলাই করছিল। বাবা এখানে বসে লেখে আর পড়ে। বাবা অনেক লেখে, খালি লেখে। তখন পুতলি বাবার পায়ের কাছে টেবিলের তলায় উপুড় হয়ে শুয়ে বই পড়ে। যে বই ইচ্ছে পুতলি আলমারি থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে পড়ে। মা তাই বাগ করে। এতটুকু মেয়ে সমানে বড়োদের বই পড়ছে। বাবা বলে "পড়ুক না, বই পড়ে কেউ কখনো খাবাপ হয় না।" "হ্যাঁ, তা বলে ন'বছর হতে না হতে যত রাজ্যের উপন্যাস পড়ে ফেলুক। কিছু বলতে গেলে আমারই দোষ। বেম্মো ছুঁচিবাই।" সত্যি কথা বলতে কি পুতলি যে বই সবচেয়ে বেশি পড়ে তা হল বাবার টেবিলে রাখা চলন্তিকা। তাব চারদিকে সব শক্ত শক্ত শব্দ, কি বইতে, কি বড়োদের মুখে। এই যেমন বেম্মো ছুঁচিবাই। পুতলি বুঝতেই পারে না। চলন্তিকাতে তো 'বেম্মো' পেলই না, আর ছুঁচিবাই হচ্ছে শুচিবাই — শুচিতারক্ষাব বাতিক, মনোরোগ বিশেষ।

রোগ মানে পুতলি বেশ জানে। জ্বর, সর্দি, কাশি, পেটখারাপ, বার্লি, সাবু পথ্য করা, সিং মাছের লংকা ছাড়া পাতলা ঝোল। কিন্তু তার সঙ্গে বই পড়ার সম্পর্ক কি? এই জন্যই পুতলি বড়োদের সঙ্গে কথাবার্তায় থাকে না, বই পড়ে। মা মাঝে মাঝে রেগে বলে বইয়ের পোকা। আসলে পুতলি অনেক সময়ই বই হাতে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। মা তো আর জানে না। অথবা দেখে পেয়ারা গাছে কেমন সাদা সাদা লোম লোম ফুল ঝরে ছোট ছোট খেলার মার্বেলের মত পেয়ারা ধরল। রোজ দেখে; তবুও আশ্চর্য যে কখন বেড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে বুঝতেই পারে না। তারপর মাস্টার মশাইয়ের হোম ওয়ার্ক করে। ফাউন্টেন পেন দিয়ে। মা বলে তাই পুতলির হাতের লেখা কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং।

"পই পই করে বললাম, এতটুকু বাচ্চাকে ফাউন্টেন পেন ধরিও না। প্রথমে কিছুদিন দোয়াত কলমে হাতের লেখা মক্‌শ করুক। তারপর তোমার আদরের মেয়েকে উজাড় করে ফাউন্টেন পেন কিনে দিও। তা আমার কথা তো কানে যায় না, এখন নাও, দেখ লেখার কি

ছিরি।" — "দোয়াত কলমে লিখবে? তুমি কোন যুগে বাস কর বলতো? অত ছিরি ছাঁদ দিয়ে হবেটাই বা কি? আমার মেয়ে কি কাছারির সামনে বসে মনিঅর্ডার আর চিঠি লিখবে?"

"বাঃ, তা না লিখলেই বা। লেখার একটা শ্রী দরকার নেই?" — "এই আমার হাতের লেখাই তো বিশ্রী, তা বলে বাংলাদেশের কোনো প্রকাশক আমার পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেয়? নাকি হাতের লেখার জন্য আমার খ্যাতি কিছু কম কারো থেকে?"

পুতলি জানে এ ধরনের তর্ক বহুক্ষণ ধরে চলবে। সবটা সে শোনে না বড়ো একটা। তাকে অনেক ফাউন্টেন পেন বাবা কিনে দেয়। সেগুলোর বেশির ভাগই অবশ্য এখন অচল, কারণ পুতলি প্রত্যেকটাই খুলে খুলে দেখে কী ভাবে তৈরী, ভেতরে কী কী আছে। দেখাটেকা হয়ে গেলে আবার ঠিকঠাক লাগিয়েও রাখে। তবুও কেন জানি আর সেগুলোতে ভাল করে লেখা পড়ে না। মা ভাগ্যি জানতে পারে না, জানলে নির্ঘাত কষে বকুনি দিত। পুতলি তো অনেক কথাই বাবা মাকে বলে না। বাবা ব্যস্ত লেখাপড়া নিয়ে। আর মায়ের তো ঢের ঢের কাজ। রান্নাবান্না, পুতলির জামা-ইজের সেলাই, টেবলক্লথে এমব্রয়ডারি, শীতকালে পুতলির, বাবার, দাদুর সোয়েটার বোনা। তাছাড়া ফড়িয়াপুকুরের কাছে বঙ্গীয় কলালয় ইস্কুল আছে। সেখানে মা সেতার সেখে। সপ্তাহে দুদিন। পুতলি তো রোজ সন্ধ্যায় সামনে বসে শোনে, মা বাজায়। ঠিক যেন সরস্বতী ঠাকরুনটি! সেতারের খাতাটায় ঝুঁকে দেখে, কী ভীষণ শক্ত শক্ত কথা, রাগিণী নট মল্লার, তাল তেতালা বা রাগিণী পিলু তেতালা দুই রে গা মা ধা নি। পাতার পর পাতা সা গা রে গা, ডা ডি রি ডি রি ডা রা ডা রা। এ ছাড়া আছে পুতলির অঙ্কের খাতার মত ০, ১, ৩ — কোনোই মাথামুণ্ডু পায় না পুতলি। মা অবশ্য বুঝিয়েছে, এক একটা চিহ্নর সঙ্গে সেতারের এক একটা আওয়াজ জড়িয়ে আছে। যদিও চিহ্নের সঙ্গে আওয়াজটার আসলে কিন্তু কোনোই সম্পর্ক নেই। সকলে ভাবে সম্পর্ক আছে। যেমন, পু ত লি। এই তিনটে অক্ষরের সঙ্গে আট বছরের মেয়েটার যোগ, খালি লোকের বিশ্বাসে। পুতলির মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগে পুতলি যে পুতলি তা খালি অন্য সবার বিশ্বাসের জন্যই, সে আলাদা করে কিছুই নয়। নামনেইদা ঠিকই বলেছিল, নাম আসলে কারো নেই। যে নামে অন্যের ডাকার ইচ্ছে, সেটাই নাম হয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলায় এসব ভাবনা চিন্তা মনে আসবার আগে পুতলি খেলতে যায়। যেখানে শিউলি গাছ পেয়ারা গাছ সেই গলিতে খেলে, জলকুমীর, কানামাছি, ক্রিকেট। সব খেলাই শুধু নরেশের সঙ্গে তাই খেলাগুলোকে অনেক ছাটকাট করে নিতে হয়। নরেশ পুতলির চেয়ে দুবছরের ছোটো ওকে ডাকে পুত্লিদি বলে। নরেশটা একেবারে গোবর গণেশ। পুতলি ওকে কত শেখায়, গাছে চড়া, পাঁচিলে ওঠা, তবু ও খালি ভয় পায়। পুতলির মত কাকডাকা ভোরে চেয়ার টেনে নিয়ে ছিটকিনি খুলে খিড়কির পাঁচিল টপকে দেশবন্ধু পার্কে ফুল তুলতে যেতে পারে না। অনেক সময় পুতলি পার্কে যাওয়ার পথে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ হাসপাতালে ঢুকে পড়ে। ওখানে না একটা গাছ আছে তার পাতা অনেকটা রক্তকরবীর মতো, কিন্তু ফুলগুলো ছোটো ছোটো থোকা থোকা মেটে লাল, যেন হিন্দুস্থানী জমাদারনীর সিঁথির সিঁদুর। ওরকম ফুল পুতলি কোথাও আর দেখেনি। যদি দেখে দারোয়ানটা সামনে নেই তো ঝটপট একটা থোকা তুলেই দে দৌড়। পার্কে অবশ্য ফুল তুললে কেউ কিছু পুতলিকে বলে টলে না, এত বড়ো পার্ক কত গাছ কে অত খেয়াল রাখছে। কৃষ্ণচূড়া না হয় খুব বড়ো গাছ, পুতলির নাগালের বাইরে, কিন্তু টগর আর কাঠচাঁপাতো আছে। কাঠচাঁপা গাছেই তো পুতলি বেশি চড়ে। পার্কের পেছনের দিকে, খালধারে পুতলি একবার একটা কাঠচাঁপা গাছে উঠে বসেছিল। হঠাৎ দেখে পাতার ফাঁক দিয়ে মালার পুঁতির মত ছোট্ট ছোট্ট এক জোড়া লাল চোখ জ্বলছে সূর্যের আলোয়। ও মা, কী অদ্ভুত ঘন কচি কলাপাতা একটা

দড়ির মাথায় চোখ দুটো। দেখ্ না দেখ্ সরু লিকলিকে একটা জিভ বেরিয়ে এল, মাঝখান দিয়ে সটান চেরা। পুতলি তো তখুনি ওপর থেকে এক লাফ। ভাগ্যি আগের দিন এক ঝাঁক বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তলায় সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটিটা এমন নরম-নরম ছিল যে পুতলির ওরকম ধপাস করে পড়ে গিয়েও বিশেষ লাগেটাগেনি। মুস্কিল হল পরদিন যখন পুতলি টেবিলের তলায় শুয়ে শুয়ে ঘটনাটা বাবাকে বলেছিল। বাবা অবিশ্যি প্রথমে বিশেষ কানে নিচ্ছিল না, প্রতিদিনেব মত লিখে যাচ্ছিল আর পুতলির কথার ফাঁকে ফাঁকে দু'চার বার "হুঁ হুঁ তারপর, আচ্ছা" বলছিল। যখনি কচি কলাপাতা রঙের দড়িটার কথা উঠল অমনি বাবা হঠাৎ বলে উঠল "আরে ওটা যে লাউডগা সাপ।"

ব্যস, আর যাবে কোথায়, হুলস্থুল পড়ে গেল।

"নীলিমা, নীলিমা, কী কর বলতো সারাদিন। পাঁচটা নয় সাতটা নয় একটা মাত্র মেয়ে, তাও দেখে শুনে রাখতে পার না। এই তো দেখ, পার্কে গাছে উঠে বসেছিল। আর একটু হলে সাপের কামড়ে প্রাণ যেত।"

"তোমার মেয়েকে সামলানো শিবের অসাধ্যি। খালি ছেলেদের মত টো টো, এই গাছে চড়ছে, নয় তো পাঁচিলে উঠছে। একটা কথাও কি শোনে? এত পুতুল আছে, আর পাঁচটা মেয়ের মতো পুতুল খেলবে, রান্নাবাটি, সাজসরঞ্জাম নিয়ে থাকবে। তা নয়। এ সবে মনই নেই তার। ঐ তো ঐ জাপানী পুতুলটা কেমন সুন্দর চোখ খুলত বন্ধ করত, ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদত, তাকে তো আনতে না আনতেই চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে এমন চানই করালে যে তার দফারফা। ছেলেদের মতো, উড়নচণ্ডী।"

"দেখ, তুমি কী যেন বল না, আমার রাগ ধরে যায়। এত লক্ষ্মী মেয়ে, মুখেব ওপর কথা কখনো বলতে শুনেছ? সারাদিন পড়ে। আর আমি আপিস গেলে একটু বেরোয়, তাও তুমি সামলাতে পার না?"

বাবা পুতলির জন্য একটা মেকানো সেট কিনে আনে। পুতলি যাতে বাড়িতে থাকে। মা বলে ওটাও নাকি ছেলেদের খেলা, স্ক্রু ড্রাইভার, রেঞ্চ সব দিয়ে, নানা সাইজের রঙিন টিনের টুকরো জুড়ে জুড়ে মডেল তৈরি করা। বাবা খুব বিরক্ত। ছেলে আর মেয়েতে কি এতই তফাৎ যে আট বছরেই আলাদা আলাদা খেলনা চাই। খেলুক না ছেলেদের খেলনা দিয়ে ক্ষতি কি? পুতলি জানে, বাবা বলে সব মানুষ সমান, ছেলেমেয়ে গরিব বড়োলোক। তাই বোধ হয় মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার ছেলেদের মতো মেকানোতে খুব ঝোঁক। পর পর সব নম্বরের মেকানো কেনা হ'ল পুতলির জন্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুতলি ছবি দেখে দেখে মডেল বানায় আর খোলে, বানায় আর খোলে, বানায় আর খোলে। কখনো কখনো নিজের মন থেকেও কত কী তৈরি করে। কিন্তু পুতলির বাইরে টো টো বন্ধ হয় না। পুতলি বাড়ি থেকে রোজ দুবার অন্তত বেরোবেই। সকালে তার ফুল চাই-ই চাই। তাই তো পুতলি রোজ পার্কে যায়। লেডিজ পার্কে না একটা মস্ত শিব ফুলের গাছ আছে, সেটাতে পুতলি মোটেই চড়তে পারে না। তবে মালি অনেক সময়ই একটা করে শিবফুল তাকে দেয়। প্রতি বার ফুলটা হাতে নিয়ে পুতলি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। মাঝখানে ঠিক যেন সাপের ফণা, বাবার হাতির দাঁতের কাগজকাটা ছুরির মত ম্যাটমেটে সাদা, চারপাশে মোটা মোটা পুরুষ্টু কালচে লাল পাপড়ি। অন্য সব ফুল কত হাল্কা, কত নরম নরম তাদের পাপড়ি। এ ফুল কিন্তু হাওয়ায় ভাসা নয়। মাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পুতলির শরীরের মতো, রক্ত মাংসের। সবচেয়ে তাজ্জব লাগে ফণাটাকে যখন সাবধানে একটু একটু তোলে, ভিতরে অবিকল শিবের মাথার জটা। যেদিন শিবফুল পায় সেদিন আর তাকে ঠাকুর খুঁজতে হয় না। যে ফুল

দেবে আর যাকে দেবে দুইই এক হয়ে যায়। অন্য ফুল পেলে অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা রকমের হয়। নিত্য নতুন দেবতা আছে কিনা তার। পুতলিদের বাড়িতে কোনো পুজোর ঘর নেই। নরেশদের বাড়িতে আছে, পুতলিদের মামা বাড়িতে আছে। অনেক দিন দেখেছে রোজ পুজো হয়। মা বছরে দুদিন পুজো করে, লক্ষ্মী পুজো আর সরস্বতী পুজো। বাবা বলে যত সব হিন্দু ভণ্ডামি। চালকলা দিয়ে বোকা ভোলান! লোকের বাড়িতে যেরকম ঠাকুরের ছবি থাকে, বাবার ঘরেও সেরকম ছবি টাঙানো আছে। এরা সব অন্য দেবতা। এদেরই এক-একটা ছবি পুতলি নামায়, মালা গেঁথে পরিয়ে দেয়। সামনে মার পুরী থেকে আনা পেতলের রেকাবিতে সাজিয়ে দেয় ফুল আর ঠাকুমা পুতলিকে যে একটা সূর্য আঁকা ঘটি দিয়েছিল, তাতে করে কলের জল ছিটিয়ে দেয়। এই ঘটিটা পুতলির নিজস্ব সম্পত্তি, ঠাকুমা মাঝে মাঝে কাশী থেকে এলে তাকে শেখায় — প্রণতোঅস্মি দিবাকরম্। বাবার ঘরের ছবি পুজো করার সময় কিন্তু পুতলি কিছু বলে টলে না। কারণ যাদের ছবি তারা বেশির ভাগই সাহেব। সবাই ইংরিজিতে কবিতা লিখেছে। পুতলি বড় হয়ে পড়বে। বাবা বলে বায়রন খুব সুপুরুষ, কিন্তু পুতলির কাছে শেলীর চেহারাই বেশি সুন্দর লাগে। আরেকটা ছবি আছে। সেটাকে কিন্তু পুতলির মোটেই ভালো লাগে না। শুধু একখানা মুখ, পেছনে ভয়ানক অন্ধকার গর্ত। এ কবির নাম কীটস। চোখের কোলে কী কালি, যেন নামনেইদার মত। পুতলির গা ছমছম করে। তবে সব চেয়ে বড়ো ছবিটা পুতলির খুব চেনা, লম্বা দাড়িওয়ালা বুড়ো, নাম রবিঠাকুর। বাবার ঘরের কবিদের মধ্যে একা রবিঠাকুরই বাংলায় কবিতা লিখেছে। পুতলি তার অনেক কবিতা পড়েছে, বাবা-মা দাদু সকলেই তার কবিতা অনেক অনেক পড়েছে। তাই বড় ছবিটা নামিয়ে পুজো করতে পুতলির কিচ্ছু অসুবিধা হয় না। যেন শিব বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতীর মতোই বরাবরের চেনা নিজেদেরই ঠাকুর। বড়োদের মুখে শুনে পুতলির অনেক বাংলা কবিতার লাইনই মুখস্থ। যেমন ধর, মা, মোটা একটা বই খুলে প্রায়ই পড়ে — "তোমা-'পরে/এই মোর অভিশাপ — যে বিদ্যার তরে/মোরে কর অবহেলা সে বিদ্যা তোমার / সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার / ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ; শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।" পুতলি খালি বুঝতে পারে না এসব লাইন পড়তে পড়তে কেন মায়ের চোখ ছলছল করে, গলা ধরে আসে, নাকের ডগা হয়ে ওঠে লাল। ঠিক যেমনটি পুতলি দেখেছে কতবার নিজের মনে গান করতে করতে মা আলনা গুছিয়ে রাখছে। হয়তো বা সামনের পায়ে শাড়ির খুঁটটা চেপে ধরে কাপড় কুচোচ্ছে, "এই কি গো শেষ দান, বিরহ দিয়ে গেলে — এ" বা "চিরদিন যারে তুমি করেছ হেলা/হৃদয় লয়ে শুধু করেছ খেলা।" সারাদিনই মা কাজ করে ভুরু কুঁচকে, যেন কী একটা যন্ত্রণা কোথায় সবসময় বিঁধে আছে। পুতলির পায়ে একবার কাঁটা ফুটে গিয়েছিল। প্রথমে সে তো গ্রাহ্যই করেনি। ছোট্ট এইটুকুতো কাঁটাটা। ওমা, তা থেকে কতদিন ব্যথা চলল তো চললই। তারপর মা একদিন সেফ্‌টিপিন আগুনে পুড়িয়ে খুঁচিয়ে তাকে বের করে দিল। ব্যস ব্যথা সেরে গেল। পুতলি ভেবে পায় না মায়ের কাঁটাটা কোন্ সেফ্‌টিপিন দিয়ে তুলে ফেলা যায়। বিকেলে বাবা পাবলিশারের আড্ডায় যায়, তখন মা টেলিফোনে গল্প করে। বড়ো খাটটার ধারে গোল শ্বেতপাথরের টেবিলে টেলিফোন, সামনে পুবদিকের মেঝে ছোঁওয়া লম্বা জানালা। খাটের মাথার দিকে হেলান দিয়ে বসে মা সমানে কথা বলে আর শোনে। কখনো কখনো জানালা দিয়ে দেখে আকাশ। পুতলির মতো মাও আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে। তখন কিন্তু মাকে আর চেনাই যায় না। কত সুন্দর লাগে দেখতে, মা কত হাসে। যেন অন্য মানুষ, পুতলির মা-ই নয়। যদি পুতলি বাড়ি থাকার সময় টেলিফোন আসে, মায়ের আগে দৌড়ে

গিয়ে পুতলি টেলিফোন ধরে : "হ্যালো, কাকে চাই?" "পুতলি? টুনিকে দাও।" সবাইতো মাকে নীলিমা বলে ডাকে, বাবাও! খালি দাদু আর বড়ো মাসি মাকে টুনি বলে।

"মা, কার সঙ্গে কথা বলছ?"

"ও আমার এক বন্ধু।"

"তোমাকে টুনি বলে ডাকে কেন?"

"আমাকে অনেক ছোটোবেলা থেকে চেনে কিনা।"

"এখানে কোনো দিন আসে না কেন মা? নরেশ তো আমার বন্ধু, ও তো রোজ আসে।"

"আমার বন্ধু আসতে পারে না, অনেক দূরে থাকে কিনা।"

"কত দূরে?"

"সে বহুদূর।"

দূরের কথা ভাবতে পুতলির খুব ভালো লাগে। অনেক দূর; আরও অনেক দূরের কথা ভেবে ভেবে তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, যেন কনকনে শীতে ঠাণ্ডা জল পড়ল। তাই তো তার দোলনায় চড়া চাই-ই। রোজ বিকেলে নরেশকে নিয়ে পুতলি আর একবার যায় দেশবন্ধু পার্কে। দোলনা দুলতে। রোজ যখন মালির ঘর থেকে দোলনার পাটাগুলো বের করা হয়, কী ভীষণ ভিড় আর হুড়োহুড়ি। বেশির ভাগই বড়ো বড়ো ছেলে থাকে এখানে, চিলড্রেনস পার্কে। পুতলির মত ছোট মেয়েরাতো এখানে আসে না। তারা পাউডার মেখে, বিনুনিতে রঙিন রিবনের ফুল বেঁধে, ইস্ত্রি করা জামা আর জুতো মোজা পরে ঝি এর হাত ধরে লেডিজ পার্কে যায়। পুতলির অবিশ্যি এসবের বালাই নেই। মা তো জানতেই পারে না কখন টুক করে সে বাড়ি থেকে উধাও। তার ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো। একগোছা চোখের ওপর এসে এসে পড়ে। এক ঝটকায় সরিয়ে দেয় পুতলি। জুতো মোজা পরলে দৌড়তে অসুবিধা, তাই ওসব সে পরে না। জামা সেই সকালে স্নান করে যা পরে, তাই গায়ে বেরিয়ে যায়। সাজাগোজার ঝামেলার মধ্যে পুতলি যায়ই না। তার মন পড়ে থাকে দোলনায়। ছেলেদের ভিড় ঠেলে ঠেলে কনুইয়ের গুঁতো মেরে সাঁ করে এক্কেবারে ভিতরে ঢুকে যায়, দোলনা ধরতে। যে প্রথমে ধরবে তারই দখল হবে। পুতলির হাতে একবার দোলনা এলে, ব্যস হয়ে গেল, কেউ আর পাচ্ছে না। ছেলেরা তাই মোটেই পুতলিকে দোলনা দিতে চায় না। একদিন তো মারামারিও হয়ে গেল। একটা বেশ ঢ্যাঙা মতো ছেলেকে পুতলিই প্রথমে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ছেলেটা, "এই খুকী, ভারি বাড় বেড়েছো না," বলে যেই না তার চুলের মুঠি ধরেছে অমনি মালিটালি সব ছেলেটাকে এই মারে তো সেই মারে। পুতলি এত ছোট্ট, এত রোগা, তার পাতলা মুখ আর বড় বড় শান্ত চোখ দেখলে কারো বিশ্বাসই হয় না যে সে নিজে থেকে হাত তুলতে পারে। তবে সবাই জানে যে দোলনায় দুলতে পুতলির মতো আর কেউ পারে না। দাঁড়িয়ে বল, কি বসে, এমন কি ডবল। কত সময় পুতলি নিজে দাঁড়িয়ে নরেশকে দুপায়ের মধ্যে বসিয়ে দোলে। নরেশটা অবশ্য ভীতুর ডিম, খালি চেঁচায়, "ও পুতলিদি আর ওপরে উঠো না, পড়ে যাব, পড়ে যাব।" এই জন্য পুতলির মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত লাগে নরেশের ওপর। বেশির ভাগ সময় পুতলি তাই একলাই দোলে। একা, একেবারে একা সে উঠে যায় উঁচুতে, আরও উঁচুতে। যেন এই আকাশ ছুঁয়ে ফেলল বলে। চারিদিকে আর কেউ নেই, খালি পুতলি আর আকাশ। আর কিছু নেই, একা সে, স্বাধীন, মাটির সব কিছুর ওপরে। যেন বাবার গল্পের পক্ষীরাজ ঘোড়া।

যে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র যায় সাত সমুদ্র তের নদী ডিঙিয়ে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, সেই দূরে, বহু দূরে যেখানে রাক্ষসেরা বন্দী করে রেখেছে রাজকন্যাকে, আর দীঘির সেই তলা থেকে এক ডুব দিয়ে রাজপুত্র কৌটো তুলে নিয়ে আসে। যেই না রাক্ষসেরা বলে

হালুম লো ঝালুম লো মানুষের গন্ধ পালুমলো — পুতলি তো দু চোখ বন্ধ করে বাবার ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বুকে মুখ লুকোয়। ব্যস আর কোনো ভয় নেই। জবাকুসুম তেল আর মহীশূরের চন্দন সাবানের গন্ধ তাকে ঘিরে রাখে। অতঃপর রাজপুত্র কৌটো খুলে প্রাণভোমরাটা পটাস্ করে টিপে মেরে ফেলে, আর সব রাক্ষস খতম। খাওয়ার পর দুপুবে পুতলি বাবার কাছে শুয়ে রোজ রাজপুত্র রাজকন্যা রাক্ষসের গল্প শোনে। প্রত্যেক দিনই তার রাক্ষসদের মারা চাই। বাবা মাঝে মাঝে বলে, এই একটা গল্পে তোর কী যে নেশা। গল্প শুনে পুতলি কিন্তু মোটেই ঘুমোয় না, বরং গল্প বলে ঘুমিয়ে পড়ে বাবা। আর পুতলি পা টিপে টিপে খাট থেকে নেমে বাবার পড়ার ঘরের জানালায় গিয়ে বসে। গরাদের ফাঁকে ফাঁকে দেখে আকাশ। পক্ষীরাজ ঘোড়া বুঝি রাজপুত্রকে নিয়ে উঠে যাচ্ছে। মাটির দিকে চোখ নামাতে গিয়ে দেখে পেয়ারা গাছে কাকের বাসা। এই বাসাটায় পুতলির খুব আগ্রহ। গোড়া থেকেই সে লক্ষ করে আসছে কেমন একটু একটু করে কুটোকাটা নিয়ে এসে দুটো কাক বাসা বাঁধলো। একদিন কয়েকটা ডিম দেখা গেল, ছোট্ট ছোট্ট, পুতলি যে রকম ডিম পোচ বা সেদ্ধ খায় তত বড়ো নয় মোটেই। জানালা থেকে ডিমগুলো ভালো করে দেখা যায় না, বাসার মধ্যে রাখা তো। পুতলি ছাদ থেকে দেখতে চেষ্টা করে। না ওপর থেকেও ভালো দেখা যায় না। এমন তিনটে ডালের জোড়ার জায়গায় কাকেরা বাসা বেঁধেছে যে চট করে কোনোখান থেকেই দেখা যায় না। পুতলির অবাক লাগে, কাকেরা কী সাবধানি! তারপর খেয়াল করে দেখে একটা কাক সব সময় বাসার ওপর পেট চেপে বেশ বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মা বলে তা দিচ্ছে। যখন ছোটো ছোটো ছানা ডিম ফুটে বেরুল সবচেয়ে মজা পুতলির, আকাশ দেখা প্রায় বন্ধ করে দেখে ছানাগুলোর রকম সকম। কী রকম রোগা রোগা ঠ্যাং ঠ্যাং-এ চেহারা, মা বাবা তো দিব্যি নাদুসনুদুস। ঠিক যেন পুতলির মতো হাড় জিরজিরে, মা তো কত সুন্দর। বাবার চোখে অবশ্য পুতলি রোগাটোগা কিছুই নয়। বাবা হয়তো বলল, 'অরুণটার কী কপাল। একটা মাত্র মেয়ে, তাও আবার যেমন কালো রঙ, তেমনি অখাদ্য গড়ন। যেন প্যাঁকাটি।"

"অন্যের মেয়ে সম্বন্ধে এ রকম বলতে নেই, তোমার নিজের মেয়ের কী এমন ফিট গৌরবর্ণ, হাড় পাঁজরা তো সব একেবারে চেয়ে চেয়ে আছে।"

"নীলিমা তুমি আমাকে অবাক করলে। আমার পুতলির সঙ্গে তুলনা হয়। এরকম মুখ আর দেখেছো, এমন চোখ, নাক, ঠোঁট, আর কী স্নিগ্ধ রং, কেমন ছিপছিপে গড়ন, যেন রজনীগন্ধা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক হয়েছে। অন্যের মেয়ে হলে কালো প্যাঁকাটি, নিজের মেয়ে রজনীগন্ধা। ব'ল না ব'ল না, লোকে হাসবে।"

কাকছানাদের চেহারা টেহারা নিয়ে কাক বাবা মার তেমন মাথাব্যথা দেখা যায় না। তাদের সারাদিনের কাজ খালি বারে বারে ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে আসা। পুতলির বড়ো বড়ো চোখ আরও বড়ো হয় যখন দেখে বাবা মার সাড়া পেলেই ছানাগুলো কেমন এত লাল হাঁ করে, একটু কিছু মুখে পড়তে না পড়তেই গরগর করে গিলে ফেলছে। কাক বাবা মা ছানাপোনা দেখলে পুতলির কখনো কখনো নরেশ আর নরেশের বাবা মার কথা মনে হয়। সকালে পার্ক থেকে ফুল তুলে ফিরে যদি দেখে তখনও বাড়িতে কেউ ওঠেটোঠেনি, তাহলে পুতলি মাঝে মাঝে নরেশদের ওখানে চলে যায়। দেখে অত সকালেই নরেশের মা চান টান সেরে ঠাকুরের ছবি পুজো করছেন, ঠিক যেমন পুতলি করে ফুলটুলি দিয়ে শেলি বায়রন রবিঠাকুরকে। কাকিমা — নরেশের মা — বাড়তি দেন শুধু বাতাসা। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে মোটা মোটা পাঁউরুটির স্লাইসে মাখন মাখাতে মাখাতে ডাকেন নরেশকে, কাকাবাবুকে, মানে নরেশের বাবাকে। খেয়ে দেয়ে কাকাবাবু যান হাসপাতালে, নরেশ যায় নার্সারি স্কুলে, ব্যাগ ঝুলিয়ে। পুতলি গেলে কাকিমা পুরু মাখন মাখানো রুটিতে বেশ করে

চিনি ছড়িয়ে তার হাতে দেন। কখনো বা বলেন, "আহা এতটুকু মেয়ে, এত বেলা অব্দি খালি পেটে!" পুতলিদের বাড়িতে সব অন্যরকম। এখানে সবাই দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে, পুতলি ছাড়া। অবশ্য হঠাৎ হঠাৎ এক একদিন বাবা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, সেদিন বাজারে যায়। যেমন পুতলির জন্মদিনে। এ বছরই তো বাবা মুটের মাথায় চাপিয়ে রাশি রাশি মাছ তরকারি কিনে এনেছিল। তারপর খেয়াল হ'ল, তাই তো কাউকে নেমন্তন্ন করা হয়নি যে! টেলিফোন করে বাবার বন্ধুদের বলতে বলতে দুপুর। তখন বড় মাসিকে খবর দেওয়া হ'ল রান্নার দিকটা সামলাতে। বড় মাসির মতো ভাজার মুলো তো আর কেউ কাটতে পারে না। তা ছাড়া মাংসের পুর দিয়ে টমাটোর কলসি। পুতলির এতে খুব উৎসাহ, অনেকক্ষণ ধরে দেখে, কী বিরাট ব্যাপার , দুখানা উনোনই ধরতে ধরতে বেলা হয়ে গেল। তারপর এত রকমের মাছ রান্না। সন্ধে হতে না হতেই পুতলি তো যথারীতি ঘুমিয়ে কাদা। প্রায়ই অবশ্য সে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। মা সেতার বাজানো, টেলিফোনে গল্প সব সেরে তাকে তুলে দুধভাত খাইয়ে দেয়। বিরক্ত হয়ে বলে, এত বড়ো মেয়ে, আট বছরের ওপরে বয়স হ'ল, রাতের পর রাত দুধ ভাত খেয়ে থাকে। নরেশদের বাড়ি ছাড়া পুতলি পাড়াতে আর কারো বাড়ি যায় না। একবার মিনুদের বাড়ি গিয়েছিল। ওদের বাড়ি খুব বড়ো, গাড়িবারান্দা আছে, আর তার ছাদে কত ফুল গাছের টব। নরেশ একদিন বলল কি না মিনুদের বাড়িতে একটা গাছ আছে, তার পাতায় ঠিক পায়েসের গন্ধ। তাই তো পুতলি নরেশের সঙ্গে গেল। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে নক্‌শাকাটা জ্বালি ঘেরা এক বারান্দা। মেঝেটা কেমন সুন্দর কালো সাদা বরফি। সেখানে খুব মোটা এক মহিলা মস্ত চওড়া পাড় শাড়ি পরে, ঝন্‌ঝন্‌ হাতভর্তি চুড়িবালার আওয়াজ করে পান সাজছিলেন। মিনুর সঙ্গে পুতলিকে দেখে বললেন, "তুমি কার মেয়ে গা?" পুতলি বাবার নাম বলতেই ফুলো ফুলো গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, "ও মা, সে তো পাঁড় মাতাল, পদ্যটদ্য লেখে, চাল নেই চুলো নেই ভাড়াটে বাড়িতে থাকে। তার বৌটা তো শুনি বায়স্কোপের মেয়েছেলের মত খাটে শুয়ে চুল এলিয়ে নবেল পড়ে, আবার নাকি বীণে বাজায়। ও বৌমা, বলি তোমাদের কি আক্কেল বলে কিছুই নেই? আমরা ছাপোষা গেরস্ত, বাড়ির মেয়েকে যার তার সঙ্গে মিশতে দিতে আছে?" মিনুর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, "মা, এ তো শিশু, এর কী দোষ?" পুতলি জানে না তার কী দোষ। তবে মিনুদের বাড়িতে আর কখনো সে যায় না। নরেশদের বাড়ি ছাড়া আর কারো বাড়িতেই পুতলি যায় না। এ পাড়ায় আর কোনো বাবাই গদ্যপদ্য কিছুই লেখে না। বাবার মতো এত বইও পড়ে না। অন্য মায়েরাও কেউ সেতার বাজায় না, কবিতা পড়ে না। একা একা পুতলি ঘুরে বেড়ায় দেশবন্ধু পার্কে। মনে হয় পাড়া থেকে, বাড়ি থেকে, বাবা-মা থেকে দূরে বহুদূরে চলে এসেছে।

"আচ্ছা, পুতলি তুমি তো এত শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার এই অদ্ভুত বাতিক কেন? খালি একলা একলা দূর দূর ঘুরে বেড়ানো?"

"আমার যে খুব ভাল লাগে, নামনেইদা।"

যেমন সেবার পার্কে সারাদিন বসেছিল পুতলি। শেষে পার্কের পুবদিকে রাস্তার ওপারের তিনতলা বাড়ি থেকে শংকরদা তাকে দেখতে পেল। শংকরদা খদ্দর পরে আর খুব আস্তে আস্তে কথা বলে, প্রায়ই দাড়ি কামায় না। বাবা বলে শংকরদা গান্ধীজির চেলা। পুতলিকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে সটান নেমে এল পার্কে।

"পুতলি এই অসময়ে এখানে কী করছ? বাড়ি যাবে মা?"

"না।"

"কেন? মা বকেছে?"

"না।"

"তবে?"

"এমনিই। আমার এখানে কিচ্ছু ভালো লাগে না। অন্য কোথাও যেতে চাই।"

'অন্য কোথাও যেতে চাও? তা বেশ তো, একলা না গিয়ে চল না আমাদের সঙ্গে। আমরা আজই একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি, তুমি কখনো সেরকম জায়গা দেখনি। চল, আমাদের সঙ্গে। বাড়ি ফেরার দরকারই নেই।"

শংকরদা হাত ধরে পুতলিকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে গেল। শংকরদা, তার বোন ঝন্টিদি পুতলির বাড়ি গিয়ে তার জামাকাপড় সব নিয়ে এল। ওদের সঙ্গে সোজা চলে গেল ঘাটাল। সেখানে খুব মজা হল। হৈ হৈ। বাড়িভর্তি লোক, কত হাসি গল্প খেলা, সব সময় জমজমাট। কিন্তু কদিনের জন্য! আবার ফিরে এল সব কলকাতায়, পুতলিকে বাড়ি পৌঁছে দিল শংকরদা। পুতলি দেখে বাবা-মা দুজনেরই কেমন যেন মুখ ভার ভার। যাকগে, পুতুলির ভারি বয়ে গেল। পুতলিতো প্রত্যেকদিনই গম্ভীর মুখে থাকে, তাতে কারো কিছু এসে যায় কি? দুপুর হতে না হতেই জানালায় গিয়ে বসে, সামনের জানালায় নামনেইদা আধশোওয়া।

"পুতলি, কোথায় গিয়েছিলে? কদিন তোমাকে তো দেখিনি।"

"আমি তো বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলাম।"

"চলে গিয়েছিলে? সে কি, কোথায় চলে গিয়েছিলে?"

"ওই যে শংকরদা আছে না, খদ্দর পবে, বাবাকে কাকাবাবু বলে ডাকে আর বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে তর্ক করে, আমি ওদেব সঙ্গে একটা নতুন জায়গায় গিয়েছিলাম।"

"তাই নাকি, কী রকম জায়গা?"

"খুব মজার। নাম ঘাটাল। ওখানে না অনেক বাঁদব আছে। একদিন হয়েছে কি ছাদে সব জামাকাপড় শুকোচ্ছে, আব আমি সিঁড়ির মাথায় বসে কুল খাচ্ছি। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বাঁদর এসে পটাপট কাপড়গুলো তুলতে শুরু করল। আমি চেঁচিয়ে যেই সবাইকে ডাকাডাকি করছি অমনি বাঁদরটা না কাপড়টাপড় সব ধপ্ করে ফেলে দিয়ে আমার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে লাফ দিয়ে পাশের মস্ত কাঁঠালগাছটার ডালে উঠে পালিয়ে গেল।"

"হাঃ হাঃ হাঃ। আর তুমি কী করলে?"

"আমি? আমি তো ভ্যা করে কেঁদে ফেললাম, জান আমার গালে না লাল লাল দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাই জন্য শংকরদা, বুলুদা, টুলুদা সবাই মিলে ঝন্টিদিকে কী বকুনিই না দিল। 'মেয়ের গালে দাগ দেখলে কাকাবাবু আমাদের কারো আর মুখ দেখবেন না।' ওরা সব বাবাকে কাকাবাবু বলে।"

"আচ্ছা, পুতলি, তুমি এরকম বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলে কেন?"

"এমনিই।"

"এমনিই মানে কি? তোমার বাবা-মা তোমাকে কত ভালোবাসে। তুমি তাঁদের একমাত্র সন্তান। তুমি যদি এরকম শুধু এমনি এমনি সব ছেড়ে চলে যেতে চাও তাহলে ওঁদের মনে কত কষ্ট হয়? তুমিও তো ওঁদের ভালোবাসো, তাই না?"

"হুঁ।"

"তাহলে?"

পুতলি চুপ। খানিকক্ষণ বাদে বলে ঃ

"আমার যে অনেক দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করে, তাই।"

"কেন তোর এত দূরে যেতে ইচ্ছে করে বল্‌তো?"

"বাঃ তুমিই তো রোজ বল, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে রাজপুত্র যাচ্ছে দূরে, বহুদূরে।"

"সে তো গল্প। আর এ তো প্রত্যেক দিনের সত্যি, আমরা যাকে বলি বাস্তব, যা আমাদের জীবনে দু-বেলা ঘটছে। তাছাড়া গল্পেও তো রাজপুত্র যায় বহুদূরে রাজকন্যার খোঁজে, রাজকন্যা কি কোথাও যায়?"

"আচ্ছা বাবা, এমন গল্প হতে পারে না যেখানে রাজকন্যা যায় রাজপুত্রের খোঁজে?

"দূর বোকা, তা কি করে হবে। গল্প একটাই। রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় করে যায় রাজকন্যার খোঁজে আর রাক্ষসের হাতে বন্দিনী রাজকন্যা অপেক্ষা করে থাকে কবে রাজপুত্র আসবে, রাক্ষসকে মেরে তার হাতের কড়া পায়ের শেকল খুলে দিয়ে নিয়ে যাবে নিজের রাজ্যে।"

"কেন?"

"কেন আবার কি, রাজকন্যা মেয়ে, রাজপুত্র ছেলে, তাই।"

"বাঃ, এই তো নরেশ ছেলে আর আমি মেয়ে। ও তো একটা এক নম্বরের ভীতু। তুমি কি ভাব ও কখনো কিছু করতে পারবে? কক্ষনো না। আর আমি তো মেয়ে, কিন্তু দেখ আমি সব পারি। পাঁচিল টপকানো, গাছে চড়া, দোলনা নিয়ে মারামারি করা। ও পারে আমার মতো দোলনা নিয়ে ওই অত ওপরে উঠতে?"

"দূর পাগলি কোথাকার। এই সব পাঁচিলে ওঠা, গাছে চড়া, দোলনায় দোলা নিয়ে কি গল্প হয়?"

"কেন এগুলো তো সত্যি। সেই যে তুমি যাকে বললে বাস্তব, তাই। ঠিক না?

"নিশ্চয়ই। কিন্তু শুধু বাস্তব দিয়ে তো গল্প হয় না।"

"তবে কী করে গল্প হয়?"

"আচ্ছা, তোর মা বিজয়ার সময় যখন নারকোলের তক্তি বানায় তুই খেয়াল করে দেখেছিস?"

"বারে, দেখব না কেন। এইবার তো আমি মায়ের সঙ্গে কত তক্তি বানালাম?"

"তাহলে বল্‌ দেখি কী করে তক্তি হয়।"

"সে তো আমি খুব জানি। নারকোল কুরিয়ে বাটা হয়। বড়ো কড়াইয়ে এত চিনি ঢেলে এই এতটুকু জল দিতে হয়। চিনি যখন গলে রসগোল্লার রসের মতো তখন তাতে নারকোল বাটা দিয়ে খুব করে নাড়তে হয়। যেই কড়াইয়ে লেগে লেগে আসে, অমনি নামিয়ে বড় থালায় ঢেলে ফেলতে হয়। ট্রাঙ্কে ঠাকুমার সেই যে কালো কালো মাটির সব ছাঁচ আছে না — কোনোটা পদ্ম, কোনোটা শাঁখ, কোনোটা মাছ — সেগুলোতে আগে থেকে তেল হাত বুলোনো থাকে। এবার গরম গরম চিনি-জ্বাল দেওয়া নারকোল বাটা বেশ করে চেপে ছাঁচগুলোতে ভর্তি কর, একটু বাদে সাবধানে খুলে নাও। ব্যস হয়ে গেল। মা বলে, যত পরিপাটি করে, মোলায়েম করে ছাঁচ ভরাট করবে তত চমৎকার হবে শাঁখ পদ্ম মাছ।"

"গল্পও ঠিক এরকম, বুঝলি। রাজপুত্র রাজকন্যার খোঁজ করে — একটা ছাঁচ, যেমন তোর শাঁখ; রাজকন্যা রাক্ষসের হাতে বন্দিনী — ধর তোর মাছ; আবার রাজপুত্র রাক্ষসকে মেরে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে — একটা পদ্ম। পর পর ছাঁচে ফেলতে হবে, তবেই না সুন্দর হবে। আর প্রত্যেক দিনের সত্যি যাকে আমরা বাস্তব বলি, তা হচ্ছে একেবারে গোটা গোটা নারকোল। তা থেকে গল্প বানানো অনেক পরিশ্রম। তাকে মিহি করে পিষে যখন নরম করে ছাঁচে ফেলা হয়, তখন আর তার নারকোলের চেহারা থাকে না। দেখিস তো, যেরকম ছাঁচ, ঠিক সেইরকমই তক্তি। গল্পে বাস্তব তার বেশি নয়, বুঝলি এবারে?।"

পুতলি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না। তার মনে সবসময় কেমন একটা সন্দেহ, ছাঁচের সঙ্গে সত্যির সম্পর্কটা বুঝি একেবারে গোলমেলে।

"আচ্ছা বাবা, রাজকন্যার যদি রাজপুত্রকে পছন্দ না হয়?"

"সে কি কথা, এত কাণ্ড করে সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে, কোন দীঘির তলায় ডুব দিয়ে প্রাণভোমরা তুলে এনে রাক্ষসদের মেরে ফেলে রাজপুত্র! কত কষ্ট করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করবে আর রাজকন্যার কিনা এমন বীর রাজপুত্রকে পছন্দ হবে না?"

"হতেই হবে এমন কোনো মানে আছে? ওই যে সামনের বাড়ির পল্টুদা, কী জোয়ান তাগড়া, বাপরে! কত স্পোর্টসে জেতে, বিরাট বিরাট ঝকঝকে কাপ হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরে। ও যদি রাজপুত্র হয় তো নির্ঘাত রাক্ষস খোক্কস সব মেরেই পাট করে দেবে। কিন্তু আমি যদি রাজকন্যা হতাম, আমার কিন্তু ওই পল্টুদার মতো রাজপুত্র মোটেই ভাল লাগত না।"

"তোর কী রকম রাজপুত্র চাই একবার শুনি।"

"কেন, নামনেইদার মতো। কিন্তু বাবা, নামনেইদা তো কোনো খেলাতেই কাপ পায় না। সে তো খেলতেই পারে না। তাহলে কী হবে?"

"এই তো, তুই আবার মুস্কিলে ফেললি। গল্পে যে রাজপুত্রকে বীর হতেই হয়। আর তোর বাস্তবের রাজপুত্র বিছানায় শুয়ে কেশে কেশে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরকম সত্যিকারের রাজপুত্র বীর হবে কী করে?"

কী করে তা পুতলিও ভেবে পায় না। মাঝে মাঝে মনে হয় গল্পের সঙ্গে বাস্তবের কোনোই সম্পর্ক নেই, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। গল্পে রাজপুত্র রাক্ষসকে মেরে রাজকন্যাকে বিয়ে করে। তারা চিরকাল সুখে ঘরকন্না করে। মায়েরও তো বিয়ে হয়েছে। মা তো রাজকন্যার মতোই রূপসী। আর কারো মা এত সুন্দর নয়। সবাই বলে মেজজ্যাঠাইমা কেমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মত। আর নীতুকাকিমা কি ঢলঢলে শ্রী। পুতলি একদম বিশ্বাস করে না। মেজজ্যাঠাইমা তো খালি মোটাসোটা ফর্সা, আর নীতুকাকিমা? হুঁ, সে তো একেবারে কালোকুচ্ছিৎ। বড়োরা তো কিছুই বোঝে না তাই হাসে, যখন পুতলি গম্ভীর মুখে বলে, 'আমার মা পরমাসুন্দরী রাজকন্যা। ঘরে বন্দী। মোটা মোটা লোহার গরাদে জানালায়, তার ফাঁকে ফাঁকে আকাশ দেখে। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র আসবে।

হয়তো বা মাঝে মাঝে গুনগুন করে "এই কি গো শেষ দান" বা "জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা" বা ছলছল চোখে রবিঠাকুর পড়ে, "তোমা 'পরে এই মোর অভিশাপ।" কিন্তু মা যদি রাজকন্যা, তাহলে রাক্ষস কে? রাজকন্যার বিয়ে হয়, বাবার সঙ্গে তো মায়ের বিয়ে হয়েছে, আবার রাজকন্যা চোখের জল ফেলে যখন সে রাক্ষসের হাতে বন্দী থাকে। কত সময় মায়ের চোখেও তো জল দেখে পুতলি' তাহলে রাজপুত্র কে?

"আচ্ছা বাবা, তোমার কি মনে হয় রাজপুত্র সবসময় রাজপুত্রই থাকে? বিয়ের পর সে যদি রাক্ষস হয়ে যায় আর রাজকন্যাকে ঘরে বন্দী করে রাখে?"

"তোর মাথায় কোথা থেকে যে উদ্ভট প্রশ্ন আসে। রাজপুত্র সবসময় রাজপুত্র, রাক্ষস সবসময় রাক্ষস, রাজকন্যা সবসময় রাজকন্যা। তক্তির ছাঁচ, মনে রাখবি। পদ্মফুলের ছাঁচে শুধুই পদ্ম, শাঁখের ছাঁচে শাখ. মাছের ছাঁচে মাছ। ব্যস, কোনো এদিক ওদিক হওয়ার যো নেই। পদ্ম কী করে শাঁখ বা মাছ হবে?"

"জান, গতবার পুজোর পরে মায়ের সঙ্গে দুটো থিয়েটার দেখেছিলাম। প্রথমদিনে যে ভালো লোক হল, ওমা পরের দিনে দেখি স্টেজে সেই আবার খারাপ লোক হয়ে গেছে। যেন একদিন যে রাজপুত্র অন্যদিন সেই রাক্ষস। আমি ঠিক জানি তুমি বলবে গল্পে যা হয় সত্যি করে, তোমার সেই যে কি বলে বাস্তবে, সেরকম হয় না।"

কিন্তু পুতলি জানে বাস্তবে হামেশাই রাজপুত্র রাক্ষস বদলা-বদলি হয়ে যায়। যেমন বাবা। দিনের বেলা কত ভাল, শান্ত সুন্দর। রাত্রে অন্য চেহারা। একটা ছাঁচে মোটেই মানুষকে আঁটে না। রাতের বাবা কখনও বন্দিনী রাজকন্যার মত চোখের জল ফেলে, কখনও বা হয়ে যায় রাক্ষস — হালুম লো ঝালুম লো — কী সাংঘাতিক নিষ্ঠুর। আবার কখনও তাকে এমনই গোলমেলে দেখায়, পুতলি রাজপুত্র না রাক্ষস কিছুই ঠিক করতে পারে না। বাবার সঙ্গে মায়ের কিন্তু বদল হয় না। মা সেই একই রকম থাকে, ভুরু কুঁচকে পাতলা ঠোঁট শক্ত করে চেপে রাখা পুতলির স্কেলে টানা লাইনের মতো। প্রতিদিন সন্ধে হতে না হতেই পুতলি ঘুমিয়ে পড়ে, মাঝরাত নাগাদ তার দিব্যি এক ঘুম হয়ে যায়। তখন বিছানায় শুয়ে জেগে থাকে। কত রাত শুনে শুনে রাতের বাবা সম্পর্কে পুতলির মনে গুটিকতক ছক হয়ে গেছে। যেন তার নিজস্ব তত্ত্বির ছাঁচ।

পুতলির তত্ত্বি ঃ ছাঁচ নং ঃ বন্দিনী রাজকন্যা

মা ঃ আচ্ছা, তোমার রোজই এত মদ খেতে হয়? একটা রাতও কি তুমি সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পার না?

বাবা ঃ আ ঃ নীলিমা। তুমি কেন বোঝ না কী যে ভীষণ কষ্ট। আমার দোষের মধ্যে ছাদে টবে দুটো ফুলগাছ লাগাই। যে আমি দেশে কত সুন্দর বাগান করেছিলাম, এখন দুটো টব নিয়ে থাকি। বরাবর আমার গাছেব শখ মাইনর স্কুলে পড়বার সময় অঙ্ক ভুল করলেই যামিনী পণ্ডিত কান ধরে বলতেন, 'খালি বাগিচা করস! খালি বাগিচা করস, হারামজাদা!

মা ঃ তোমার দেশের বাগানের সঙ্গে আজকের এই আচরণের সম্পর্ক কী?

বাবা ঃ আ ঃ এই তোমাকে নিয়ে মুস্কিল। খুব সম্পর্ক আছে খুব সম্পর্ক আছে। অতীত থেকেই তো বর্তমান আবার বর্তমানের গহ্বরে ভবিষ্যৎ। সেই যে সেবার হাতিবাগানে বোমা পড়ল, মনে পড়ে? পুতলি তখন তোমার কোলে। তোমাদের দেশে পাঠিয়ে দিলাম। আচ্ছা তখন তো তুমি নিজের চোখে দেখেছ আমার হাতের সেই কামিনী গাছ? কী তার ফুল, কেমন তার সুবাস। আর আজ সে ফুল চোখে দেখার অধিকার পর্যন্ত আমার নেই। এইজন্যই কি ক্লাস ছেড়ে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম? এমনই স্বাধীনতা পেলাম যে সাতপুরুষের ভিটেয় পা পর্যন্ত দিতে পারি না। এই জন্যই মদ খাই। মদ খেলে আমার সেই কামিনী ফুলের গন্ধ পাই। কোথায় সে গাছ, কোথায় সে মাটি। 'হে পদ্মা আমার, তোমায় আমায় দেখা শতশতবার/একদিন জনহীন তোমার পুলিনে/গোধূলির সন্ধ্যালগ্নে হেমন্তের দিনে/সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান/তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরাণ।"

ম্যাপ খুলে পুতলি দেখেছে পদ্মা একটা নদীর নাম। পদ্মাকে কেন কীর্তিনাশা বলা হইয়া থাকে? মাষ্টারমশাই-এর কাছে পুতলিকে লিখতে হবে। পুতলি তো অনেক পড়ে ফেলেছে কিনা। বাবা অনেক সময়ই কবিতা মুখস্থ বলে। এটা নাকি আবৃত্তি করা। খুব ভালো লাগে বাবার গলায় কবিতা, যদিও অনেক শক্ত শক্ত কথা থাকে — পুলিনে, লগ্নে, অস্তমান, সঁপিয়াছিনু। তবে মানে পুরোপুরি না বুঝলেও খুব একটা এসে যায় না। পুতলির ধারণা কবিতা শুধু কবিতাই, তার কোনো মানে টানে থাকার বিশেষ দরকার নেই।

পুতলির তত্ত্বি ঃ ছাঁচ নং ২ ঃ রাক্ষস

মা ঃ এই যে এতক্ষণে মনে পড়ল, সংসার বলে কিছু আছে? আর ফিরলে কেন, যেখানে ফূর্তি করছিলে বাকি রাতটুকু সেখানেই কাটিয়ে এলে পারতে?

বাবা ঃ আমার যখন ইচ্ছে তখন ফিরব। এটা কলকাতা শহর, আমি পুরুষমানুষ। ফূর্তি করার ইচ্ছে হলে করব, ইচ্ছে ফুরিয়ে গেলে করব না ব্যস। আমাদের দেশে চিরকাল তাই হয়ে এসেছে, চিরকাল হবে। তুমি নারী, তোমার একমাত্র পরিচয় আমার স্ত্রী হিসাবে। আমি ছাড়া তোমার গতি নেই। হিন্দু স্ত্রীর যেভাবে থাকার কথা সেভাবে থাক, ওরকম চোখ রাঙাতে এস না।

মা ঃ কেন রাঙাব না? মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে আমি কি মানুষ নই?

পুরুষ আর মেয়েমানুষ কি এতই তফাৎ যে সারা জীবন তোমরা স্বামীরা স্ত্রীদের একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে আর আমাদের তা মুখ বুজে সইতে হবে?

বাবা ঃ আহা, কত তুমি মুখ বুজে সহ্য করছ! যাও, অত নাকে কেঁদো না। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের আদর্শ সর্বংসহা ধরিত্রী, আর তুমি কি? আমার যেন আর জানতে বাকি নেই তোমার লীলাখেলা কাকে নিয়ে। তুমি আবার হিন্দু স্ত্রী, না? তোমার মতো স্ত্রী যার সে পুরুষ বাইরে যাবে না তো কী করবে? ঘরে বসে পরপুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর লীলাখেলা দেখবে?"

মা ঃ কী, কী বললে? লীলাখেলা? কোথায়, কবে আমাকে দেখেছো লীলাখেলা খেলতে? কে দেখেছে? আন, সাক্ষী আন। যা মুখে আসে তাই বলে যাচ্ছ, না?

বাবা ঃ বেশ করছি! সাক্ষী আনতে হবে আমাকে, না? আমি তোমার স্বামী, আমার মুখের কথাই যথেষ্ট, বুঝেছ। বেশি মেজাজ দেখিও না। আহা, রাধিকার কলঙ্ক প্রমাণের জন্য বৃন্দাবনে এজলাস বসবে।

মা ঃ বটে? আমি রাধিকা! বেশ তো তাই যদি হয়ে থাকি তাহলেই বা তুমি কোন মুখে বাকাচ্ছ? বলি, এই না কত বড়ো বড়ো বুলি, সতীত্ব বুর্জোয়া সংস্কার মাত্র! ওই তো কদিন আগে তোমার বিপ্লবী সাঙ্গোপাঙ্গরা যখন তাড়াখাওয়া ঘেয়ো কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, ওই যে তোমাদের সাধের কমরেড দিলীপ গুপ্ত [illegible] উপ্তে, তখন তার কমরেডানি বৌ বিজয়ার পেট খসানোর জন্য আমার গলার দেড় [illegible] সরু চেনটা খুলে নিয়ে যাওনি? আমার কাছে স্বামীগিরি ফলাতে এসেছ, না? আহা, হিন্দু [illegible] আদর্শ। নিজের স্ত্রীর বেলায় ষোল আনা তো নয় একেবারে আঠারো আনা হিন্দু [illegible] পরস্ত্রীর বেলায় বিপ্লবী! আমি তো মুখ্যুসুখ্যু মেয়েমানুষ কিন্তু তোমাদের এই ধাপ্পাবাজি"......

ঝনঝন ঝনঝন ঝনঝন। পুতলি জানে টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখা খাবারদাবার, বাসনপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলার শব্দ। পাশের ঘর থেকে পুতলি দেখতে পায় না, বাবা না মা। নির্ঘাৎ মা। চটে গেলে মায়ের ফর্সা মুখ লাল হয়ে যায়, সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে, কী যে করে আর না করে কোনো কাণ্ডজ্ঞানই থাকে না। যেসব কথা মা তরতর করে বলে যায় অনেক সময়ই সে তার মানে কোথাও খুঁজে পায় না। যেমন, পেট খসানো। চলন্তিকা খুলে পেট আর খসানো দুটোই বের করেছে পুতলি। পেট — উদর জঠর। খসা— - বিচ্যুত হওয়া, ভাঙিয়া পড়া, ধসা। কিন্তু পেট আর খসা দুটো মিলে কোনো মাথামুণ্ডুই হয় না। পুতলি সত্যি বুঝতে পারে না মা কেন এমন বিদঘুটে বাংলা বলে! বাবার বাংলাও শক্ত, কিন্তু শুনতে কত সুন্দর, অনেকটা কবিতারই মত। তাছাড়া একটু চলন্তিকা ঘাঁটাঘাঁটি করলে একটা কোনোরকম মানে দাঁড় করানো যায়। এই তো বাবার সর্বংসহা, ধরিত্রী, দুটোই সে দিব্যি চলন্তিকায় পেয়ে গেল। দিনের বাবা আর রাতের বাবা একটা জিনিসে এক, চলন্তিকার বাংলায়। সেইজন্যই বোধ হয় বাবা এত বড় মুখ করে নিজেকে পুরুষ বলে। আর মা তো মেয়েমানুষ তাই কথাও বাবার মতো এত ভাল করে বলতে পারে না। আচ্ছা, পুতলিও তো মায়েরই মতো মেয়ে, তাহলে তার মুখেও কি কখনও বাবার মতো সুন্দর বাংলা আসবে না? এটা ভাবলেই

পুতলির মনটা খারাপ হয়। তাই রোজ সে চেয়ার টেনে টেনে বাবার আলমারির উঁচু উঁচু তাক থেকে কত শক্ত শক্ত বই নামিয়ে পড়তে চেষ্টা করে। কোলে তার সবসময় চলন্তিকা।

পুতলির তক্তি ঃ ছাঁচ নং ৩ ঃ রাজপুত্র-রাক্ষস-রাজ.....

মা ঃ দেখ, তোমাকে আমি শেষ বারের মত বলছি, আমি কিছুতেই তোমার এই বেলেল্লাপনা সইব না। কী পেয়েছ কি আমাকে? কাঠ না পাথর?

বাবা ঃ আঃ নীলিমা, রোজ রাতে কেন অনর্থক ঝামেলা কর বলতো? আমি লেখক, আমি বুদ্ধিজীবী, বুঝেছ? আমাকে কঠোর সাধনা করতে হয়, তার জন্য রসদ চাই। টলস্টয়ের জীবনী পড়েছ, ভিক্টর হুগোর, বায়রনের?

মা ঃ না। আমি কোনো টলস্টয়, কোনো ভিক্টর হুগো, কোনো বায়রন কিচ্ছু পড়িনি। আমি নেহাৎ সাদামাটা মেয়েমানুষ। আমি চাই ঘর-সংসার, একটু শান্তি, একটু মাথা তুলে থাকা। এটা কি এমনই বেশি কিছু, একেবারে আকাশের চাঁদ চাওয়া?

বাবা ঃ সংসার চাও। সাধারণ মেয়ে, সাদামাটা। তা হলে সাধারণ সাদামাটা পুরুষের কাছে যাও না কেন? আমি কি সরকারি অফিসের কেরানী কোনো হরিদাস পাল, যে ১০টা — ৫টা ফাইল চষব, ঝাড়নে করে বৌয়ের হাতের রুটি তরকারি টিফিন কৌটোয় বেঁধে অফিস-কাছারি করব, বিকেলে তোমার মতো সাধারণ মেয়ের পাখার বাতাস খেতে খেতে যত খেঁদি-পেঁচি -হাবু-গাবুর বায়না শুনব? ওসব আমার দ্বারা হবে না। আমার একটা মিশন আছে, সমস্ত জীবন ধরে তার জন্য আমার সাধনা, বুঝলে?

মা ঃ না, বুঝিনি। কিসের মিশন, কিসের সাধনা, এমন কোন্ আহা-মরি শেষের সন্ধান?

বাবা ঃ কেন, আমি লিখি। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জীবনের সত্যকে তুলে ধরাই আমার লক্ষ্য। এই যে মানুষের এত দুঃখ, এত বঞ্চনা, লাঞ্ছনার যন্ত্রণা —

মা ঃ থাক থাক, হয়েছে। ওসব বস্তাপচা বুলি তোমার পাঠকদের শুনিও। মানুষের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদে, এই তো? তাই আমার সংসারে টানাটানি থাক বা না থাক, সেই পার্টিশানের পর দেশ থেকে যত লোক এ বাড়িতে এসে ছিঁচকাঁদুনে আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছে, কেউ আজ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরে যায়নি। পাশের বাড়ির ঐ যে ছোকরা কেশে কেশে মরছে তার জন্য তো দুবেলা তোমার চোখের জল ঝরে।

বাবা ঃ হ্যাঁ ঝরবেই তো, একশো বার ঝরবে। আমার মনুষ্যত্ব আছে, মানবিক মূল্যবোধ আছে। চোখের সামনে এরকম অন্যায় দেখে নির্বিকার রয়ে যাব? সমস্ত সভ্যদেশে আজকাল যক্ষ্মা সারিয়ে ফেলা যায়। আর ছেলেটার বাবা-মা নেই বলে কাকা-জ্যাঠারা বিনা চিকিৎসায় ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে দেবে! সব সম্পত্তির লোভ! এই সব মধ্যবিত্ত, বুর্জোয়ারা জেলের আসামীদের চেয়েও নিকৃষ্ট। একটা জ্বলজ্যান্ত টাটকা যুবককে তিলে তিলে মেরে ফেলছে। এই তো সমাজ, ন্যায়নীতির লেশমাত্র নেই।

মা ঃ আর আমার বেলাতেই বুঝি খুব নীতিফীতির বালাই আছে? আমার বাবা গরিব, আমাদের স্কুল কলেজে পড়াতে পারেননি, বাড়িতে খালি বাংলাটুকু শিখিয়ে কোনো গতিকে মেয়ে পার করেছেন। ঝি গিরি ছাড়া আমার রোজগারের কোনো রাস্তাই নেই। তোমার সংসারে আমিও কি ওই ক্ষয়া ছেলেটার মতো ঘরে-বন্ধ নই? ওর মতো আমারও কি ভেতরটা ঝাঁজরা হয়ে যাচ্ছে না?

বাবা ঃ এই তো তোমাকে নিয়ে মুস্কিল, নীলিমা। সব প্রশ্নই তুমি ব্যক্তিগত করে ফেল। আদর্শর সঙ্গে সবসময় জীবনকে মিশিয়ে দাও কেন? সেই জন্যই অযথা অধীর হয়ে পড়। তোমার কষ্টের কী হয়েছেটা কী? খেতে পাচ্ছ, পরতে পাচ্ছ, সমাজে স্ত্রী হিসাবে পরিচয় পাচ্ছ, আবার কী চাই?

মা ঃ ভারি আমার খাওয়া পরা পরিচয়! কিসের পরিচয়? ও তো একখানা লেবেল, অমুকের বৌ। একটা জেলখানার কয়েদিও এসব পায় — খাওয়া পরা লেবেল।

বাবা ঃ আচ্ছা নীলিমা, তোমার কি এত উত্তেজিত হবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে? পৃথিবীতে তুমিই তো একমাত্র স্ত্রী নও যাকে স্বামীর দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হয়? পুরুষের, বিশেষ করে শিল্পীপুরুষের স্বভাবইতো সৃষ্টিছাড়া। আমাদের মধ্যে প্রতিভার যে, প্রচণ্ড চাপ তা তোমাদের ঐ ছোটো ছোটো একনিষ্ঠ গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকতে পারে না, সব সীমা ভেঙেচুরে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।

মা ঃ তাহলে ঐ ছোটো ছোটো গণ্ডিটণ্ডির মধ্যে আদৌ আস কেন? যাও না, সব কিছুর বাইরে গিয়ে থাকগে যাও। বিয়ে কর কেন?

বাবা ঃ এইটাই তো তোমার ভুল। কী যে মারাত্মক ভুল! চিরকাল তো বাইরে ঘুরে বেরিয়ে থাকা যায় না, ক্লান্তি আসে, ঘরে তখন ফিরতেই হয়। আচ্ছা নীলিমা, তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা কর না কেন বলতো? আমাদের মতো পুরুষের জীবনে স্ত্রী হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু, এই স্থির কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করেই তো চারিদিকে নিজেদের বিস্তার করে দিতে পারি। একেবারে যে হারিয়ে যাই না, নষ্ট হয়ে যাই না, সে তো তোমাদের মতো শক্ত খুঁটির জোরেই। তোমার কাছেই যে আমার নির্বিচার আশ্রয়। জান, এইজন্যই আমরা পুরুষরা সাহিত্যে তোমাদের কল্যাণীমূর্তির কত স্তুতি করি। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি মেয়েদের ত্যাগ অপরিসীম। সত্যিই তোমরা দেবী।

মা ঃ দেবী? কে দেবী? দেবী তো মাটির পাথরের মূর্তিমাত্র। না, আমি দেবী নই, আমার রক্তমাংসের শরীর। ক্ষিদে তেষ্টা চাহিদা সব আমার আছে। এমন কি মনও আছে। বুঝেছ? মন বলে একটা জিনিস আছে যেটা কোনো জন্মে কোনোদিন কোনো কিছুই ত্যাগ করতে চায়নি, চায় না, না না। ত্যাগ! কল্যাণী মূর্তি! তোমরা মেয়েদের কষ্ট না দিয়ে, যন্ত্রণা না দিয়ে সৃষ্টি করতে পার না কেন? কেন, কেন, কেন.......?

ঠক্‌ঠক্ ঠক্‌ঠক্ ঠক্‌ঠক্ ঠক্.....। জোড়া আলমারি দুটোর মাঝখানে যে ফাঁকা দেওয়ালটুকু আছে, পুতলি জানে, মা এখন সেইখানটায় মাথা ঠুকছে। আর তো জায়গাই নেই ও ঘরে, বাকি দেওয়াল সব বইয়ের আলমারি-র‍্যাকে ঠাসা। এই রকম মাথা ঠুকে ঠুকেই কবে কখন মাথা ফেটে লাল রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। মায়ের সিঁথির সিঁদুর দেখলেই পুতলির মনে হয় যেন কত কত বছরের বন্ধ দেওয়ালে মাথা ঠোকার চিহ্ন। আর মায়ের এই কেন-কেন-কেন অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে বাতাসে সবখানে। পুতলিকেও বেশ দিব্যি কেন-রোগে পেয়ে বসেছে। সরকারি অফিসের কেরানীকে হরিদাস পাল বলে কেন? কেন? এ বাড়িতে যারা যাতায়াত করে তারা হয় বাবার মতো, লেখে, কেউ বা ছবি আঁকে, নয় তো খদ্দর পরে। অন্য কোনো রকম মানুষ পুতলি দেখে না। কেন? বাবা বলে যারা খদ্দর পরে, যারা দেশের কাজ করে, লিখিয়ে-আঁকিয়েদের মতো তাদেরও আদর্শ আছে, তাদেরও নাকি সাধনা আছে। মা কিন্তু মুখ বেঁকায়। ঘোড়ার ডিমের আদর্শ। ঐ তো ছবি আঁকিয়ে পঙ্কজ সেন, ও তো নিজে মুখেই বলত, 'পার্টিতে ঢুকেছিলাম গৌরীর জন্য, আহা কী অপরূপ রূপ! তখন কি আর জানি সে নাচছে মোহনের কপালে। মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে এখন তো প্যারিসে, ফরাসী বৌ নিয়ে ফিরল বলে। ভারি আমার আদর্শ! বালিগঞ্জের বিপ্লবীদের মতো আদর্শ হল তোমাদের একটা ফ্যাশান। আর শুধু ফ্যাশানই নয়, যা ইচ্ছে তাই করার চাবিকাঠি। শিল্প, সাহিত্য, দেশোদ্ধার — হুঁ! নাম করলেই চিচিংফাঁক।"

পুতলি কিন্তু বাবার কথাই বিশ্বাস করে। সে জানে আদর্শ জিনিসটা মোটেই ফেলনা নয়। বাবার মুখে অনেকবার শুনে শুনে সে শিখে গেছে পৃথিবীতে দুরকমের মানুষ হয় —

একদল বাবা আর বাবার বন্ধুদের মতো লেখক, শিল্পী, দেশপ্রেমিক — বাবা যাদের বলে আদর্শবাদী। আর অন্যদল হল বুর্জোয়া, হরিদাস পাল। এরা খায়দায়, ঘুমায়, টাকা রোজগার করে, বাস। অর্থাৎ বাবার চলন্তিকার ভাষায় মানব সভ্যতার বিবর্তনে এদের কোনো অবদান নেই। এই অবদান কথাটা একেবারে আণ্ডার লাইন করা, যেন মাস্টারমশাই শক্ত বানানের তলায় লাল পেনসিলে বেশ করে ধরে ধরে লাইন কাটছেন, পুতলিকে আবার মুখস্থ করতে হবে তো। সবাই বলে বাবার অনেক অবদান আছে; সেইজন্যই বোধ হয় সকলে সবসময় পুতলিকে বলে অমুকের মেয়ে। এইটা পুতলির খুব আশ্চর্য লাগে। কই রাজকন্যাকে তো কেউ কক্ষনো অমুকের মেয়ে বলে না। রাজকন্যা শুধুই রাজকন্যা। পরমাসুন্দরী, দুধে আলতা গায়ের রঙ, পটলচেরা চোখ বাঁশির মত নাক, মেঘের মত চুল। নাঃ, পুতলির এসব কিছুই নেই, সেই তো অনেকটা বাবার মতই দেখতে। কিন্তু রাজকন্যা তো রাক্ষসের হাতে বন্দী থাকে বলেই রাজকন্যা। নইলে তো তাকে রাজপুত্র চিনতই না। পুতলি জানালার আলসেতে বসে গরাদের ফাঁকে ফাঁকে দেখে আকাশ। কবে কখন এই আকাশ দিয়েই উড়ে আসবে পক্ষীরাজ ঘোড়া।

"আচ্ছা নামনেইদা, তুমি কখনো পক্ষীরাজ ঘোড়া দেখেছ?"

"কেন? হঠাৎ পক্ষীরাজ ঘোড়া দিয়ে কী হবে?"

"বাবা বলে কিনা আমার এই ঘুরে বেড়ানো, বাড়ি থেকে চলে যাওয়া — এসব বাতিক একদম ভাল নয়। রাজকন্যা কি কোথাও যায়? রাজপুত্রই পক্ষীরাজ ঘোড়ায় করে তার কাছে আসে। তাই ভাবছিলাম কি তুমি যদি একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া পেতে তাহলে তাতে আমাকে চাপিয়ে এক্ষুনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারতে।"

"কোথায় নিয়ে যেতাম তোমাকে?"

"ঐ অনেক অনেক দূরে, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে অন্য কোনো দেশে, যেখানে কেউ আমাকে চেনে না, আমার নামই জানে না।"

"নাম না জানলে কী লাভ হবে তোমার ? তুমি যে পুতলি তাই তো কেউ বুঝবে না।"

"বাঃ সেই তো চাই। আমি যখন দোলনায় দুলতে দুলতে অনেক অনেক ওপরে উঠি সামনে দেখি খালি আকাশ আর আকাশ, তখন মনে হয় আমি খালি আমি, আর কিচ্ছু নই, কেউ আমাকে কোনো নামে তখন ডাকে না। কী যে ভীষণ ভীষণ আনন্দ হয় আমার। জান, আমার এত ভাল লাগে।"

"কিন্তু আমার যে অসুখ বেড়েছে পুতলি, গায়ে মোটে জোরই নেই। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় যে আমি নিজেই চড়তে পারব না, তোমাকে নিয়ে যাব কী করে?"

"তাহলে কী হবে?"

"কোনো চিন্তা নেই। অনেক সময় আছে। গল্পে কি রাজকন্যা তোমার মতো মোটে আট বছরের? তুমি বড়ো হও, ঠিক দেখবে রাজপুত্র এসে যাবে। তার থাকবে কি সুন্দর সাদা ধবধবে পক্ষীরাজ ঘোড়া ; তাতে তোমাকে বসিয়ে নিয়ে যাবে নতুন দেশে, যেখানে তুমি হবে শুধু তুমি, কোনো নাম থাকবে না, ঠিক যেমনটি তুমি চাও।"

"তুমি ঠিক জান রাজপুত্র আসবে?"

"নিশ্চয়ই আসবে।"

"তিন সত্যি কর।"

"সত্যি সত্যি সত্যি।"

এমন এক একদিন আসে যখন বাস্তবের সঙ্গে পুতলির তত্ত্বের কোনো ছাঁচই মেলে না। একদিন যায় দুদিন যায় বাবা ফেরে না। তিন দিনের দিন কত রাতে অন্য লোকেরা বাবাকে

নিয়ে আসে, ধরাধরি করে শোবার ঘরে পৌঁছে দেয়। তখন আর কোনো কথাই হয় না, চলন্তিকা হার মানে। এ কদিন মায়ের খাওয়া নেই ঘুম নেই। পরমাসুন্দরী রাজকন্যার চোখের কোলে ঘন অন্ধকার। নামনেইদার মতো, ঘর থেকে বেরুবার কোনো আশাই নেই। আসলে তখন গল্পটল্প, রাজকন্যা রাজপুত্র কোনো কিছুই মনে পড়ে না পুতলির। চারিদিকে খালি কষ্ট। সকাল হয়। পার্কে না গিয়ে আজ পুতলি চুপচাপ বিছানায় শুয়ে। মা এসে হাত ধরে টেনে তোলে, বাবার সামনে নিয়ে হাজির করে। পুতলি দেখে তার এতকালের চেনা বাবা কোথায় হারিয়ে গেছে। তালপাকানো চিনিজ্বাল দেওয়া নারকোল বাটার স্তূপ পড়ে, কোনো ছাঁচেই পরিচয় মেলে না। না পদ্ম, না শাঁখ, না মাছ। সেবার পার্কের পুকুরে পুবদিকের কোনায় শান্তির মার সঙ্গে সরস্বতী ঠাকুর ভাসান দিয়ে এসেছিল পুতলি। পরে একদিন ঠাকুরকে দেখতে গিয়ে তো অবাক , কোথায় প্রতিমা, কোথায় মুক্তাহার, শ্বেত পদ্মাসন, কোথায়ই বা বাহন রাজহাঁস! যা ছিল বীণা পুস্তকে হস্তে কমল লোচনা-ভগবতী ভারতী, তা হয়ে গেছে এক তাল কাদা। না আছে রূপ, না আছে রঙ, না আছে অর্থ। এই এক তাল কাদার কাছেই তো সেদিন মা বলেছিল সে তো লেখাপড়া শেখেনি, কিন্তু ঠাকুর তার মেয়ে যেন শেখে। পুতলিকে কত যত্নে বসিয়ে বেলপাতায় গঙ্গাজল-দুধে খাগের কলম ডুবিয়ে ধরে ধরে লিখিয়েছিল শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ, শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ, শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ। আজকে বাবার নিচু মাথা বন্ধ মুখ দেখে কেন জানি পুতলির মনে পড়ে বাগ্‌দেবী বিসর্জন। এদিকে তার সামনে এক অজানা নাটকের অভিনয় চলেছে। "নিজের মেয়ের মাথায় হাত রেখে তুমি বল....."। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে মায়ের জেরাগুলো যন্ত্রণা। রান্না খাওয়া সব মাথায় ওঠে। শেষে কতক্ষণ পরে নস্যিরঙের ঢাকনা দেওয়া ছোট স্যুটকেসটা আলমারির মাথা থেকে নামিয়ে এনে মা হাতের কাছে যা পায়, এলোমেলো কতগুলো জামাকাপড় ভর্তি করে পুতলির হাত ধরে চলে যায় দাদুর বাড়ি। সেখানে মোটে দুটো ঘর, একতলা স্যাঁতসেঁতে। তবুও পুতলির খুব আরাম লাগে। বাইরের ঘরে সে একটা জানালার আলসেতে বসে পড়ে 'নীল পাখী'। আর তার দু বছরের বড় মামু অন্য জানালায় বসে একমনে সেফটিপিন চোষে। পুতলির আর মামুর খুব ভাব। বড়োদের সম্পর্কে সব শলাপরামর্শ তারা একসঙ্গে করে। এখন অন্য ঘরে বেঞ্চিতে সারি করে রাখা ট্রাঙ্কের ওপর থাক থাক রাখা তোষক বিছানার মাথায় দুজনে চড়ে বসে থাকে। দাদু পুতলিদের বাড়ি গেলে প্রায়ই পুতলি দাদুর হাত ধরে এ বাড়িতে চলে আসে। একদিন আধদিন কাটিয়ে দেয় মামুর সার্ট আর হাফপ্যান্ট পরে। বাবা কিন্তু পুতলির এ বাড়িতে থেকে যাওয়াটা বেশি পছন্দ করে না। এবারে তিনদিন যেতে বাবা এসে হাজির। চিরকালের চেনা বাবা। "খুব মামাবাড়ির আদর খাওয়া হচ্ছে, মামার বিয়ে হলে বুঝবি। মামাবাড়ি ভারি মজা কিলচড় নাই/মামী আইল ঠ্যাংগা লইয়া পরাণ লইয়া ধাই।" হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। সবাই খুব হাসে। তারপর দাদুর সঙ্গে বাবার নিচু গলায় কী যেন কথা হয়। ও ঘরে মা চুপটি করে বসে। দাদু এসে মাকে আস্তে আস্তে কত কী বলে। মা অনেকবার মাথা নাড়ে। মাঝে মাঝে জোরে বলে ওঠে "খালি অমুকের স্ত্রী অমুকের স্ত্রী।" দাদু মায়ের মাথায় পিঠে হাত বোলায়, বারান্দা থেকে পুতলিকে ডেকে এনে মায়ের হাতে তার ছোটো হাতখানা ধরিয়ে দেয়। ট্যাক্সি ডাকা হয়। বাবা-মার সঙ্গে বাড়ি ফেরে পুতলি। দরজায় পা দিতে না দিতেই শান্তির মা বলে, "ওমা পুতলিদিদি তুমি তো দুদিন ছিলে না, এদিকে তোমার নামনেইদার কি হয়েছে জানো? আহা, অমন সোন্দর চাঁদের মত ছেলেটা! পরশু রাতে কী রক্তবমি, ঘর বিছানা একেবারে ভেসে গিয়েছিল গো। আমার ঠাকুরঝি তো ও বাড়িতে কাজ করে, বলে "বৌদি, কী রক্ত কী রক্ত, সে চোখে দেখা যায় না....."

"হয়েছে হয়েছে, আর এতটুকু বাচ্চাকে এসব অসুখবিসুখের কথা সাতখানা করে বলতে হবে না।"

বাবার ধমকে শান্তির মা চুপ। এক ঝটকায় মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে সোজা পড়ার ঘরে চলে যায় পুতলি, সামনে নামনেইদার জানালা খোলা, ঘন কালির ভেতর ডুবে থাকা চোখ জোড়া নেই, বালিসে হেলান দেওয়া নেই কোনো পাতলা ফর্সা মুখ — বিছানাটাই নেই। সব ফাঁকা। যেন কোনো দিনই কিছু ছিল না। আর এক দৌড়ে ফিরে আসে পুতলি।

"বাবা, বাবা, নামনেইদা কোথায়?"

"ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, অসুখটা একটু বেড়েছে কিনা। তুই এসব নিয়ে মাথা ঘামাসনি। নরেশ দেখ গিয়ে তোর জন্য কত মন কেমন করছে। প্রত্যেকদিন জিজ্ঞাসা করত শান্তির মাকে, পুতলিদি কবে আসবে। যা, আজ বিকেলে নরেশকে নিয়ে পার্কে দোলনায় দুলে আয়।"

পুতলি কিছু বলে না, চুপ করে শোনে। দুপুরে খেতে বসে পুতলি আর বাবা। এক হাতা বিটের ডালনা দেয় মা পুতলির থালায়। সোনার মতো ঝকঝকে কাঁসার থালায় ছড়িয়ে পড়ে লাল টুকটুকে রঙ। নামেনেইদার চারিদিকে কি এমনই লাল রক্ত। হাত গুটিয়ে নেয় পুতলি। না, সে খাবে না। মা বিরক্ত হয়। এই অবুঝ জেদী মেয়ে নিয়ে তার হয়েছে এক যন্ত্রণা। কিছুতেই খাবে না। "আহা, থাকই না। একদিন বিটের তরকারি না খেলে তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে না। সবসময় ওকে তাড়না কর কেন? শিশুদের মন কোমল বাবার বক্তৃতা।....." পুতলি খাওয়া ফেলে উঠে যায়। আজকে আর রাজকন্যা-রাজপুত্রের গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে না। পড়ার ঘরে জানালায় গিয়ে বসে পুতলি। কাক ছানা পোনারা কী করছে দেখা যাক। ও মা, বাসাটা যে একেবারে খালি। কোথায় গেল সব? পুতলির মনে পড়ে ক'দিন ধরেই দেখছিল ছানাগুলো একটু একটু উড়তে চেষ্টা করছে। তখনো অবশ্য বাবা-মার মত হৃষ্টপুষ্ট হয়নি, তবু কাক বলে অন্তত চেনা যায়, একটু ছোটখাট রোগা-রোগা এই যা। তাহলে সব উড়ে চলে গেছে। ঐ আকাশে। গরাদের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ দেখে পুতলি। যত জোরেই পুতলি দোলনা ওপরে তুলুক না কেন, সে খালি এক মুহূর্তের জন্য আকাশ ছুঁতে পারে। আর কাকছানারা কেমন দিব্যি আকাশের কোলের মধ্যে উড়ে চলে যায় কোথায়, হয়তো বা নতুন কোনো দেশে।

আজ চারটে বাজতে না বাজতেই বেরিয়ে পড়ে পুতলি। না, দোলনায় দুলতে নয়। দোলনায় চড়ে কী হবে, শুধু তো নিমেষের জন্য আকাশ ছোঁওয়া, পরক্ষণেই তো নিচে, মাটির দিকে নেমে আসতে হয়। না, ফুলও তুলবে না, বিকেলবেলা তো ফুল তোলার সময় নয়। পুজো তো সব সকালে হয়। সে সময় চলে গেছে বহুক্ষণ। ছোটো ছোটো পা ফেলে পুতলি চলে।

রাস্তা পার হতে হবে, ও পারে পার্কের গেট। মোড়ের মাথায় ভুবন দোকানের ঝাঁপ খুলেছে। এখান থেকে পুতলি সবসময় বিস্কুট লজেন্স কেনে। পয়সা না দিয়েও কেনা যায়। মাসের শেষে ভুবন বাড়িতে এসে মায়ের কাছ থেকে সব পয়সা নিয়ে যায়। যেদিন বিকেলে গান্ধীজি মারা গেলেন, তারপর দিন তো পুতলিদের বাড়িতে উনোন জ্বলেনি, বাবা বলেছিল, "নিদারুণ বিপর্যয়, খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছা হয় কারো; আজ শোকের দিন।" পুতলির কিন্তু খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল। পার্কে যাবার সময় দেখে ভুবনের দোকান বন্ধ, পাশে খুপরি জানালা খুলে ভুবন দাঁড়িয়ে, ওখানেই ও থাকে কি না। পুতলি ডেকে বলল, "ও ভুবনদা খুব খিদে পেয়েছে। আমাদের বাড়িতে আজ রান্না হয়নি। আমাকে বিস্কুট দাও।" ভুবন তাড়াতাড়ি চোখ পাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল চেপে মাথা নাড়ল। কিন্তু আস্তে আস্তে এদিক ওদিক তাকিয়ে

চট্ করে ঝাঁপ খুলে সামনের বোয়মটা থেকে চারটে ক্রিম বিস্কুট বের করে পুতলির হাতে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল "কাউকে ব'লো না যেন।" একবার পুতলি ভাবল আজকেই সেদিনের মতো ভুবনদার কাছ থেকে ক্রিম বিস্কুট নিয়ে গেলে হয়। কিন্তু তার যে খিদে নেই মোটেই। তাহলে আজকে কি বাবা সেদিন যা বলেছিল তাই, শোকের দিন? চলন্তিকা খুলে পুতলি দেখেছে, শোক — ইষ্ট বিয়োগজনিত দুঃখ। আবার ইষ্ট বিয়োগ মানে আত্মীয় বিয়োগ। বিয়োগ, অর্থাৎ কিনা বিচ্ছেদ, বিরহ, মৃত্যু, অভাব। পরিষ্কার মনে আছে পুতলির বিচ্ছেদ, বিরহ, মৃত্যু, অভাব। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে পুতলি। পার্কে ঢুকে সোজা চলতে থাকে উত্তর-পুব দিকে। রেলিং টপকে ধুপ করে লাফিয়ে পড়ে সীমানার বাইরে। সামনে খাল। দুদিকে মাঝে মাঝে কাঠের গুদাম। এখানে কুলিকামিন দিনমজুর ছাড়া বিশেষ কেউ আসে না। আস্তে আস্তে পুতলি উত্তর দিকে খাল বরাবর এগিয়ে চলে। জল থেকে জমি অনেক ওপরে। এবড়ো খেবড়ো পাড়, বেশি খাড়াই নয়। একটু দূরে দেখে একটা ছোটো নৌকো। ঠিক যেমনটি গল্পের বইতে থাকে। নৌকো আঁকতে হলে পুতলি সবসময় এই রকম নৌকোই আঁকে। এমন কি মাঝখানে ছোটো এতটুকু ছইও আছে। মানুষজন কেউ কোথাও নেই। যেন নৌকোটা আপনি আপনিই ভেসে এসেছে, আবার নিজে নিজেই ভেসে চলে যাবে কোথায় কে জানে। চটি জোড়া পুতলি খুলে রাখে পাড়ে। তারপর বসে প'ড়ে দুহাতে মাটিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে লাফিয়ে পড়ে। ও মা, নৌকোটা যে টল্‌মল টল্‌মল্ করছে। আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল বলে। গলুইটা চেপে ধরে সামলে নেয় পুতলি। ছইয়ের মধ্যে ঢুকে উঠে বসে, দুদিকে আবার কাপড় দিয়ে পর্দার মতো ঢাকা। বেশ ভালই হ'ল, বাইরে থেকে পুতলিকে কেউ আর দেখতে পাবে না। তবে কী ভীষণ নোংরা কাপড়টা, কী বিচ্ছিরি মেছো মেছো গন্ধ! ঝট করে ফ্রকের একটা কোণ তুলে নাকে চেপে বসে থাকে, এখানে কেউ তো আর তাকে দেখছে না। একটু বাদে নৌকোটা খুব দুলে উঠল, বেশ ভারি পায়ে কে যেন এসে উঠল। খুটখাট আওয়াজ, দড়ি খোলার শব্দ। জলে ছপ্ ছপ্ করে যেন কী পড়তে লাগল। আরে নৌকোটা চলতে শুরু করেছে যে! এতদিনে সত্যি সত্যি পুতলি চলে যাচ্ছে। এই নৌকোয় করে পুতলি চলে যাবে কোথায়, সেই বড়ো নদীতে, সেখান থেকে সমুদ্রে আর সমুদ্রে, যেমন সাত সমুদ্র তেরো নদী — নাঃ বড্ড গন্ধ। পুতলির কী রকম বমি-বমি লাগছে। কিন্তু বেরুলেই যে লোকটা দেখতে পাবে আর নির্ঘাৎ জিজ্ঞাসা করবে, কার মেয়ে, কী নাম। তাহলে কী করে হবে। কী করা যায়। হঠাৎ পুতলির মাথায় একটা বুদ্ধি এল। যে দিকে বসে লোকটা নৌকো বাইছে, ছইয়ের কাপড় তুলে আস্তে আস্তে তার উল্টো দিকে বেরিয়ে এসে বসে পুতলি। বাবাঃ। এতক্ষণে একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচে। এখন বেশ ভালো লাগছে। তবে নৌকোটা যাচ্ছে খুব আস্তে আস্তে। এ তো অনেক অনেক দেরি হবে সমুদ্রে পৌঁছাতে। সামনে কাঠের গোলা ছাড়িয়ে যায় একটা, এই আর একটা। হঠাৎ কে যেন এ পাড় থেকে বলে ওঠে "আরে এযে পুতলি দিদি। ও পুতলি দিদি তুমি ও নৌকোয় চড়ে বসে আছ কেন?"

"ভজুদা আমি নৌকোয় করে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। বাড়িতে থাকব না। আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না।" পুতলির কথা শেষ হতে না হতেই ভজু তো প্রচণ্ড হৈ চৈ রৈ রৈ লাগিয়ে দিয়েছে। "নৌকো থামা, নৌকো থামা। ওরে কে কোথায় আছিস শিগগিরি আয়। বাবুদের বাড়ির মেয়েকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ধর ধর ধর....."

দেখতে না দেখতে পিল্‌পিল্ করে কত লোক বেরিয়ে এল। চারিদিক থেকে লোক নেমে এসে নৌকো আটকায়। পুতলিকে কোলে তুলে পাড়ে নিয়ে আসে ভজু। এদিকে মুখ তার সমানে চলছে, "অমুকবাবুর মেয়ে। আমি সে বাড়িতে কত বছর কাজ করেছি, ওকে

তো আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। কী-কাণ্ড, কী কাণ্ড। সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল, ভগবান রক্ষে করেছেন।" তখন মাঝিকে নিয়ে এক মহা ঝঞ্ঝাট। সে বেচারা যত বলে — সে এসবের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না, পুতলিকে সে কোনোদিন চর্মচক্ষে দেখেইনি, নৌকোতে কোনো বাবুদের বাড়ির বাচ্চাকে তোলবার কথা সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। সে গরীব মানুষ, নৌকোতে মাল আনানেওয়া করে বৌ-বাচ্চার মুখের ভাত জোগায় — কিন্তু কে শোনে কার কথা। "বেটা বদমাশ, ন্যাকামি হচ্ছে, ছেলেধরা কোথাকার।" দমাদম মার পড়তে থাকে। তখন বুদ্ধি করে পুতলি বলে ওঠে, "ওকে মেরো না, মেরো না। ও সত্যি কিছু জানে না। আমি খালি নৌকোতে উঠে ছইয়ের মধ্যে বসেছিলাম। ও যখন নৌকোতে এল, আমাকে দেখতেই পায়নি। পরে আমি বাইরে এসে বসলাম, তখন ভজুদা আমাকে দেখল।' যাই হোক মাঝিটা তো মানে মানে ছাড়া পেল। ভজু, কাঠগোলার আরও কয়েকজন লোক মিলে পুতলিকে বাড়ি নিয়ে এল। বাবাকে টেলিফোন করল মা। তাড়াতাড়ি আড্ডা থেকে চলে এল বাবা।

"দেখ, মেয়ের কীর্তি দেখ একবাব। খালে নৌকোয় চেপে সমুদ্রে যাচ্ছিল। চিবকাল জেনেছি ছেলেরা সন্ন্যাসী হয়, সংসার ত্যাগট্যাগ করে। কোনো মেয়েব স্বভাব যে এরকম বাউণ্ডুলে হতে পারে তা তো বাপের জন্মে শুনিনি। কতবার বলেছি, ওকে ইস্কুলে দাও ইস্কুলে দাও। তাতো শুনবে না। আহ্লাদ কবে বাড়িতে রেখে দেবে। মেয়ে একা একা টৈ টৈ করে বেড়াক আর যত রাজ্যের বড়োদের বই পড়ুক। নাও, এখন ঠেলা সামলাও।"

"না, তুমি ঠিকই বলেছ। এখন দেখছি ওকে স্কুলে দেওয়া নেহাৎই দরকাব। একা বাড়িতে ওর মন টেকে না, নিঃসঙ্গ তো। আব পাঁচটা মেয়ের মতো সংসাব করতে হবে একদিন, এত উদাসীন হলে চলবে কী করে। নাঃ এই বছরই ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে। সবে তো মাস তিনেক হয়েছে নতুন বছরের। চেনাশোনা কত আছে, দেখি বলেটলে।"

পরের দিন দুপুবে খাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে কথা হয় পুতলির আব বাবার। 'তুই তো ভারি বোকা মেয়ে, মারাঠা ডিচ দিয়ে সমুদ্রে যাচ্ছিলি। একেবারে হাঁদারাম! এত বই পড়িস, ঘটে তবু কিছু বুদ্ধি নেই। আরে ও খাল তো মানুষ হাতে কেটে করেছে, বাইরে থেকে যাতে ডাকাত বদমাস দস্যু না ঢুকতে পারে, তাদের আটকাবার জন্য। ভেতরেব লোককে পালাতে দেবার জন্য নয়। দেখেছিস তো, কেমন নোংরা ঘোলা জল, কোনো ঢেউ নেই, যেন একটা ময়লা নালা।" সত্যিই তাই। এবারে বুঝতে পারে পুতলি। এখান থেকে বেরুবার কোনো রাস্তাই নেই। হয় শঙ্করদা হাত ধরে নিয়ে আসে, নয় ভজুদা কোলে করে বাড়ি পৌঁছায়। সবাই ওকে চেনে, ওর নাম জানে। পুতলি, অমুকের মেয়ে। যেমন মা, অমুকেব স্ত্রী। আকাশের দিকে চেয়ে টেলিফোনে গল্প করে, কখনও বা দুদিনের জন্য বাপের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সবই খালের নৌকো, কোনোটাই সমুদ্রে যায় না।

এই মাটি এই দেশ

কানাই কুণ্ডু

ভোরবেলা সাইকেলে কাগজের বাণ্ডিল চাপিয়ে পাঁই পাঁই দৌড়চ্ছিল মুকুল। দারুণ কাণ্ড। সারা দুনিয়া তোলপাড....

ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিল গোকুল। চিৎকার শুনে হাত কেঁপে গেল। আজকাল সুতো পরাতে একটু দেরি হয়। গত শীতে চোখের ছানি কাটাবে ভেবেছিল। এই শীতও পেরিয়ে গেল। এখন ডাক্তার দেখানোর অনেক হ্যাপা। গেলেই বলে, রক্ত পেচ্ছাপ করিয়ে আনো। বুকের ছবি কবো। এত কি পাবে গোকুল! ঝাপসা চোখে সুতোটা যখন প্রায় গলিয়ে এনেছে, ওদিকে লেলোর দোকানে বেয়াড়া চিৎকার। এইবার এস চাঁদু। বাড়াবাড়ি করেছ তো দেব একখানা ঝেড়ে।

গোকুল রাস্তার ওপারে তাকায়। উল্টো দিকে লেলোর পান সিগাবেটের দোকান। আগে নকশাল পার্টি করত। বোমায় একটা হাত উড়ে গেছে। তারপব তার নামও বদলে যায়। এখন সে এক হাতেই পানে চুন-খয়ের মাখায়। সুপুরি মৌরি জর্দা এলাচ ছড়িয়ে খিলি মুড়ে দিতে পারে। সেইখানেই অনেকে খবারের কাগজ খুলে তড়পায়। বোমার কথা বলে।

বোমা গোকুলের কাছে নতুন নয়। চোখের সামনে তাণ্ডব দেখেছে। বিকট আওয়াজ, আগুনের ঝলকানি আর ধোঁয়ায় ঢাকা চত্বর। তারপর পুলিশ আসে। আবার বাজার গম গম করে। কেনা বেচা চলে। মাঝখানে কাল যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আজ সে শহীদ। আজ যার সঙ্গে কথা হয়, কাল সে লাশ। কী যে একটা সময় গেছে তখন।

এখনও ফাটে না এমন নয়। তবে তারা সব গুণ্ডা বদমাশ। তোলা তোলে, চাঁদা নেয়। চুরি ছিনতাই করে। হঠাৎ আজকের চিৎকারে সে বিরক্ত হয়। বলে, সাত সকালে কী আরম্ভ করলি তোরা। বোমা ছাড়া অন্য কথা নেই?

আমরা নয় গো গোকুলদা। আমাদের গরমেন্ট বোমা ফাটিয়েছে।

ছি ছি। সকালবেলা গুজব ছড়াতে শুরু করলি।

গুজব হবে কেন। খবরের কাগজে লিখেছে। কাগজের লেখা কখনও গুজব হয়?

বলিস কী রে লেলো। গরমেন্ট হল গিয়ে আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কত্তা। আদালত পুলিশ নিয়ে দেশ শাসন করার কথা। তারা কেন বোমা ফাটাতে যাবে!

এইবার দেখ না, পাকিস্তানকে কী রকম টাইট দিই।

অনঙ্গ লেলোর কথার রেশ ধরে বলে, শুধু পাকিস্তান কেন। আমেরিকার দাদাগিরিও এবার বন্ধ। টুঁ করেছ কি দোব একখানা ঠুসে।

অনঙ্গ সুরকি কলে কুলি খাটায়। হাজিরা লেখে। লাল পার্টির মিটিন মিছিলে ঝাণ্ডা নিয়ে যায়। কলকাতা যাবার লোক যোগাড় করে।

পার্টির দাদাদের ধরে সুরকি কলে কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। দিব্যি আছে। এক হিন্দুস্তানী কাজিনকে বিয়ে করেছে। কলের টিনের চালায় কোয়ার্টার। বাচ্চার বাপ হয়েছে। তার এখন ফূর্তির প্রাণ। আজকের খবরে সে টগবগ করে ফুটছে। বলে, গোকুলকে একটা মিষ্টি পান :দ লেলো। আমি পয়সা দিচ্ছি।

সে কি রে অনঙ্গ। এত পয়সা খরচা করবি আমার জন্যে।

কেন তুমি যে আমার বউ-এর ব্লাউজের টিপকল খুলে হুকের ঘর বানিয়ে দিয়েছিলে।

তখন তোর নতুন বউ। কিছু একটা তো দিতে হয়।

আমাদের দেশ আজ বোমা বানিয়েছে। সেই খুশিতে তোমাকে খাওয়ালাম।

বোমা তো জগা পল্টুরাও বানায় শুনেছি।

আরে এ বোমা সে বোমা নয়। আণবিক বোমা।

সে আবার কেমন?

মানুষকে মানব বলে জানো তো। আর মানব থেকে হয় মানবিক?

কী জানি। হয় বোধহয়।

আর এই বোমা হল মানুষকে অমানুষ, মানে ধ্বংস করার বোমা। তাই আণবিক। একটা ফাটালে গোটা দেশ উড়ে যাবে। সবাই মায়ের ভোগে।

তবে কি পাকিস্তানের সঙ্গে আবার লড়াই বাধবে?

কি যে বল না তুমি। খবর শুনে অন্য দেশের লিডারদের রক্ত মাথায় উঠে গেছে। আর তোমার ওই ছিঁচকে দেশ পাকিস্তান। ওকে এখন আমরা...দুই আঙুলের নখের মুদ্রায় চাপ দিয়ে কথা শেষ করে অনঙ্গ।

গোকুল টিনের চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে থাকে। সামনে রঙচটা মান্ধাতা আমলের সেলাই মেশিন। বহু ব্যবহারে এবং নানা যন্ত্রাংশের বদলে নাম লেবেল নিশ্চিহ্ন। খোঁচা দাড়িওয়ালা গাল সে আস্তে মেশিনের গায়ে ঠেকায়। চোখ বোজা। ঠাণ্ডা হিমেল ছোঁয়া তাকে কাতর করে। বুকের মাঝে কথা বাজে। লেখাপড়ায় মন দিলি না বাজান। নজর এই ভাঙা মেশিনের চাকায়। তোর নসিবে এটাই লিখা আছে। তা শেখ মন দিয়া। চাকা ঘুরাইতে পারলে দুবেলার গোসলের অভাব থাকব না।

কোলে বসিয়ে মানুষটা তাকে সব দেখাত, শেখাত। এটা সুই হুইল। এইটা হইল গিয়্যা মেশিনের দাঁত। আমরা যেমন খাবার চাবাই, এও তেমন। অখন প্যাডেলে চাপা দিলেই, হুইল ঘুরব। আর এই রবিন হইল গিয়া মেশিনের ডানা।

তারপর পাশের টুলে বসিয়ে হাতে কাঁচি দেয়। কাপড় কাটার কত যে ছিড়ি ছাঁদ। বোতাম ঘরের কত যে কায়দা। একটু ভুল হলেই চড় থাপ্পড়। কান ধরে টান। তারপর আদর, গালে চুমা। দাড়িওয়ালা সুখের চুমায় তার ঘেন্না লাগত। কিন্তু দু'দিন সেই চুমা না পেলে গোকুল ইচ্ছে করে ভুল করত। থাপ্পড় খেত। অথচ তারা গোকুলের কেউ নয়। গোকুলও তাদের সংসারে উটকো মানুষ।

আজ কেন যে হাত পা থেমে আছে। কিছুতেই কাজে মন দিতে পারছে না। কত কাজ বাকি পড়ে আছে। সবই খুচরো। কারও প্যান্টের ঝুল খুলে বাড়ানো। কারও জামার হাতা ছোট করা। ভেতরের পকেট লাগানো। পুরো একটা জামা বা প্যান্ট সেলাই করাতে কেউ আসে না। তবে সুরকি কলের কামিনরা ব্লাউজ সেলাই করতে আসে। তাদেরও খুঁত খুতানি কত। বলে গলা হল্টারনেক হয়নি। এয়ারহোস্টেস কাট বানাতে বলেছিলাম। পাইপিং লালরঙের দাওনি কেন। মজুরি তো কম নাও না।

কথা শুনে গোকুলের দুখ্যু হয়। ভবানন্দের আউটফিট টেলারিং, চকবাজারের ফ্যাশন হাউসের তুলনায় তার মজুরি অর্ধেকেরও কম। অথচ সে সব কাট জানে। ছবি দেখে যে কোনও ডিজাইন বানাতে পারে। কিন্তু তার চেহারা দেখে লোকে বিশ্বাস করে না। তার দোকানের নামও নেই। ঝলমলে আলো নেই। পাঁচটা কারিগর নেই। সাইনবোর্ডও নেই। নেই বলা ভুল হবে, ছিল। দাঙ্গার সময় লোকেরা ভেঙে দিয়েছে। বেশ বাহারী নামও ছিল দোকানের। নওরোজ টেলারিং। প্রোঃ মাসাদুল নবী। কারিগর ছিল। ভিড়ও ছিল মানুষের। এইসব দেখেই না ঝড় জলের রাতে সে এই দোকানের আলসেতে উঠে বসেছিল। আগের দুটো দিন তার খাওয়া জোটেনি। সারা গায়ে ব্যথা। পাঁচটা টাকা চুরির দায়ে রানাঘাট স্টেশনের চা-দোকানী চড় লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

কত রকমের কাজই না করেছে গোকুল। চায়ের দোকান, মুদিখানা, মিঠাই তেলেভাজার দোকান, বাবুদের বাড়ি বাসন মাজা, কাপড় কাচা। কিন্তু তার এসব করার কথা নয়। জমি জিরেত ছিল। বাপ নরনারায়ণ ভটচায চাষ-বাস আর যজমানী করত। নদীর ধারে তুলসীতলা খামার নিয়ে বড় চালাঘর। পাঠশালে ভর্তিও করে দিয়েছিল। কে ভেবেছিল, যে নদী ফসলের জল যোগায়, তেষ্টা মেটায়, সেই একদিন পাড় ভাঙতে ভাঙতে ভরদুপুরে বাবা মাকে সমেত গভ্যে টেনে নিয়ে যাবে!

সে তখন পাঠশালে। খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছিল। নিজেদের ঘর আর খুঁজে পায়নি। বাবা-মাকেও না। ভটচায পাড়ার ভেতর দিয়ে খলবল করে নদীর জল ছুটে চলেছে। তিনখানা ঘর নেই। আর একটা অর্ধেক ঝুলছে। আকুল কান্নায় সে লুটিয়ে পড়েছিল। পাড়া পড়শিরা বাবা-বাছা করে ডেকে নিয়ে গেল। কিন্তু সে আর কটা দিন! তারা তাকে গরু চরাতে পাঠায়। মাঠ থেকে খড়ের আঁটি তুলে আনতে বলে। ধান সেদ্ধ করতে হয়। গোয়াল ঝাড়তে হয়। এর বদলে কারও বাড়িতে এক বাটি পান্তাভাত। কারও বাড়িতে মুড়ি পেঁয়াজ। কোনও বেলা তাও জুটত না। কাজ না থাকলে মানুষ শুধু শুধু খেতে দেবেই বা কেন!

কলকাতা থেকে এক ছোকরা বাবু এসেছিল বোসদের বাড়ি। তাকে আহাম্মুক বলে ডাকত। বলত, চরে খা রে আহাম্মুক, চরে খা।

গোকুল তার কথা বুঝত না। সে কি গরু না ছাগল। নাকি আকাশের পাখি। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। মাঠ থেকে গোবর কুড়িয়ে আনা। হাট থেকে আনাজের বস্তা বয়ে নিয়ে আসা। নেহাত কোনও কাজ না থাকলে টিউকল থেকে বৌদিদের ঘড়াভর্তি জল এনে দেওয়া। সারা দিনে তার বিশ্রাম ছিল না। অথচ খেতে দেবার সময়ে ভুলে যায়। বলে, আজ তো ও বাড়িতে খাবার কথা।

সে বলত, না গো বৌদি, আজ তোমাদের পালি।

এই যা! চাল নিতে মনে ছিল না বাছা। দু মুঠো মুড়ি খেয়ে নে।

এভাবেই পাঁচ বাড়িতে বাড়তি ভাত তরকারি, মুড়ি চিড়েতে তার পেটের খিদে পেটেই মরে যেত। ছোকরাবাবু তাকে বলত, খেয়ে উঠলি আহাম্মুক। যা দূরের কোনও গাছ তলে শুয়ে থাক। দেখলেই কাজে ডাকবে।

একদিন বিকেলবেলা তাকে একটা পুরো টাকা দিয়ে বাবুটি বলেছিল, নিজের কাছে রেখে দে। আমি কাল সকালে চলে যাব।

টাকার ছোঁয়া পেয়েই গোকুল বুঝেছিল, চরে খাওয়ার মানে। সেই রাতেই খামারে পাতা তার ছেঁড়া চটের বিছানা বগলে নদীর পারে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই তোড় নেই। বিক্রম নেই। ধূ ধূ বালিডাঙা। মাঝখানে তিরতিরে একফালি জল। ঝিলমিল করছে চাঁদের আলো। তার বুক ভরে কান্না এসেছিল। গলা বোজা। সেই মরা নদীর দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল,

মা গো মা, বাবা গো তোমাদের সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। আমি চলে যাচ্ছি গো মা। যাই রে রাক্কুসী নদী, যাই।

চোখটা রগড়ে নেয় গোকুল। তেলচিটে চশমার কাঁচ মোছে। তবু সব কেমন ঝাপসা মনে হয়। জেলাবোর্ডের মেম্বার সত্যসাধন ঘোষের ছেলে তুষারকে দেখতে পায়। বলে, একটা দু'লাইনের চিঠি লিখে দাও না দাদু।

পাশে বসিয়ে বিত্তান্ত বলে যায়। লেখা শেষ হলে, কি লিখলে দাদু একবার পড়ে শোনাও তো।

তুষার পড়া শুরু করে।

চাচামিঞা, আশাকরি তুমি ও চাচিমা ভগবানের দয়ায় কুশল। আমি একই রকম। তবে বিপদের কথা হইল যে আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট বোমা বানাইয়াছে। তোমাদের দেশের সঙ্গে নাকি যুদ্ধ করিবে। এটি সাংঘাতিক বোমা। ফাটাইলে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়া যাইবে। আমার ভীষণ ভয় হইতেছে। তোমরা পত্রপাঠ এখানে চলিয়া আসিবে। প্রণাম।

ইতি তোমাদের গোকুল

গোকুল চোখের জল মোছে। বলে, বাহ বেশ গুছিয়ে লিখেছ দাদু। এখন খামের ওপরে এই ঠিকানাটা ইংরিজিতে লিখে বাড়ি যাবার সময়ে চিঠিটা পোস্টমাস্টারমশায়ের হাতে দিও কিন্তু। বাক্সে ফেলোনি যেন। বিদেশের চিঠি তো। আর এই নাও ডাকটিকিটের টাকা। যদি কিছু ফেরত হয়, তুমি জিলিপি খেও।

তবু মনে শান্তি নেই। কেমন ভয়ের মধ্যে থাকে। সবাইকে সন্দেহ হয়। খদ্দের দেখলেও বিরক্ত। আর সবাই ওই এক চচ্চা। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বলে, বোমা ছাড়া কি তোমাদের অন্য কথা নেই। দুটো শান্তির কথা বলতে পার। ধম্মের কথা কও। তা নয়, কেবল মানুষ মারার কল নিয়ে বকর বকর।

নির্বিরোধ শান্ত মানুষটার এমন কথা শুনে তারা অবাক। বলে, হঠাৎ ধর্মের কথা বলতে যাব কেন। আমাদের কি মরার বয়স হয়েছে!

তর্ক করা গোকুলের স্বভাব নয়। সে জোরে প্যাডেল চালায়। পুরনো মেশিনে এক টানা খ্যারর খ্যারর শব্দ। কথা শোনা যায় না। তারা বিরক্ত হয়ে চলে যায়। গোকুল থাকে না। জোর প্যাডেল চালিয়ে আওয়াজ তোলে। সে কারও কথা শুনতে চায় না। কেবল মাস্টারমশাইয়ের অপেক্ষা করে। তিনি খাঁটি খবর জানেন। অনেক জ্ঞানেব কথা বলেন। বেশ কিছুদিন তিনি আসছেন না। বুড়ো মানুষ। শরীর খারাপ হয়েছে হয়তো। বাকি সবার চোখে সে হিংসা দেখতে পায়। মানুষ যে কত তাড়াতাড়ি বদলে যায়। কেবল সে নিজে বদলাতে পারে না। পারবেই বা কী করে। সেই মানুষটা ছিল তার বাপের চেয়েও আপন। আর তার চাচিমা!

সেই ঝড়জলের রাতে এই দোকানের বাইরে সে উবু হয়ে বসেছিল। কী বিষ্টি কী বিষ্টি! থামার নামটি নেই। সঙ্গে দমকা হাওয়া। সুরকি কলে ইঁটভাঙার মজুর নেবে খবর পেয়েছিল। ভোর সকালে লাইন দিতে হবে। রাতটুকু বারান্দার আলসেতে শুয়ে কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে এসে মালিক তাকে দেখতে পায়। হেট হেট করে তাড়া করে। কিন্তু কোথায় যাবে গোকুল। জুল জুল করে তাকিয়ে থাকে। মালিকের বউ আওয়াজ পেয়ে বাইরে আসে। কারে তাড়াও। কুত্তা নাকি। হায় আল্লা এ যে মানষের পোলা। তোমার ঘর দুয়ার নাই বাজান?

ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠেছিল গোকুল। আমার কেউ নাই গো মা। বাপ মা ঘর দুয়ার সব নদীর গভ্যে।

এখানে কার কাছে আসছ?

মাথা নাড়ে গোকুল।

রাইতে কই থাকবা?

গোকুল আবার মাথা নাড়ে। দুহাতে চোখের জল মোছে।

আস ভিতরে আস। ভিজ্যা একারে গোবর হইয়া গেছ। লও পানি মুছ্যা ফালাও বলে, গামছা এগিয়ে দেয়।

মালিক তেড়ে আসে। কর কী। চিনা নাই জানা নাই। ঘরে তুলবার চাও!

দেখছ না, বাইরে ঝড় জলের রাত। এই বিপদে লোক বিড়াল কুত্তারেও আশ্রয় দেয়। আর এ তো মানষের পোলা।

ন দশ বছর বয়সে সেই অসহায় অবস্থায় সামান্য আদর অথবা নরম কথাব সুখে শেষ রাতের দিকে তার হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এল। কটা দিন বেঘোরে শুয়ে কাটিয়েছিল তার মনে নেই। আর এই কদিনেই সে এ বাড়ির গোউল্যা হয়ে গেছে। মালিক হয়েছে চাচামিঞা। মায়ের মতো সেই বউটি হয়েছে তাব আদরের চাচিমা। ইস্কুলে ভর্তি হল গোকুল। কিন্তু পড়ার চেয়ে চাচামিঞার মেশিনে সে অনেক বেশি রহস্য খুঁজে পায়। যত্নে আদরে দিন কাটে। পেটভরে খেতে পায়। ইচ্ছেমতো মেশিনের প্যাডেল ঘোবায়। একদিন চাচিমা বলে, গোউল্যা তো অখন আমাদের ঘরের পোলা। অব ছুন্নত কবাইয়া দাও মিঞাজান। মসজিদে নিয়া যাও।

রেগে গিয়েছিল চাচামিঞা। তুমি কি আমারে দেশছাড়া কবাইতে চাও। অর ধর্ম আমি নষ্ট করতে পারুম না। তুমি কালসাপ পোষ। অখনও সময় আছে। অরে বিদা কইরা দাও।

তুমি যে অরে সহ্য করতে পার না জানি। বিদা দিতে হইলে আমারেও দিও। আমিও অর লগে যামু।

কিন্তু একদিন সত্যি যে তাদের দেশছাড়া হতে হবে ভাবেনি গোকুল। সেই দিনগুলো ভুলতে পারে না। ভয়ঙ্কর সব ভয়ের দিন। দেশ জুড়ে দাঙ্গা। কলকাতা ব্যারাকপুর নৈহাটি পেরিয়ে এই চক বাজারেও ছড়িয়ে পড়ল। দিনে কথার ফিসফাস। রাতে বুক কাঁপানো হল্লা। অঞ্চলের সব মুসলমান ঘব বাড়ি ছেড়ে মসজিদে আশ্রয় নেয়। চাচামিঞাও গোছগাছ করে। আর সেই রাতেই টেলারিং-এর ঝাপে দুমদাম লাঠি ডাণ্ডার আওয়াজ। বাইরে খ্যাপা মানুষের চিৎকার। চাচামিঞার নাম ধরে গালাগাল। বেবিযে আয় শালা নেড়ের বাচ্চা। না বেরোলে ঘরে আগুন দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।

সাইনবোর্ড ঝনঝন শব্দে খসে পড়ে। টিনের ঝাঁপ দুমড়ে যায়। চাচামিঞা মেশিনের আড়ালে লুকিয়ে ঠকঠক করে কাঁপে। চাচিমা তাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদে। বাইরে যাবার ঝাঁপ ছাড়া কোনও ফাঁক-ফোকর নেই। ঝাঁপের সামনে খুনের নেশায় মেতে ওঠা একপাল মানুষ। তাদের লাঠি ডাণ্ডার ঘায়ে ঝাঁপ আর বেশিক্ষণ টিকবে না। ষোলো সতেরো বছরের গোকুলের মনে কোথা থেকে যেন সাহস ভর করে। চাচিমাকে বুক থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। ঝাঁপ খোলে। চাচামিঞা ফিসফিস করে, ওই দেখ তোমার কালসাপ হিন্দুগো দরজা খুইল্যা দেয়। আগে আর কোপাও।

এক দঙ্গল মানুষের সামনে সেই রাতের অন্ধকারে সে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, তোরা আমার হিন্দুয়ানী দেখে নে। আমি বারেন্দ্র বামুনের ছেলে। গয়েশপুরের ভটচায পাড়ায় আমার কাকা জেঠাদের বাস। চাচার গায়ে হাত তুলবার আগে তোদের বম্মহত্যা করতে হবে।

মানুষগুলো থমকে যায়। নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করে। তারপর শাসিয়ে যায়, আজ পার পেয়ে গেলি গোকুল। কিন্তু তোর চাচাকে তুই বাঁচাতে পারবি না।

রাত্রে কারও চোখে ঘুম ছিল না। খাওয়া হয়নি। হল্লা চিৎকার এবং আর্তনাদের আতঙ্ক সবাইকে যেন বোবা করে রেখেছিল। ভোরের আগে চারপাশে নিঝুম। কোনও আওয়াজ নেই। দূরের চটকলে কেবল বয়লারের একঘেয়ে ফ্যাসফ্যাস। টাকা সোনার বাণ্ডিল পেটের কাপড়ে বেঁধে চাচামিঞারা বেরিয়ে পড়ে। চাচিমা যাবার সময়ে ছলছল চোখে গোকুলকে বুকে জড়ায়। ব্রাহ্মণ হিঁদু যাই হইস না ক্যান, তুই আমার পোলা। তরে সব দিয়া গেলাম। আমাদের এন্তেকালের খবর পাইলে দফনে দুমুঠা মাটি দিস বাজান।

তারপর তারা অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

পঞ্চাশ বছর পরে আজ রাতের অন্ধকারে তার ঝাঁপে ধাক্কাধাক্কি কেন। এবার কি তবে মুসলমানরা বদলা নিতে এল। কিন্তু তার চাচামিঞা, চাচিমা তো মারা যায়নি। তার যাবাব এক বছর পরেই সে চিঠি পেয়েছিল। লাহোরের এক গ্রাম থেকে লেখা। এখন বছবে দু বছরে চিঠি আসে তবে কি তার চিঠি পেয়ে চাচামিঞারা ফিবে এল। সে ধড়মড় করে উঠে পড়ে। যাই গো চাচিমা। আসছি আমি। একটু দাঁড়াও বলে, সে ঝাঁপের শিকল খুলে তুলে ধরে।

খাকি পোষাকের দুই পুলিশ ভেতরে ঢোকে। পিঠেব ওপর সজোরে ডাণ্ডা মেবে বলে, চলিয়ে।

কোথায়?

থানায়।

কেন?

থানায় গেলে মালুম পড়বে।

কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না গোকুল। দিন চলে যায়। পুলিশবা খাঁচার ভেতরে আটকে রাখে। কখন দিন হয়, রাত নামে, গোকুলের হিসেব থাকে না। দিন গুনতেও ভুল হয়ে যায়।

হঠাৎ একদিন তাকে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। এক চিলতে আলো বাতাসও ঢোকে না। সামনে লোহার গরাদ জাল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে একটা আলোর ডুম আছে। কিন্তু জ্বালানোর সুইচ নেই। মেঝেয় শুয়ে গোকুল আকাশ পাতাল ভাবে। সে তো কোনও খুন-জখম, চুরি-চামারি করেনি। কাউকে গালাগালও দেয়নি। দু'পয়সা ফাঁকি দেয়নি। তবু যে তাকে কেন এরা আটকে রাখে। তার ভাবনা গুলিয়ে যায়। কখনও নেশাখোরের মতো ঝিমোয়।

তখন দিন না রাত ঠিক বুঝতে পারে না। ঘরের ভেতরের ডুমটা হঠাৎ জ্বলে ওঠে। লালচে রঙের আবছা আলো। অন্ধকার কাটে না। বাইরে সেপাইয়ের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। গোকুল তাকে বলে, আলো জ্বালালে কেন। নিবিয়ে দাও। অন্ধকারই আমার ভাল লাগে।

বাতি এখন জ্বলবে। কলকাতা থেকে বড়সাহেব এসেছে। তোমার জেরা হবে।

কিছু পরেই ভারিক্কি চেহারার এক বেঁটে মানুষ দু'জন পুলিশ নিয়ে ঘরে ঢোকে। অন্ধকারে তাদের মুখ দেখা যায় না। তাদের বসার জন্যে চেয়ার আসে। জালের দরজা বন্ধ হয়। তার মুখের ওপর জোরালো টর্চের আলো পড়ে। গোকুল হাত দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের ওপর শক্ত রুলের বাড়ি। ব্যথায় ককিয়ে ওঠে গোকুল। আলোটা মুখ থেকে তার শরীরে নামে। পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে আলোটা নিভে যায়। গমগম শব্দে কথা শোনা যায়। এ তো দেখি বুড়ো হাবড়া। ঠিক লোক এনেছেন তো?

হ্যাঁ স্যার। এই সেই লোক।

জমাট ছানিপড়া চোখটায় আবার আলো ছড়িয়ে তিনি নিভিয়ে দেন ঘরময় আবার লাল আবছা আলো। মানুষগুলো অস্পষ্ট ছায়ার মত। ভারিক্কি মানুষটি আবার তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি আই এস আইয়ের চর!

এজ্ঞে কার চর বললেন বাবু? কোন নদী?

হুম। কী নাম তোমার?

গোকুলেশ্বর ভটচায। পিতা ঈশ্বর নরনারায়ণ ভটচায।

তা বাবু গোকুলচন্দ্র, তোমাকে যে এখন সব বলতে হবে। নয়তো ওই যে রড দেখছ ওপরে, ওতে ঝুলিয়ে এরা তোমার হাড় ভেঙে গোকুলে পাঠিয়ে দেবে।

আমি সবই সত্যি বলব। আপনি হুকুম করুন।

পাকিস্তানে খবর পাঠাও?

এজ্ঞে কদিন আগে পাঠিয়েছিলুম।

কেন?

এজ্ঞে, ভয়ে।

কিসের ভয়?

গরমেন্ট নাকি বোমা ফাটিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। তাই চাচামিঞাকে সাবধানে থাকতে বলেছি।

মাসাদুল নবী কে?

আমার গুরু। বাপের মতো।

হিন্দুর গুরু মুসলমান হয় নাকি!

হয় কি না জানি না। তবে আমার হয়েছে। সেই আমার হাত ধরে মেশিনের কাজ শিখিয়েছে। খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে। আবার দেশ ছেড়ে যাবার সময় তার ঘর. দোকান, মেশিন আমাকে দিয়ে গেছে। চাচা-চাচি যাই বলি না কেন, তারাই আমার মা-বাপ।

তোমার কাছে আর কেউ আসে?

আসে।

কে?

সুরকি কলের কামিনরা আসে.....

তুমি তো বেশ রসিক মানুষ হে।

এজ্ঞে বাবুদের ছেলেরাও আসে। বাড়ির কাজের লোক। ছেঁড়াফাটা জামা-প্যান্ট সেলাই করতে দেয়। এই তো আমার কাজ। আর ওই চাচার দেওয়া মেশিনে আমি সব সেলাই করি।

তোমার চাচা তোমাকে চিঠি দেয়?

পাঁচ-দশ বছরে দু'একখানা পাঠায়।

তোমার কাছে আছে সেই চিঠি?

এজ্ঞে কাছে তো নেই। দোকানের কুলুঙ্গিতে অ্যালুমিনির বাক্সে রাখা আছে।

চাচার ঘরে কতদিন থেকে আছ?

প্রায় ষাট বছর।

তোমার বয়স কত?

সত্তোর-টত্তোর হবে। ঠিক হিসেব নেই।

চেনা-জানা কেউ আছে?

হালিশহরের তেঁতুলতলা বলবেন। আমাকে সব্বাই চেনে। দোকান দেখিয়ে দেবে। আপনি যাবেন এজ্ঞে?

কোনও জ্ঞানীগুণী মানুষ, বা আত্মীয়স্বজন?

এজ্ঞে আত্মীয়রাই তো আগে পর করে দেয়। নয়তো গয়েশপুরের ভটচাযিপাড়া থেকে কি আমাকে চলে আসতে হয়। তবে জ্ঞানীগুণী বলতে আমি একজনকেই মান্য করি। তিনি ইস্কুলে হেডস্যার ছিলেন। পড়া করতুম না বলে কত কান-চুল টেনেছেন। মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে আমার দোকানে এসে বসেন। পুরনো দিনের গল্প করেন। তেঁতুলতলার সব চেয়ে পুরনো মানুষ।

কী নাম?

প্রণবরঞ্জন ঘোষাল।

এর মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে কথা বলে দেখুন। স্টেটমেন্ট সত্যি হলে বিলিজ করে দেবেন।

পরের দিন বিকেলেই গোকুলের ডাক পড়ে। খাতায় সইসাবুদের পবে তার হাতে দোকানের চাবি, পুরনো চিঠির বাণ্ডিল তুলে দেওয়া হল। পাশের ঘরে আসতেই হেডস্যার বলেন, এস গোকুল। তাকে প্রণাম করে গোকুল। প্রায় আঠারো দিন পরে বাইরে আসে। কিন্তু ক্ষোভ যায় না। হেডস্যারকে বলে, দেখুন দিকি মাস্টারমশাই, খামাখা হয়রানি।

তুমি চাচাকে হঠাৎ যুদ্ধের কথা লিখতে গেলে কেন?

লাখ লাখ মানুষ মারা এই বোমার কথা না জানালে যদি বিপদে পড়ে যায়।

তুমি কি জান, তোমার চাচার দেশ পাকিস্তানও বোমা বানিয়েছে?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে গোকুল। কী বলছেন মাস্টারমশাই!

হ্যাঁ। দিন কয়েক আগে পাকিস্তানের বোমা ফাটানোর খবর কাগজে ছাপা হয়েছে। টিভিতেও বলেছে।

দুনিয়াটা তাহলে এখন জগা-পল্টুদের হাতেই চলে গেল মাস্টারমশাই!

মাস্টারমশাই কথার উত্তর দিতে পারেন না। মানুষের এই অপমানের কথা মেনে নিতে তাঁর কষ্ট হয়। নীরবে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে চলেন।

অসুন্দর

চন্দন মুখোপাধ্যায়

চামুণ্ডা একটা বাংলা নিল। অশোকের রোড হোটেলের সামনে খবরের কাগজে মুড়িয়ে বোতলটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা বাচ্চা ছেলে। বোতলের দাম আর ছেলেটাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে সিটে ফিরে এসে কেবিনের কাঠের বাক্সটার মধ্যে যত্ন করে রেখে দিল বোতলটা। তারপর গিয়ার দিল।

আজ আর ডব্লিউ. জি. ই. তেরো তেরো, রাণাঘাট-বাগআঁচড়া লোকাল, 'গলায় দড়ি বটতলা' স্টপেজে দাঁড়াল না। আজ বিয়ের রিজার্ভ আছে।

অন্যান্য বিয়ের রিজার্ভের দিন, গলায় দড়ি বটতলায়, রয়টারের সেলুনে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যায় চামুণ্ডা। বিভিন্ন খবরাখবর শোনে, ডাঙ্কেল শোনে, ক্লাস এইটের বিদ্যেয় নিজের মতামতও জাহির করে, চা খায়, ম্যাসাজের আরাম খায় তারপর স্টিয়ারিং ধরে। আজ আর ইচ্ছে করল না। আজ তার মন-মেজাজ খুব ফুরফুরে, অন্যরকম ভাল।

কারণ, আজ শিখার বিয়ে। শিখা — লঙ্কার বোন। লঙ্কা — ডব্লিউ. জি. ই. তেরো তেরোর অ্যাসিস্ট্যান্ট। চামুণ্ডার সবসময়ের শিষ্য।

আজ, অজিত ঘোষ, বাসের মালিক, বাস বিনা পয়সায় দিয়ে দিয়েছে। বরযাত্রী নিয়ে আসা, দিয়ে আসা সব ফ্রি। এমন কি তিরিশ লিটার তেলও কিনে দিয়েছে। বলেছে, 'লঙ্কা, আমি বোধহয় আসতে পারব না। তোর বউদির মামাতো ভাইয়ের বিয়ে আছে। তা, গাড়িটা দিয়ে দিলুম। দেখেটেকে ম্যানেজ করে নিস। আর চামুণ্ডাকে বলবি ও-ই যেন স্টিয়ারিং ধরে।'

চামুণ্ডা। লাইনের নাম। ভাল নাম স্বপন। কালো শক্ত মাঝারি সাইজ, রংকরা ব্রাশের মত চুল, ডাবাড্যাবা লালচে দুটো চোখ... এ ছাড়া স্বপনের দেখানোর মতো আর একটা জিনিস আছে, তা হচ্ছে ওর গোঁফ। ইঞ্চি খানেক মোটা, থুতনি অবধি নেমে আসা, ভয়ঙ্কর এই গোঁফের জন্যে মুখমণ্ডল অনুযায়ী কখন যে তার নাম বাজারে চালু হয়ে গেছে 'চামুণ্ডা' কে জানে। চলেও আসছে আজ পাঁচ ছ বছর।

সাত বছর বয়স থেকে পয়সার ধান্দায় বেরিয়েছে চামুণ্ডা। প্রথমে, তখনো সে চামুণ্ডা হয়নি, কী করে কে জানে, একটা ছোটখাটো সার্কাসের দলে গাড়ি ধোওয়ার কাজ পেয়েছিল। পেটচুক্তি চাকরি। মাস দুয়েক বাদে শহর থেকে সার্কাস চলে গেল, চলে গেল তার চাকরিও। ঠাঁই পেল মামার গ্যারেজে। নিজের মামা নয়, মোটর লাইনের মামা। তা, মামা তাকে খাটাত যেমন, ভালোওবাসতো। মামার জন্যেই ক্লাস এইট পর্যন্ত স্কুল নামক একটা বস্তুর সঙ্গে সংযোগ ছিল তার।

তেল, মবিল, ধুলো খেতে খেতে খাটিয়ে হিসেবে নামও হয়েছিল দেদার। কল্যাণী-এসপ্ল্যানেড রুটে লাক্সারি বাসে অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করেছিল কয়েক বছর। তারপর 'রাণাঘাট-শান্তিপুর লোকাল'-এ কণ্ডাক্টরের ব্যাগ চালালো বছর পাঁচেক। তখন ইউনিয়ন ছিল একটাই, প্রোমোশন দিয়ে তাকে ড্রাইভার করে দিল।

দু'এক বছর ম্যাটাডোর, ছোট লরি ইত্যাদি চালিয়ে হাত পাকা করে নিয়ে এক বর্ষার বিকেল বেলায় বদলি ড্রাইভার হিসেবে এই তেরো তেরো-র স্টিয়ারিং ধরল সে। আর থেকেও গেল সেই থেকে। মালিকের কাছে সে পয়মন্ত ড্রাইভার। সে গাড়ি ধরতেই সেল বেড়েছে। আজ পর্যন্ত বডির গায়ে কোনও আঁচড় লাগেনি। মালিক এবং অন্যান্য সকলেও তাকে একটু অন্যচোখে দেখে।

লঙ্কা আর পেছনের গেটের ক্লিনার ল্যাটা, দুজনেই তাকে ভালোবাসে। ছাদ কালেকশন থেকে দশটাকা করে ভাগ দেয়। কণ্ডাক্টর যিশুও গড়ে পনের টাকা ঠিক পকেটে গুঁজে দেয়। চুরির টাকা। লাইনের নাম 'ছোট'।

তা, চামুণ্ডার রোজগার মন্দ নয়। রাণাঘাট-বাগআঁচড়া রুটে পাঁচটা ট্রিপে ডেলি হাজার টাকার সেল আছে। তার প্রাপ্য টেন পার্সেন্টি, যিশুর এইট, লঙ্কা ও ল্যাটার ফিক্সড মাইনে ডেলি তিরিশ টাকা। যার যেদিন ছাদ কালেকশন থাকে তার সেদিন এক্সট্রা বিশ পঁচিশের মার নেই। ছাদে ছাগল যায়, মুর্গির ঝুড়ি যায় হাটে। থাওকো ভাড়া। লঙ্কা ল্যাটার পালা করে ডিউটি চলে। চামুণ্ডা আছে তাই কোনো ঝগড়া কাজিয়া নেই।

রিজার্ভ খাটার মাইনে একটু আলাদা। হাজার টাকার রিজার্ভ হলে চামুণ্ডা পাবে একশো, লঙ্কা ও ল্যাটা তিরিশ তিরিশ, যিশুর কোনো চান্স নেই। তবে খোরাকির ষাট টাকা থেকে যিশুকে পুষিয়ে দিতে হয়।

চামুণ্ডা কোনো বিয়ে বাড়িতে খেতে পারে না। গা ঘিনঘিন করে। লঙ্কা, ল্যাটা খায়। খোরাকির টাকাটা বাঁচায়। চামুণ্ডা কোনোদিন একটা বড় বাংলা নেয়, কোনোদিন একটা ছোট বিলিতি। কনেযাত্রী কিংবা বরযাত্রীরা ক্যাওড়া শেষ করে ফিরে আসবার আগেই শেষ হয়ে যায় তার বোতল। টুলবক্সে তার গ্লাস, বাদাম, পেঁযাজ, শসা, ছুবি..... সব মজুত থাকে, এমনকি একটা একশো বিশ পান পর্যন্ত। তবে যতই খেয়ে গাড়ি চালাক না কেন, অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না যে আজ অবধি চামুণ্ডা গাড়ির তলায় একটা বেড়াল মেরেছে।

আজ অবশ্য মাইনের কোনো ব্যাপার নেই। ফাঁকা গাড়ি বরযাত্রী তুলবে গোবিন্দপুর থেকে, ফেলবে বাগআঁচড়ায় লঙ্কাদেব বাড়ি। বরও যাবে এই বাসে, তবে বউ সমেত ফিববে কিসে, সে জানে না। বরযাত্রীদের রাত্তিরের মধ্যেই গোবিন্দপুরে ফেলে দিয়ে যেতে হবে। পরদিন সকালে বাগআঁচড়া থেকে ফার্স্ট ট্রিপ সাতটা দশে।

লঙ্কাদের বাড়ি যেতে গেলে কাঁচায় নামতে হবে অনেকটা। যদি চাকা ফেঁসে যায়।

যায় যাবে। একটা গরিবের মেয়ে উদ্ধার পাচ্ছে আজকালকার দিনে। কে বলে শালা ভগবান নেই। তা ছাড়া, লঙ্কা বেচারা এতদিন ধরে রক্ত জল করে খাটছে বাসটার পেছনে, কথায় কথায় বলে 'আমার গাড়ি', বোনটার বিয়ের সময় বরপক্ষকে একটা বাস না দিতে পারলে প্রেস্টিজ থাকে। জয় তারা মা। অজিত ঘোষ কথা রেখেছে।

লঙ্কাকে খুব কৃতজ্ঞ দেখাচ্ছে। কালো, রোগা, শ্বদন্তসমেত লঙ্কা আজ একটা সাদা পাটভাঙা জামা আর একটা চকচকে সাদা প্যান্ট পরেছে। টেনশন হচ্ছে খুব। তিরিশ টাকা মাইনের চাকরি করে, কী ভাবে যে সে বোনের বিয়ে দিচ্ছে, নিজেই জানে না।

এই বাসেই শান্তিপুর কলেজে এগারো ক্লাস পড়তে আসত শিখা। দশটা পঁচিশের ট্রিপে লঙ্কার জন্যে ভাতভর্তি টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বাগআঁচড়া থেকে বাসে উঠত সে। কেবিনের দরজা খুলে চামুণ্ডার সিটের পেছনে টিফিন ক্যারিয়ার রেখে, সিঙ্গল সিটটায় জড়সড় হয়ে বসে থাকত।

একদিন লঙ্কা সাট্টার পের্নসিলার নিতাই-এর কাছে গেছে পেমেন্ট নিতে, শিখা এদিক ওদিক তাকিয়ে, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, টিফিন ক্যারিয়ারটা চামুণ্ডার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'দিয়ে দেবেন তো এটা আর বলে দেবেন আমি কলেজে যাব না।'

টিফিন ক্যারিয়ার নিতে গিয়ে একটু আঙুলের স্পর্শ, প্রায় দৌড়ে গলির মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া, রিনঝিন কণ্ঠস্বর....চামুণ্ডার বুকের ভেতর ফাঁকা ফাঁকা আর মনের ভেতর কেমন যেন খারাপ হয়েছিল একটু। তা হোক। গরিবের ঘরের বিয়ের কাজ, তারা মা যেন ঠিকঠাক উতরে দেয়। বুকের লকেটটা সে কপালে ছোঁয়ায়।

বেলেডাঙার মোড়ে টার্নিং নিতে নিতে হুঙ্কার দেয় চামুণ্ডা, 'অ্যায় লঙ্কা'।

'বলো ওস্তাদ' বিনয়ী লঙ্কা কেবিনের দরজা খুলে মাথা ঢোকায়।

'বরযাত্রীদের তাড়াতাড়ি উঠতে বলবি। ওদিকেও তাড়াতাড়ি সারতে বলবি। আমি বুড়োবটতলার মাঠে থাকব। প্যাণ্ডেলে যাব না। পারলে খানিকটা মাংস দিয়ে যাস, মিষ্টি ফিষ্টি নয়, বুঝলি?'

'কিন্তু ওস্তাদ, বোনের বিয়ে, তুমি একটু আশীর্বাদ করবা না?'

'ধোততর আশীর্বাদ, তাও আবার আমার। তারা মা আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আর... এই নে।' কেবিনের কাঠের বাক্সটা থেকে একটা শাড়ির প্যাকেট বের করে। বেনারসি। ফুলিয়ার বসাকদের ঘর থেকে ইনস্টলমেন্টে নেওয়া। চামুণ্ডা জানে একটা বেনারসি দেওয়া মানে লঙ্কার অনেকখানি ভার লাঘব করা। শিখার পছন্দ হলে হয়।

লঙ্কা শাড়ির প্যাকেট হাতে অনুনয় বিনয়ে মত্ত হয়ে ওঠে। ঠোঁটের মাঝে উইলস ফিল্টার গলায় রুপোর চেন, মিঠুনের ছবি আঁকা হলুদ গেঞ্জি গায়ে বলিষ্ঠ চামুণ্ডা গোবিন্দপুবে এসে সজোরে ব্রেক মারে। আজ তার মন খুব ফুরফুরে, অন্যরকম ভাল।

শিখার বিয়ের কথা সে জানতে পারে দিন কুড়ি আগে। বিকেলে পাঁচটা পঁচিশেব ট্রিপে ছাদ বাম্পার গোল করে প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসার সময়, হাসপাতাল স্টপেজে, কেবিনে হাঁচড় পাঁচড় করে উঠে বনেটের ওপর বসল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাড়ু মণ্ডল। চামুণ্ডার সঙ্গে এইসব রাজনৈতিক লোকেদের বেশ মাখামাখি আছে। ভোটের সময় চামুণ্ডা ভালোই লেবার দেয়, তা ছাড়া অসুখবিসুখে, পরোপকারে চামুণ্ডার জুড়ি নেই এ অঞ্চলে। যে কোনো পেশেন্ট নিয়ে কলকাতার যে কোনো হাসপাতালে উড়ে যেতে তার সময় লাগে দেড় ঘণ্টা। ফলে সকলেই একটু সমীহ করে চলে তাকে।

লাইটারের ফুঁসে ওঠা আগুনে একসঙ্গে দুটো বিড়ি জ্বালাতে জ্বালাতে মুখ খোলে নাড়ু মণ্ডল, 'শুনিচিস তো, লঙ্কার বোনের বে ঠিক হোয়েলো। হারু ঘোষের ছেলের সাতে।'

'হারু ঘোষের কোন ছেলে?' চামুণ্ডা উৎকণ্ঠিত হয়।

'উই যেডা দোজবরে। ন্যালাখ্যাপা মতো ......উইডা।' একটা ধরানো বিড়ি চামুণ্ডার দিকে এগিয়ে দেয় নাড়ু। তারপর নিজেরটা টানতে থাকে। 'লঙ্কাব দুই মামা হারু ঘোষকে খুব পইটেছে। বইলেচে — বে ডা দিইয়ে দাও, মেয়ের হাতে কানে গলায় দোবো খাট বিসনা দোবো, দশ হাজার নগদ দেবো।.. ..... তো আমি বয়েলাম — অ্যাতই ঢ্যাখন দিবা ত্যাখন মেয়েডারে জলে না ফেইলে অ্যাড্ডা ভাল ছেলের হাতে দাও না, বাজারে কী ভাল পাত্তরের অ্যাতই আকাল!'

হঠাৎই, রাগে রক্ত উঠে গিয়েছিল চামুণ্ডার মাথায়। উপপ্রধান ঠিকই বলেছে। শিখার মতো মেয়ের জন্যে এরকম পাত্র। না হয় শিখা একটু কালো আর দাঁত উঁচু, তাই বলে ওই

ন্যালাখ্যাপা দোজবরের সঙ্গে বিয়ে। নেহাত স্টিয়ারিংয়ে বসে, না হলে লঙ্কাকে কেলিয়ে দিত একচোট।

পরে অবশ্য জানতে পেরেছে ব্যাপারটায় লঙ্কার কোনো হাত ছিল না। সবকিছু করেছে লঙ্কার দুই মামা আর হারু ঘোষ। হারু ঘোষের ডিপ টিউবওয়েল আর শ্যালো থেকে বড়মামাকে জল নিতে হয় ফি মাস, ফি বছর। নইলে চাষ ভোগে যাবে। আর ছোটমামা হারু ঘোষের গুদোমে পাট রাখে, নুনের বস্তা রাখে, সময়ে-অসময়ে ধার নেয়। হারু ঘোষের টোপটাকে তাই কর্তব্য ও লোকলজ্জার দোহাই দিয়ে দুই মামা লঙ্কার মায়ের মুখে গুঁজে দিয়েছে।

লঙ্কার মা অবশ্য প্রথম থেকেই বলে এসেছে যে দশ হাজার নগদ অসম্ভব। কোথায় পাবে অত টাকা! বড় মামা আশ্বাস দিয়েছে, 'আরে এখন তো ঢপে চলুক। বিয়েটা হয়ে যাক। টাকা পরেও দিয়ে দেওয়া যাবে। তুই তোর কানের গলার যা যা আছে সব দিয়ে দিস। সোমত্থ মেয়েকে ঘরে ফেলে রাখা ঠিক নয়।'

লঙ্কা একটু কিন্তু কিন্তু করেছিল। কিন্তু দুই মামার ঝাপটে সে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে নি। লাইট, প্যাণ্ডেল, বাস আর বেনারসির দায়িত্ব ছিল তার। গত শুক্রবার সাট্টায় হঠাৎ দু হাজার পেয়ে গেল। একেই বলে ওপরওয়ালা গরমেন্টের বিচার। ল্যাটাও কিছু ধার দেবে বলেছে। শিখাকে একটা এইচ.এম.টি হাতঘড়ি কিনে দিয়েছে। কিন্তু আজ ভীষণ টেনশন হচ্ছে। যতক্ষণ না বিয়েটা শেষ হচ্ছে.. ....মানে, ওই টাকার ঢপ কি হারু ঘোষ মেনে নেবে।...লঙ্কার কপালে বিনবিনে ঘাম জমতে শুরু করে। বলে, 'ওস্তাদ, একটু থেকো শেষরক্ষে পজ্জন্ত।'

চামুণ্ডার মুখে খিস্তি আসে। গিলে ফেলে। টেক্কার চায়ের দোকানে চাটাই-বেঞ্চিতে বসে হাঁক দেয়, 'টেক্কা একটা লিকার দিস। চিনি কম।'

টেক্কা তৎপর হয় চা বানাতে। ল্যাটা টায়ার চেক করে। লঙ্কা বুঝতে পারে ওস্তাদ রেগে গেছে। চামুণ্ডা রাগলে চণ্ডাল — একথা বাসলাইনের.. ...বাসের কাঠগুলো পর্যন্ত জানে।

চামুণ্ডার বাড়িতে এক রোগাভোগা বুড়ি মা ছাড়া আর কেউ নেই। সে বুড়িরও লাস্ট সিন চলছে। শীতকালে তো নড়তেই পারে না। বাত। তক্তপোশে জবুথবু হয়ে 'মাগো, বাবাগো' করে আর তার মরণের পর স্বপনের যে কী হবে সেই কথা নিয়ে হাউ-মাউ করে ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়।

খাওয়া-পরা আর একশো টাকা মাইনে দিয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে রেখেছে। সে-ই রাঁধে। টিফিন ক্যারিয়ারে চামুণ্ডার জন্যে ভাত নিয়ে থানার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাকে ভাত বেড়ে দেয়, খাইয়েও দেয় মাঝে মাঝে, বিছানা নোংরা করে ফেললে হাসিমুখেই পরিষ্কার করে, মন্দ নয় মেয়েটা।

চামুণ্ডা মাকে কিছু বলে না। একটা গোপন দুঃখ তার শরীরের মধ্যে বিছের মতো ঘুরে বেড়ায়। মা কী জানে না যে গোঁফ ছাড়াও স্বপন আসলে চামুণ্ডা। তার মতো বিশ্রী, কদাকার মানুষকে সাধ করে বিয়ে করবে কে? নিজের মা যখন সন্তানের দুঃখ বোঝে না, অন্য মেয়েছেলে বুঝবে কী করে?

মায়ের ক্যাওড়া-ক্যাচাল যখন চলতেই থাকে, তখন একটা ছোট বিলিতি নয়তো একটা বড় বাংলা উদরস্থ করে টেপরেকর্ডারে কিশোরকুমার চালিয়ে দেয় চামুণ্ডা। গানগুলো তার দগ্ধ বুকে প্রলেপ লাগায়, ঘুম আসে, ঘুম.....।

নাড়ু মণ্ডলের কথাগুলো শোনার পর, হারু ঘোষের ন্যালাখ্যাপা ছেলের জায়গায় নিজেকে একবার কল্পনাও করেছিল। তারপরেই মনে মনে বলেছিল, 'ধ্যাত্, শিখা এগারো ক্লাস পাস,

কলেজে পড়া মেয়ে, আর সে টেনেটুনে ক্লাস এইট, তারপর কাজ বলতে এই লোকাল বাসে ড্রাইভারি, তার থেকেও বড় ব্যাপার — তার পরিচয় চামুণ্ডা। তবে মেয়েটার মধ্যে একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে, হোক না গায়ের রং কালো, হোক না সামনের দাঁত উঁচু। কেমন যেন একটা অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা ভাব আছেও।

তবু, বিয়ের কথা ভাবলেই তার বুকের ভেতরটা শ্মশান-চিতার মতো জ্বলতে থাকে। মনে পড়ে তিন বছর আগের সেই সন্ধ্যেবেলার কথা। রাগে, অপমানে সমস্ত কিছু গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। শক্ত হাতের মধ্যে চায়ের গ্লাসটা প্রচণ্ড চাপে ফেটে যায়। গায়ের ওপর চলকে পড়ে গরম লিকার। খিস্তি শুনে দৌড়ে আসে টেক্কা। ভাঙা গ্লাসের টুকরোগুলো জড়ো করতে শুরু করে। ল্যাটা দৌড়োয় কেবিন থেকে তুলো, ডেটল আনার জন্যে।

হয়েছিল কী, পয়লা বোশেখের রাতে সে, মালিক অজিত ঘোষ, তার এক বন্ধু, কণ্ডাক্টর যিশু — চারজন মিলে অজিত ঘোষেরই ভিডিও হলের চাতালে বসে মাল খাচ্ছিল। বছরের প্রথম দিন বলে মালিকই খাওয়াচ্ছিল। ফরেন। কাজুবাদাম আর কিসমিস ছিল চাট। নেশাটা বেশ ভালোই ধরেছিল। ভিডিও হলের পেছনে গিয়ে পেচ্ছাপ করতে করতে মনের সুখে গান গাইছিল চামুণ্ডা। তাই শুনে অজিত ঘোষ খ্যাক খ্যাক করে হেসেছিল অনেকক্ষণ। নেশার হাসি। তারপর বলেছিল 'এবার একটা বিয়ে থা কর চামুণ্ডা।'

'আমি তো এক্ষুনি রাজি। কিন্তু বিয়ে করতে গেলে তো একটা মেয়ের দরকার হয়'। সেও হেসেছিল একচোট।

'একে গব্বর সিং-এর থেকেও বিলা থোবড়া, তারপর গোগা কাপুরের মতো গলার আওয়াজ। শূর্পণখাও তোকে বিয়ে করত না। ওই বটের ঝুরির মতো গোঁফটা কেটে ফেল, নইলে সারাজীবন নাবালক হয়েই কাটাতে হবে।'

'তুই সত্যিই বিয়ে করবি?' অজিত ঘোষের বন্ধু বলেছিল জড়ানো গলায়। 'আমার হাতে মেয়ে আছে। মাধ্যমিক দিয়েছে। ফরসা।'

'আমি রাজি। গোঁফও কেটে ফেলব। মালের ঘোরে নয়, সত্যি কথা বলছি, মাইরি। তুমি কথাবার্তা চালাও, বুড়িটা ছেলের বউ দেখে গঙ্গায় যাক।'

'কী কী পণ নিবি?'

'পণের ইয়ে মারে চামুণ্ডা......।' তৃতীয় বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে বলেছিল 'মাল কসম, সারাজীবন সুখে রাখব। শুধু আমার মাটাকে যেন একটু যত্ন করে........।'

অন্য কেউ জানত না যে চামুণ্ডার ঠোঁটের ওপরে দুদিকেই দুটো ভয়ঙ্কর দেখতে জড়ুল আছে, আর সে দুটো ঢাকতেই ওই বিশাল গোঁফ।

শ্রাবণের সাত। চামুণ্ডা গোঁফ কামিয়ে ফেলেছে। লালচে দুটো ড্যাবডেবে চোখের তলায় একটা কালো শক্ত নাক, তার নিচে দুটো ফুলে ওঠা জড়ুল, গায়ে হলুদের স্নান সেরে টেবিল পাখার সামনে বালিশে ঠেস দিয়ে সিগারেট টানছিল সে। কেউ জানে না, পাশের ঘরে তারা মা'র ছবির সামনে উপুড় হয়ে অঝোরে কেঁদে চলেছিল তার মা। 'তারা মা গো, এত কদাকার সন্তান যেন শত্তুরের পেটেও না আসে।'

রাত সাড়ে আটটায় লগ্ন। সন্ধে সন্ধে বেরিয়ে গেল বরবেশী চামুণ্ডা ও তিনজন বন্ধুকে নিয়ে দিলীপ সাহার প্রাইভেট, পেছন পেছন জনা তিরিশেক বরযাত্রী নিয়ে তপন কুণ্ডুর লাক্সারি বাস। লাইনের লোক — সবই ফ্রি।

মেয়েদের কলকাকলি, উলুধ্বনি, শাঁখের আওয়াজ, চেল্লামেল্লির মধ্যে চামুণ্ডাকে নিয়ে প্রাইভেট থামল নহবত গেটের নিচে, বিয়ে বাড়ির ঠিক সামনে।

কয়েকজন মহিলা বরণডালা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'বর এসেছে, বর এসেছে' চিৎকার উঠতেই কে যেন খুলে দিল গাড়ির দরজা, মুখ বাড়াল চামুণ্ডা। আর তখনই সভয়ে পিছিয়ে গেল জনতা। পালিয়ে গেল মেয়েরা। থেমে গেল শাঁখ, উলুধ্বনি।

এলোমেলো, কৌণিকভাবে কিছু শব্দ ছোটাছুটি করতে লাগল হাওয়ায়।

'বর নয় রে, যম এসেছে, যম....'

'ডাকাত ফাকাত হবে। পুলিশে খবর দাও......

'চামুণ্ডা........চামুণ্ডা......'

কনেপক্ষের এক কর্মকর্তা কয়েকজন বয়স্ক মানুষের সঙ্গে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল। চামুণ্ডা তখন গাড়ি থেকে নেমেছে। পরনে সাদা ধবধবে ধুতি, গায়ে বিয়ের পাঞ্জাবি, টোপরটা গাড়ির সিটে পড়ে আছে। একহাতে ধরা রজনীগন্ধার মালা অন্য হাত প্রাইভেটের ছাদে। বুকের ভেতর টিপটিপ করছে, চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে জল।

একটা লোক কনেকর্তাকে বলল, 'খুলেই বল না, আর কী হবে, বলে ফেল।'

কনেকর্তা পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে বলল, 'ইয়ে, মানে....কনে পালিয়েছে। এই চিঠিটা রেখে গেছে।'

খপ্ করে চিঠিটা কেড়ে নিয়ে, নহবত গেটের আলোয়, চামুণ্ডার এক বন্ধু কেটে কেটে পড়ল, 'জল্লাদের সাথে বিয়ে দেবার বদলে আমাকে একটু বিষ এনে দিতে পারতে। তোমরা কী বাবা-মা? আমি যাচ্ছি। আমার খোঁজ করার চেষ্টা করো না। আর যাই হোক ওই রাজপুত্তুরের গলায় মালা দিতে আমি পারব না।'

চামুণ্ডার শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল।

পাড়ার কয়েকটা চ্যাংড়া পাশে দাঁড়িয়েছিল। একজন বলল, 'থোবড়া দেখ, শালা জানী দুশমন।'

আর একজন বলল, 'বাবা-মা বোধহয় গ্রহণের রাতে...খিক খিক খিক......'

চামুণ্ডা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। ফেটে পড়া আগ্নেয়গিরির মতো গালাগালির লাভাস্রোত আর প্যাণ্ডেলের একটা বাঁশ খুলে নিয়ে রক্তারক্তি শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

কনেপক্ষ থানা পুলিশ করেছিল। স্বাভাবিক। থানার মেজবাবু অবশ্য চামুণ্ডার পক্ষ নিয়েছিলেন সস্নেহে। 'কই সেই সুমুন্দির পো? অজিত ঘোষের বন্ধুর কথা বলছি রে শালা।' বাগআঁচড়া বাসস্ট্যান্ডে একবাজার লোকের সামনে হাঁড়ি ফাটালেন মেজবাবু। 'শালার ছেলে মেয়ের বাবার কাছ থেকে চার হাজার খেয়েছে। একবার দর্শন পেলে ঘটকগিরি বের করে দিতাম। আর তোমরাও কি ধরনের মানুষ অ্যাঁ? ও যে চামুণ্ডা, অমিতাভ বচ্চন নয়, তা কী জানতে না? জেনেশুনে বিয়ে। যে করে হোক মেয়েটাকে খ্যাদাতে পারলে হয়, না? বেশ হয়েছে। ঢ্যামনা কোথাকার। ... শোনরে চামুণ্ডা, মা'কে নিয়ে কদিন তারাপীঠ থেকে বেড়িয়ে আয়। কেস ফেস কিস্যু হবে না, আমি বলছি। গোপাল, গাড়ি ঘোরা......'

মিলিয়ে যাওয়া জিপের ধুলোয়, শনিমন্দিরের বারান্দায় চুপ করে বসে থাকা চামুণ্ডা দেখে ভিডিও হলের দেওয়ালে নতুন হিন্দি সিনেমার পোস্টার লাগান হচ্ছে। কী সুন্দর মুখখানা নায়কের, যেন মাখন গলে পড়ছে, চোখ তো নয়, সন্ধেবেলার পুকুর, যার মধ্যে স্নান করতে এগিয়ে আসছে প্রায় বিবসনা এক সুন্দরী।

সুন্দর অসুন্দরের সংজ্ঞা বুঝতে না পারা এই পার্থিব জগতের এক ভয়ঙ্কর পুরুষ শনিমন্দিরের বারান্দায় গড়াগড়ি দেয় আর কাঁদে, 'বড় ঠাকুর গো, আমি বউ চাই না, সহবাস চাই না, সংসার চাই না, আমাকে শুধু অপমানের হাত থেকে বাঁচিও....।'

সে যে বড়ো জ্বালা। বুক ফেটে যায়। সে জ্বালা যন্ত্রণার কাছে হাতে কাচ ফুটে যাওয়া তো অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য।

লঙ্কা আর ল্যাটা ওস্তাদের হাতে তুলো, ন্যাকড়া ইত্যাদি দিয়ে ডেটল লাগাচ্ছিল, পরিষ্কার করছিল ক্ষত। লঙ্কার মুখ গম্ভীর। শুভ কাজের আগে রক্তপাত। অমঙ্গলের চিহ্ন। চাটাইয়ের বেঞ্চিতে বসে বাঁশে গা এলিয়ে চামুণ্ডা আক্রমণ করল লঙ্কাকে।

'মাংস খাওয়াচ্ছিস কেন? খচ্চা বেশি হবে না?'

'কী করব ওস্তাদ, মামারা বলল তাই...।'

'বরযাত্রী কতজন আসবে?'

'চল্লিশজন তো বলেছে।'

'হারু ঘোষের গুষ্টিতে অ্যাণ্ডাগুড়গুড়িই তো চল্লিশ খানা.....। দেওয়া-থোওয়া সব হয়ে গেছে?'

'গয়না-টয়না তো শিখার গায়েই থাকবে। বেনারসিও তুমি দিয়ে দিলে। বড় মামা একটা খাট দিয়েছে। লেপ নেই, তবে তোশক আছে। ছোটমামা খানতকত থালাবাসন দিয়েছে।'

'আর নগদ?'

'ওই জন্যেই তো ভয় করছে ওস্তাদ। সাট্টা আর মা'র জমানো থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে সবশুদ্ধু সাতহাজার হয়েছিল। খাওয়ানোর খরচের জন্যে মা পুরোটাই তুলে দিয়েছে মামাদের হাতে। আমার অবস্থা তো জানোই। এদিকে মামারা বলছে নগদ পরে দিলেও হবে। হারু ঘোষ কী পরে নগদ নেওয়ার পার্টি!'

'তোর মামাদের কোনো স্কিম আছে মনে হচ্ছে?'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে ওস্তাদ, কিন্তু কেসটা ঘিরতে পারছি না। কাল রাতে মা'র সঙ্গে মামাদের ঝগড়া হচ্ছিল। আমি যেতেই থেমে গেল। বড়মামার হাতে দলিলমতো কী যেন একটা ছিল। মাকে জিগ্যেস করলাম কী হয়েছে, তা বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে সেই যে দরজা দিল, আমি বাড়ি থেকে বেরুনোর সময়ও খোলেনি।

'স্কিম, স্কিম, আমি বুইতে পেরেচি।' হঠাৎ উত্তেজনায় লাফ দিয়ে ওঠে ল্যাটা।

'বোস শালা।' চামুণ্ডা হুঙ্কার ছাড়ে। 'বোস। খুলে বল কী ব্যাপার?'

'লঙ্কার বড়মামা হারু ঘোষের যে ডিপ টিউবয়েল থেকে জল নেয়, তার ঠিক গায়ে লাগানো জমিটা লঙ্কার মা'র নামে। লঙ্কার ঠাকুর্দা দিয়ে গেয়েলো। সেই জমিটা ঝেড়ে দেবার স্কিম করেছে ওস্তাদ।' ল্যাটা হাঁফায়। 'শনিবার জমিতে আমিন এয়েচিলো।'

লঙ্কা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে চামুণ্ডার সামনে। তার সাদা প্যান্টের হাঁটুতে ময়লার ছোপ। 'কী হবে ওস্তাদ, জমিটা ঝেড়ে দেবে? আবার না দিলেও তো বোনডার বিয়ে হবে না, কী করব ওস্তাদ?'

চামুণ্ডা সিটে বসে। গিয়ার দেয়। একবার গলায় দড়ি বটতলায় যেতেই হবে। রয়টারের সেলুনে গেলেই নাড়িনক্ষত্র সব জানা যাবে। তার অন্যরকম ভাল মনটা পচা তাড়ির মতো হয়ে গেছে এখন। লঙ্কা বনেটের ওপর বসে বসে তারা মাকে ডাকে। তার কালো কালো গাল দুটো চকচক করে চোখের জলে।

সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে গ্যারেজে গ্যারেজে লাথি চড় খেয়ে, ওস্তাদের পর ওস্তাদের ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে জীবন শুরু লঙ্কার। সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির সব মিলে-মিশে একাকার। শুধু পেটের গর্ত বোজানোর জন্য শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে তার। এই সতেরটা বছর সে তিনটে পেটের গর্ত বুজিয়েছে গতির সঙ্গে যুদ্ধ করে। বসনহীন গাড়ির সঙ্গে রাতের পর

রাত তার কেটে গেছে একাকী গল্পে। তখন থেকে এখন পর্যন্ত তার বিশ্বস্ত বন্ধু হচ্ছে গিয়ার বক্স, টেল কাউন্ট, রেডিয়েটর.....।

গ্যারেজ থেকে যেদিন অজিত ঘোষ তেরো তেরোয় তুলে নিল তাকে, সেদিন থেকে একটা সুখের রুগ্‌ণ পালক ঘুরে বেড়াত তাদের টালিছাওয়া দুই খুপরির আনাচে কানাচে।

শিখাকে পড়ানোর খরচা জুগিয়েছে লঙ্কা। মা'র চোখের ছানি অপারেশন করিয়েছে। শিখা অবশ্য এগারো ক্লাস পাশ করে কলেজ যাওয়া ছেড়ে দিল। এই ছেড়ে দেওয়া যে দাদাকে একটু রেহাই দেওয়ার জন্যে, তা কী লঙ্কা জানে না!

তার কালো গাল চকচকে হতে থাকে। আরও চকচকে। গাড়ি এসে থমকে দাঁড়ায় গলায় দড়ি বটতলায়।

দুনিয়ার যাবতীয় খবরাখবর নিখুঁত পাওয়া যায় বলে ঝিঙের সেলুনের নাম হয়ে গেছে রয়টারের সেলুন। এই নামকরণ কলেজে পড়া কোনো ছাত্রটাত্র'র মস্তিস্কপ্রসূত, ঝিঙের ধারণা। নইলে রয়টার আর সংবাদ মাধ্যমের অনুষঙ্গ বোঝার মতো মানুষ এ দিগরে নেই। অনেকেই মানে না-জেনে বলে আসছে রয়টারের সেলুন।

যাই হোক, চামুণ্ডার কেঠো শরীর ম্যাসাজ কবতে করতে ঝিঙে কাকা, মানে রয়টাব জানাল যে, ল্যাটা যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

লঙ্কার বাবা ছিল বোবা। সারাদিন নাকি জমিতে বলদের মতো খাটত। একথালা পান্তা মেরে জমিতে যেত সকালে, ফিরত সন্ধে উতরে গেলে। আবার পান্তা, তারপব ঘুম। সাবাজীবন একটা লোকের সঙ্গে তাব বউয়ের কোনো কথা হয়নি, ভাবা যায়! ছেলেব অবর্তমানে বউমার অবস্থার কথা ভেবে — ছেলে নয়, ছেলের বউয়ের নামে উত্তরের সাত বিঘে জমি লিখে দিয়ে গিয়েছিল শ্বশুরবুড়ো। সেই জমিব দাম এখন কম কবে সত্তব হাজাব। পর্যাপ্ত জলের গর্বে আহ্লাদিত হারু ঘোষ ও লঙ্কার দুই অনন্ত সুযোগসন্ধানী মামা এখন সেই জমিব সদ্ব্যবহার করার অসাধারণ স্কিম তৈরি করেছে।

হারু ঘোষের ছেলে জন্ম থেকেই হাবা, ন্যালাখ্যাপা। এখনো চান করিযে দিতে হয়, খাইযে দিতে হয়। এহেন ছেলের প্রথম বিয়েতে পণ এসেছিল দু ম্যাটাডোর ভর্তি। বছব ঘুরতে না ঘুরতেই আমবাগানের একটা উঁচু ডাল থেকে গলায শাড়ি বেঁধে ঝুলে সে বেটি কেটে পড়ল। লোকে নানা কথা বলে, হারু ঘোষ সম্পর্কে। বউটা মারা যাওয়ার পর তার ছেলেটা যেন আরও কেল্‌সে গেল। বংশরক্ষার জন্যে হারু ঘোষকে উদ্যোগী হতে হল আবার।

রয়টার জানায়, হারু ঘোষই বলেছিল লঙ্কার মামাদের, 'দশ হাজার কোত্থেকে দেবে! বলবি, পরে দিলেই হবে। বিয়ের দিন বলবি দলিলে সই করতে, কাগজপত্র আমি ঠিক করে রাখব..... সই না করলে বিয়ে হবে না। কোন মা চায় বলতো তার মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হোক! পুরো জমিটা আমাকে দিস, তোদের হাজার বিশেক দেব'খন আর গুদোমে মাল রাখা, শ্যালোর জল, সব ফ্রি। কাজটা ভালয় ভালয তুলে দিতে পারলে তোদেরই মঙ্গল।'

মামারা শেষ পর্যন্ত, ধৈর্য রাখতে পারেনি। বিয়ের আগের দিনই হামলে পড়েছিল।

অ্যাস্কিলেটরে পা দাবাতে থাকে চামুণ্ডা। এত জানোয়ারে ভরে গেছে দুনিয়া! চারপাশে গিজগিজ করছে শেয়াল শকুনের দল। একটা মেয়ে কালো, দাঁত উঁচু, রোগা আর গরীব বলে তাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিতে হবে! এ কী বিচার! মা, তারা মাগো, তোমার চোখদুটো কী অন্ধ হয়ে গেছে? তুমি কী কিছুই দেখতে পাও না?

রাগে গলার লকেটটা পিঠের দিকে ছুঁড়ে দেয় চামুণ্ডা। সে রাগলে বাসের স্প্রিং পাতি পর্যন্ত তটস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু কী-ই বা করতে পারে সে। তার যে হাত, পা, শরীর, মন, সব

আটকে গেছে অসুন্দরের খাঁচায়। বুড়ো বটতলায় সতরঞ্চির ওপর আধশোওয়া অবস্থায় হাফ বাংলা শেষ করেও রাগ কমে না চামুণ্ডার। সে যদি একটু সুন্দর হত, এক্ষুনি গিয়ে বুক চিতিয়ে চিৎকার করে বলত 'ভাগো শালা শেয়াল শকুনের দল। শিখাকে আমি বিয়ে করব।' কিন্তু উপায় নেই যে। বাকি বাংলাটুকু গলায় ঢেলে হুঙ্কার ছাড়ে চামুণ্ডা, 'ল্যাটা, বউদির ঝোপড়া থেকে আর একটা বড় নিয়ে আয়, জলদি।'

ওদিকে বিয়েবাড়িতে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সিনেমার মতো। লঙ্কার মা দুই ভাইয়ের কোলের ওপর প্রায় মূৰ্ছিতা অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'আমার এত বড় সর্বনাশ করবি? তোরা না আমার মায়ের পেটের ভাই?'

বড় মামা বলছে, 'আরে দে না সই করে। তোর ছেলে তো আর ওই জমিতে চাষ করতে যাচ্ছে না। ইচ্ছে হলেও শরীরে কুলোবে না।'

ছোটমামা বলছে, 'তুই-ই বল, তোর ওই কেলে সুন্দরীকে লাখখানেকের কমে পার করা যেত? যা দিনকাল পড়েছে। বিয়েটা হয়ে গেলে মরেও শান্তি পাবি।'

লঙ্কার মা বলেছে, 'ওই জমিটায় যে সেই বোবা মানুষটার হাতের ছোঁয়া লেগে রয়েছে রে.....।'

হারু ঘোষ বলছে, 'এরকম ব্যাপার জানলে, বিয়েতে আমি মতই দিতাম না। পণের টাকা.... সেটাও বাকি! জমিটা বন্ধক রাখো, পরে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিও। হ্যাঁ, ছেলে আমার হাবাহাবড়া ঠিকই। কিন্তু ছেলে তো! সোনার আংটি সোজা আর ব্যাঁকা। দলিলে টিপছাপ না পড়লে আমিও ছেলে তুলে নিয়ে যাব। সোজা কথা....।'

কাটা কলাগাছগুলোর মধ্যে, না-শোওয়া না-বসা অবস্থায়, লঙ্কা কাঁদছে আর বলছে, 'বোনডা আমার লগ্নভোস্টা হয়ে যাবে গা....।'

লোক জমেছে ভালই। রাস্তার পোস্ট থেকে হুক করা বিদ্যুতের হ্যালোজেন ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছে ক্রমশ। এঁটোকাঁটা খাওয়ার আশায় বসে থাকা কুকুরগুলো অদ্ভুত চিৎকার করছে হতাশায়। দরজার পাশে এককোণে এসে দাঁড়িয়েছে চামুণ্ডা। দেখছে।

বিয়ের পুরুত শিব চক্কোত্তি নারায়ণশিলা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে যখন, লঙ্কার মা চোখের জল মুছতে মুছতে এগিয়ে দিল বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল, দৌড়ে এল ছোটমামা স্ট্যাম্প প্যাড হাতে, হারু ঘোষ ধরালো নতুন সিগারেট — ঠিক তক্ষুণি আর এক নাটক।

ঘড়াংঘত্ জাতীয় একটা শব্দে দরজা খুলে ছাদনাতলায় আছড়ে পড়ল শিখা।

'সই করবে না মা। আমার বিয়ের দরকার নেই। ওই জমি বিক্রি করে টাকা ব্যাঙ্কে রাখব। সুদ পাব। আমাদের ঠিক চলে যাবে। এই শয়তানগুলোকে এক্ষুনি বিদেয় হতে বলো। এই দাদা, কাঁদছিস কেন? শকুনি মামাদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর। তুই না পুরুষ মানুষ?'

বরযাত্রীদের মধ্যে গুঞ্জন 'অপমান, অপমান'। হারু ঘোষ 'দ্যাকো মেয়ে....' বলে শাসাতে যেতেই — কালকেউটের ছোবল মারল শিখা। এগারো ক্লাস পাশ করা শিখা। 'গেট আউট। লজ্জা করে না আপনাদের? ছেলে বিক্রি করে গরীবের সম্পত্তি গ্রাস করতে লজ্জা করে না? একটা মেয়েকে তো গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলালেন, সারাজীবন তো লোকের সর্বনাশ করে এলেন, বাকি কটা দিন ধর্মটর্ম করুন গে তাতে যদি পাপের বোঝা একটু হাল্কা হয়।'

দুই মামা আর হারু ঘোষ ঝটপট ঝটপট করে বেরিয়ে গেল। পড়ে রইলো জ্বলন্ত সিগারেট।

শিখা হাঁফাচ্ছে। শুকনো বুকের ওপর থেকে খুলে পড়েছে অনভ্যাসের বেনারসি। বাটা চন্দন, সস্তার মেকআপ আর ঘামের মধ্যে অনর্গল ধারায় মিশে যাচ্ছে চোখের জল। শিখা ভিড়ের দিকে এগিয়ে এল।

চামুণ্ডা সবে ব্যাক গিয়ার দিয়েছিল নিঃশব্দে, হঠাৎ তার ডান হাতের ওপর এসে পড়ল একটা সরু কালো হাত, বড় বড় রঙিন নখ। খামচে ধরল।

দুটো বড় বাংলার ঘোরের টালমাটাল চামুণ্ডা একসঙ্গে তিন চারটে শিখা দেখতে পেল। কানে এল, 'এই যে ভালমানুষ, তুমি নাকি খুব মহান! বিনা পয়সায় বরযাত্রী নিয়ে এসেছ, বেনারসি কিনে দিয়েছ, আমার পছন্দ-অপছন্দ বুঝতে পেরেছ, আর এতদিন ধরে তোমাকে কী বলতে চেয়েছি সেটা বুঝতে পারনি? তাহলে বড় বড় চোখে ওইভাবে তাকাতে কেন? বলো, আমি তোমায় চিনতে ভুল করেছি? আমি কি জোর করে তোমার গলায় ঝুলে পড়তে চাইছি? বলো।'

চামুণ্ডা তলিয়ে গেছে তখন। তার পা দুটো স্পর্শ করছে অতলের কাদামাটি। 'বলো বীরপুরুষ, বলো ওস্তাদ, তোমার পেছনের সিঙ্গল সিটটা রোজ ফাঁকা থাকত কেন?'

নিচে থেকে ধাক্কা খাওয়া চামুণ্ডা তখন খড়কুটো পেয়েছে, 'আমি....মানে, আমি.....'

'সাহস আছে আমাকে বউ করে ঘরে তোলার? আছে? কিছু চাইব না। শুধু দু বেলা পেটের গর্ত ভরাট করা আর শরীর ঢাকতে যেটুকু কাপড় লাগে, ব্যস। আমি শুধু সবাইকে দেখিয়ে দিতে চাই যে চামুণ্ডাও সুন্দর হয় ....সুন্দর.....।'

কান্নায় বন্ধ হয়ে আসে শিখার কণ্ঠ। দরজার পাল্লা ধরে হাঁফায় সে। শাড়ি ম্যাচিং শায়া বেয়ে, পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে পালাবার চেষ্টা করতেই চামুণ্ডা হাত বাড়িয়ে ধরে তাকে। কৃষ্ণবর্ণ অসুন্দর এক নারীর দিকে তাকিয়ে সে বোকা বোকা হাসে। তারপর ধীর কণ্ঠে বলে, 'ল্যাটা, একটা একশো বিশ পান নিয়ে আয় তো..।'

আর তখনই আকাশে সংঘর্ষ হয় মেঘে মেঘে। আবার বেজে ওঠে শাঁখ, উলুধ্বনি। আনন্দে শব্দ করে ওঠে ডব্লিউ জি ই তেরো তেরো-র টেলকাউন্ট, গিয়ার বক্স, অ্যাকসিলেটর। চক্কোত্তিমশাই স্বস্থানে বসিয়ে দেন নারায়ণশিলা। হ্যালোজেন হয়ে ওঠে উজ্জ্বলতর। লুচি ভাজা শুরু হয় আবার।

সকাল। বাসের কেবিনে, তোশক গোল করে বড় সড় একটা গদি বানিয়ে দিয়েছে লঙ্কা ও ল্যাটা। তার ওপরে নতুন বেনারসি পরে সলজ্জ মাথা নিচু করে বসে আছে শিখা। রাত থাকতেই চামুণ্ডার মার কাছে খবর চলে গিয়েছিল — এখন খবর এলো, বউ বরণ করার জন্যে সেই বেতো বুড়ি মালপত্তর নিয়ে দোরগোড়ায় রেডি হয়ে বসে আছে।

চামুণ্ডা দরজা খুলে সিটে এসে বসে। বৃষ্টি নেমেছে অঝোরে। কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় ধারাবর্ষণে ধুয়ে যাচ্ছে সমস্ত অসুন্দর। গুনগুন করতে করতে গিয়ার দেয় চামুণ্ডা।

আজ তার মন খুব ফুরফুরে। অন্য, অন্যরকম ভাল।

বিপ্রলব্ধা

চন্দ্রা ঘোষ মিত্র

শেষ বেলাকার রোদ্দুর টেবিলের কোণ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শিরীষ গাছের মাথায় তার সপ্তাশ্ব রথ এসে গেছে, ক্ষুরের অধৈর্য আঘাতে ধুলো হয়ে যাচ্ছে মেঘ, পশ্চিম থেকে পুবে অনেকটা পথের উড়ান, সময় নষ্ট করার মোটেই সময় নেই। রোদ্দুরের বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে, দিনের কাজ সারা, দরজা অবধি গিয়েও কি মনে করে আবার ফিরে আসা, দু চারটে দরকারি কথা, আবার তেমন দরকারি নয়ও, শুধু একবার পিছন ফিরে তাকান, করমর্দনের ভঙ্গিতে একটু ছুঁয়ে যাওয়া।

ঠিক তখনই মনের কথার টুকরোটা পেয়ে গেল রুমেলি। মরিস ডবের তিনশো বারো আর তেরো নম্বর পাতার কোলে, ছোট্ট একটা চিরকুট। কোনও সম্বোধন নেই, না কোনও স্বাক্ষর, স্পষ্ট গতিময় হস্তাক্ষরে কেবল দু-চার পঙ্‌ক্তি।

"কাল তোমাকে দেখলাম, কফি হাউসের সিঁড়িতে। ডাকতে যাব, তুমি বললে ওপরে বন্ধুরা অপেক্ষা করছে, আমি যাই। আমিও পিছনে পিছনে যাব কিনা ভাবছি। তোমার চটির তলায় একটা কাঁকর আটকাল। তুমি দু-পা পিছোলে, পা-টা ঠুকলে মেঝেতে দুবার, তারপর এক ঠেলায় গড়িয়ে দিলে কাঁকরটা। দৃশ্যটা দেখে ইস্তক আমার আর ভরসা হল না যেতে। তোমার ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গিতে যে রূঢ়তা ছিল সেটাই রুখে দিল আমাকে সিঁড়ির মুখে। যদি কোনওদিন এমন হয়, ওই ইটের টুকরোটার মতো? আমাকে টপকে, আমার পাশ দিয়ে অনেকে উঠে গেল। খাকি রংয়ের ডেনিমের শার্ট পরা একটা ছেলে, ভয়ানক ওপর-চালাক গোছের, তোমার কনুই ছুঁয়ে তোমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। আমি এটা বরাবর লক্ষ করেছি যে এই ছেলেটা তোমাকে কোনও না কোনও ভাবে একটু ছুঁয়ে যাবে। তুমি খেয়াল কর না, না? একদিন বাসে ভিড়ের মধ্যে পেয়ে ওর পা-টা এইসান মাড়িয়ে দিয়েছি না! তবে বদমাসদের চামড়া মোটা। যাক, আমার তো জ্বালা খানিক জুড়োল।"

চকিত চমকে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল রুমেলি। কেউ কি লক্ষ করছে তার প্রতিক্রিয়া? প্রেরক কি কাছে পিঠেই আছে কোথাও? এতক্ষণে ইউনিভার্সিটির অনেক ডিপার্টমেন্টই ছুটি হয়ে গেছে, দু এক জায়গায় ওয়ার্কশপ চালু আছে হয়তো, লাইব্রেরিও জনবিরল হয়ে গেছে। জনা কয়েক অধ্যাপক এদিকে ওদিকে গভীর অভিনিবেশে বই পড়ছেন। তাঁদের নিষ্ঠা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, জ্ঞানলাভই তাঁদের একমাত্র অভীষ্ট। তাছাড়া প্রত্যেকেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ডানদিকের কোণে থার্ড-ইয়ারের সোমনাথদা আর শম্পাদি একটা মোটা বই খুলে কথা বলে যাচ্ছে, কোনও শব্দই নেই তাতে, ফিসফিসও নেই, একদম পিঁপড়েদের মতো। তিন বছর ধরে জোড় বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য নির্দিষ্ট সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে এখন লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছে। পিঁপড়ের ভাষাটাও শিখে নিয়েছে এই ফাঁকে। সোমনাথদা কখনওই এই চিঠি লিখবে না। দুটো টেবিল পরে বসে

আছে ফিলজফির ছ'জনের ওই গ্রুপটা। ওই ছ'টি মেয়ে মিলিটারি প্যারেডের মতো তালে তালে পা ফেলে, একসঙ্গে ডানদিকে ঘোরে, একসঙ্গে বাঁয়ে। কৌস্তুভ একদিন ওদের ব্যূহ ভেদ করে আলাপ করে এসেছে কিন্তু কার কি নাম জানতে পারেনি। এই নিয়ে বেচারিকে প্রচুর আওয়াজ দিয়েছে কৌশিক, এমনকি রুমেলিও। যাকগে, পারিসনি, পারিসনি, চেপে যা, তা না কৌস্তুভও ওদের স্বপক্ষে প্রকারান্তরে নিজের স্বপক্ষে বলে যেতে লাগল, ওরা আসলে খুব ভাল মেয়ে। সবুজ শাড়ি-পরা মেয়েটি তো অত্যন্ত সহজ সরল, আর বেগনি-সাদা সালোয়ার-কামিজ ভীষণ হাসিখুশি। ওদের সঙ্গে আর দ্বিতীয় দিন কথা বলার সাহস হয়নি কৌস্তুভের, কিন্তু ওদের সম্পর্কেকিছু বলতে গেলে, সাধারণত কৌস্তুভের সহজ-সরল বা কৌস্তুভের হাসিখুশি — এইরকমভাবেই বোঝান হয়। যাই হোক এই চিঠি সহজ-সরল বা হাসিখুশিরা লিখবে না। একে তো ওরা মেয়ে, তার ওপর কোনও সস্তা রসিকতা করা — ওদের স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। আচ্ছা, কে বলেছে, সেই দুর্বৃত্ত এই রিডিং রুমের মধ্যেই বসে আছে? চিঠিটা বইয়ের ভাঁজে গুঁজে দিয়েই হাওয়া হয়ে যায়নি তো? আর তাকেই বা কে বলে দিয়েছে, রুমেলি বাড়ি যাবার পথে সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে আসবে, গোদ্ধর মরিস ডবের বইখানাই ওল্টাবে, শেষ বিকেলের রোদ্দুর তিরকাঠি হয়ে দেখিয়ে দেবে তিনশো বারো নম্বর পাতা?

কে তাকে এত নজরে নজরে রেখেছে, কে ঘোরে তার সঙ্গে ছায়ার মতো? ভাবতে বসে রুমেলি। কাল? কফি হাউস? চটিতে টিল-মত-কী আটকে গিয়েছিল, ঠিকই, খুব কদর্যভাবে তাকে ছুঁড়েছিল কি? কে আর জানে, কেউ তাকে লক্ষ করছে। খাকি রংয়ের ডেনিমের শার্ট পরেছিল বটে অনুরাগ, কিন্তু ছুতোনাতায় শরীর ছোঁয়ার মতো বদ্ অভ্যেস তো তাব মোটেই নেই। ওপর-চালাকও কখনওই নয়, বরং সত্যিকারের সহজ সরল বলতে গেলে অনুরাগই। চিঠির লেখক আবার একটু বেশি দেখে। বেশি শোনেও। ঘটনা যা বলছে আদ্যোপান্ত সত্যি হলেও সিঁড়ির নীচে কারওকেই 'ওপরে বন্ধুরা বসে আছে, আমি যাই' এমন কথা বলেনি রুমেলি। কিন্তু যে-ই হোক সে তার খুব নিকট-কথা জানে, এমনকি যে কথা বলা হয়নি — তাও।

।। দুই ।।

বসন্তসেনা হইহই করে এসে হাজির, একেবারে লাইব্রেরির রিডিং রুমে। বসন্তসেনা মানে সৌন্দর্যের সমুদ্র। ঢেউয়ের ধাক্কায় কাত হবে না এমন মানুষই নেই। ওর জন্য কোনও নিয়মই নিয়ম নয়। যেমন, এখানে 'সাইলেন্স' বোর্ডটা টাঙান আছে। কেউ কোনও আপত্তি করবে না, বসন্তসেনা যদি আশি ডেসিবেলে কথা বলে। রুমেলির সামনে খোলা বইটা টেনে নিয়ে নামটা দেখেই ও কাঁধ ঝাকিয়ে ভ্রূতে অদ্ভুত বিভঙ্গ আনল, মাইগড, মরিস ডবের পাব্লিক ফিনান্স। বিশল্যকরণী আনতে গন্ধমাদন? তুই কি গোটা 'ক্যাপিটাল' পড়ে মার্কস-এর ইকনমি পড়বি? আমার বাবা বেদ ওই স্যামুয়েলসন। আর নোটস্। চল, চল এত পড়লে তুই পাগল হয়ে যাবি।

বসন্তসেনা রুমেলিকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে মিলনদার ক্যান্টিনে এনে হাজির করল। এখানে আগে থেকেই কৌশিক, কৌস্তুভ, অনুরাগরা বসে আছে। কিছু খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে, ওদের হাতে তার টোকেন ঘুরছে। রুমেলি আসাতে আর এক প্রস্থ হইহই শুরু হল। আজ মাত্র দুটো পিরিয়ড হয়ে ক্লাস মুলতুবি হয়ে গেছে। সামনের সেমেস্টারের আগে দু সপ্তাহ ছুটি। তার মানে বন্ধুদের মধ্যে রোজকার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ। তাই দিনটা ওরা

একটু উপভোগ করে নিতে চায়। অন্য অন্য টেবিলেও ওদেরই ক্লাসের আরও কয়েকজন বসে আছে। এদের মধ্যে কেউ? কে?

কৌশিক তাকে দেখিয়ে বলল, এটাকে কোথায় ডিসকভার করলি?

লাইব্রেরিতে, একগাদা বই মুখে করে বসে।

হোয়াট আর ইউ ডুইং দেয়ার? ফান্ডা বাড়াচ্ছিলি? হোয়াট টু ডু উইথ ফান্ডা? ওসব পরীক্ষার পরের জন্য, বুঝলি? আগে ওনলি সাম কোশ্চেনস্ এন্ড সাম চোথা।

কী উত্তর দেবে রুমেলি। এদেরকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। এরা সব এক একটি সবজান্তা।

অনুরাগ একটু খোঁচা মেরে বলল, কিরে, কী ভাবছিস?

ওর পাশ থেকে একটু সরে বসে রুমেলি বলল, এই, তুই এই সাদা পাতায় বাংলায় ভয়ে আকার লেখ তো।

তারপর বসন্তসেনাকে বলল, তুই লেখ 'ল'।

ইতিমধ্যে কৌশিক আর কৌস্তুভ ধোঁয়া-ওঠা চাউমিন এনে হাজির করল টেবিলে। তাদের দিয়ে লিখিয়ে নিল 'বা' আর 'সা'। যেমন না শব্দটা তৈরি হল, ওরা চারজন হাততালি দিয়ে উঠল, কনগ্রাট্স রুমেলি, তুই প্রেমে পড়েছিস? হু ইজ দি লাকি চ্যাপ?

কে সে? কে-ই বা জানে! যদি বলা যায় রোদ্দুর, শিরীষ পাতার ছায়া, বা ঝিলের জলে ঢেউয়ের বৃত্ত, ঢেউয়ের মাথায় হিরের চুমকি, কিংবা জলফড়িংয়ের পাখনা কাঁপান — বিশ্বাস করতে কারও বয়েই গেছে!

।। তিন ।।

আজকে অ্যাডাম স্মিথ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছাপ্পান্ন-সাতান্ন।

"কাল আমার রুটিনটা কি শুনবে? সকাল ছটায় ঘুম থেকে ওঠা, পড়তে বসার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। বইটা খুলে বসতেই ল্যাব খেয়ে গেলাম। কিচ্ছু পড়া হল না, শুধু উল্টে পাল্টে রেখে দিলাম। কিছু হল না দেখে দুপুরে ঘুম। অল্প টিভি। তারপর রাত দেড়টা অবধি সলিড পড়া।"

"ওঃ, তোমাকে সেদিন যা দেখাচ্ছিল না! ওই যে সেদিন — যখন সন্ধ্যা নামছিল ঝিলের ওপর। তার দ্বিধা থরো থরো পায়ের পাতা যেই না ছুঁয়ে ছিল, তাকে কৃতাঞ্জলিপুটে ধরে নিয়ে আঙুলের ওপর ওষ্ঠ রাখল জল। আমূল শিহরিত হয়ে উঠল সন্ধ্যা। তার সেই রোমাঞ্চ জেগে রইল রাস্তার ধারে বাতিস্তম্ভে। কারওর খেয়াল নেই সাঁকোর ওপর তখনও বিকেল, তুমি আর বসন্তসেনা পার হয়ে যাচ্ছ। কথা বলতে বলতে একসময় তুমি ঘুরে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ে হেলান দিলে। বুকটা ধড়াস করে উঠল, মনে হল এইবার বুঝি উল্টেজলে পড়ে যাবে। তারপর তলিয়ে যাবে কোথায়, ঝিল যত গভীর নয় তার থেকেও নীচে। আর সেখানে গিয়ে তুমি মৎস্যকন্যা বনে যাবে। কেননা, তোমার মাথায় চুড়ো করে জড়ো করা ছিল চুল, দু'পাশে শ্যাওলার মতো নেমে আসছিল চুলের জালি। কড়ির মালা দুলছিল গলায়। শাড়িতে কাপড়ের টুকরো জুড়ে তাতে গাঁথা ছিল কড়ি ও কাজ। বসন্তসেনাও সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর। তবে ও কোনওদিন মৎস্যকন্যা হবে না। তোমাকে নিয়ে আমার সে ভয়টা আছে।"

খুব খুঁটিয়ে হাতের লেখাটা লক্ষ করে রুমেলি। অনুরাগ ভয়ে আকার লিখেছে, কেমন তালগোল পাকানো। ভ আর ত-এ তফাত করা যাচ্ছে না। আর এর ভ-এর প্রথম টানটা নাচের মুদ্রা প্রসারিত হাতে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করছে যেন নর্তকী। কৌস্তভের দন্ত স — মধ্যযুগের কলকাতার বাবু। লুটিয়ে পড়া কোঁচার খুঁট হাত বাড়িয়ে ধরে রেখেছেন বুকের

কাছে। এরা কেউ এই চিঠি লেখেনি। লিখলেই কি খুশি হত রুমেলি? কেন এই নৈর্ব্যক্তিক চিঠি এরা লিখবে, সোজাসুজি কথা বলার যখন এত সুযোগ আছে?

গতকাল ছিল ছুটির দিন। রুমেলিও কি ভাবেনি অনেক পড়বে? কিন্তু কার্যত কী হল — মা ঝুনুমাসির বুটিকে দুপুরবেলা যাবে কি যাবে না ; না, না তুমি যাও, পুজোর আগে এই সময়টা যা ভিড় না, একা সামলাতে ঝুনুমাসি হিমসিম খাবে। তোরও তো পরীক্ষা। এখন আর পরীক্ষার আগে মাকে লাগে না, না? তারপর নির্জন ফ্ল্যাটে, ততোধিক নির্জন ঘরে বুকের নীচে বালিশ চেপে সামনে অবশ্যই বই খোলা, শুধু স্বপ্ন দেখা, দেদার স্বপ্ন। ধুধু ধানক্ষেতের মধ্যে থেকে আচমকা বকের ওড়া, উড়তে উড়তে রোদ্দুরে ঝাপসা হয়ে যাওয়া। রোদ্দুর এখন শিরীষ গাছের ছায়াবৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ্মণরেখার মধ্যে ঢুকতে পারেনি। একটা বুলবুলি কোথ্ থেকে উড়ে এসে ডালে বসল, বাকিংহাম প্যালেসের প্রহরীদের মতো উঁচু টুপি মাথায়, পিছন পিছন তার প্রেমিকা। পাখিরা বড় ভালবাসাবাসি করে, যদি পাখিদের মতো ভালবাসা যেত!

কৌশিকের ফোন এল।

কি রে তোর গলাটা এত ভার ভার লাগছে কেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলি? ওঃ, না, ঘুমোবি কি? তুই তো প্রেমে পড়েছিস।

আর কিছু?

কাঁচা প্রেমে বড় আঠা।

আর পাকলে?

খসে পড়ে যায়। পাকা ফল দেখিসনি?

।। চার ।।

ইউনিভার্সিটি ফেস্ট চলছে। এই মহাপার্বণে সবাই একটু খোলামেলা। সারা রাত ধরে চলছে গানের জলসা। কে কার বুকে মাথা রেখে ঘুমোবে ঠিক করে নিয়েই বসছে পাশাপাশি। ভোররাতে জলসা ভাঙলে শতরঞ্চির সঙ্গে গুটিয়ে যাচ্ছে এমন ছেলেমেয়েও আছে দু চারটে। মাস্টারমশাইরা দেখেও দেখছেন না। তাঁরাও টুকিটাকি প্রেম সেরে নিচ্ছেন এই ফাঁকে। রুমেলি রাত্তিরে থাকা চলবে না, কড়া হুকুম আছে মায়ের। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে রাত জাগার যে কী মজা, মা সেসব বুঝবে না! জলের মধ্যে কালপুরুষের ছায়া দেখলে মানুষ নাকি ঘরছাড়া হয়। কতদিন ভেবেছে ঝিলের জলে তারা ভাসা দেখবে, কিংবা ক্যাম্পাসের গা ঘেঁষে যে-রেললাইন, শুনবে সেখান দিয়ে দিনের শেষ রেলগাড়ি যাওয়ার আওয়াজ — মা'র অসহযোগিতায় সেসব আর এ জীবনে হওয়ার নয়। সেই দুঃখ ভুলবার জন্য পোশাকে যতটা পারা যায় খোলামেলা হবার চেষ্টা করল সে। শখ করে একটা স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপ টপ্ কিনেছিল পুজোর সময়, পরা হয়নি, আনকোরা পড়েই ছিল আলমারির কোণে, জিনসের ওপর সেটাই পরে নিল। চুলটা যে কী করা যায়? চুলগুলো নিয়ে মহাসমস্যায় পড়ে যায় রুমেলি, একঢাল ভ্রমরকৃষ্ণ চুল তার। কিছু ঠিক করতে না-পেরে পার্লারে গিয়ে কান ছোঁয়া ব্লান্ট কাট দিয়ে এল। মায়ের তো দেখে মাথায় হাত, এ কী মূর্তি হয়েছে তোর। রাত্রে থাকতে দিচ্ছি না বলে প্রতিশোধ নিলি? যা, যা পারিস কর।

ঠিকই বলেছে মা, প্রথম রাগটা মায়ের ওপরই হয়েছিল। তারপর গিয়ে পড়ল চুলের ওপর। এখন রাগ হচ্ছে সবার ওপর। শেষ বিচারে নিজের ওপরই। গান্ধী ভবনের সামনের মাঠে বসে আড্ডা দিচ্ছিল তারা। মাউথ অর্গ্যানে সুর তুলছিল কৌশিক। একটু দূরে অন্য

দলে বসেছিল অনির্বাণ, দীপশিখারা। ওরা পরের ব্যাচের। দীপশিখা গলা তুলে ডাকল, কৌশিকদা, আমাদের এখানে একটু। বিনা বাক্যব্যয়ে কৌশিক উঠে গেল। মাউথ অর্গ্যান হাতে থাকলে কেউ ওর বন্ধু না, কিংবা সবাই বন্ধু। বসন্তসেনাও উশখুশ করছিল। বলল, তোরা সিগারেটের ধোঁয়ায় এত পলিউশন করেছিস, আমার চোখ জ্বালা করছে। এই কৌস্তভ, চল ফুচকা খেয়ে আসি, না হলে আমি দেখতে পাব না।

কৌস্তভ বলল, রুমেলিও চল।

ঘাড় নাড়ল রুমেলি। সেই মুহূর্তে তার উঠে যেতে ইচ্ছে করছিল না। বসন্তসেনা কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বলল, 'মা মানা করেছে, নাকি? মাদার্স চাইল্ড।' হেসে উঠল অনুরাগ আর কৌস্তভ। এরপর আর যাওয়াই চলে না। রুমেলি রাগ করেছে বুঝতে পেরে উঠেও আবার বসে পড়ল অনুরাগ। বসন্তসেনাও মত পাল্টে ফেলল। কেউ যাচ্ছে না দেখে রুমেলিকেই আবার জোর করতে হল। শেষ পর্যন্ত বসন্তসেনা আর কৌস্তভ গেল। শর্ত রইল এই, ওদের আনা চুড়মুড় খেতে হবে রুমেলি আর অনুরাগকে। অনুরাগকে নিয়ে সমস্যা নেই। সে সবেতেই রাজি। কিন্তু রুমেলির রাগ চলে গেলেও নিমরাগ থেকে যায়। কারওর সঙ্গে কথা বলবে না ঠিক করে সে পাশে পড়ে থাকা বই, কার জানা নেই, তুলে নয়। ইন কোয়েস্ট অভ হ্যাপিনেস। এটা আবার কোন পরীক্ষায় লাগে? বইটা খুলতেই মাঝখানের পাতা বেরিয়ে পড়ে। সেই মনের কথা। এখানেও? অনুরাগকে লুকিয়ে চুপি চুপি পড়ে নেয় সে।

'শরীরে এত সম্পদ তোমার, অনেকেই তৃপ্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। ভালমানুষের মতো মুখ করে বসে রয়েছে যে-ছেলেটি, সে তো তোমার পাশ ছাড়া হচ্ছেই না। কেন এসব পরো? শাড়িতেই তো বেশ ছিলে।''

দ্রুত হাতের টানে দু চার লাইন। কতক্ষণই বা লাগে পড়তে। ছুঁড়ে বইটা ফেলে দেয় রুমেলি। বড় সাহস বেড়েছে, এখন আবার শাসন হচ্ছে। এদিকে সামনে আসার সাহস নেই। জ্বলন্ত চোখে তাকায় রুমেলি। রোদ্দুর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বকুলের ওপর। সম্ভোগ পরিতৃপ্ত তরুণীর মতো বকুলের পাতা স্থির, নিষ্কম্প। সব পারে রোদ্দুর, আজ শিরীষ, কাল কৃষ্ণচূড়া, পরশু বকুল, সবাইকে ছুঁয়ে যেতে পারে কেবল রোদ্দুরই। আর তার বেলা? তুমি অনন্যা হও। কেন? বেশ করবে অনুরাগকে বলবে, এই চল তো, আমায় বাসে তুলে দিবি। অন্যদিন সে দিব্যি নিজেই বাসে উঠে যায়, কেউ তুলতে যায় না।

মৃদু আপত্তি করল অনুরাগ, দাঁড়া, ওরা চুড়মুড় নিয়ে আসুক।

কৌশিক রুমেলির রাগের কারণ কিছু জানে না। আবার এই দলে ফিরে এসে বলল, এখনই যাচ্ছিস কেন, এখনও তো সন্ধেই হয়নি? একটু দাঁড়া, আমিও যাব একসঙ্গেই।

কোনও কথায় কান দিল না রুমেলি, গটগট করে হেঁটে চলে গেল বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

বন্ধুদের কাজ বাড়ল। পরদিন দলবেঁধে বাড়িতে এসে রাগ ভাঙিয়ে গেল।

দুদিন পরে এক সকালে রুমেলি ফোন করল কৌশিককে, আজকের দিনটা মনে আছে তো?

কেন, কী আছে আজ? আকাশ থেকে পড়ল কৌশিক।

বাঃ, আমার জন্মদিন না?

তুমি কে বাবা হরিদাস, তোমার জন্মদিনটা বিশ্বসুদ্ধু লোককে মনে রাখতে হবে?

অ্যাই, কানমলা খাবি বলে দিচ্ছি। বিকেলে আসবি কিন্তু, আমি আজ আর ক্লাসে যাব না। খ্যাঁটনটা কেমন হবে আগে বল।

মোগলাই পরোটা, মাটন চাপ, আইসক্রিম।
ছ্যা, ছ্যা —
তাহলে, মাটন বিরিয়ানি, চিলি চিকেন।
ওয়াক থুঃ!
তাহলে ডাল, রুটি, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা।
ওঃ ফাইন, ফাইন।
আস্তে আস্তে মেঘ কেটে গিয়ে মনটা ঝলমল করে উঠল রুমেলির।

।। পাঁচ ।।

কৌস্তভের বাড়ি থেকে বেরিয়েই রুমেলি আর বসন্তসেনা দেখল আকাশ প্রচুর সাজগোজ করে তৈরি। এক্ষুনি বর্ষাবাহিনী এল বলে। ওরা দৌড়পায়ে হেঁটেও বাসরাস্তা পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না, তার আগেই চড়বড় করে বৃষ্টি এসে গেল। কারওর কাছেই ছাতা নেই অবধারিতভাবে। কী করি, কোথায় যাই — করতে করতে ওরা একটা দোকানের আতপত্রের তলায় আশ্রয় নিল। সেখানে ইতিপূর্বেই আরও দু'চারজন দাঁড়িয়ে আছে। এই দুজন নবোদ্ভিন্ন যুবতীকে পেয়ে তারা উৎসাহিত হয়ে উঠল নিঃসন্দেহে। মানুষের পক্ষে সেটা কিছু এমন দোষের নয়, বিশেষত বসন্তসেনা যখন রয়েছে। এখন আবার একটা নিলে, অমনই মেলে আর একটা, সেভাবে গিঁট বেঁধে রয়েছে রুমেলি। কিন্তু বৃষ্টির বাড়াবাড়িটা কি সহ্য হয়? অশোকবনে তাদের দুজনকে বন্দী করে রাবণের অনুচররা রাক্ষস-নৃত্য জুড়েছে। ঝলসে উঠছে তাদের তলোয়ারের মুক্ত ফলা, অট্টহাস্যে ফেটে পড়ছে তারা, মেঘে মেঘে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাদের হাসির আওয়াজ, আসন্ন সম্ভোগের আনন্দে আত্মহারা তাদের হাত, হাতের আঙুল ছুঁয়ে দিচ্ছে পা, পায়ের পাতা। জল ক্রমশ বাড়ছে, নাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে উপর্ঝরণ। রুমেলি নিশ্চয় করে বলতে পারে, আর যারা নিরুপায় দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চোখ একটা স্বাদু খাদ্য পেয়েছে। বসন্তসেনা অস্বস্তিবোধ করছে, দু একবার বিরক্তিও প্রকাশ করে ফেলল। রুমেলিকে যদি একা দাঁড়িয়ে থাকতে হত এখানে, ওর অবস্থাও এরকমই হত। এখন না হয় বসন্তসেনার উপচ্ছায় অঞ্চলে ঢুকে পড়ে কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক বোধ করছে। এতে তো খুশি হওয়ারই কথা, কিন্তু গোপন ঈর্ষার মতো কী এক গভীর দুঃখ বৃষ্টির ছাটের মতো ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে রুমেলিকে। ওর উসকো-খুসকো চুলে ধুলোর মতো লেগে আছে জলকণা। বসন্তসেনা কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। মুখের মোচড়ে ঝরে পড়ল অসহিষ্ণুতা। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বার করে নাম্বার টিপতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া মিলল ওধারে।

হাই ইন্দ্র, তুমি একটু গাড়ি নিয়ে আসবে?

ইন্দ্রর তরফে কোনও কথাই শুনতে পাচ্ছে না রুমেলি। বসন্তসেনার উত্তরের ফাঁকগুলোতে নিজের মতো করে টীকাটিপ্পনি বসিয়ে যাচ্ছে।

ইন্দ্রটা আবার কে? বসন্তসেনার আপৎকালীন প্রেমিক বোধহয়। নিশ্চয়ই কোনওদিন প্রাণ-টান দেবে এমন প্রতিজ্ঞা করেছিল। আজ তবে তার সেই পরীক্ষা দেবার দিন। এই দুর্যোগ মাথায় করে, জল ঠেলে ঠেলে সদানন্দ রোডে পৌঁছতে পৌঁছতে তার প্রাণটা থাকলে হয়। কেন, বসন্তসেনাদের নিজেদের গাড়ির কী হল? ও, সেটা বুঝি হালকা-পলকা। জলে ভেসে যাবে। দেখা যাক, ইন্দ্র কী রকম জবরদস্ত গাড়ি আনে। সে আসবে এই সম্ভাবনাতেই তার দূতেরা, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। তাণ্ডব যেন বা কিছু কমের দিকে। কি রে বাবা, ইন্দ্র কি দেবতা নাকি?

বসন্তসেনা বলল, কি রে রুমেলি, কী ভাবছিস? খুব ভাবনায় পড়েছিস মনে হচ্ছে।

রুমেলির মন তখন দূরে কোথাও, কোনও দুর্নিরীক্ষ্য দূরত্বে, যা দূরেও হতে পারে আবার একই সঙ্গে খুব কাছেও। যেখান থেকে কেউ একজন খুব গভীর দৃষ্টিতে ধরে রেখেছে তাকে। সে আর একা নেই।

বসন্তসেনা তাকে আশ্বস্ত করে, ডোন্ট ওরি। আমরা তোকে ঢাকুরিয়া ড্রপ করে দিয়ে যাব। ঠিক আছে?

রুমেলির দৃষ্টিতে তখন জলের ফোঁটা। দোকানের সামনে টিনের ছাউনি। তার ধারটা সরু কাঠ দিয়ে মোড়া। সেই কাঠের রেখা বরাবর জলের ফোঁটা দৌড়ে আসছে দু দিক থেকে। এক সময় দুটো মিলে একটা বড় ফোঁটা তৈরি হচ্ছে। তারপর টুপ করে ঝরে পড়ছে। ততক্ষণে পিছনে পিছনে ফোঁটাদের লাইন পড়ে গেছে। অপ্রতিরোধ্য মিলন টানে তারা ধরে ফেলছে একে অপরের হাত। তারপরই মরণ-ঝাঁপ।

।। ছয় ।।

সেই বৃষ্টি চলল পরদিন, তার পরদিন, তারও পরদিন। এ বছর সারা বর্ষাকাল জুড়ে ভালই বৃষ্টি হয়ে গেছে। বেশির ভাগ নদীই বইছিল বিপদসীমার ওপর দিয়ে, এবার বাঁধভাঙা জল এসে বান ডাকিয়ে দিল। রেল লাইন ভেঙে দিয়ে জল ঢুকল গ্রামে। ঘর-বাড়ি ভেঙে, মানুষ, গরু-মোষ ভাসিয়ে, শষ্যক্ষেত ডুবিয়ে জল সমুদ্র হয়ে শুয়ে থাকল। এমনি না-ছোড়, কিছুতেই যাবে না, একদিকে ঠেলা খেলে ফুঁসে ওঠে আর এক দিকে।

এর মধ্যেই কৌশিক, কৌস্তভরা পুজোর কটা দিন হলদিয়ায় কাটাবে ঠিক করেছে। ওদিকে বন্যা হয়নি। বসন্তসেনাও নাকি যাচ্ছে ওদের সঙ্গে। গেলে ওর বোনকেও নিয়ে যাবে। রুমেলিকেও ধরেছিল খুব করে। গেল না বলে একটু রাগারাগিও হয়ে গেল। কিন্তু কিছু করার নেই তার। একে তো তাদের বাড়িতে মা-বাবা, ক'জন বন্ধু মিলে বাইরে রাত কাটাবে, এই প্রস্তাবেই আঁতকে উঠবে। তার ওপর, প্রত্যেক বছর পুজোয় কৃষ্ণনগর যাওয়া রুমেলিদের পরিবারের রীতি। সেখানে অবশ্য বন্ধুরা যেতে পারে। গেলে সবাই খুশিও হবে খুব। কিন্তু সে কেউ যাবে? তার বেলা, না।

এবার বাবা-মা, কাকু, পিসি যে যেখানে ছিল সবাই খুব উদ্বিগ্ন, এই অবস্থায় কৃষ্ণনগরে দিদান কি করছে, আর মন্টুকাকাই বা সামলাচ্ছে কি করে সবদিক। সৌভাগ্যক্রমে পুজো আসতে আসতে জলটা নামতে শুরু করল। রাস্তাঘাটের বেহাল দশা খানিকটা স্বাভাবিক হতেই সবাই মিলে হুড়মুড় করে এসে হাজির হল দিদানকে দেখতে। দিদানের বাড়ির ভিত খুব উঁচু, জল ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারেনি কিন্তু দালান ছুঁয়ে গেছে। শিবুকাকারা পাশেই থাকে। তাদের মাটির দেওয়াল, খড়ের চালের গোয়াল আর রান্নাঘর ধ্বসে পড়েছে। জল ঢুকে গেছে ধানের মরাইতে। এখন জল নেমে যাওয়াতে কাকিমা আর ও বাড়ির দিদা সারা উঠোন মেলে ভেজা ধানের আলপনা দিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে এক ঝাঁক পায়রা এসে বসছে আর কাকিমা 'হুস' করে দৌড়ে যাচ্ছে। নেড়ি কুকুরটাও ফিরে এল একদিন। দিদান তাকে খুব খাতির করে খাওয়াল দাওয়াল।

সবকিছু আবার আস্তে আস্তে জীবনের ছন্দে ফিরে যেতে লাগল। এর মধ্যে রাংতা এল একদিন। ওর বরকে নিয়ে, বিয়ের পরে প্রথম। বড়পিসিমার মেয়ে রাংতা, একদম রুমেলির

বয়সী। সারা পুজোর ছুটিটা রুমেলি আব রাংতা হাতে হাত পেঁচিয়ে ঘুরে বেড়াত। সেই রাংতার মুখে রুমেলি যেন আবিষ্কার করল সেই আশ্চর্য রোদ্দুর। অমনি দুদ্দাড় ছুটে একেবারে ছাদে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। সারা ছাদময় একটা মন-কেমন-করা আকাশ।

।। সাত ।।

দু দুটো মাস পার হয়ে গেল পরীক্ষা আর রেজাল্ট বার হতে হতে। এই দুটো মাস ইউনির্ভাসিটির মুখ দেখেনি রুমেলি। এতদিন পর সব কেমন অচেনা লাগছে। নতুন একদল ছেলেমেয়ে ঢুকে লবিতে জায়গা দখল করে নিয়েছে। গেটের পাশে রবার গাছটা আরও একহাত লম্বা হয়ে গেছে। ঝিলের যত শাপলা শামুক উজাড় করে রাখা আছে ধার বরাবর। লাইব্রেরিব পিছনে আখাম্বা একটা বিল্ডিং উঠছে। সবচে' বড়ো কথা শম্পাদি মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে তার বন্ধুর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। রুমেলিকে দেখে চিৎকার করে বলে উঠল, 'কেমন রেজাল্ট হয়েছে তোর? তোদের ব্যাচে কটা ফার্স্ট ক্লাস?' সোমনাথদা ধারেকাছেও নেই। বসন্তসেনা মডেলিং-এ চলে গেছে। সম্প্রতি একটা সাবানের বিজ্ঞাপনে টি.ভি-তে তাকে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। স্নানদৃশ্যে ক্যামেরা তার পিছু ধাওয়া করে নদীর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে একেবারে। আর রুমেলি নয়, বসন্তসেনাই অবিকল মৎস্যকন্যার মত সাঁতার কাটতে কাটতে কখনও ফেনা হয়ে যাচ্ছে, কখনও ফেনাব মধ্যে থেকে ভুস করে বেরিয়ে এসে দর্শকদের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে সাবানের প্যাকেটসুদ্ধু হাতটা। আবার কি কোনও উথাল-পাথাল বাদল দিনে বসন্তসেনা ডাক পাঠাবে ইন্দ্রকে? কৌস্তুভ চলে গেছে ম্যানেজমেন্ট পড়তে। কেবল কৌশিকই এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। অপ্রত্যাশিত ভাল রেজাল্ট করেছে ও। পি. এইচ. ডি করে নিয়ে অধ্যাপনা করার ইচ্ছে আছে ওর। সেইটা মাথায় রেখেই এগোচ্ছে ও। অনুরাগ বাবার ব্যবসায়। ওর আর ডিগ্রির দরকার নেই।

ডিপার্টমেন্টে গিয়ে কৌশিকের খোঁজ করতে হল। বি. এম ক্লাস নিচ্ছেন তখন। ওকে দেখতে পেয়ে কৌশিক ভেতর থেকে হাত নেড়ে অপেক্ষা করতে বলল। চারতলার ব্যালকনির একেবারে কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল রুমেলি। এই জায়গাটারই নাম আন্টার্কটিকা। শীতকালে কোনও কোনও দিন এখানে ববফ পড়ে আর সেই সঙ্গে হু হু হাওয়া। আজ সেইবকম একটা দিন। এক অতীন্দ্রিয় রোদ্দুব ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। এত অপর্যাপ্ত, কিন্তু একটুও গায়ে লাগছে না। গায়ের ওপর চাদরটা টেনে নিয়ে তৃষিত চোখে দূরের রোদ্দুরের দিকে তাকিযে রইল সে। বি. এম বেরিয়ে যেতেই অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছে কৌশিক।

কি রে, এতদিন পরে থোবড়া দেখালি যাহোক! তোকে ফোনেও পাওয়া যায় না, ব্যাপারটা কী?

ঠিক আমার না থাকার সময়টায় ফোন করলে ওরকমই হয়। মা বলছিল, কৌশিক তোকে প্রায়ই ফোন করে। সেইজন্যেই তো এলাম দেখা করতে। বল, কী বলবি বল।

কিছু বলতেই হবে? কেন, এমনি আসা যায় না? মাসিমা বলছিলেন, তুই নাকি প্রায়ই সাইবার কাফেতে যাচ্ছিস চ্যাট করতে।

হ্যাঁ, ওই আর কি! পাড়াতেই খুলেছে একটা।

তাই মানুষ ছেড়ে যন্ত্রের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাওয়া। তুই ভাত-টাত খাচ্ছিস, না সাইবার চিপ্স?

ফোনে পাচ্ছিস না, তো একবার বাড়ি গেলে কি হয়? ফার্স্ট হয়ে খুব পায়াভারি হয়েছে না তোর?

পায়াভারি? না, এই দ্যাখ একই রকম আছে, পাটা একটু তুলে ধরে কৌশিক, ভারি তো একটুও হয়নি। সেই জিনস মেলা থেকে হাফ দামে তুই আর আমি যে প্যান্টটা কিনেছিলাম, সেটাই তো পরে আছি।

সুস্মিতাদি একগাদা খাতাপত্র নিয়ে তড়িঘড়ি ক্লাসে ঢুকলেন, ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এলোমেলো দাঁড়িয়ে বসে কথা বলছিল এর-ওর সঙ্গে। সুশৃঙ্খলভাবে বসে গেল যে যার সিটে। দু-একটি ছেলে বেরিয়ে চলে গেছিল কমনরুমের দিকে দু-চার টান ধোঁয়া ছাড়বার জন্য, তারাও কয়েক কদম সিঁড়ি টপকে টপকে উঠে আসতে লাগল ক্লাসরুমের দিকে।

সেই দিকে ইঙ্গিত করে রুমেলি বলল, যা, ক্লাস শুরু হয়ে গেছে।

কৌশিকের কোনও তাড়া নেই। ও তখনও কথা বলে চলেছে, তোকে দেখে সবাই কি বলছে বলত? ফোবোস এক ফিরে এসেছে। ফোবোস দুইটা আসবে কি পিছু পিছু?

মানে? সকল জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে রুমেলির চোখে।

বুঝতে পারছিস না? একদম টিউব লাইট হয়ে গেছিস তুই। মঙ্গলগ্রহের দিকে পাঠানো মহাকাশযান। এরা মহাশূন্যে হারিয়ে গেছে, ফোবোস এক, তুই, হারিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছিস। বসন্তসেনা ফোবোস দুই।

রাগের চোখে তাকায় রুমেলি, কিন্তু মুখের হাসিটা চাপতে পারে না।

যা, যা ক্লাসে যা। ফালতু বকিস না।

ব্যালকনির আলসের ওপর রাখা ছিল রুমেলির হাত। কৌশিক নিজের হাত দিয়ে ঢেকে দিল সেটা। আঙুল দিয়ে তার পিঠে লিখল, এল ও এল।

আবার বিস্ময় বিস্ফোরিত হ'ল রুমেলির চোখে।

মানে? এল ও এল কি ইনটারনেটের ভাষা। লটস্ অফ লাফ্, অনেক হাসি? হাসছিস কেন?

এত মানে মানে করলে ঝাড় খাবি কিন্তু রুমেলি। এল ও এল হচ্ছে লটস্ অফ্ লাভ্।

হাতের ওপর ছোট্ট চাপড় মেরে দৌড়ে ক্লাসরুমে ঢুকে গেল কৌশিক।

রুমেলি গিয়ে বসল লাইব্রেরিতে। তার সেই পুরনো চেয়ারে, শিরীষ গাছের দিকে মুখ করে। অত্যন্ত সাধারণ রেজাল্ট করেছে সে, এম. এ-তে ভর্তির প্রথম লিস্টে তার নামই নেই। সেকেন্ড লিস্ট কবে বেরোবে তা জানা নেই, শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা। কিন্তু অপেক্ষাতে তার মন ওঠে না। বুকের মধ্যে 'কী জানি, কী যেন' শিহরন, তলপেটে অসহ্য সুখের মত কষ্ট। নিশ্চয়ই সেই মনের কথার টুকরো পড়ে আছে বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে। এই দুমাসে মনে মনে জমে গেছে কত কথা। অস্থির হাতে পাতা উল্টে যায় রুমেলি। মরিস ডব্ — হল না, এ্যাডাম স্মিথ — কোথায়, কোথায় — নেই তো, স্যামুয়েলসন.... কোত্থাও নেই, কো-থা-ও নেই। শীতবেলার সূর্য পাটে বসেছে, দক্ষিণায়ন হয়েছে তার, রোদ্দুর সরে গেছে অন্য টেবিলে, রং লাগান শেষ করে শিল্পীর তুলি ঝাড়ার মতো নিভে আসা আকাশের গায়ে রঙের গোল্লা, সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে এক ঝাঁক পাখিদের ঘরে ফেরা।

লাইব্রেরির রিডিং রুমেও আলো জ্বলে গেছে। রুমেলির সামনে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে একগাদা বই। সেখানে কোনও পাতার ভাঁজে আর মনের কথার চিহ্নমাত্র নেই।

সুখ

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়

— এখনো ভেবে দ্যাখ নিমাই। তোর ওপর শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তোর সহযোগিতা না পেলে আমরা ধর্মঘট চালাতে পারবো না। তোর স্বার্থও তো এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তুইওতো আমাদেরই একজন। তুই আমাদের সঙ্গে হাত মেলালে আমরা বাকী লোকগুলোকে সঙ্গে পাবো। মালিক নরম হোতে বাধ্য হবে।

অস্বস্তি বোধকরে নিমাই — তোমরা আমায় ভুল বুঝো না মধুদা। তোমরা মনে করছো ধর্মঘট করেনি যারা তাদের আমি পরিচালনা করছি, আমার কথামতো ওরা ধর্মঘটে যোগ দিচ্ছে না, কিন্তু তা নয় মধুদা।

— তোর কথামতো ওরা ধর্মঘটে যোগ দিচ্ছে না তা আমি বলিনি। আমি শুধু বলতে চাই, তুই কারখানায় না গেলে ওরাও যাবে না। তুই একথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবি না নিমাই, আমাদের চেয়ে ওদের ওপর তোর প্রভাব অনেক বেশী। এটা তো আমরা সবাই জানি যে আগের ধর্মঘটে আমাদের সাফল্যেব ব্যাপারে তোর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকদের একটা বড় অংশ তোর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল।

— সে আজ পাঁচবছর আগের কথা। তখন পেরেছিলাম বলে এখনো পারবো, এমন ভাবলে কি করে?

জ্বলন্ত বিড়ি মুখ থেকে ফেলে দ্যায় হারাণ — আলবৎ পারবি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তোকে পাওয়া মানে আরও পঞ্চাশ জন শ্রমিককে পাওয়া। তখন কি করবে মালিকপক্ষ ওই তিন-চার জন কর্মীকে নিয়ে? তাছাড়া তুইতো এটা ভালো বুঝিস যে আমাদেব মধ্যে যদি ঐক্যের অভাব ঘটে তাহলে আমাদের আন্দোলনের ইমেজটাই নষ্ট হোয়ে যাবে।

— আমাকে দোষী সাব্যস্ত না করে তোমরাই ওদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলো হারাণদা।

নিমাইয়ের হাতে হাত রাখে মধু — কথা আমরা যথেষ্ট বলেছি নিমাই। ওরা তোর মুখ চেয়েই বসে আছে। তুই একবার ডাক দিলেই ওরা আসবে।

চুপ করে থাকে নিমাই। তার কাঁধে হাত রাখে বংশী, এর আগের ধর্মঘটে তুই আন্তরিকভাবে লড়াই করেছিলি। সেই আন্দোলনে তোর ছিল এক বিরাট ভূমিকা। কিন্তু এবারে কেন যে তুই নিজেকে সরিয়ে রাখছিস, কিছু বুঝতে পারছি না। আচ্ছা নিমাই, তোর কি মনে হয় আমাদের এই ধর্মঘট অন্যায়? মালিকের কাছে? আমাদের দাবীগুলো কি অমূলক?

— না না বংশীদা। সে প্রশ্ন ওঠেই না, এ দাবী আমাদের সকলের। এ দাবী ন্যায্য। এ আমাদের বাঁচার লড়াই।

মধু এসে হাত চেপে ধরে নিমাইয়ের — তাহলে বল, কেন তুই এখনো মালিকের সেবা করছিস? ধর্মঘটের দু'মাস পূর্ণ হোতে চলল, তবু আমরা তোকে পেলাম না। আমরা জানি, মালিক পক্ষ তোকে ভয় পায়। তুই ধর্মঘটে যোগ দিলে ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। ওরা আমাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হবে। পিঠে হাত বুলোয় হারাণ — জানি নিমাই, নোতুন

বিয়ে করেছিস। সংসার পেতেছিস। দোটানায় পড়ে তাই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিস না। কিন্তু সংসার তো আমাদের সকলেরই আছে ভাই। সংসারের মানুষদের সুখী করবার জন্যেই তো আমাদের এ লড়াই। বাবা-মা-বৌ-ছেলেমেয়ের মঙ্গলের জন্যেই তো আমাদের ধর্মঘট।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে নিমাই। তারপর বিড়ি ধরায়।

— কথা দে নিমাই, তুই আমাদের সঙ্গে থাকবি।

— আমায় একটু সময় দাও হারাণদা। আমায় একটু ভাবতে দাও।

বিড়ি ধরায় মধু — বেশ তো! নিমাইকে আজ এখন ছেড়ে দাও, রাত হোয়েছে। ও বাড়ি যাক। পরে আবার কথা হবে ওর সঙ্গে।

বুকের মধ্যে অস্থিরতার ঝড় নিয়ে হেঁটে চলেছে নিমাই। আকাশে ঘন মেঘ। আকাশটা যেন নেমে এসেছে তার মাথার ওপর। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। রাস্তার আলো নিভে গেছে অনেক আগেই। বৃষ্টি বোধ হয় এখনই শুরু হবে, চলার গতি বাড়ায় নিমাই। বাড়িতে গৌরী একা আছে। নিশ্চয়ই পথ চেয়ে বসে আছে নিমাইয়ের জন্যে। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে নিমাইয়ের — হারাণদার ধারণাই ঠিক। ধর্মঘটে ষোলআনা সমর্থন থাকতেও সে গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে ধর্মঘটে যোগ দিতে পারেনি। নিজেকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হয় ঠিকই। কিন্তু গৌরীর কাছে এলে ওসব কথা তার বেশীক্ষণ মনেই থাকে না। গৌরীকে কষ্ট দিয়ে ধর্মঘটে যোগ দেবার কথা সে ভাবতেও পারে না। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পাশ করা মেয়ে গৌরী। সে এই ছন্নছাড়া, ভিটেছাড়া নিমাইকে ভালবেসে পালিয়ে এসেছিল তার সব ছেড়ে। নিমাইকে ভালবেসেই সে গড়ে তুলেছে তার ছোট্ট সুখের সংসার।

গৌরীকে সে কথা দিয়েছে, তাকে সুখী করবেই। তাই বিয়ের পর বস্তির বাস উঠিয়ে দিয়ে বস্তির এলাকা থেকে অনেক দূরেই ছোট্ট একটা বাসা নিয়েছে নিমাই। সেই ছোট্ট বাসাটুকু সস্তা সামগ্রীতে সুন্দর করে সাজিয়েছে গৌরী। ছ'মাস না যেতেই কেমন করে সেই সুখের বাসাটুকু ভেঙে দেবে নিমাই? সে যে তাকে সুখী করবে বলে কথা দিয়েছিল। সে কথা ফিরিয়ে কেমন করে সে ধর্মঘটীদের কথা দ্যায়! হাতে মাত্র তিন রাত্রি সময়। আবার দেখা করবে হারাণদারা। এর মধ্যে সিদ্ধান্ত তাকে নিতেই হবে। সে কি গৌরীকে জানাবে সব কথা? গৌরী যদি আঘাত পায়? নিমাইকে যদি সে ভুল বোঝে? না না, এসব চিন্তার বোঝা গৌরীর মাথায় সে কিছুতেই চাপাতে পারবে না, তার দেওয়া সামান্য সুখেই সন্তুষ্ট গৌরী। সে সুখটুকু কেড়ে নেওয়া নিমাইয়ের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

—মধুদা তো ঠিকই বলেছে গুরু। মালিক পক্ষের এতো অত্যাচার সহ্য করে আমরা বাঁচবো কি করে? খাটবো আমরা, কারখানাকে বাঁচিয়ে রাখবো আমরা, আর লাভের সবটাই খাবে মালিক! সারা দিনরাত গতর খাটিয়ে আমরা কি পাই বলতো! দিনকে দিন কারখানা ফুলে ফেঁপে উঠছে আর আমরা শালা যেমন ছিলাম তেমনই থাকবো। তাও আবার ইচ্ছেমতো ছাঁটাই করবে, বোনাস বাড়াবে না, যখন তখন লক আউট ঘোষণা করবে। এটা কি একটা চাকরী হ'ল?

আনন্দর কথার রেশ টেনেই বক্ৰু বলে চলে — এতো গধবা কি মাফিক জীবন হ্যায়। সির্ফ কাম করো আউর চাবুক খাও। ক্যায়সা ইয়হ জীবন নিমাইদাদা? অব হী কুছ হোনা চাহিয়ে।

—সে তো আমিও জানি বক্রু। আমারও তো ইচ্ছে হোচ্ছে আন্দোলনের সামনের সারিতে এসে বিদ্রোহ ঘোষণা করি মালিকের বিরুদ্ধে। আটাত্তরের ধর্মঘটের সময় যে মনোবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আবার সেইভাবে ফিরিয়ে আনি নিজেকে।

— সাব্বাস! লেকিন ভাওনা কিঁউ? তুম হমারে গুরুকে জ্যায়দা। তুম আওয়াজ দো তো হম সব স্ট্রাইক করনেকে লিয়ে তুম্হারে পাশ খড়া হো জায়েঙ্গে।

আনন্দ বিড়ি ধরিয়ে বলে — তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করো গুরু। তুমি আমাদের সুখে দুঃখে অকৃত্রিম বন্ধু। তোমার পরামর্শ না নিয়ে আমরা কিছুই ক'রবো না।

আনন্দর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফয়ের বলে — আমরা জানি, তুমি যা করবে তা ন্যায্যই করবে। আমরা প্রস্তুত। তুমি বললে কাল থেকেই কাজ বয়কট। কি বলিস বদ্রু?

— জরুর!

নিমাইকে চুপ করে থাকতে দেখে অসীম বলে — আচ্ছা নিমাইদা, এই ধর্মঘটের ব্যাপারে তোমার কি কিছু বলার আছে? তুমি বলছ আমাদের ধর্মঘট করা উচিত অথচ তুমি যেন মনের দিক দিয়ে খানিকটা পিছিয়ে যাচ্ছো। তুমি কি অন্য কিছু ভাবছো?

— না না। ভাববার কিছু নেই। শুধু......

— শুধু কি?

— তোর বৌদির শরীরটা খুব খারাপ। তাই ভাবছি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে রানীগঞ্জে মামার বাড়ি থেকে ওকে একটু ঘুরিয়ে আনতে হবে। বিয়ের পরে তো বেরোয়নি কোথাও! মনটাও ওর খুব ব্যস্ত হোয়েছে।

— সেটা আর এমন কি ব্যাপার? বরং ভালই হবে। বৌদির দায়িত্ব একটা কোথাও চাপাতে পারলে তুমি তো নিশ্চিন্ত। তারপর লালঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ো সামনের সারিতে। আমরাও কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়বো তোমাদের পাশে।

— অব্ সিদ্ধান্ত্ শুনাও গুরু।

— আমায় দু'চারদিন সময় দে বদ্রু। আমি পরশু তোর বৌদিকে নিয়ে রানীগঞ্জে যাচ্ছি। ওকে রেখেই আমি চলে আসছি। তারপর শুরু হবে আমাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট।

— সাব্বাস গুরু!

মুখের বিড়ি ফেলে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে অসীম — চল্ আনন্দ, খবরটা মধুদাকে এক্ষুনি দিয়ে আসি। তুমি বাড়ি গিয়ে বৌদিকে চায়ের কথা বলে রেখো নিমাইদা, সন্ধ্যেবেলা আমরা সবাই যাবো।

আতঙ্কে মুখ ফ্যাকাশে হোয়ে-যায় নিমাইয়ের — না, না, গৌরী ভীষণ অসুস্থ। কিছু মনে করিসনে ভাই। ও রানীগঞ্জ থেকে ফিরলে একদিন যাস, কেমন?

অবাক চোখে নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই। বন্ধুদের চোখের ভাষা বুঝতে পেরে লজ্জায় মাথা নিচু করে নিমাই। নীরবতা ভেঙে বদ্রু বলে — ঠিক হ্যায়। ওইসা হী হোগা।

গৌরীর জন্যে একজোড়া শাড়ি, জুতো আর কিছু ইমিটেশনের গয়না কিনেছে নিমাই। একটা সুন্দর ভ্যানিটি ব্যাগও নিয়েছে সে। ভীষণ খুশী হবে গৌরী। কিন্তু মনের মধ্যে লড়াই থামে না নিমাইয়ের। হাতে মাত্র দুটো রাত। এর মধ্যে একটা কিছু করতেই হবে তাকে। বড্ড নিঃসঙ্গ লাগে তার। ভীষণ ইচ্ছে হয় সবকিছু গৌরীকে বলতে। কিন্তু আবার পিছিয়ে আসে। গৌরীর এখন সে ছাড়া আর কেউ নেই। ওকে সুখে রাখতেই হবে। নিমাই জানে, ছাঁটাই হ'লে প্রথম সারির আন্দোলনকারীরাই ছাঁটাই হবে। তাহলে সেও বাদ যাবে না। তখন সে গৌরীকে নিয়ে কি করবে? তাছাড়া ধর্মঘট কবে শেষ হবে তারও কোনো ঠিক নেই। নিমাই চায় না অন্য শ্রমিকদের বউয়ের মতো গৌরীও খালের শালুক তুলে খাক। নানা বিশৃঙ্খল চিন্তার জট মাথায় নিয়ে বাসার দিকে হাঁটতে থাকে নিমাই।

আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে ওঠে গৌরী — ভীষণ ভালো হবে গো। কতদিন কোথাও বেড়াতে যাইনি। মামা-মামীমাও আমাদের দেখে খুব খুশী হবেন তাই না? তুমিও তো

ওখানে কত বছর যাও না শুনেছি। একা একা বাড়িতে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। কিছুদিন হ'ল তোমার একজন বন্ধুবান্ধবও আমাদের বাসায় আসে না। কেন বলতো?

— আমাদের বাসাটা ওদের বস্তি থেকে অনেক দূর হোয়ে গেছে গৌরী। তাছাড়া সংসারের ঝামেলায় মানুষের সময়ও বড় কম।

— কতদিনের ছুটি নিলে তুমি?

— পনেরো দিনের ছুটির দরখাস্ত দিয়েছি। যদি ওখানে ভালো লাগে তবে আবো পনেরো দিনের দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবো।

— একমাসের ছুটি! পরের বাড়িতে এতদিন। তাছাড়া অতোদূরে যাতাযাতের খরচ।

— কিছু টাকা ধার করেছি। ওতেই চলে যাবে।

— তোমার অফিসের বন্ধুরা কিছু বলছে না?

— ওরা জানেই না।

— কেন?

— ওদের বলিনি।

— ওমা! কেন?

— ওরা পেছনে লাগবে তাই। যাবার দিন সবাইকে জানিযে যাবো। নাও। রাত হোয়েছে অনেক। শোবে চলো।

— না। আমি এখন গোছগাছ করব। তুমি শুয়ে পড়োগে। আমি একটু পরে আসছি।

নিমাইয়ের বন্ধুদের কিছু না জানানোয সন্দেহ উঁকি মাবে গৌবীব মনে।

বস্তি এলাকায় ঢুকতেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগে গৌবীব। সেদিনকার মতো কোনো উচ্ছ্বাসের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। মণ্টুর বউ, রসিদেব মা, বাসুর বোন প্রত্যেকেই তাকে বসতে দিয়েছে, কথা বলেছে কিন্তু কারো ব্যবহারেই সেই আন্তরিকতা খুঁজে পাচ্ছে না গৌরী। প্রত্যেকের মুখে যেন বিষাদের ছায়া। কি যেন হোযেছে এই বস্তির মানুষগুলোর। রসিদের হাড় জিরজিরে ছেলেটাকে দুখানা শুকনো রুটি চিবোতে দেখে কৌতূহল চাপতে পারে না গৌরী — তোর ছেলে রুটি খাচ্ছে কেন বে রেহেনা? ওর কি অসুখ?

— না দিদি।

— তবে? রুটি খাচ্ছে কেন ও? ভাত দিসনি কেন?

— ভাত পাবো কোথায় দিদি?

— তার মানে?

— রুটি তাই সবদিন জোগাড় হয় না!

— তুই বলছিস কি রেহেনা? আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

— কেন, তুমি ধর্মঘটের কথা শোননি?

— ধর্মঘট! কোথায়!

— কারখানায়। দু'মাস ধরে ধর্মঘট চলছে। দু'মাস মাইনে বন্ধ। এ বস্তিতে কারো হাঁড়িতে আর ভাত জোটে না। বাড়ির লোকেরা বাইবে জন খেটে কোনো রকমে রুটির জোগাড়টা করে যাচ্ছে। বস্তির অনেক মেয়েই শহরে ঝি খাটতে বেরিয়েছে।

এক ঝুড়ি শালুক কাঁখে নিয়ে বিজয়া এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে পড়ে উঠোনে একটা তক্তার ওপর। সামনে রাখে শালুকের ঝুড়ি। বিজয়ার হাত-পা চুপসে সাদা হোয়ে গেছে। রোদ্দুরে ঝলসে গেছে তার মুখ। চোখ দুটো লাল। অস্থির হোয়ে ওঠে গৌরী— শালুক তুলতে কোথায় গিয়েছিলি বিজয়া?

— বিলে।

— এগুলো কি খাবি তোরা?

— না খেয়ে আর কি ক'রবো বৌদি! পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা।

— কিন্তু এসব খেয়ে মানুষ কতদিন বাঁচে!

— বেশীদিন আমাদের কষ্ট করতে হতো না যদি নিমাইদা ধর্মঘটে যোগ দিত। নিমাইদা যে মালিকের লোক হোয়ে যাবে আমরা ভাবতেও পারিনি।

— না রে বিজয়া। ও তোদের ভুল ধারণা। ও মালিকের লোক হোতেই পারে না।

— তবে কেন ধর্মঘটে যোগ দিল না?

— আমি ওকে বুঝিয়ে বলব রে। ও নিশ্চয়ই তোদের সঙ্গে থাকবে। তুই ভিজে কাপড় ছাড় বিজয়া।

— এখন আমার কাপড় ছাড়তে গেলে চলবে না বৌদি। এখন আমাকে সামাদ ভাইয়ের ঘরে যেতে হবে। ওর বউটার খুব অসুখ। ঘরে খাবার কিছু নেই। গণ্ডা কয়েক শালুক ওকে দিয়ে আসব। সেদ্ধ করে খাবে।

— কেন, ওর একটা গাই গরু ছিল না? সেটা তো দুধ দেয়।

— আর দুধ! গরুটাই বিক্রী হোয়ে গেছে। আমি যাই বৌদি। তুমি একটু ব'সো। আমি এক্ষুনি আসব।

— চল বিজয়া, আমি তোর সঙ্গে যাবো। দেখে আসবো সাকিনাকে।

অন্ধকারের বুক ভেঙে এগিয়ে চলেছে দুটো মানুষ। স্টেশনের দিকে। একজন নিমাই। অন্যজন গৌরী। এখন শেষ রাত। চারিদিকে নিস্তব্ধতা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। তবে এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে কোথা থেকে ডেকে উঠছে একটা কুকুর। মৃদু হাওয়া বইছে মাঝে মাঝে। স্টেশানে পৌঁছে যায় মানুষ দুটো। পাশে বাক্স রেখে বেঞ্চিতে বসে পড়ে গৌরী। টিকিট কাটতে চলে যায় নিমাই। সারারাত ঘুমোতে পারেনি গৌরী। ঘুমোয়নি নিমাইও। গৌরী জানে কেন সে নিজে ঘুমোতে পারেনি। কিন্তু নিমাইয়ের ঘুম না হবার কারণ সে জানে না। নিমাইও জানে তার নিজের কেন ঘুম হয়নি। কিন্তু গৌরীর ঘুম না হবার কারণ তার জানা নেই। হাতে টিকিট নিয়ে গৌরীর পাশে এসে বসে পড়ে নিমাই।

— কি ভাবছো গৌরী?

— ভাবছি, আমরা বিয়ের পর এই প্রথম বেড়াতে বেরিয়েছি। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কারো মনেই যেন আনন্দ নেই।

কোথায় যেন ধাক্কা খায় নিমাই — কে বলেছে আনন্দ নেই? তুমি তো সেই পরশু রাত থেকে গোছগাছ করতে শুরু করেছো।

— হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। কিন্তু পরশুদিনের সেই অনুভূতিটুকু আজ আর নেই।

— কি যাতা বকছো? গাড়ি আসতে আর মিনিট পাঁচেক দেরী। কি হল তোমার বলতো? কাল কারখানা থেকে ফিরে তোমার মুখে আর হাসি দেখলাম না।

— আমার মুখে হাসি ছিল না ঠিকই। কিন্তু তোমার হাসিটাও কাল থেকে বড্ড কৃত্রিম মনে হোয়েছে আমার।

আবার বুকের মধ্যে ধাক্কা খায় নিমাই।

—এইসব ভেবেই বুঝি কালরাতে ঘুম এলো না তোমার?

— তুমি ঘুমোলে না কি ভেবে?

চোখ তুলে সোজা তাকিয়ে থাকে গৌরী নিমাইয়ের চোখের দিকে। চোখ নামিয়ে নেয় নিমাই। অনেক চেষ্টা করে হাসি আনে মুখে। দু'জনেরই টেনশান, কি যে বলো?

দূরে ট্রেনের হুইসেল শোনা যায়। সচকিত হোয়ে ওঠে অখ্যাত স্টেশানের মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাত্রী। তল্পিতল্পা নিয়ে লাইনের দিকে এগিয়ে আসে গৌরী আর নিমাই। ট্রেন ঢোকে প্ল্যাটফর্মে। জামাকাপড় বোঝাই ব্যাগ দুটো নিয়ে আগে আগে উঠে যায় নিমাই একটা ফাঁকা কামরায়। ব্যাগ দুটো রেখে জায়গা নেয় সে। তারপর পিছন ফিরে দ্যাখে গৌরী ওঠেনি। জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দ্যাখে স্ট্যাচুর মতো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে গৌরী।

— উঠে এসো গৌরী। এ কামরাটা একদম ফাঁকা। শিগগির এসো।

— আমি উঠবো না। তুমি যাও।

— কি পাগলামি করছ? ট্রেন ছেড়ে দেবে যে!

— বললাম তো আমি যাবো না।

বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে নিমাই। তাড়াতাড়ি নেমে এসে গৌরীর হাত ধরে — এসো ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে।

হাত ছাড়িয়ে নেয় গৌরী। ট্রেন চলতে শুরু কবল।

— যাও উঠে পড়। তোমার মামার বাড়ির ট্রেন চলে যাচ্ছে।

—কিন্তু তুমি কেন যাবে না?

— আমি যাবো। তবে ডাউন ট্রেনে। বিজয়াদের বস্তিতে।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে নিমাই গৌবীর মুখের দিকে। তারপর পিছন দিকে তাকিয়ে ট্রেনের শেষ বগীটাও আর দেখতে পায় না নিমাই।

— ব্যাগ দুটো নামানো হয়নি। ওর মধ্যে তোমার নতুন শাড়ীগুলো। ভ্যানিটি ব্যাগটাও রয়েছে! আমার জামাকাপড় সব গেল।

— তাতে আমার সুখের ব্যাঘাত ঘটেনি একটুও।

রেগে ওঠে নিমাই — কি বলতে চাও একটু স্পষ্ট করে বলতো গৌরী। আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

— তুমি কি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছো না!

— না না।

— তুমি কি আমায় সত্যিসত্যি সুখী করতে চেয়েছো? তুমি কি আমায সত্যিসত্যি ভালবাসো?

— গৌরী! তোমাকে সুখী করার জন্যে আমি কিনা করেছি।

— অমন সুখ আমি চাইনি, চাইনি। কান্নায় ভেঙে পড়ে গৌরী।

গৌরীর হাত ধরে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে এনে বসায় নিমাই।

— তুমি আমাকে এতো ছোট করে দিতে পারলে? তোমার কাছে আমার প্রয়োজন এতো কম?

— আমায় একটু বুঝতে দাও লক্ষ্মীটি।

— তোমাদের কারখানার ধর্মঘটের কথা আমায় বললে না কেন? কেন বন্ধুদের দুর্দশার মুখে ফেলে রেখে, মিথ্যে কথা বলে পালিয়ে যাচ্ছিলে চোরের মতো? তুমি এতো স্বার্থপর!

— কিন্তু তুমি এসব জানলে কি করে?

— কাল দুপুরে আমি গিয়েছিলাম ওদের বস্তিতে। দু'মাস ধরে মানুষগুলো আধপেটা খেয়ে, শালুক খেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে। আর তুমি। বউকে সুখে রাখবার জন্যে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে।

— না, গৌরী না। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

— তবে ধর্মঘটে যোগ দিলে না কেন? শ্রমিকদের দাবী তো অন্যায্য ছিল না। বস্তি থেকে ফিরবার পথে বক্রুর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তুমি ওদের আশা দিয়েও আজ পালিয়ে যাচ্ছিলে। আর ওরা তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

— আমায় ভুল বুঝো না গৌরী। তোমার বাবা-মার কাছ থেকে তোমাকে আমি চুরি করে নিয়ে এসেছি। তাই আমি চাইনি তুমি কষ্ট পাও, তুমি অসুখী হও। শুধু তোমার মুখের কথা ভেবেই নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।

— সুখ কাকে বলে তুমি জানো না, তুমি জানো না। জান না বলেই তুমি আমায় সত্যিকারের সুখ থেকে বঞ্চিত করেছো।

— গৌরী তুমিও জানো না কতদিন ধরে মনের সঙ্গে লড়াই করেছি আমি? বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি.....

— তবু সেসব কথা জানবার অধিকার ছিল না গৌরীর।

— কতবার ভেবেছি তোমায় বলব সব কথা। কিন্তু....

— বিশ্বাস করোনি, তাই বলতে পারোনি! মাথা নিচু করে নিমাই।

— রেহেনা, লক্ষ্মী, কমলারা ভাগ্যবতী। ওদেঁর স্বামীরা ওদের বিশ্বাস করে। তাই ওরা ছেঁড়া শাড়ি কোমরে জড়িয়ে রুক্ষ চুলে সারাদিন বিলে শালুক তুলে বেড়ায়। সামাদের বৌ খালি পেটে জ্বর গায়ে শুয়ে শুয়ে ভুল বকে, তবু সে সামাদকে অভিশাপ দেয় না। আর আমি! আমি একা, একেবারে একা, আমার স্বামীর মনে প্রবেশ করবার কোনও অধিকার নেই।

কান্নায় ভেঙে পড়ে গৌরী। বুকের মধ্যে মুখ গোঁজে নিমাইয়ের।

— আর আমার ভুল হবে না। নিমাই বলে।

আবছা অন্ধকারের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নিমাইয়ের চোখে তৃপ্তির সমুদ্র। জল টলটলে চোখদুটো আরও বড়ো দেখায় গৌরীর। ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে পুবের আকাশ। প্ল্যাটফর্মের শেডের নিচে ঘুম ভেঙে গেছে পায়রাগুলোর। বাঁশী শোনা যায় ডাউন ট্রেনের। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা দুজন। নিমাইয়ের শক্ত মুঠোয় ঘেমে ওঠে সুখী গৌরীর নরম হাত।

নিহিত পাতাল

জয়ন্ত দে

বাড়ি চিনতে কষ্ট হল না।

জয়নগরে ট্রেন প্রায় ফাঁকা। পরের স্টেশন মথুরাপুর। স্টেশনে নেমে রিকশ খুঁজল তুষার। যে দু একটা ছিল তারা লোক তুলে ভোঁ। পেল না। একটা ভ্যানরিকশ এগিয়ে এল, জনা চারেক লোক বসে। — যাবেন বাবু?

তুষার ঘাড় ঘুরিয়ে ডাইনে বাঁয়ে দেখল। কেউ যেন দেখছে তাকে, মুখ টিপে হাসছে। শেষে কি এই ভ্যানরিকশ করে যেতে হবে? হেঁটে গেলে হয় না। কতটা পথ কে জানে। তুষার বলল, চরমাধবপুর যাবে?

— ওঠেন। জনা চারেক সওয়ারি তুষারকে দেখে, নড়ে চড়ে না। স্থির, যেমন কে তেমনই, শুধু হাঁ করে তুষারকে গিলছিল। তুষারও ইতস্তত করে, কোথায় বসবে সে! বলতে বলতে আরও দু জন এসে হুড়মুড় করে বসে। রিকশাঅলা হাঁক দেয়, বাবু আপনি সামনে আসেন।

ক্যাঁচকোঁচ করে বেশ অনেকখানি রাস্তা। চরমাধবপুরে নেমে তিনজনকে জিগ্যেস করে রত্নাদের বাড়ি। দু তিনটে বাঁক ঘুরে ঘুরে নরেশ পালের নাম বলতে বাড়ি দেখিয়ে দিল। বাড়ির চৌহদ্দি রাংচিতার বেড়া। সামনে শাক সবজির বাগান, বাগানে শশার মাচা। বেশ ভেতর দিক করে বাড়ি। বাগানের মধ্যে দিয়েই পথ।

তুষার নিচু বাখারির গেট ধরে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। শরীরের ভেতর যেন ট্রেনের দোলানি। কি করবে ভাবছিল, গেট ঠেলে কি ঢুকে পড়বে বাড়ির ভেতর। আসল বলতে তো গেটের গায়ে বাঁধা নারকেল দড়ি বেড়ার একটা বাঁশের মাথায় গলিয়ে দেওয়া। তবে কি দড়িটা খুলে ভেতরে গিয়ে রত্নাকে ডাকবে? না এখান থেকে? এখান থেকে ডাকলে কি শুনতে পাবে? কার নাম ধরে ডাকবে — রত্না, না, নরেশবাবু? এই বাড়িটাই তো? ধারে কাছে কেউ নেই। একটানা ঘুঘু ডেকে চলেছে। ঘু ঘু ঘু ঘু।

তুষার দেখল, মাচার নীচে সবুজ পাতা শুকনো পাতার ফাঁক ফোকর গলে একটা বাচ্চা ছেলের মুখ, তাকে দেখছে। চোখাচুখি হতেই ছ্যাঁক করে উঠল বুকের ভেতর। হাত ইশারায় ডাকতেই ছেলেটা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল বাড়ির ভেতর। ছেলেটার পেছন পেছন বেরিয়ে এল রত্না। প্রথমে যেন চিনতে পারল না। তারপরই কিছুটা লাফিয়ে নেমে এল বারান্দা থেকে বাগানের মাটিতে। বেড়ার গেট খুলে এগিয়ে গেল তুষার। বিস্মিত রত্না, দাদাবাবু!

তুষার হাসল। চিনতে পারলে তাহলে। ভাবছিলাম বুঝি চিনতেই পারবে না।

এগিয়ে আসা রত্না হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। যেন বইখাতা হুড়মুড় করে পড়ে গেল, আলমারির কোণে রত্না, ছোট খাটের ওপরে। তুষার মুখের ওপর, বুকের খাঁজে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলে চলেছে, তুমি তুমি রত্না তুমি। সকলের সামনে ডাকা 'তুই' সম্বোধনটা শুধু পালটে দেওয়া — আর কিছু না।

তুষার এলোমেলো। গলার স্বর ফাঁকা ফাঁকা শোনাল। মুহূর্তে ঠিক করে নিল নিজেকে। এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, হঠাৎ মনে হল তোর বাড়ি থেকে একবার ঘুরে যাই, তাই চলে এলাম।

ভাল করেছ। খুব ভাল করেছ দাদাবাবু। কতদিন তোমাদের দেখিনি।

ঘরে ঢুকে তুষার লম্বা করে রাখা বেঞ্চে বসে। রত্না বলল, না না দাদাবাবু, বিছানায় উঠে বসো। তুষার বসল। রত্না বলল, পা দুটো তুলে ভাল করে বসো।

তুষার হাসল। জল দে এক গ্লাস।

জল দিচ্ছি। তার আগে তুমি বরং হাত মুখটা ধুয়ে এসো।

আমি কিন্তু এক্ষুনি চলে যাব। তোর কাছে এলাম রত্না, শুধু একটা কথা জানতে এলাম —। এক গ্লাস জল দে— চলে যাব।

যাই বললে কি যাওয়া হয় দাদাবাবু? জল নিয়ে এল রত্না।

ঘটি নিতে গিয়ে আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে গেল। চমকে উঠল তুষার। রত্না কি বুঝতে পেরেছে সে হঠাৎ আসেনি। এ ভাবে কোনও খোঁজ না নিয়ে, না জেনে আসা যায় না। সব কিছু জেনে বুঝে আসার জন্যই সে এসেছে। তুষার স্বাভাবিক, ভীষণ স্বাভাবিক হয়ে বিছানায় এলিয়ে বসতে চায়। বিছানার চাদরটা খাবলা মেরে কুঁচকে থাকে। রত্নার দেশ-গ্রাম জানত তুষার। এই লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনেই। বহড়ু। রত্নার মা মারা গেছে। তবু গ্রাম প্রতিবেশীর কাছ থেকে খোঁজ পেয়ে গেল ওর শ্বশুরবাড়ির। রত্না কি সব জানে! ও কি জানতে পেরেছে, ওর গ্রামে গিয়ে খোঁজ করেছে তুষার, ওর স্বামীর নাম গ্রাম সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনেছে। রত্নার কাছে কি এ খবর গ্রামের কেউ বয়ে আনেনি? তবে কি ও জানত তুষার আসবে? কেন আসবে তাও কি জানে? যা, তা কি করে জানবে? তুষার হাত বাড়িয়ে বিছানার চাদর সমান করে, টানটান হয়ে বসে।

বাচ্চাটা দৌড়ে এসে রত্নাকে জড়িয়ে ধরে। রত্না হাসে, আমার ছেলে।

তুষারের বুকের খাঁচা খালি — পাখি নেই। এত বড় হয়েছে!

ন বছর বয়স হল। রত্না ছেলেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। বল তো এটা কে? কে হয় জানিস?

ছেলেটা ঘাড় নাড়ে। ফ্যালফেলে চোখ।

রত্না হঠাৎ কথা থামায়। যেন কে হয়, কে হতে পারে এসব ভাবতেই তার সব তালগোল পাকিয়ে গেল। প্রসঙ্গ পালটায়। বলে, তোর বাপ কোথা গেল রে, দেখ তো। বল, ঘরে লোক এসেছে।

ছেলেটা ঘর বারান্দা বাগান ভেঙে দৌড়ে যায়।

লোক! তুষার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বলুক, যা খুশি বলুক। শুধু একবার রত্নাকে সে জিগ্যেস করবে। শুধু একবার জানা কথাটা আরও একবার জেনে সে ফিরে যাবে।

সে যে অক্ষম পুরুষদের দলে নয় — এ কথা সে বিশ্বাস করে। কিন্তু অনুরাধা বিশ্বাস করে না। ভাবে, ওই রিপোর্ট ঠিক, ডাক্তার ঠিক, তুষার ভুল।

অনুরাধা চোয়াল চেপে, মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ডাক্তারের চেম্বার থেকে। তুষারের মনে হল, আজ যেন অনুরাধা তার জন্যে মাথা নিচু করে আছে। কিন্তু সেদিন, যে দিন অনুরাধার রিপোর্ট বেরিয়েছিল, তখন জেতার ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে চেম্বার ছেড়েছিল অনুরাধা। আর আজ যেন তুষারের ভূমিকায়।

ডাক্তারের মুখোমুখি তুষার। ভেতর ভেতর ফিস ফিস করে দু চারবার ডাক্তারকে ডাকল। কিন্তু ডাক্তার শুনতে পেল না। শুনতে পেলে তুষার অন্য কথা বলত। যে কথা অনুরাধাকে বলতে পারেনি — সেই কথা। এ রিপোর্ট যে ঠিক নয় তুষার প্রমাণ করে দিত। বলতে পারল না। আসলে তুষার নিজেকে ভাঙতে পারল না।

তাই আজ তার এত দূর ছুটে আসা। একবার রত্নার মুখোমুখি দাঁড়ানো। একবার বলুক রত্না, দোষ দিক, ঘেন্নায় জ্বালায় তাকে ছিঁড়েখুড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিক।

আর এই অপরাধবোধেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে তুষার। এই অপরাধেই তার ভেতরের জ্বালা মিটবে। কিন্তু অনুরাধাকে বলতে পারবে না, ডাক্তারকে বলতে পারবে না তবু। শুধু সামনে ভেসে থাকা ডাক্তারের গম্ভীর মুখটা ভেঙে তছনচ করে, রিপোর্টের গা গতরের অসংখ্য ফাটা চোরা দিয়ে রোদ এসে পড়বে সেই ছোট্ট চৌখুপি ঘরে। যেখানে টেস্ট টিউব হাতে সে আর একবার দাঁড়াবে। পৃথিবীর বুকের অস্থি-সন্ধি পেট নাভি থেকে নেমে মন গুঁজে শরীর মুচড়ে বলবে, আয় আয়, এ কাচের পাত্র ভরে যাক প্রাণ-সুধা।

রত্না বিছানায় চা রাখে। মুড়ির থালা সামনে ধরে। দাদাবাবু এই ক'টা খেয়ে নাও।

তুষার বলে, এত!

থালায় মুড়ি আলুভাজা, একপাশে একটা কাঁচালঙ্কা। দেখতে দেখতে তুষার সব মুড়িই খেয়ে ফেলল। সেই কোন সকালে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে স্রেফ চা আর দুটো বিস্কুট। অনুরাধা বার দুই 'কোথায় যাচ্ছো' জিগ্যেস করার জন্যে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু নিরুত্তাপ তুষারকে দেখে জিগ্যেস করেনি। অবশ্য জিগ্যেস করলে, তুষার একটা উত্তর তৈরি করেই রেখেছিল।

রত্না থালা কাপ নিতে এসে থমকে দাঁড়াল। কাকিমা কেমন আছে দাদাবাবু?

মা। স্বগতোক্তির ঢঙে তুষার বিড়বিড় করে। মা নেই রে।

রত্না চমকে ওঠে, কাকিমা নেই। কবে গো —?

সে অনেক দিন — বছর সাতেক হবে। নির্লিপ্ত তুষার। রান্না করতে গিয়ে আগুন লেগে গিয়েছিল।

আহা কি ভালমানুষ ছিল গো। আমাকে নিজের মেয়ের মতো দেখত। এই পাপ মুখে তার কথা বললেও পাপ হয়। সেই মানুষটা কি না শেষকালে আগুন —।

তারপর বাবা। মায়ের মৃত্যুর বছর ঘুরতে না ঘুরতে। বাবাও কম পুণ্যবান ছিল না; ঘুমের মধ্যে চলে গেল — কোনও রোগ ভোগ যন্ত্রণা না। মা এত কষ্ট পেল, অথচ বাবা টুপ করে —। তুষার থামে।

দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় রত্না। ওর ছেলেটাও আচমকা ঘরে ঢুকে আরও দ্রুত চলে যায়। তুষার ভাবে, যা বাচ্চাটার তো নাম জানা হল না।

একা ঘরের ভেতর বসে থাকে তুষার। বেশ বোঝা যায় এই ঘরটা নতুন। এই একটিমাত্র ঘর ইট সিমেন্টে গাঁথা, দেওয়ালে পরিপাটি করে প্লাস্টার, চুনকামে এখনও ময়লা ধরেনি। মাথার ওপর চাঁছা বেড়ার সিলিং, চালে টিন। তবে মেঝে মাটির। অন্যসব ঘরগুলোও মাটির। লম্বা টানা বারান্দা এল হয়ে বেঁকে গেছে। তার প্রান্তে দু ঘর, মাথায় খড়। ওটা কি রান্না ঘর হবে? তুষার বিছানায় শরীর একটু কোনাকুনি রেখে ওদিকে দেখার চেষ্টা করে।

একটানা ঘুঘু ডেকে চলে। জানা অজানা পাখির ডাক। তুষার কান খাড়া করে রত্নার পায়ের শব্দের প্রতীক্ষায়, কথাটা বলতে হবে এবার ওকে। রত্না কি বলবে তুষার জানে। হয়তো চুপ করে থাকবে। সেই চুপ করা ভাষা পড়ে সে চলে যাবে। তার তো আর কোনও প্রয়োজন নেই।

ছেলেটা আবার ঘরের ভেতর দিয়ে এসে দরজা ধরে দাঁড়ায়। চুপচাপ। তুষারকে এক দৃষ্টে দেখে। তুষার ডাকে, শোনো।

ছেলেটা হালকা ঘাড় নাড়ায়। না-হ্যাঁর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে।

তুষার বলে, এদিকে এসো, কি নাম তোমার?

ছেলেটা দু-এক পা এগিয়ে আসে। অস্ফুটে কি যেন বলে। এর মধ্যেই হুড়মুড় করে এসে পড়ে রত্না। কি করছিলি তুই এখানে? ধাঁই করে পিঠের চালে একটা চড় কষিয়ে দেয়। তুষার বারণ করতে যাবার আগেই রত্না ছেলেটাকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে চলে গেছে।

তুষার থম মেরে বসে থাকে। ছেলেটাকে ধারে কাছে দেখছে না কোথাও। বাগানের দিকে তাকাল। রোদের তেজে গাছগুলো ম্লান হয়ে আছে। তাকে দেখে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রত্না। কি হল দাদাবাবু, বিছানায় বরং একটু গড়িয়ে নাও।

এতক্ষণ তো গড়ালাম, ঘাড় পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে। ছেলেটাকে ওভাবে মারলি কেন তুই? ওকে যে আমিই ডেকেছিলাম। বেচারা সবে কথা বলতে এল।

তুমি জানো না দাদাবাবু, ও খুব শয়তান! একটু সুযোগ পেলে তোমাকে বিরক্তের এক শেষ করে দেবে।

না না, তবু মারবি না।

খুব যে বাপ হয়েছ দেখছি। কটা ছেলে মেয়ে তোমার? তাদের বুঝি শাসন করো না?

লম্বা টানা বারান্দায় সার সার খুঁটি। খুঁটির সারিতে তুষারও খুঁটি হয়ে থাকে। শুধু কাঠ। প্রাণের অতল আহ্বান নেই কোষে। তবু মাথায় ভার বহন, পায়ের নীচে শক্ত, আরও শক্ত মাটির তল্লাশ।

অসম্ভব — হতেই পারে না। তুষার কাঁপা গলায় চিৎকার করে ওঠে।

অনুরাধা চোয়াল চেপে নীরবে এঘর ওঘর করছিল। যেন সবই ও জানে, সবই জানত, শোনার কোনও তাগিদ নেই তার।

তুষার টেবিল থেকে রিপোর্টটা তুলে আর এক পলক চোখ বোলায়। এটাকে কি করে। মানব, একটা ভুল রিপোর্ট। ক্ষিপ্ত হাতে দলা মোচড়া পাকায়, ছুঁড়ে ফেলে দেয় মেঝেয়।

এবার অনুরাধা থামল। স্থির চোখ। ছেলেমানুষী করছ কেন?

আমি সিওর ওটা ভুল রিপোর্ট। এই ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ডায়গনস্টিক সেন্টারের রিপোর্ট আমি মানি না।

ওখানের ঠিকানা তো ডাক্তারবাবুই লিখে দিলেন, তবে?

ও সব কমিশন খাওয়ার লোভ। নাহলে কলকাতায় কি ভাল জায়গার অভাব। একটা নতুন জায়গায় পাঠিয়ে দিল। ওদের প্রথমেই আমার বিশ্বাস হয়নি। ডাক্তারবাবুকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললাম, কিন্তু উনি তো ওই জায়গার কথা ধরে বসে থাকল। ওদের রিপোর্ট কখনই পারফেক্ট হতে পারে না।

ওদের রিপোর্ট পারফেক্ট নয়! ওদের সব রিপোর্টই ভুল বলছ? থরথর অনুরাধার গলা কাঁপে। আমার রিপোর্টটাও তাহলে ভুল।

না না, তোমার রিপোর্ট ভুল হবে কেন? তোমার তো পজেটিভ, তোমার তো সব কিছুই ঠিক আছে।

আসলে তুমি, তোমার বাড়ির লোকজন — সবাই ভেবেছিল দোষটা আমারই। এখন দেখছ আমার সব ঠিক আছে, দোষটা তোমারই — এটা আর তুমি মানতে পারছ না। ডাক্তারবাবু তো বললেন, তোমার স্পার্মই তৈরি হয় না। তবে তোমার স্বাভাবিক হবে কি করে?

অনুরাধা মাথা উঁচু করে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিন ঠিক এরকম, উঁচু আর কঠিন হয়ে, নিজের রিপোর্টের ফাইলটা বুকে আঁকড়ে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়েছিল।

তুষার ঘরের ভেতর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা অনুরাধার দিকে তাকাতে পারল না। এত উঁচু যেন চোখ তুলতে গেলে ঘাড় টনটন করে, এত কঠিন ছোঁয়া যায় না। তুষার বিড়বিড় করল, বিশ্বাস করো আর পাঁচজনের যেমন, আমারও তেমন। কোথাও কোনও ভুল... আমি আবার টেস্ট করাব। অন্য জায়গায়, ভাল কোথাও।

সে তো ডাক্তারবাবুও বললেন, এক মাস বাদ দিয়ে দিয়ে আরও দুটো টেস্ট করিয়ে কনফার্মড হতে। কিন্তু আমার মনে হয়, আবার করানো মানে ফালতু কিছু টাকা খরচ। তোমার যদি ঠিকই থাকে তবে আমাদের সন্তান হচ্ছে না কেন?

তুষার ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রত্না রান্নাঘরে। তুষার একবার কি দাঁড়াবে ওর সামনে। বলবে, সে কেন এসেছে। সে তো এমনও ভেবেছিল, রত্না তাকে না চেনার ভান করে ঢুকে যাবে ঘরের ভেতরে। কিংবা দেখামাত্র চিৎকার করে উঠবে ভূত দেখার মতো, ওর স্বামী এসে হয়তো গলা ধাক্কাও দেবে। আর সে যে প্রশ্নের উত্তর আরও একবার জানতে গেছে, তা জানতে চাওয়ার আগেই জেনে যাবে। এক বুক টাটকা স্বস্তির হাওয়া নিয়ে ফিরে আসবে বাড়িতে। অনুরাধার মুখোমুখি দাঁড়াবে। কিন্তু বলতে পারবে না। চুপ করেও থাকবে না। সমস্ত উৎসে যেন সে গর্জন শুনবে। একা।

তুষার পায়ে পায়ে. রান্নাঘরের দরজার তিন কাঠের ভেতর এসে দাঁড়াল। রত্নার মুখে হাসির আভা। একা একা ভাল লাগছে না বুঝি? একটু তো ঘুমিয়ে নিতে পারতে —।

আমি পাপ করেছি রত্না —।

রত্না গরম কড়া শুধু হাতে ঝপ করে নামিয়ে ফেলে।

আমি এই পাপের অভিশাপে — তুই আমায় ক্ষমা করে দে।

রত্না উনুনে কাঠ গোঁজে। এই কাঠকুটো জ্বালিয়ে রান্না, বড্ড ধোঁয়া! দাদাবাবু তুমি ঘরে যাও।

আমার পাপে আজ অনুরাধা কষ্ট পাচ্ছে।

রত্না হাসে। বউদি কেমন হল দাদাবাবু? বউদিকে তো নিয়েই আসতে পারতে।

সেদিন বাবা না থাকলে আমি জেল খাটতাম। আমার সে শাস্তি ভোগ করাই উচিত ছিল।

একটু ডাল পাতা গুঁজে দিতে আগুন ঝলসে ওঠে। লাল আগুনের আভা। তেতে পুড়ে উঠেছে রত্নার মুখ। গনগনে। কঠিন মুখ। দাদাবাবু ঘরে যাও।

বাবার জন্যে সেদিন আমি বেঁচে গেছি — রত্না তুই আমায় আজ শাস্তি দে।

মুহূর্তে রত্না উনুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ টেনে বের করে। ঝলক আগুন নিয়ে কাঠটা ছোবল তুলে ফুঁসে ওঠে। টুকরো টুকরো আগুন ছাই হয়ে খসে পড়ে। তুমি যাবে? তুমি আর একটা কথা বললে পুড়ে মরব আমি।

।। দুই ।।

ওয়ান মিলিলিটার সিমেনে টোয়েন্টি মিলিয়ন স্পার্ম থাকা জরুরী। এই স্পার্মের ফোর্টি পার্সেন্ট চার ঘণ্টার পরও বেঁচে থাকতে হবে। এবং স্পার্মের সিক্সটি পার্সেন্ট হবে নরমাল ফর্ম। এগুলো থাকলেই আমরা স্বাভাবিক ধরে নি। তার স্পার্ম কাউন্ট যদি কম হয়। অথবা

সামনের দিকে এগোবার ক্ষমতা না থাকে; যেটা ভীষণ জরুরী। এছাড়া স্পার্ম এক বিশেষ ধরনের সেল। এই সেলের প্রাচীরের গঠন সম্পূর্ণ না হলেই আমরা ধরেনি অ্যাবনরমাল কেস। শেষমেশ আছে শুক্রনালীতে কোনও বাধা বা ব্লকেজ। কিন্তু তুষারবাবু আপনার এসব কিছুই না। আপনার কেসটা আরও ডিফিকাল্ট। আপনার শুক্রাশয়ে শুক্রাণু তৈরিই হয় না। আপনাদের মতো দম্পতির সংখ্যা শতকরা পনেরো জন।

ডাক্তারের মুখ ক্রমাগত ভেঙে আবার স্পষ্ট হচ্ছিল। বসে বসে তন্দ্রা মতো এসেছিল তুষারের। রত্না ছাড়ল না কিছুতেই। যা হোক চাড্ডি খেয়ে যাও। খিড়কি পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে এলো তুষার। খেতে বসার জন্যে জোরাজুরি করল রত্না, তুষার রাজি হল না। বলল, নরেশবাবু ফিরুক একসঙ্গে বসব। সবে তো একটা।

তখনও রত্নার স্বামী ফেরেনি। রত্না ঘর-বার করছিল। বাইরের দিকে চোখ রেখে বলল, ওর ফেরার কি ঠিক আছে। আমি বুদ্ধুকে দিয়ে বটতলায় খবর পাঠিয়েছি — এই এসে পড়ল বলে। তুমি বরং বসো, খেতে খেতে ও এসে পড়বে —।

না রে একা খাব না — তবে তোর ছেলেকেও দে। দুজনে একসঙ্গে খাই।

হঠাৎ রত্না সিঁটিয়ে যায়। না না, তুমি বসো দাদাবাবু। ও বড় শয়তান। ওকে বারান্দায় দিচ্ছি।

ছেলেটা দরজার আড়াল থেকে তুষারকে দেখছিল। রত্না যেন কিছুটা সরে ওকে আড়াল করল। তবু তুষার হাত ইশারা করে ওকে ডাকে। ছেলেটা এল না। বরং ভোঁ করে দৌড়ে চলে গেল।

তুষার হাসল। বল রত্না, ও যেভাবে দৌড়াল যদি আমার জায়গায় বাবা থাকত তবে নির্ঘাত ওকে তাড়া করত এখন, তারপর ধরতে পারলে এই উঁচুতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে লোফালুফি করত। তুষার হাসে। নিজের মেনেই হেসে চলে। রত্না হাসে না, বরং একটু যেন গম্ভীর। ঘর ছেড়ে রান্নাঘরের দিকে হাঁটে।

নরেশ ফেরে। পক্ পক্ দুবার হর্ন দিয়ে ভ্যানরিকশ নিয়ে সোজা চলে আসে বারান্দার কাছে। মানুষটার চোখে মুখে একটা খুঁজে যাওয়া ভাব, প্রশ্ন। কোন কুটুম এলো? বারান্দায় উঠতে না উঠতে রত্না ডাকে, কে এসেছে দেখবে এসো। রত্না রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে বারান্দার দিকে উঠে আসে।

ছেলেটা এক দৌড়ে কাছে চলে যায়, হাতটা আঁকড়ে ধরে। নরেশ রত্নার পাশে দরজায় এসে দাঁড়ায়। অবাক চোখ মুখ। রত্না বলে, এই হল তুতু দাদাবাবু। নরেশের বিস্ময় কাটে না। রত্না বলে, সেই গো-ভাবানীপুরের বাড়ি। কলকাতায়।

এবার হাত জোড়করে নমস্কারে নরেশের মাথা ঝুঁকে আসে। নরেশ ফিস ফিস করে কিছু বলে রত্নাকে। রত্না ঘাড় নেড়ে রান্না ঘরের দিকে যায়। নরেশ বলে, আমি দুটো ডুব দিয়ে আসি বাবু।

এই তেতে পুড়ে এলেন — একটু বিশ্রাম নিয়ে চান করুন।

নরেশ হাসে। ছেলেকে গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে বারান্দায় পাতা বেঞ্চে বসে।

তুষার বলে, তারপর একসঙ্গে খেতে বসা যাবে। রত্না তো আর একটু হলেই আমাকে জোর করে একা খেতে বসিয়ে দিচ্ছিল আর কি!

ঝটকা মেরে উঠে পড়ে নরেশ, আমার জন্য আপনি বসে আছেন! ছিঃ ছিঃ! আমি এই দুটো ডুব মেরে এলাম বলে।

রান্নাঘর থেকে রত্না বলে ওঠে, না না দাদাবাবুকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। সব আমার বাড়া। তোমার তাড়ার কিছু নেই, তুমি ধীরে সুস্থে এসো।

বিব্রত তুষার। ইস্ আর একটু পরে বসলে হত না। নরেশবাবু আসুক, একসঙ্গে বসছি।

না না তুমি বসো। ওর অনেক দেরি। রত্না আসন পেতে, জল দিয়ে থালা এগিয়ে দেয়। রত্না যেন তার কোনও কথাই শুনবে না। তুষারকে একা খেতে বসতে হয়। খেয়ে উঠে, মুখ ধুতে বাইরে এসে দেখল, বারান্দায় নরেশ আর বুদ্ধু বসে খাচ্ছে। তুষারের বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন ভারী হয়ে যায়। রত্না কি তার স্বামী সন্তান থেকে তাকে আলাদা করে রাখতে চাইছে। আড়াল রাখতে চাইছে তার সব কিছু। নাকি লজ্জা পাচ্ছে, অথবা ভয়?

তুষার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় নরেশকে? নরেশ দু'হাত বাড়িয়ে বিনয়ের সঙ্গে সিগারেট নেয়। তুষার নিজের সিগারেট ধরিয়ে আগুনটা নরেশের দিকে এগিয়ে দেয়। নরেশ ইতস্তত করে। আগুন নিভে যায়। এবার দেশলাই দেয়। নরেশের ঠিক পিছনে সেঁটে আছে বুদ্ধু। মাঝে মাঝে আড়াল থেকে চোখ বের করে অবাক হয়ে তুষারকে দেখছে। তড়িঘড়ি রত্না উঠে আসে বারান্দায়। দাদাবাবু একটু ঘুমিয়ে নাও ঘরে গিয়ে। তারপর নরেশের দিকে তাকায়, রান্নাঘরের দাবায় মাদুর পেতে দিয়েছি, যাও গিয়ে শুয়ে পড়ো।

তুষার বলল, আমরা গল্প করতে বসলাম, আর তুই শুয়ে পড়ার ব্যবস্থা করে ফেললি। আমরা শোবো না। তুই ও বরং বস, গল্প করি।

রত্না ঠোঁট ওলটায়, দেশ ঘরে কি আর গল্প আছে যে করবে?

নরেশবাবুকে আমি আমার মা বাবার কথা বলছিলাম। আর তাদের দেখা পাবেন না। নিশ্চয় গল্প শুনেছেন। আমার মা মেয়ের মতো ভালবাসত রত্নাকে। শুধু মা কেন? বাবাও তো রত্না বলতে পাগল। সব কিছুতেই রত্না আর রত্না।

কি হল বসে রইলে যে তুমি। তুমি না শুলে বুদ্ধু ঘুমাবে? যাও, গিয়ে বুদ্ধুকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। নইলে একটু পরেই চরতে বেরুবে।

শূন্য মুখে বুদ্ধুকে বুকে চেপে উঠে পড়ে নরেশ। আপনিও বাবু বরঞ্চ একটু গড়িয়ে দিন।

নরেশ যায়। রত্না খিড়কি পুকুরের দিকে যায়। সিগারেটে লম্বা শেষ টান দিয়ে উঠে পড়ে তুষার। ঘরে ঢুকে বিছানায় শরীর ফেলে দেয়। বুকের ভেতর দাউ দাউ জ্বলছে। সেই সাতসকাল থেকেই আকাশ গাছপালা এ বাড়ি ঘর বিছানা শরীরের অন্ধি সন্ধি পুড়ছে যেন।

এই দুপুরে চিলেকোঠার ঘরে উঠে আসত রত্না। প্রথমে কিছুটা আপত্তি ছিল যেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় এসে দাঁড়াত এই নির্জনে। দরজায় পিঠ দিয়ে, সিঁড়ির শেষ ধাপে। তুষার টানত, রত্না কাঠপুতুল।

তারপর হঠাৎ একদিন কেঁদে কেটে বাড়ি চলে গেল রত্না। ফিরল তারও বেশ কিছুদিন পরে, সঙ্গে মা। এসে দাঁড়াল তুষারের মায়ের মুখোমুখি। রত্না কাঁদল। রত্নার মা কাঁদল।

ওদের কান্না আর টুকরো টুকরো কথায় প্রথমে হতভম্ব মা। তারপর ক্রমশ গম্ভীর হতে হতে তীব্র রাগে ফেটে পড়ল। এত আস্পর্ধা হল কি করে — দূর করে দেব। পড়ে মরুক রাস্তায়।

রত্নার মা বলল, আপনি না দেখলে কে দেখবে ওকে? আপনিই ওর মা বাপ। ও ছোটটি থেকে এখানেই আছে।

মা বলল, এই পাপ আমি রাখব না কিছুতেই।

ফুঁসে উঠল রত্নার মা, এই পাপ কে ঢোকাল পেটে?

যেখানে করেছে সেখানে যাক। নাহলে আমি জুতো মেরে তাড়াব।

বাবা ঠেকাল। এতে হিতে বিপরীত হবে। বাইরে জানাজানি হলে, ছিঃ ছিঃ, একটা গরিব মানুষের জীবন। তাছাড়া থানা পুলিস, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

রত্নার মা বলল, ও তো বছর ঘুরতে গেল বাড়িমুখো হয়নি।

মা বলল, কিন্তু আমাদের বাড়িতে তো বাইরের কেউ আসেনি।

বাইরের লোক কেন, আপনাদের বাড়িতে তো দু দুটো ব্যাটাছেলে।

মা তখনও ভাবেনি, এ বাড়িতে দু দুটো পুরুষ। মা ভাবল, অনেক কিছু, সাত পাঁচ। তারপর তীব্র আক্রোশে চেপে ধরল বাবার কলার। তুমি কেন এমন সর্বনাশ করলে। তোমার মেয়ের বয়সী, ছিঃ ছিঃ। আমার অনেকদিন আগেই বোঝা উচিত ছিল, তোমার মতিগতি ভাল না। তুমি যেন বড্ড বেশি বেশি করছিলে।

বাবা স্থির। ঠাণ্ডা। তুমিই তো ভুল করেছ। ছেলে তোমার ছোট নয়। সে নয় চিলেকোঠায় পড়াশোনা করে, সেখানে কি হুটহাট একটা মেয়েকে তোমার পাঠানো উচিত হয়েছে? ভুল তো ওরা করবেই। বয়সের ধর্ম।

মা স্তম্ভিত। মুখে হাত চাপা দিয়ে শব্দ করে কেঁদে ফেলল। ঘরের আলো নিভিয়ে তুষার চুপচাপ বসে থাকে। কেউ কিছু বলল না তাকে। তবু সে তো ধরা পড়ে গেল সবার কাছে।

বাবাই সব ব্যবস্থা করল। নার্সিং হোম ঘুরিয়ে ট্রেনে তুলে দিল। ওর মা রত্নার বিয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিল। বাবা সব কিছু আগের মতো করার জন্য অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু দিন দিন মা যেন কেমন হয়ে গেল। তুষারের মুখ দেখত না। কথা বলত না। শুধু তুষার নয় বাবার সঙ্গেও। চুপচাপ। একদিন রান্না করতে গিয়ে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে ফেলল। কেউ ছিল না বাড়িতে। মা একা একাই পুড়ে গেল।

· তুষার ভাবে, মা কি এমনি এমনি মরে গেল। সত্যিই কি রান্নার আগুন। সত্যিই কি সে আগুন ছুঁয়েছিল মায়ের শাড়ি। না কি মা ছুঁয়েছিল আগুন। মা কি কোনও চিৎকার করেনি। কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে গেল। রান্নাঘরের বালতিতে জল। মা জল ছুঁল না। তাই আরও যত দিন যায় এ সংসারের ভেতরে যেন আগুনের ছারখার। তাত।

তুষার ডাক্তারবাবুকে হস্তমৈথুনের কথা বলেছিল। আগে খুব, বেশি বেশি তাতেই কি?

।। তিন ।।

এবার বিখ্যাত কোনও ডায়গনিস্টক সেন্টার। কাচের কাউন্টারের ওপারে মহিলা কিংবা পুরুষ। চোখের সামনে গুম-মারা প্রেসক্রিপশন। তাদের চোখে ঝিলিক। ঠোঁটের কোণ বেঁকে সুতোর মতো। কাচের এপারে কুঁকড়ে তুষার। মানুষগুলো ঝলক মেরে মেরে তুষারকে দেখছিল। তুষারের চোখে যেন ছবি উলটে পালটে যাচ্ছে, হাত পা মাথা সব কেটে কেটে, টিভির ভেতরের ঘুরপাক। তুষারের হঠাৎ মনে হল, ওদের মুখে ক্লান্তির ছাপ। যেন একটু সুখের খোঁজে, যেন জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে করতে ওরা ক্লান্ত। কত কনডোম, কত পিল, কতদিন গুনে সারা মাসের হিসাব রাখা, কত কায়দাকানুন।

আর এসব ঝক্কি বিয়ের প্রথম বছর তিন সাড়ে তিন তুষারও সামলে ছিল। অনুরাধার বউদি বলেছিল, একটু আনন্দ ফূর্তি করে নিন। সাত তাড়াতাড়ি চ্যাঁ ভ্যাঁ এসে গেলে সব শেষ।

অফিসে বিপুল বিব্রত গলায় বলেছিল, বুঝলি এ হল আমাদের রেকারিং প্রবলেম। কেন যে ফুলের সঙ্গে এমন কাঁটা দিল বুঝি না।

সেই কাঁটার খোঁজে তুষার এসে আবার দাঁড়াবে। ডাক্তার বলবে, আপনি কবে দিতে চান সিমেন। এটাই কি ফার্স্ট?

কি বলবে তুষার। চোখ কান বুজিয়ে বলে দেবে, এটাই প্রথম। ডাক্তার বলবে, সিমেন দেওয়ার আগের তিন চার দিন ইন্টারকোর্স করবেন না।

রাতে অনুরাধার দিকে একটু সরে শুতে গেলে, অনুরাধা বলবে, এমনি করো না। একটু স্থির হও — কবে যেন যাবে তুমি?

তারপর আবার টিউব হাতে ছোট্টঘরে। একা। শরীরের কাছে তীব্র আকুতি নতজানু। মাথা ঘোরা। শরীর ছুঁয়ে মহার্ঘ্য ফোঁটা ফোঁটা। আবার টিউব হাতে ডাক্তারের সামনে। তুষার জানে, যে যাই বলুক, এই টিউবের ভেতর প্রাণের তুড়িলাফ। এবার ডাক্তার জানবে, অনুরাধা জানবে। একদিন তুষার জানত। তার বাবা-মা জানত, রত্না — রত্নার মা জানত। এবার অনুরাধা জানবে, এই জানাটুকুই আজ তুষারের কাছে বড় প্রয়োজন। ব্যস। আর কিছু চায় না সে। সন্তানও না। সে শুধু প্রমাণ দিতে চায়, ওই রিপোর্ট ভুল। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়। সে পুরুষ!

এর মধ্যে রত্না এসে দাঁড়ায় ঘরে। চাপা গলার স্বর, দাদাবাবু তুমি ঘুমালে?

চোখ খুলে তুষার উঠে বসে, তুই তো গল্প করতে দিলি না। ঘুমাতেই বললি।

রত্না হাসে। তবে তুমি ঘুমিয়ে পড়। আমি তো তোমার সঙ্গে গল্প করতেই এলাম।

বস তাহলে। এখানে এসে বস। তুষার পিছন দিকে একটু সরে গিয়ে বিছানা দেখায়। রত্না বিছানায় বসে না, দেওয়াল ঘেঁষা নিচু বেঞ্চে বসে। বলো কি গল্প করবে?

তুষার যেন আটকে যায়। একটা একটা পেরেক তার শরীরে পোঁতা। কি গল্প করবে সে। সেই চিলেকোঠা, সেই রত্না, সেই বাবা মা, আর এই অভিশাপের গল্প!

রত্না বলে, কি হল চুপ করে রইলে যে, তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।

বাইরের রোদে এখনও আগুনের আঁচড়। জ্বালা পোড়া। এই ঘরের ভেতর বিছানার ওপর বসে বসে তুষার যেন ক্রমশ ন্যাড়া প্রান্তরে এসে পড়ে। সেখানে ঘাস পোড়া হলুদ পাতা ঝরা আর ধুলোর ঝড়। দু চোখ অন্ধ, তুষার যেন ধুলোর আড়ালে ঢেকে যাবে। বাঁচার জন্য দু হাত আকাশে তুলে ছটফট করে দেখে, আগুন-তাতে হাত দুটো শুখনো শীর্ণ হয়ে শরীরের সঙ্গে লটপট করছে।

তুষার বলে, বাচ্চাদের অত মারবি না। তোর ছেলে তো খুব ভাল, শান্ত শিষ্ট। তুষার যেন নিজেকে মেরামত করে, ভীষণ সতর্ক হয়ে অন্য গল্পে ঢুকে পড়তে চায়।

ছোট্ট থেকেই একটু শাসনে রাখতে হয় দাদাবাবু। একটু ভয় পাইয়ে রাখতে হয়। ওর স্বভাব চরিত্রটা তো আমাদেরই তৈরি করে দিতে হবে।

তাই বলে মেরে? মার খেতে খেতে ভয় তো ভেঙে যাবে —।

তুমি তো কোনওদিন মার খাওনি দাদাবাবু। কেউ কোনওদিন তোমায় শাসনও করেনি। তাই জন্যে কি তুমি এত বেপরোয়া ছিলে, ভালমন্দ কিছুই বুঝতে না!

তুষার চুপ করে থাকে। না, এবার কথাটা তুলতেই হবে। অন্তত প্রশ্নটা ছুঁড়ে চুপচাপ রত্নার মুখের ঘনিষ্ঠ রেখার বদলে যাওয়া দেখতে হবে। বিছানার ওপর আধশোয়া তুষার ভেতর ভেতর বেপরোয়া হয়ে ওঠে। যেন এখন মার খেতে খেতেই ওই বেপরোয়াভাব!

বাইরে বেলা পুড়ে যাচ্ছে। ক্ষয়ে যাচ্ছে।

রত্না বলে, কাকিমা কি এমনি এমনি পুড়ে গেল দাদাবাবু? নাকি আগুনটা কেউ ধরিয়ে দিয়েছিল গায়ে?

আঁতকে ওঠে তুষার। কি বলছিস কি তুই! আগুন! মায়ের গায়ে কে আগুন ধরাবে?

কেন? যে কেউ আগুন দিতে পারে। তুমি দিতে পারো, তোমার বাবা দিতে পারে। বাড়িতে পুরুষ বলতে তো তোমরা দুজনেই। একটা মেয়েমানুষে গায়ে আগুন আর কে দিতে যাবে?

কি বলছিস — আমরা মাকে? ছিঃ ছিঃ! তুই কি প্রতিশোধ নিতে চাইছিস? আমার কথা বলছিস বল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবাকেও!

প্রতিশোধ! ফুঁসে ওঠে রত্না। কার ওপর প্রতিশোধ নেব আমি? তোমার ওপব! কি করেছ তুমি আমার?

তুষার বিছানার ওপর শরীর ঠেলে ওঠে। আমি অন্যায় করেছি রত্না। সেই অভিশাপেই আজ আমি দগ্ধে মরছি। সবাই আমার দিকে আঙুল তুলে হাসছে। নিজের স্ত্রীর কাছেও আমি ছোট হয়ে গেছি। আমি পুরুষ না। আমি মানুষ না। কিন্তু তুই তো জানিস। আমায় ক্ষমা করে দে।

রত্না থমকে যায়। সরীসৃপের মতো বুকে ভর করে ঠেলে ওঠা তুষারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ফিসফিস বাতাস-লাগা গলায় বলে, তুমি কি এত দূরে শুধু ক্ষমা চাইতে ছুটে এলে দাদাবাবু? নাকি অন্য কিছু — তুমি, না, তোমার বাপ — কে কত দবেব ব্যাটাছেলে সেটাই জানতে এলে?

তুষার মেরুদণ্ডের ভরে ঝটকা মেরে ফণা তুলতে চায়, কিন্তু তার আগেই রত্না দু-এক পা এগিয়ে বিছানা ঘেঁষে দাঁড়ায়। তুষার শরীর গুটিয়ে বলে, মৃত বাবা আমার। তাঁকে আনছিস কেন? আমি পাপ করেছি — তুই আমার কথা বল।

কাঁধ থেকে আঁচল খসে যায়, রত্না ঠিকরে ওঠে, কেন? ব্যাটাছেলে তো তোমরা দুজন, আর আমি মেয়েমানুষ, তা আমি কি করে তোমাদের আলাদা করি!

তুষারের ভেতর হিম কালো রক্তের স্রোত। সেই স্রোতে কিলবিল করে উঠে বলে, তুই আমায় যত পারিস অভিশাপ দে — শুধু বল তোর সেই সর্বনাশ আমিই করেছি।

রত্না ধীর স্থির, কঠোর মুখ। তা আমি কি করে বুঝব — অত বোঝার ক্ষমতা কি আমাব ছিল — কে আগুন দিল, আর কে বাতাস করল।

রত্না যেন মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়। আঁচলটা পিঠ ঘুরিয়ে ডান দিকে টেনে নিয়ে বলে, আজ তোমাকে দেখে বড় ঘেন্না হল।

আঁচলে মুখ মুছে রত্না বারান্দায় এসে দাঁড়ায, গলা তোলে, কই তুমি ঘুমালে? দাদাবাবু যে বেরুবে এবার। ভ্যানটা বের করে পৌঁছে দিয়ে এসো।

বিছানায় বসে তুষার রত্নার গলা শোনে, বোঝে যাবাব সময় হয়েছে।

নরেশ উঠে আসে গুটি গুটি পায়ে। ভ্যান রিকশটা বারান্দার কোণ থেকে টেনে, বাগান পেরিয়ে রাস্তায় নিয়ে দাড়ায।

ধারে কাছে রত্না নেই। একা তুষার ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে। ক্রমশ ঘরের দেওয়াল যেন সরে সরে ডায়গনস্টিক সেণ্টারের সেই ছোট্ট ঘর হয়ে যায়। বাইরে স্বচ্ছ দিনের আলো কাচের টেস্ট টিউবের মতো ঝলসে ওঠে।

মোমবাতির মা ও জীবন-শিউলি গাছ

তরুণতপন বিশ্বাস

কাজের মেয়ের নাম জয়ন্তী, বোধ হয় ষষ্ঠীতলা লেনের ভদ্দরলোকেরা মেনে নিতে পারেনি। আর পারেনি বলেই তারা জয়ন্তী নামটা দুমড়ে মুচড়ে 'ঝেন্তি' করে নিয়েছে। বছর চল্লিশেক বয়সের ঝেন্তি এ পর্যন্ত মোটে না হোক ডজন খানিক বাড়ির কাজ ধরেছে, কাজ ছেড়েছে। এবং আশ্চর্য এই যে, কোনটাই তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্ভর ছিল না। বাবু-গিন্নিরাই লাগানি-ভাঙানি করে কাজ ছাড়িয়েছে, বাড়তি পয়সার লোভ দেখিযে কাজ ধরিয়েছে। অবিশ্যি চল্লিশ বছরই সে লাগাতার ঝিয়ের কাজ করছে, তা নয়। খুব বেশি হলে বছর দশেক হবে। তার আগে তার ঘর ছিল, বর ছিল। পরের বাড়ি কাজ করার প্রয়োজন ছিল না।

যাই হোক ষষ্ঠীতলা লেনে এই যে ঝেন্তি ডিমাণ্ডের গ্রাফ লাইন সব সময় ঊর্ধ্বমুখী, তার কারণও প্রচণ্ড সৎ। ভীষণ পরিশ্রমী। বুদ্ধি শুদ্ধি কিঞ্চিৎ কম। নিজের মত করে সব বাড়ির কাজ তুলে দেয়। আর একটা মহৎ গুণ — এক বাড়িব গল্প, আর এক বাড়ি ফেঁদে বসে না। অবিশ্যি গল্প করবে কি, আমড়া আঁটি মাথায় কিছু ধরে রাখতে পারে না বেশিক্ষণ। তার মাথার তরল ঘিলুর সাথে প্রায়শই গরু, ছাগল ইত্যাদির তুলনা হয়।

কালো কুৎসিত, খ্যাংড়া কাঠি শরীর, এলোমেলো দাঁতেব অবস্থান, ঘোলাটে চোখ — তবু প্রকৃতির নিয়মে সে শরীরে যৌবন এসেছিল যথা সময়ে। আব সেই নিয়মের কালে, ঝেন্তির মা; ফুড গোডাউনের ভুটিয়া বাহাদুরের হাতে মেয়েকে তুলে দিয়েছিল বড় আশায়। বিধবা বুড়ি জামাই-মেয়ে, নাতি-পুতি নিয়ে শেষ ক'টা দিন ভালো-মন্দে কাটিয়ে দেবে।

সে আশায় বাদ সেধেছিল জামাই নিজে। ঝেন্তির কোলে কাঁখে গোটা পাঁচেক বাচ্চা ধরিয়ে দিয়ে, ঝেন্তির মায়ের বিশেষণে — ও খেকোর ব্যাটা হাওয়া। তার সন্তান সন্ততির ক্রমিক সংখ্যা, লিঙ্গ ভেদে এই রকম — এক মেয়ে, দুই মেয়ে, তিন ছেলে, চার মেয়ে, পাঁচ মেয়ে। এবং এই চার নম্বর মেয়েটি বামন জাতক। বর্তমান বয়স বারো। উচ্চতা দু' ফুট পাঁচ ইঞ্চি। ওজন চব্বিশ কেজি। নাম মোমবাতি।

মোমবাতি! খুকু খুকু — খিক খিক... .মানুষের বাচ্চার নাম মোমবাতি! হা হা হি হি। দোহাই পাঠক, হাসি অথবা কান্নার গল্পটা এইখান থেকে শুরু।

. শ্যাম মণ্ডলের পাঁচিল ঘেরা পেল্লাই প্রাসাদ। সেই লম্বা পাঁচিলের পশ্চিম বরাবর হাত পঞ্চাশেক মাটির রাস্তা ডিঙিয়ে মায়া বাড়িওয়ালির ঘর দোর। বাসিন্দাদের মুখে মুখে 'মায়া কলোনী' উচ্চারিত হতে হতে স্থায়িত্ব পেয়ে গেছে স্থান নাম। যতীন মণ্ডলের তিন ছেলের তিন টুকরো সংসার। উত্তরে ভীম সর্দারের বাড়ি, পাশে ঘাট বাঁধান পুকুর আর মাঝখানে বিশাল জীবন-জিউলি গাছের নীচে ঘন ছায়ায় মায়া-র লম্বা দো-চালা আট ঘরের বাড়ি। আট ঘরে দশ ভাড়াটিয়া নিয়ে একা মায়া ব বেশ চলে যায়। বিয়ে-শাদি কেন করেনি কেউ

জানে না। খোঁজখবরও কেউ রাখে না। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই বয়স। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় শরীরে তাপ বাড়লে, তা কমানোর জন্য দু'একজন কবিরাজ নাকি ধরা আছে — লোকে বলে। সেই মায়ার দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায় তো ক'ঘরের ভাড়াটে আগ্‌লে রাখা খুব একটা সমস্যা হয় না।

রিক্সাওয়ালা ভূপতি, তেলে ভাজা নীহার, কাঠের মিস্ত্রী বাসু, মাদুলি বেচা গুরুপদ, আয়া রাধারাণী — আরও কারা কারা থাকে মায়ার ভাড়াটে হয়ে। এবং থাকে ঝেন্তিও।

ঝেন্তি ঘরের ভাড়াটে নয়, এক বারান্দা ঘিরে তার আস্তানা। ভাড়া মাসে পঁচিশ টাকা। জলেজল পড়ে, ঝড়ে হাওয়া খেলে সে আস্তানায়। ঝেন্তির তাতেই সই। মাথার উপর চাল আছে, সেই বড় ভরসা। অবিশ্যি ঝড় জলের সময় তার ছেলেপুলে এর-তার দালানে দিন কাটায়, রাত পার করে। মায়া কলোনীর সবাই সবার শোকে — সুখে থাকে। তার মধ্যে ঝেন্তির পাঁচ বাচ্চার উপর সবাই একটু বাড়তি টান-টোন, অতিরিক্ত আহা উহু ইত্যাদি করুণা জাতীয় পদার্থের প্রলেপ মাখায়। বাপ হারা বাচ্চাগুলোকে সময়ে-অসময়ে দেখভাল্ করে। ছেঁড়াছুটো জামা কাপড়, কি বাড়তি খাবার-দাবারের ভাগ দেয়।

বড় রাস্তার মোড়ে নীহারের তেলে ভাজা ব্যবসা বিকেল থেকে রাত ন'টা — দশটা পর্যন্ত বেশ চলে। সঙ্গে সাথে থাকে মোমবাতি। ফাই-ফরমাশ খাটে, লিকলিকে হাতে খদ্দের সামলায়। মাঝে মধ্যে খিদের মুখে ভাজা-পোড়াটা টুকটাক পায়। মোমবাতি তাতেই খুশি। নীহার লক্ষ্য করে, মোমবাতিকে দোকানে বসানোর পর থেকে বিক্রি-বাটার বৃদ্ধি ঘটেছে। ভাবে, পয়মন্ত না কি মেয়েটা! আর এই ভাবনা থেকেই স্বাভাবিক কারণে অতিরিক্ত ভালোবাসা উথ্‌লে ওঠে। মাঝে মধ্যে দোকান বন্ধের সময় মেয়েটার হাতে আট আনা — এক টাকা গুঁজে দেয়, কৃতজ্ঞতায়।

মেয়ের হাত ঘুরে সেই টাকা-পয়সা যখন ঝেন্তির হাতে এসে পৌঁছায়, তার বড় বড় দাঁত কান পর্যন্ত ছুঁইয়ে কলোনীর পাঁচজনের কাছে গল্প করতে বসে যায়।

— দেখিছো, আমাদের মোমবাতি কেমন আয় করতি শিখিছে — নীহার তখন কলতলায় বাসন মাজা থামিয়ে চীৎকার ছোঁড়ে — ও রকম করে বলিস কেন ঝেন্তি? আমি কি তোর মেয়েরে রোজগার করতি নে যাই?

ভূপতির বউ দালানে বসে চালে কাঁকর বাছতে বাছতে উত্তর করে — তোমার কি জ্ঞান নীহারদি, অতটুকু বাচ্চার হাতে পয়সা তুলি দেও।

— ছেলেমানুষ, দোকানে বসে থাকে। এক-আধ পয়সার লবেঞ্চুস কিনে খাওয়ার সাধ তো হয়। তাই ভালবেসে —

— আদিখ্যেতা। হাসপাতালের আয়া রাধারাণী তার ঘর থেকে ছুঁড়ে দেয় মন্তব্য।

ব্যস্। নারদ — নারদ। আগুনে ঘি, ঘিয়ে বিল্বপত্র। বিড়বিড় চড়চড় করে ওঠে হোম যজ্ঞ। ঠিক দুপুরে মেতে ওঠে মায়া কলোনী। জীবন-জিউলি গাছে বসে থাকা কাকের দল অসহ্য হয়ে খা-খা করে ওঠে। তেতে পুড়ে কলোনীর পুরুষেরা কাজ-কর্ম সেরে ঘরে ফিরেই হোম-আগুনের সামনে যথার্থ পুরোহিত হয়ে ওঠে। ওঁং অগ্নি স্বাহা।

শেষমেশ মায়া এসে জল ঢালে এ ঘরে, সে ঝুপড়িতে। ঝেন্তি তখন পাঁচ বাচ্চা মা-মমতায় বুকে চেপে, ভয়ে ভয়ে বসে থাকে। মোমবাতির রোজগারের সংবাদ যে একটা অর্থহীন তামাশা এবং পাঁচজনকে সেই নিছক — কৌতুকের কথা বিলিয়ে দিতে চেয়ে সে যেন মহাপাতকী। রঙ্গ রসিকতা নিয়ে এমন রণ-রঙ্গে মেতে উঠবে কলোনির আম-জনতা, ঝেন্তি বুঝে উঠতে পারেনি। যেমন সে বুঝে উঠতে পারে না, তার পাঁচ পাঁচটি সন্তানের

মধ্যে মোমবাতিকে ঘিরেই কেন এত ঝঞ্ঝাট, এত টানাপোড়েন। এই বড় মাথা, গোল চোখ, লিকলিকে হাত-পা, নাদা পেট — এই অদ্ভুত দর্শন সন্তান তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না কোনদিন, একটা ভুল অঙ্ক কষে নিয়ে রাগে দুঃখে গুমাগুম খান আট-দশ কিল বসিয়ে দেয় মোমবাতির পিঠে।

ধারাবাহিক এক দীর্ঘ সিরিয়ালের একটি মধ্যাহ্নের দৃশ্য এভাবেই শেষ হয়।

একটু বেশি রাত করে ফেরে গুরুপদ। কলোনীর শেষ মাথায় তার আশ্রয়। কোনদিন ঘরে ফিরে কেরোসিন স্টোভে ফুটিয়ে নেয় রাতের আহার। বেশির ভাগ দিনই সে কর্মটি সস্তা হোটেলেই সেরে আসে। একা মানুষ, ঝামেলা ঝক্কিতে যত কম থাকা যায়। ঘরে বসে শিকড়-বাকড় বাটা ঘষা করে কী সব ওষুধ বানায়, মাদুলি করে। মূল উপাদান অবিশ্যি কলোনীর মধ্যস্থিত জীবন-শিউলি গাছের ছাল। গুরুপদর অত্যাচারে গাছটার নীচের কাণ্ড যেন শ্বেতী রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে সারা বছর। হাটে-কোর্টে, মেলা-মাঠে সে সব ওষুধ মাদুলী বিকোয় কথার ফুলঝুরি ছিটিয়ে —

বাংলার গাছ কথা বলে। সে কখনও বেইমানী করে না। গাছের মূল শিকড় আর প্রাণের মূল স্বাস্থ্য। একটা গাছের প্রাণ থেকে হাজার মানুষের প্রাণের আরাম। শান্তি-স্বস্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জীওন কাঠি এই মাদুলী। মাত্র দু'টাকা — দু'টাকা — দু'টাকা। বাহুতে ধারণ করুন, রাহু তাড়ান।

যে সমস্ত রোগে তার ওষুধ কাজ করে বলে প্রচার করে, সেই চোঁয়া ঢেকুর, বুক জ্বালা, অম্বল গ্যাস — সবই সে যত্ন করে যেন শরীরে পুষে রেখেছে! লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারা। কোটরে চোখ। ফকফকে সাদা গায়ের রঙ। সারা মুখে ফন্দি-ফিকির আর ধূর্ততা, জল-বসন্তের চিরস্থায়ী দাগের সাথে লেপটে আছে সবসময়। গুরুপদর নিজের জবানীতে — প্রথম বউ বাচ্চা দিতে গিয়ে মারা যায়। দ্বিতীয় বউ তাকে ছেড়ে ভোকাট্টা হয়ে অন্য কোন মগ্‌ডালে গিয়ে লটকেছে। তার তারপর ওমুখো না মাড়িয়ে 'এই বেশ আছি' মার্কা স্বস্তি নিয়ে দিন গুজরান করে যাচ্ছে।

সাতে পাঁচে না থাকলে কি হয়, কলোনীর সকলের সাথে 'কেমন আছেন' 'খবর ভালো' ইত্যাদি সৌজন্যমূলক আলাপনে খামতি নেই। ঝেন্তির পাঁচ বাচ্চার শেষের দিকের দু' একটিতে নাকি সে লোকের অবদান আছে — মন্দ লোকে বলে। অবিশ্যি সাক্ষী-প্রমাণ নেই। হলেও হতে পারে কলোনীর মুখরোচক পাঁচা অথবা মুখশুদ্ধি গুজব। তবে পালা-পার্বণে, দোল-দুর্গোৎসবে দু-পাঁচ টাকার মিষ্টি-মেঠাই, বাজি-পটকা, রঙ-আবির অথবা এক-আধটা নতুন জামা প্যান্ট কিনে দেয়। সে দীন-দরিদ্রের প্রতি স্নেহ পরবশে হতে পারে অথবা যদি কোন পাপ গুরুপদকে ছুঁয়ে থাকে, তার স্খালনের প্রচেষ্টাও হতে পারে।

এহেন গুরুপদকে নিয়ে সেই দীর্ঘ সিরিয়ালে, মধ্যরাতের এক দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। মধ্য রাত এই জন্য — আগামীকাল বেরেমনগরে হাটবার। সেখানে গুরুপদর ওষুধ আর মাদুলি বিক্রির ডেট।

হামান দিস্তার ঘটাং ঘটাং শব্দ অনেকক্ষণ আগে থেমে গেছে। জীবন-জীউলি গাছের নীচে এসে গুরুপদ এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। মুখের বিড়ি পায়ের চাপে নিভিয়ে দেয়। বারোয়ারি কুকুর ফুলমণি একবার মুখ তুলে শব্দ করে। তারপর কলোনীর পরিচিত মানুষ বুঝে ফেলে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে।

— ঝেন্তি রে, ঘুমিয়ে পড়িছিস? গুরুপদর নীচু গলা।

উত্তর নেই।

আঁধার হাত্‌ড়ে কাঙ্ক্ষিত মানুষটাকে খুঁজে পায় তার হাত।

— ও ঝেন্তি, ঝেন্তি।

— কেডা?

— আমি গুরুপদ। ওঠ, কথা আছে।

— কথা সকালে কইয়ো। আধো ঘুমে ঝেন্তির জবাব।

— কাজের কথা।

— ওসব কাজ-বাজ আর ভাল্লাগে না। দিন-ভর খাটনির পর নিশ্চিন্তে ঘুমুত্তি দ্যাও।

ক্রমশঃ উবে যায় ঝেন্তির ঘুম। নীচুগ্রামে চলছে কথোপকথন। ততক্ষণে গুরুপদ পাঁচ বাচ্চা ঠেলা করে প্রায় ঝেন্তির পাশে জায়গা করে বসে গেছে। তার খোলা কাঁধে হাত রেখে ফিসফিসিয়ে বলে,

— অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, বুঝলি। আমি তো ফি দিন হাটে-কোর্টে যাচ্ছি। একা মানুষ, সামলাত্তি পারিনি সব। মোমবাত্তিবে সঙ্গে নে যাব।

— সে কি? ও কি কিছু পারে? ঐ তো ছিরির মানুষ।

— ঐ ছিরির মানুষই তো আমার দরকার।

বলেই যেন জিভে কামড় খায় গুরুপদ। দ্রুত কথা ঘুরিয়ে বলে, — আমার সঙ্গে সাথে থাকবে। পাঁচটা নতুন জায়গা ঘোরা হবে। নতুন মানুষ দেখা হবে। যাওয়া-খাওয়ার সব দায়িত্ব আমার।

খাটো বুদ্ধির ঝেন্তি ঘুম জড়ান চোখে বুঝে উঠতে পারে না — তাতে কী সুবাহা হবে গুরুপদর।

চতুর গুরুপদ শেষ টোপ ফেলে দেয় সামান্য সময় নিয়ে।

— খাটা-খাটনির জন্যি সন্ধ্যে রাতেই তোর হাতে নগদ পাঁচ টাকা। সপ্তায় সাত দিনই যায় তো পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ।

নব্বই টাকার ঠিকে ঝি-র চোখে ঘুম উবে যাওয়ার জন্যে জ্বালা ধরে অথবা দেড়শো টাকা বাড়তি আয়ের উত্তেজনায় জ্বলতে থাকে।

ধূর্ত গুরুপদ বুঝেছে, বাংলার গাছ আব বেশি দিন কথা বলবে না। একঘেঁয়ে প্রচারে ব্যবসার হাল-হালৎ খারাপ হতে চলেছে। লোক টানতে, লোকের মন ভেজাতে চাই নিত্য-নতুন ফিকির। এই নতুন ফিকির হবে অদ্ভুত দর্শন মোমবাতি। বাচ্চা বামন দেখিয়ে লোক জমাতে হবে।

আসুন — দেখুন, দশ অবতারের অন্যতম অবতার — বামন অবতার। এর হাত থেকেই আপনারা সংগ্রহ করুন ওষুধ-মাদুলি। অবতার তরিয়ে দেবে আপনার দুঃখ কষ্ট।

দু'টাকা — দু'টাকা — দু'টাকা —

— আঃ। মৃদু চীৎকার করে ওঠে ঝেন্তি।

তার ব্যবসায়িক সাফল্যের আনন্দে উত্তেজনায় ঝেন্তির শরীর কখন তার বুকের মধ্যে দলিত-মথিত হচ্ছিল, খেয়াল ছিল না গুরুপদর। সম্বিত ফিরে পেয়ে শুধোয়,

— কি রাজি তো?

— নে যেইয়ো।

— খবরদার। যুক্তি-চুক্তির কথা কলোনীর কেউ যেন না জানে।

— হবেনি।

মধ্য রাতে দু'টি শীর্ণ শিথিল শরীর টগবগ করে নানাবিধ উত্তেজনায়। দু'টি আঁধার জীবন কিঞ্চিৎ স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানে, আগামী দিনে মোমবাতির অবদানের কথা ভাবতে ভাবতে আলোর পোকাদের মত নাচানাচি করে।

বিকৃত গঠন নিয়ে যে কিশোরী কলোনীর সব ঘর-দালানে নেচে-গেয়ে খেলে-খেয়ে বেড়ায় অথবা করুণায় যার সব মানুষের কাছে অবাধ যাতায়াত; মেলামেশা; হঠাৎ করে তার অনুপস্থিতি বড় বেশি চোখে লাগে। একদিন যায়, দু'দিন যায় — তিন দিনের দিন হই-হই পড়ে যায় এলাকার সমস্ত নাগরিকের স্থির এক নির্দিষ্ট কর্মসূচীতে। বলাবাহুল্য প্রথম সন্দেহটি দানা বাঁধে নীহারের মনে। পয়মন্ত বালিকাকে ঘিরে তার আয় বৃদ্ধির যে বিশ্বাস জমা হচ্ছিল ক্রমশঃ, সেটি গাঢ় হলো — কোন না কোন কারণে তেলেভাজার দোকানে দু'দিন বিক্রি কমে যাওয়ায়।

ইট-উনুনে কাঠ-কুটোর আগুনে চারটি ভাতে-ভাত ফোটানোর ব্যবস্থায় মশগুল ছিল ঝেন্তি। সারাদিন চই-চই করে বেড়িয়ে ক্লান্ত মোমবাতি একপাশে ঘুমে কাদা। একমাত্র ছেলে এখনও ঘরে ফেরেনি। হাসপাতালের সামনে এক চায়ের দোকানে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে রাধাদি। কলোনীর ঘরে ঘরে রাতের স্তব্ধতা নেমে আসার প্রাক-মুহূর্তের ব্যস্ততা। সাংসারিক কথাবার্তা, গল্পগুজব, ছোট ছেলেমেয়ের ঘুম জড়ানো কান্না, গুরুপদর হামান-দিস্তার ঘটাং ঘটাং, বারোয়ারী কুকুর ফুলমণির অকারণ ছোটাছুটি এবং জীবন-জিউলীর শাখা-প্রশাখায় বাতাস বওয়ার শন-শন শব্দ।

চিরন্তন এই দৃশ্যাবলীতে নীহারের সটান উপস্থিতি ঝেন্তির ডেরায়। এবং কোন ভূমিকা ছাড়াই আক্রমণাত্মক সংলাপে বিদ্ধ করে।

— ফি দুপুরে মোমবাতি কুথায় যায় রে?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, কিন্তু অবাক হয় না ঝেন্তি। একদিন না একদিন, এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই হবে তার যেন জানা ছিল। তাই সাবলীল উত্তর,

— ওর গুরুকাকুর সাথে হাট করতি যায়।

— গুরু কাকু! নাটের গুরু এত্দিন কুথায় ছিল?

জবাব নেই।

— পেটে ধরেনি বলে কি মোমবাতিরে আমরা ভালোবাসিনে? জিজ্ঞেস করার দরকার মনে করলি নে?

উনুনে কাঠ গুঁজে দিতে দিতে ঝেন্তির জবাব — আমার এই তো ছিরির রান্না-খাওয়া। একটা পেট যদি দুপুরে কমে, তাই —

— নাঙের হাতে তুলে দিইছিস।

ঝেন্তির সংলাপ যেন নীহার শেষ করে।

ফুটন্ত ভাতের দিক থেকে নজর ঘুরিয়ে এনে ঝেঁকে ওঠে ঝেন্তি,

— কি বলতিছো। পাগলের মত?

— ওহ্, আবার ফোঁস বেড়িছে। বাব্বা!

দুই নারীর কথা কাটাকাটির মধ্যে জেগে ওঠে মোমবাতি। আড়ামোড়া ভেঙে তার বেঢপ শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

— মা, ভাত এখুনও হলোনি?

নীহার ভূমিকা পাল্টে দ্রুত ছুটে যায় মোমবাতির পাশে। দু'হাতে মুখ চেপে ধরে আদর করে। স্নেহ মাখিয়ে বলে,

— ও মোমবাতি চপ ভাজা খাবিনে? কাল দোকানে মোচার চপ করবানি।

— আমি তো হাটে জিলিপি খাই।

মোমবাতির উত্তরে মুষড়ে পড়ে নীহার।

তবুও আদর আর ভালোবাসা জড়িয়ে বলে,

— কাল দোকানে নে যাবানি।

— কালকে বাগজোলার বাজারে যাব। বাস গাড়ি করে যে যাবে গুরুকাকু।

অসহ্য অপমানে ছিট্‌কে দাঁড়ায় নীহার। ফোঁস করে ওঠে — শয়তানি। তারপর তীব্র রোষে ঝেন্তির দিকে ফিবে বলে,

— রাক্ষুসী মাগী, সন্তান বেচে খা।

গরম ভাতের হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দেয় ঝেন্তি। নীহার দপদপিয়ে আস্তানা ছাড়ে। কলোনীর শেষ ঘরখানা থেকে হামান-দিস্তার শব্দ এখন দ্বিগুণ হয়। তারই মধ্যে কলোনীর ঘরে ঘরে মোমবাতি-গুরুপদ এবং ঝেন্তির গল্প নানা রসে জারিয়ে পৌঁছে দেয় নীহার।

এ পর্যন্ত সবাই নির্ভুল সংলাপ এবং নিখুঁত আচরণে তাদের ভূমিকা এবং কলোনীর চরিত্রগুলো সঠিকভাবে চিত্রিত করছিল। কিন্তু ওলোট-পালোট হল, সপ্তাখানিক পর ঝেন্তির আট বছর আগে ফেলে যাওয়া প্রথম এবং একমাত্র স্বোয়ামী ভুটিযা বাহাদুরের উপস্থিতি।

তখন বিকেলের রঙ গেরুয়া। আসন্ন ঝড়ের প্রাক্কাল বুঝিবা। তাই থম্ মেরে রযেছে বৃক্ষ, বনলতা। ডানায় ক্লান্তির ধুলো-ধোঁয়া তবু ঘরে ফেরার তাগিদে উচ্ছল পাখ্‌পাখালি। জীবন-জিউলি যেন কোল বাড়িয়ে অপেক্ষায় থাকে — এসো শ্রান্ত পথিক। অবসন্ন জীবন, এসো।

এই দুরন্ত দৃশ্যপটে শ্যাম মণ্ডলের পাঁচিলের পাশ ববাবর মায়া কলোনীর যে নাতি-দীর্ঘ পথ, সেই পথে সাদা ধুতি সবুজ পাঞ্জাবীতে মোড়া গৌরবর্ণ ভুটিয়া বাহাদুর, রেক্সিন মোড়া সুটকেস হাতে দীর্ঘ সময়েব ব্যবধান ঘুচিয়ে নিজস্ব সন্তান-পরিজনের কাছে ফিরছে — যেন চিত্রনাট্যের অমোঘ দাবিতে।

— ও ঝেন্তি, জামাই আসে রে দ্যাখ্।

শেষ বিকেলে ঠিকে কাজের শেষে গা-হাত-পা ধুয়ে নিজের দালান-সংসার গোছাতে ব্যস্ত ঝেন্তি চমকে ওঠে। মায়া মাসীর ঘোষণা, তামাশা ভেবেও নিতান্ত তাচ্ছিল্যে গলি পথে নজর করে ও বিস্মিত হয়।

— ও মা, তাইতো!

কিঞ্চিৎ আহ্লাদে দু'পা এগিয়ে যায়। তারপর রাগ-দ্বেষ-অভিমান-সংশয়-সংকোচ, পাঁচ মিশেলী অভিব্যক্তি নিয়ে থম্‌কে দাঁড়ায় যাত্রাপথে।

মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় ভুটিয়া বাহাদুর। হাতের সুটকেস্ ঝেন্তির হাতে ধরিয়ে দিয়ে গালভরা হাসি নিয়ে প্রশ্ন করে — কিরাম আছিস? ছেলে মেয়েরা? মোমবাতি কোথায়? ঝেন্তি এখন জয়ন্তী হয়ে ওঠে। তার শুকনো শিথিল শরীরে কি এক রোমাঞ্চ জাগে। দারিদ্র্য ক্লিষ্ট মুখে সলাজ আভা। কতকাল, কতকাল পরে ঝেন্তির কাঁধের আঁচল, ঘোমটা হয়ে মাথায় ওঠে। চোখ ফেটে জল আসতে চায় অভিমানে। মুখ নীচু করে বাহাদুরের কথার জবাব না দিয়ে, পায়ের বুড়ো আঙুলে মাটি খোঁড়ে।

— চল্ ঘরে গে বসি।

— ঘর কুথায়? ফুঁপিয়ে ওঠে ঝেন্তি।

— চল্, এসে যখন গিইচি; ভাবনা নেই।

সন্ধ্যা থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত কলোনীর সমস্ত নাগরিকের দফায় দফায় আসা-যাওয়া, নানা প্রশ্ন-জেরা, অভাব-অভিযোগ চলল বাহাদুরকে ঘিরে। ঝেন্তির ডেরায় কতকাল পরে যেন উৎসবের আমেজ। বাহাদুর ছেলে-মেয়ে কোলে-কাঁধে বসিয়ে একের পর এক উত্তর করে, গল্প শোনায়। এবং সুকৌশলে তার বর্তমান সাফল্যেব কাহিনী, অবস্থান — সাতকাহন করে গল্পে অন্তর্ভুক্ত করে।

অনেক পথ মাড়িয়ে সে এখন কেষ্টপুরের চিরুনী কারখানায় গার্ড হয়েছে। আয়-পায় অনেক। কোম্পানীর ঘর-বাড়ি। সেখানেই নতুন করে সংসার পাতবে বলে ঝেন্তিদের নিতে এসেছে। এতদিন এই লজ্জায় নাকি খোঁজ-খবর করতে পারেনি কলোনীর জামাই বাবাজী।

কলোনীর সমস্ত মানুষ যখন ঘুমের দেশে, তখন ভাঙাচোরা আস্তানায় সুদীর্ঘ বিরহের শেষে, আনন্দে-উত্তেজনায় থই-থই দুই মধ্যবয়সী নারী-পুরুষের ঘন অবস্থান এবং আলাপন :

— জানিস বউ, বাগজোলার হাটে যেদিন মোমবাতিরে মাদুলি বেচতি দেখি সেদিন কি কষ্ট আমার। বাপ হইয়ে ছেলেপুলের দিকে নজর করিনি। আমার পাপ লাগে।

কান্নায় বুঁজে আসে ভুটিয়ার কণ্ঠস্বর।

দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য বাববার অন্যায় স্বীকার ঝেন্তিকে দুর্বল করে তোলে। সাধ্বী স্ত্রীর মত ভুটিয়াব চোখের জল মুছে দেয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে —থাক্ ওসব কথা।

—দেখ্, তোর উপরই কত অন্যায় করিছি।

— দিন তো ভগমান দেচে। সব ঠিক হই যাবেনি। কোম্পানীর বাড়ি কবে যাবো?

— এই সপ্তাহখানিক পর। কাল সকালে আগে ভাগে মোমবাতিরে নে যাই। ওর তো ঘোরা অব্যেস আছে। ওরে নে কেনাকাটা করে ঘর সংসার সাজাই। তারপর—

— কিন্তু —

ঝেন্তির 'কিন্তু' দ্রুত সরিয়ে দেয় ভুটিয়া বাহাদুর।

— কাউকে বলার দরকার নেই। সুটকেসে শ'তিনেক টাকা রয়েছে। ওতে এ ক'দিন চালিয়ে নে।

— তুমি বরং গোবিন্দরে নে যাও।

— তা হয় না। নতুন কাজে ঢুকেছে, কামাই যাবে। তুই ভাবনা করিস না বউ। এতদিন কষ্ট করিছিস, আর তো মাত্র ক'দিন। ঝেন্তির মনে যখনই সংশয়ের মেঘ জমে ওঠে তখনই লোভ আর স্বপ্নের ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বাহাদুর। দুশ্চিন্তাকে বাড়তে না দিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাতেও, ভুটিয়া বহু পুরনো চেনা শীর্ণ শরীর নিয়ে খেলতে থাকে। আদর আব ভালোবাসার নিখুঁত আবেগ ঝেন্তিকে মুগ্ধ করে।

— একরাতেই লোকটা কি ভুজুং-ভাজুং দিল, তাতেই মেয়েটাকে দিয়ে দিলি?....ঠকা, জোচ্চর। চিটিংবাজ।

—মূর্তিমানের হঠাৎ উদয় দেখে তখনই সন্দেহ হয়েছিল।

— বাহাদুর মেয়ে বেচে দেবে। সার্কাসওয়ালারা বিশ-পঁচিশ হাজার টাকায় কিনে জোকার করবে।

— আমাদের একবার জিজ্ঞাসা করলি না পাগলি।

— মোমবাতি তোর গেল। তুই যে আঁধারে, সে আঁধারেই থাকবি।

বাহাদুরের সাথে মোমবাতির চলে যাওয়ার সংবাদ মায়া কলোনীর ঘরে ঘরে সকাল হতেই পৌঁছে গেছে। সমস্ত বাসিন্দা কয়েক কিস্তিতে ঝেন্তিকে গালমন্দ করেছে ক্ষোভে-দুঃখে-হতাশায়-সমবেদনায়।

মায়া মাসী সুটকেস খুলে নতুন জামা-প্যান্ট-শাড়ি, কয়েকশ' টাকা বার করতে করতে বলে — লোভ তোর সর্বনাশ করেছে হতভাগী।

চার বাচ্চা মা-কে ঘিরে থাকে অবাক বিহ্বলতায়। দালানে পা ছাড়িয়ে বোবা দৃষ্টি মেলে বসে থাকে ঝেন্তি। চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে থাকে অতি-ভোরের সেই সর্বনাশা দৃশ্যখানা। দীর্ঘশ্বাসে, চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায় সেই ছবি বারবার।

যখন সমস্ত মানুষের অভিযোগে মোমবাতিকে হারানোর কথা মানতে শুরু করেছে — তখনই ঝেন্তি ভাবে, লোভ না স্বপ্ন-সর্বনাশ তার কোন্ পথে এসেছে। নতুন সংসার সাজানোর স্বপ্নে বোকা-হাব্‌লা মেয়েটি নিজের সন্তানকে হারিয়ে অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া যেন আর তার কিছু করার নেই। সপ্তাখানিক সময়ও আর কেউ অপেক্ষা করতে চায় না।

একমাত্র ছেলে গোবিন্দ এত সবের মধ্যে হঠাৎ করে বলে ওঠে, — মা কাজে যাবা না?

ঝেন্তি উঠে দাঁড়ায়। ছেলেকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে। সব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ভেসে থাকার জন্যে কাজে তাকে যেতেই হবে।

কলোনীর চত্বর জুড়ে টোকা শ্যাওলার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলো দুলে ওঠে। ঝেন্তি উঠে দাঁড়িয়েছে, ঝেন্তি কি বলে — কি করে; দেখতে দেখতে পায়ে পায়ে মানুষগুলো এগিয়ে আসতে থাকে। নিস্তরঙ্গ জীবনে যেন এক দুরন্ত মজা লোটার সকাল। বুকের ভিতর খাঁ খাঁ শূন্যতা। চোখের জল শুকিয়ে খরভূমি। চার সন্তানকে আগ্‌লে ধরে আগুয়ান মানুষগুলোকে থামিয়ে দিতে ঝেন্তি ছুঁড়ে দেয় কিছু শ্লেষ মেশানো সংলাপ।

— বাপ মেয়েকে নে গেছে। কাটুক, বেচুক — তাতে তোমাদের এত পোড়ে কেন? সব ধান্দা বুঝি। সব শালা এক জাত। — মুহূর্তে অভিযোগকারীরা থম্‌কে দাঁড়ায়। মজা নিতে আসা মানুষগুলো বাক্যহারা হয়ে পড়ে। বোকা হাব্‌লা চরিত্রটির এমন তীব্র তীক্ষ্ণ বেমানান সংলাপে তারা বিস্মিত হয়।

লক্ষ হাজার শাখা-প্রশাখা ফুল-পাতা নিয়ে যাবতীয় ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করে, জীবন-জীউলি গাছটা যেমন স্থির প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে আছে বছরের পর বছর, সমস্ত শোক-তাপের ঊর্ধ্বে উঠে ঝেন্তি যেন সেই গাছ হয়ে ওঠে এখন। তার নীচে চারটি ছেলে-মেয়ে পরম নির্ভরতায় সেই মা-গাছকে ছুঁয়ে থাকে। ছুঁয়েই থাকে।

পাখির পায়ে আংটি

তীসা রায়

আহা কি রঙের বাহার! পিঠে-বুকে ঝকঝকে ধাতব সবুজ, বেগুনি আর টকটকে লাল। নিম্নভাগে হলুদ। নীলাভ বেগুনি কোমর। সারা শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন। আর কি অস্থিরতা পাতার আড়ালে আড়ালে। পার্পল-রাম্পড সানবার্ড। আরও দূরে পয়েন্ট ক্যালিমিয়র সংরক্ষিত অরণ্যের আকাশে ওই হাঁসের ঝাঁকটা কি বার-হেডেড্ গুজের? হ্যাঁ ঠিক ধরেছি।

শুনেছিলাম গত দু বছর ধরে একটা ঝাঁক এখানে শীত কাটাতে আসছে। শুরুটা ভালই হল ভেবে বাইনোকুলার নামাল শায়ক।

এবারে ঘরের বিপরীত দিককার জানালা খুলে বালাচন্দ্রন বলল, আর এদিকটায় যে দেখতে পাচ্ছ দিগন্তবিস্তৃত জলাভূমি তার নাম, 'দ্য গ্রেট ভেদারানিয়ম সোয়াপ'।

এই তাহলে সেই বিখ্যাত জলাভূমি — তিনশো পঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটার যার আয়তন ও লক্ষ লক্ষ পাখির আবাসস্থল। পাশেই সমুদ্র — পক প্রণালী — যার ওপারে শ্রীলঙ্কার জাফনা উপদ্বীপ। শায়ক বাইনোকুলার দিয়ে তাকাল। সকালের আলোয় ঝিকমিক জলাভূমির দূর আকাশে কিছু গাল্ ও টার্ন জাতীয় পাখিদের উড়তে দেখা গেল — কিন্তু দূরত্বের জন্য ঠিক চেনা গেল না। হিমালয়, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চিন, উত্তর ও মধ্য এশিয়া, সাইবেরিযা, পূর্ব ও উত্তর ইয়োরোপ — কত হাজার হাজার কিলোমিটার উড়ে এসেছে ওরা। ওই সব পাখিদের ধরে আংটি পরাবে সে, ভাবতেই দারুণ লাগে।

এই ঘরটা তোমার ও গৌতমের। পাশের ঘরে থাকছে প্রতাপ ও ধনঞ্জয়। নিচে একটাতে কার্নেলি চাকো ও ক্রিস, অন্যটাতে নাতাশা ও পাঙ্কা। খাওয়া দাওয়া নিচের ড্রয়িং-রুম-ডাইনিং রুমে। আমি পাশের একটা বাড়িতে থাকি তবে খাব তোমাদের সঙ্গেই। এখন সবাই 'মিস্ট নেট' সাইটে আছে। তুমি তৈরি হয়ে নাও, আধ ঘণ্টা পরে মোটর সাইকেলে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। বালাচন্দ্রন চলে গেল। ''বম্বে নেচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি আয়োজিত ''বার্ড রিংগিং''-এর উপরে যে প্রশিক্ষণ শিবিরে শায়ক যোগ দিতে এসেছে, এই মধ্যবয়স্ক ছোটখাটো চেহারার মানুষটি তার প্রশিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক।

তাড়াতাড়ি বাথরুম সেরে জিন্স-প্যান্ট, হালকা সবুজ রংয়ের টি শার্ট ও টুপি পরে নেয় শায়ক। জানুয়ারি মাস অথচ ঠাণ্ডার বালাই নেই। অবশ্য রাতে মাদ্রাজ থেকে বাসে ভেদারানিয়ম হয়ে এখানে আসার সময় জানলার ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। গলায় বাইনোকুলার ও ক্যামেরা ঝুলিয়ে সে বালাচন্দ্রনের জন্য অপেক্ষা করে। 'মিস্ট নেট', পাখিকে আংটি পরানো এসব কথায় তার আর দেরি সইছিল না। এমনিতে কলকাতা থেকে মাদ্রাজের টিকিট সময়মতো না পাওয়ায় তার দু দিন দেরি হয়ে গেছে।

প্রায় দু কিলোমিটার পাকা রাস্তা দিয়ে চলার পর (এই রাস্তা দিয়েই বাস এসেছিল) মিনিট তিনেক বনপথের মধ্য দিয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে ওরা গন্তব্যে পৌছাল। আসার

সময় শায়ক লক্ষ করল বাস রাস্তা ও সংলগ্ন ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের জঙ্গল, জলাভূমিকে ডানদিকের সংরক্ষিত বনভূমি থেকে আলাদা করেছে।

জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় জনা দশেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। সবার গলায় বাইনোকুলার, কারও কাছে ক্যামেরাও। বালাচন্দ্রন সবার সঙ্গে শায়ককে পরিচয় করিয়ে দিল। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আর. টি. চাকো এসেছেন ব্যাঙ্গালোর থেকে। ভি. গৌতমন, সমুদ্রতত্ত্ববিদ, যদিও পাশের থাঞ্জাভুর জেলার ছেলে, কাজ করে 'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ওসানোগ্রাফিতে' । বেশির ভাগ সময় ওর সমুদ্রমন্থন করে কাটে। ধনঞ্জয় মোহন ও প্রতাপ সিং দুজনেই ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস অফিসার। প্রথমজন নন্দাদেবী বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের ও দ্বিতীয় জন অরুণাচল প্রদেশের নামদাফা ন্যাশনাল পার্কের সহকারী অধিকর্তা। শেষ তিনজনের বয়স ত্রিশের মধ্যে। ক্রিস কাজমিয়ারাজাক, ব্রিটিশ নাগরিক, মধ্যবয়স্ক এবং স্থূলকায়। এছাড়া দুটি মেয়ে নাতাশা মাহত্রে ও পাক্ষা ক্ষাত্রী। দুজনেই বম্বে থেকে এসেছে। নাতাশা ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে বি. এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী. আর পাক্ষা ফাইন আর্টস নিয়ে পড়ছে। দুজনেই সুন্দরী ও অভিজাত। নাতাশার চোখ-মুখ ধারালো, মনে হয় বহির্মুখী প্রকৃতির। আর পাক্ষা ঠিক বিপরীত, চুপচাপ, অন্তর্মনা। শায়কের এখন সাতাশ বছর। সে একটি সরকারি সংস্থায় ইঞ্জিনিয়ার, ও ওয়াইল্ড-লাইফ ফটোগ্রাফার।

ডঃ বালাচন্দ্রনকে সাহায্য করার জন্য আছে আলাগর রাজন, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের যুবকই বলা যায়। এছাড়া চারজন শিকারি বা ফাঁদ পেতে পাখি ধরার লোক, পনীর সেলভ্যাম, শম্ভু, মুরুগ্গান ও শশী। প্রথম দুজন বনের পাখি ধরে বেড়ায়, শেষ দুজন জলের।

বালাচন্দ্রন জানাল কাছাকাছি চার জায়গায় 'মিস্ট নেট' পাতা আছে। আধ ঘণ্টা অন্তর দেখা হচ্ছে পাখি ধরা পড়ল কি না। কয়েক মিনিট পরেই পনীর হাতে করে একটি পাখি আনতে আনতে বলল, স্যার ইন্ডিয়ান পিত্তা।

সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ইন্ডিয়ান পিত্তা বা নওরং বাংলায় উত্তর ও মধ্যভারতে গ্রীষ্মকাল কাটায়, বাসা বাঁধে। আর শীতকালে চলে আসে দক্ষিণ ভারতে। প্রায় শালিখের আকারের রঙিন পাখি এটি। সবাই হাতে নিয়ে পাখিটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। সবশেষে নাতাশা শায়ককে দিতে গেলে শায়ক পাখিটার পায়ের উপরের দিকটা মুঠো করে ধরে নিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নাতাশা প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল, ওভাবে ধরো না, পাখিটার লাগবে। দেখো. আমি কীভাবে ধরে আছি।

বলার ধরনে স্বাভাবিকভাবে শায়কের রাগ হল। ও কখনও পাখি কীভাবে হাতে ধরতে হয় তার শিক্ষা পায়নি। বাকিরা দুদিন আগে আসায় পেয়ে গেছে। তবু আস্তে করে সামান্য প্রতিবাদের সুরে সে বলল. কিন্তু একটি পাখির বইতে আমি দেখেছি এইভাবে পায়ের ওপর দিকটা মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে। কেমন করে লাগবে এতে আমি তো বুঝতে পারছি না। বালাচন্দ্রন এগিয়ে এসে নাতাশার হাত থেকে পাখিটার পা দুটো গোড়া অবধি মুঠোর মধ্যে ধরে বলল, না না এভাবে ধরলে পাখির কোনও আঘাত লাগবে না। নাতাশার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

তবে নিরাপদে, ও আংটি পরাবার সময় কীভাবে ধরতে হয় দেখে নাও। তর্জনী ও মধ্যমা ঘাড়ের দুপাশে বাকি তিনটি আঙুল দিয়ে জড়িয়ে ধরে হাতের তালুতে চিত্ত করে রাখবে। খেয়াল রাখবে বুকের উপরে যেন চাপ না পড়ে। ছোট পাখিরা খুব সুকুমার প্রাণী। মারা যেতে পারে। এসো এটাকে আংটি পরানো যাক। শম্ভু, আংটির বাক্সটা নিয়ে এসো তো। আর থলে দুটোও নিয়ে এসো, দেখি আর কি পাখি ধরেছ।

সবাই বালাচন্দ্রনকে ঘিরে বসে পড়ল। বাক্স থেকে একটা সরু নাইলনের নল তুলে আনল বালাচন্দ্রন, যার গায়ে রূপালি রংয়ের আংটিগুলো লাগানো আছে। তারপরে শায়কের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল, দেখো, পাখির আকৃতি অনুযায়ী আংটির আকৃতি বেছে নেওয়া হয়। এখানে এক গ্রামের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওজন থেকে চার গ্রাম পর্যন্ত ওজনের আংটি আছে। সবচেয়ে ছোটটা পরানো হয় টিকেলস্ ফ্লাওয়ার পেকার জাতীয় পাখিদের, আর সবচেয়ে বড়টা ফ্লেমিংগোদের। এগুলো সুইডেন থেকে তৈরি করিয়ে আনা হয়।

নল থেকে একটা আংটি টেনে বার করে এনে শায়কের হাতে দিয়ে বালাচন্দ্রন বলে চলল, দেখ, এতে এ.বি., এবি ইত্যাদি অক্ষর দিয়ে আংটির আকার বোঝান হয়। এ ছাড়াও লেখা আছে একটা নম্বর ও ইনফর্ম বম্বে ন্যাট হিস্ট সক (ইনফর্ম বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি)। এবার 'সি' অক্ষরের মত এই আংটির ফাঁক দিয়ে পায়ে ঢুকিয়ে প্লাস দিয়ে আস্তে চেপে মুখটা বন্ধ করে দাও। ব্যস্ হয়ে গেল আংটি পরানো। এবার ডাটা নেবার পালা। নাতাশা ডাটা ফর্মটা ভরে নাও আমি বলে যাচ্ছি। আংটির আকার 'বি' নং ১২১৪৬৯, স্থান পয়েন্ট ক্যালিমিয়র, বাসভূমি বন, নাম পিত্তা ব্র্যাকিউরা, এরা স্ত্রী-পুরুষ একই রকম দেখতে সুতরাং ও ঘরটা খালি রেখে দাও। (ডানা ছড়িয়ে পরীক্ষা করে) পালক প্রাপ্ত বয়স্কের, ঝরতে শুরু করেনি। হ্যাঁ শায়ক, আরও দেখ এইসব পরিযায়ী পাখিরা তাদের শীতকালের আবাসস্থলে আসার পরে পুরনো পালক ঝরিয়ে নতুন পালক গজায়। আরো একটা ব্যাপার হল প্রজনন ঋতুতে ডিমে তা দেবার সুবিধার জন্য বুকের কিছুটা পালক ঝরিয়ে ফেলে — একে বলে 'ব্রুড প্যাচ'। এর উপস্থিতি, অনুপস্থিতি ও বিভিন্ন পর্যায়ে এদের প্রজনন অভ্যাস সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু জানিয়ে দেয়। এবার ডানা, ঠোঁট, পা এসবের মাপ নিতে হবে। গৌতম এগুলো তুমিই কর। (মাপ নেওয়া শেষ হলে) এবার ওজন কর। ওজনটা কেন গুরুত্বপূর্ণ জান শায়ক? প্রজনন শুরু হওয়ার আগে পাখিরা প্রচুর খেয়ে শরীরে যথেষ্ট চর্বি তৈরি করে নেয়, ফলে ওজনও বেশ বেড়ে যায়। দীর্ঘ পথ উড়ে আসার পর চর্বি শেষ হয়ে যায়, ওজনও কমে যায়। তাই ওজন দেখে বোঝা যায় এরা আরও দূরে যাবে, নাকি, এখানেই যাত্রা শেষ করবে। নাতাশা সব লিখে নিয়েছ তো? এবার উড়িয়ে দাও। কে ওড়াবে — পাঙ্কাকে দাও গৌতম, ওই-ই ওড়াক। তবে মনে রেখ রিং পরাবার আগে হাত থেকে কোন পাখি উড়ে গেল সবাইকে বিয়ার পান করাতে হবে।

এরপর মধ্য-এশিয়া ও ইয়োরোপ থেকে আসা চারটি 'ব্লাইদস্ রিড ওয়ার্বলার' ও দুটি স্থানীয় পাখি শ্বেত-ভ্রূ বুলবুলকে বালাচন্দ্রনের নির্দেশমতো আংটি পরাল সবাই মিলে। তারপর যেখানে 'মিস্ট নেট' পাতা আছে সেখানে গেল সবাই।

এই মিহি নাইলন সুতোর জাল জাপান থেকে আমদানি করা হয়। তা এই জালগুলো দুটো খুঁটির সাহায্যে জঙ্গলের মধ্যে সামান্য ফাঁকা জায়গায় গাছের খুব কাছাকাছি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। এত মিহি বলে ও পিছনে গাছ থাকার দরুন উড়ন্ত পাখিদের প্রায় চোখেই পড়ে না। ফলে জালে জড়িয়ে যায়। মিনিট কুড়ি অন্তর এসে দেখে যেতে হয় পাখি ধরা পড়ল কিনা। নইলে জাল থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে গিয়ে চোট খেতে পারে। নিচেব দিককার জালে ধরা পড়লে তো কুকাল জাতীয় পাখিরা বা বেজি এমন কি সাপেও খেয়ে ফেলতে পারে। খুব সকালে আর শেষ বিকেলের দিকেই সবচেয়ে বেশি পাখি ধরা পড়ে। বালাচন্দ্রন থামল।

এবার সবাই প্রাতরাশ-এর জন্য বাড়ির দিকে পা বাড়াল। যেতে যেতে কর্নেল, পাঙ্কা ও নাতাশাকে বনের পাখি চেনাচ্ছিলেন। পাঙ্কা পাখির জগতে নতুন প্রবেশ করেছে। কর্নেল অনেক যত্নে তাদের বিস্ময়কর জগতের সঙ্গে পাঙ্কাকে পরিচিত করাচ্ছিলেন। নাতাশা পুরানো

বার্ড-ওয়াচার, কর্নেল যা বলছিলেন তা সবই তার জানা, তবু সে ধৈর্য ধরে সব শুনছিল। ওদের ঠিক পিছনেই হাঁটছিল ধনঞ্জয় আর প্রতাপ। সবশেষে ক্রিস, বালাচন্দ্রন, গৌতম ও শায়ক। সবার চোখ পাখি খুঁজে বেড়াচ্ছে। কথাবার্তা যা কিছু সব পাখি, বন্য জীবজন্তু ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত। এর মধ্যে শিকারি দুজন মোটর সাইকেলে করে 'মিস্ট নেট' নিয়ে ফিরে গেল। ওরা আবার বাসাতে প্রাতরাশ নিয়ে আসবে।

হঠাৎ নাতাশা দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার দিয়ে কিছু একটা দেখতে লাগল। হাতের ইশারায় কর্নেল ও পাম্মাকে এগিয়ে যেতে বলে গাছের আড়ালে চলে গেল সে। শায়করা কাছাকাছি যেতে নাতাশা আস্তে করে ডাকল, বালা, (এখানে সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে, শুধু মেয়ে দুটো কর্নেলকে 'আংকল' বলে) ওইটা কি পাখি? ওই যে জলের উপরে ঝুলে-থাকা ডালটায় পাতার আড়ালে বসে আছে?

একটা ছোট ডোবার কিনারে দাঁড়িয়েছিল সে। বালাচন্দ্রন, ক্রিস, গৌতম ও শায়ক সবাই ধীরে একসঙ্গে এগিয়ে গেল দেখতে। শায়ক প্রথম দেখতে পেয়ে বলল, লিটল্ গ্রীন হেরন।

ক্রিস ও বালাচন্দ্রন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ লিটল্ গ্রীন হেরন। বালা আরও যোগ করল, ওরা খুব লাজুক পাখি। এরকম নির্জন আধা অন্ধকার জায়গা পেলে দিনের বেলা চলে, নইলে ভোরবেলা আর সন্ধ্যাবেলাই ওরা বেশি কর্মচঞ্চল। কথাটা বলে শায়ক ছাড়া বাকি সবাই আবার রাস্তা দিয়ে চলতে থাকল। শায়ক আরও একটু ভালো করে পাখিটাকে দেখার চেষ্টা করছিল। নাতাশাও দেখছিল। হাওযা তার শরীর থেকে একটা মিষ্টি মেয়েলি গন্ধ শায়ককে পৌঁছে দিচ্ছিল। মিনিট দুয়েক ওরা দুজন একা। জঙ্গলের মধ্যে ডোবার ধারে। শায়ক একটু নার্ভাস বোধ করছিল। মেয়েটি আবার ভাবছে না তো ওর সঙ্গ পাবার জন্য ও পাখি দেখার ভান করছে! বাইনোকুলার নামিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য যেই সে পা বাড়িয়েছে অমনি গাঢ় গম্ভীর স্বরে নাতাশা বলে উঠল, আমি কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি পাখিটার নাম। তারপর দ্রুত হেঁটে এগিয়ে গেল শায়ককে পিছনে রেখে।

অদ্ভুত তো মেয়েটা! ও কি তৈরি হয়েই ছিল আমি এলেই ছোট্ট মেয়ের মতো ঝগড়া করবে। শায়ক অবাক হয়ে ভাবল। তাছাড়া মেয়েটার কোনও রসবোধও নেই। এই চিরহরিৎ বন, চারিদিকে এত পাখি, চিতল ও কৃষ্ণসার হরিণ, বরাহ, অভিভাবকের শাসন থেকে দূরে, এসবের মাঝে কারও মনে ঝগড়া আসে? বৃথাই সাহিত্যের ছাত্রী, প্রকৃতিবিদ্, ওই রূপসী, দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী! হেসে কাঁধ ঝাঁকাল শায়ক। তারপর সবার শেষে একা পাখি খুঁজতে খুঁজতে চলল।

ক্ল্যাপ-ট্র্যাপ

দেড়টা নাগাদ দুপুরের খাওয়া শেষ করে একটু বিশ্রাম নিয়ে তিনটেয় সবাই জলাভূমির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। সেখানে 'ক্ল্যাপ-ট্র্যাপে' পাখি ধরা দেখানো হবে। এছাড়া বার্ড ওয়াচিং তো আছেই।

রাস্তার পাশের জলাভূমিগুলো এখন শুকনো। এবছর ভাল বৃষ্টি হয়নি।, বালাচন্দ্রন জানাল এই জলাভূমিতে নাকি হাজার হাজার ফ্লেমিংগো আসত। এ বছর শোনা যাচ্ছে তারা পুলিকট হ্রদে গেছে। লবণ তৈরির জন্য জল বেঁধে রাখার ফলে ও বৃষ্টির স্বল্পতার জন্য আশেপাশের অন্যান্য জলাভূমির জল অত্যন্ত লবণাক্ত হয়ে গেছে, ফলে ফ্লেমিংগোদের প্রধান খাদ্য জলের তলার জৈবিক মাটির (অর্গানিক উজ) গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। এটাও ওদের না আসার অন্যতম কারণ।

ভেদারানিয়ম জলাভূমি নিরবচ্ছিন্ন নয়, বরং বলা যায় অসংখ্য দু-তিন বর্গ কিলোমিটার আয়তনের অগভীর পুকুরের সমষ্টি। হাজার হাজার জলচর পাখি সেখানে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। সবাই বাইনোকুলার বা কখনও ক্রিসের দূরবীন দিয়ে পাখী দেখতে দেখতে 'ক্ল্যাপ-ট্র্যাপ' পাতার উপযুক্ত জায়গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। জায়গাটা দু-কিলোমিটার দূরে। জলাভূমির মধ্য দিয়ে টেলিফোনের তার চলে গেছে। একটু দূরে সেই তারের উপরে বসে থাকা কয়েকটি সোয়ালো জাতীয় পাখিকে ভাল করে চিনবার জন্য শায়ক একটু থামল। নাতাশা ওর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার সময় বলে গেল, কমন্ সোয়ালো।

শায়ক মুখ ঘুরিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

নাতাশা না-শোনার ভান করে যথারীতি পাঙ্কা ও কর্নেলের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। কর্নেল পাঙ্কাকে পাখি-সংক্রান্ত নানান কথা বলেই যাচ্ছেন। তিনি পাঙ্কার অভিভাবকও। কারণ পাঙ্কার বাবা কর্নেলের বন্ধু। পাঙ্কাকে তিনিই বম্বে থেকে ব্যাঙ্গালোর হয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন। নাতাশা বোম্বাই থেকে প্লেনে মাদ্রাজ এসেছে। সেখান থেকে তার বাবার একজন স্থানীয় সহকর্মী একজন এসকর্ট দিয়ে বাসে করে পয়েন্ট ক্যালিমিয়রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মাদ্রাজ থেকে এখানকার দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমিটার।

উপযুক্ত স্থানে পৌঁছে মুরুগ্গান ও শশী 'ক্ল্যাপ-ট্র্যাপ' পাততে লেগে গেল। পাঁচ ফুট লম্বা দু ফুট চওড়া একটি জাল দুটো লাঠির মাঝখানে বাঁধা। এরকম দুটি জাল সমান্তরালভাবে অল্প জলে চার ফুট দূরত্বে খাড়া করে বসিয়ে দেওয়া হয়। মাঝখানে রাখা হয় কয়েকটি মাটির তৈরি পাখি। জাল দুটিকে একটি তারের সাহায্যে বেঁধে প্রায় ত্রিশ ফুট দূরত্বে একজন শিকারি ধরে অপেক্ষা করে। উড়ন্ত পাখিরা (সাধারণত বাটাং জাতীয়) মাটির নকল পাখিদের দেখে দুই জালের মাঝখানে নামলেই শিকারি তার ধরে টান মারে ও জাল দিয়ে পাখিদের ঢেকে ফেলে।

চল্লিশ ফুটের মত দূরে জুতো খুলে সবাই কাদা-বালির মধ্য দিয়ে হেঁটে জলের কিনারে গেছে 'ক্ল্যাপ-ট্র্যাপ' পাতা দেখতে। শায়ক একটু দেরিতে জুতো খুলে, প্যান্ট গুটিয়ে জলের দিকে হাঁটতে শুরু করল একটু ঘুর পথ দিয়ে। কিছুটা যাবার পরই নাতাশার চিৎকার শোনা গেল, ওদিক দিয়ে এসো না শায়ক, চোরাবালি থাকতে পারে! শায়ক! এদিক দিয়ে ঘুরে এসো!

আবার কৃতিত্ব ফলাতে শুরু করেছে ভেবে শায়কের গা জ্বলে গেল। ইচ্ছে হল সোজা চোরাবালির মধ্যে হেঁটে গিয়ে ডুবে যেতে। শুধুমাত্র ওকে উপেক্ষা করার জন্য। কিন্তু নাতাশা বালাচন্দ্রনের কথা আউড়ে যাচ্ছে মনে করে শায়ক ফিরে গিয়ে ওদের রাস্তাই ধরল।

'ক্ল্যাপ-ট্র্যাপ' পাতা হলে সবাই এদিক-ওদিক ছড়িয়ে বার্ড-ওয়াচিং শুরু করল। কোন পাখি চিনতে কারও অসুবিধা হলে বালাচন্দ্রন, ক্রিস বা আলাগর সাহায্য করছে। ক্রিসের দূরবীনটা থাকায় সবার খুব উপকার হয়েছে।

শায়ক খুব মন দিয়ে কারলিউ ও হুইমব্রেলের পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করছিল। বেশ কিছুটা দূরে দুটি পাখি একসঙ্গে চরছিল। হঠাৎ সেখানে উত্তর-পূর্ব ইওরোপ ও সাইবেরিয়া থেকে আসা প্রায় হাজার খানেক লিটল্ স্টিন্টের একটি ঝাঁক উড়ে এল। তাদের ডানার ভিতর দিককার সাদা অংশে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল একটা বিরাট রুপোর থালা। শায়কের মুখ দিয়ে তার অজান্তেই বেরিয়ে এল ওয়ান্ডারফুল।

চিৎকার না করে চুপচাপ দেখতে পারছ না। নাতাশা ধমকের সুরে পিছন থেকে বলে উঠল।

এত কাছে ওর উপস্থিতি সম্বন্ধে শায়ক সচেতন ছিল না। মাথাটা দপ করে জ্বলে উঠল। ইচ্ছে হল ঘুরেই একটা চড় বসিয়ে দেয় গালে। কিন্তু মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে রাগটা সামলে

নিল। তারপর আস্তে আস্তে পিছন ফিরে নাতাশার চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, তোমার তাতে কী?

তুমি অন্যদের অসুবিধা করছ। একই রকম ধমকের সুরে বলল নাতাশা। ঝগড়া করার জন্যে ও প্রস্তুত। ওদের কথা শুনতে পাবার মতো দূরত্বে আর কেউ নেইও। নাতাশা যেন ঝগড়া করার জন্যই শায়ককে একলা দেখে চলে এসেছে।

আমি এমন কিছু জোরে বলিনি যে কারও কানে গিয়ে অসুবিধে সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া তুমি আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছ তাও আমি জানতাম না। কথাটা বলে শায়ক দূরে সরে গেল। ঝগড়া করে একটা দৃশ্যের অবতারণা করার ইচ্ছে তার ছিল না। অদূরেই সমুদ্র। তীরে ঢেউ ভাঙার শব্দ। এখানে সব কিছুই এত সুন্দর। কিন্তু মেয়েটা যেন ওর সব আনন্দ মাটি করে দিতে এসেছে। অথচ আরও অনেকেই তো আছে! সবাই কত বন্ধুর মতন। নাতাশাও অন্য সবার সঙ্গে কত সহজভাবে মিশছে। কিন্তু ওর ওপর এত বিরূপ হবার কারণ সে খুঁজে পেল না। কত যত্ন করে সে ওকে এড়িয়ে চলছে। ইচ্ছে করে একবার ওর দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। যদিও নাতাশা চোখ টানার মতোই সুন্দরী।

হঠাৎ খট করে শব্দ হল। শায়ক পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল শশী 'ক্ল্যাপ-ট্র্যাপের' তারে টান মেরে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে। জালে ঢাকা পড়েছে বেশ কিছু 'লিটল্ স্টিন্ট'। সবাই হই হই করে ছুটে গেল। মুরুগ্নান জাল থেকে বার করে সবার হাতে একটা করে পাখি ধরিয়ে দিল।

মনটা খুশিতে ভরে গেল শায়কের। হাতের পাখিটা সাইবেরিযা বা উত্তর-পূর্ব ইয়োরোপ থেকে এসেছে ভাবতেই শিহরন জাগে। নাতাশা ওকে এবং হাতের পাখিটাকে মাঝে মাঝে লক্ষ করছে দেখে শায়ক পাখিটা হাতে ঠিকমতো ধরা হয়েছে কি না দেখে নিল।

আংটি পরাবার যন্ত্রপাতি ও আংটি সঙ্গেই ছিল। ওখানে দাঁড়িয়েই সবকটা পাখিকে আংটি পরানো হল। বালাচন্দ্রন বলল, জলচর পাখিদের পায়ের ওপরের অংশে আংটি পরানো হয়। বনচর পাখিদের মতো নিচের অংশে পরালে নোনা জলের সংস্পর্শে ক্ষয়ে যেতে পারে।

পয়েন্ট ক্যালিমিয়রে পরানো আংটি অন্য কোন জায়গা থেকে উদ্ধার হয়েছে? পাঙ্কা প্রশ্ন করে বালাচন্দ্রনকে।

হয়েছে বইকি! রাশিয়া, চিন, মঙ্গোলিয়া, ইরান দেশে এখানে পরানো আংটি উদ্ধার হয়েছে। এ থেকে আমরা এইসব পাখিদের প্রজনন স্থান, প্রজনন পথ, আয়ু এসব যেমন জানতে পারি, তেমনি জানতে পারি পুরুষ পাখিরা স্ত্রী পাখিদের আগে প্রজনন শুরু করে কিনা, আবার শীতের শেষে প্রজনন ঋতুতে প্রথমে তারাই আবার প্রজনন স্থানে ফিরে যায় কিনা। কারণ প্রজনন সফল করতে হলে ও সঙ্গিনী জোটাতে হলে একটা ভাল এলাকা দখল করা জরুরি।

পক প্রণালীতে জোয়ার

পোঙ্গল উৎসবের আর কয়েকদিন মোটে বাকি। চারিদিকে উৎসবের আমেজ। অনেক বাড়িতে সব সময় জোরালো আওয়াজে গান বেজেই চলছে। আসন্ন উৎসবের আহ্বান হচ্ছে। প্রতিদিন সকালে উঠোন ধুয়ে মুছে নতুন আলপনা আঁকছে প্রতিটি বাড়ির মেয়েরা। পাখির

পায়ে যারা আংটি পরাতে এসেছে তাদেরও যেন উৎসবের আমেজে পেয়েছে। স্থানীয় একটি ক্লাব তিন দিন রাতে সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা করেছে। এম. জি. রামচন্দ্রনের ছবি।

রাতে খাওয়ার ফাঁকে গৌতম একসময় পাল্কাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি 'কন্যা' রাশি?

পাল্কা ভীষণ অবাক হয়ে বলে, হ্যাঁ, কি করে জানলে?

সেটা বলতে পারব না। গৌতম বিজয়ীর হাসি হাসল।

গৌতম তাহলে কোষ্ঠীবিচারও করতে পারে! আধা ঠাট্টার সুরে ধনঞ্জয় বলল।

আরও অনেক কিছুই পারি।

যেমন? প্রতাপ যোগ দেয়।

সেটা ক্রমশপ্রকাশ্য।

গৌতম পাল্কাকে ইম্প্রেস করার চেষ্টা করছে দেখে ভাল লাগল শায়কের। মনে মনে হাসল সে। এমন রোমান্টিক পরিবেশে এটাই তো স্বাভাবিক। পাল্কা খুব ভাল মেয়ে। নাতাশার মতো রূঢ় নয় যে কথা বলতেই ভয় করবে।

খাওয়ার শেষে সবার উৎসাহে গৌতম সবার হস্তরেখা বিচার করতে বসল। শায়কের এসবে কোনই আগ্রহ নেই। সে অদূরে সমুদ্রতীরের দিকে হেঁটে গেল একটু পায়চারি করতে। নাতাশা আড়চোখে ওর বেরিয়ে যাওয়া লক্ষ কবল। একটু হতাশ মনে হল তাকে।

চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে সমুদ্র। পক প্রণালীতে এখন জোয়ার। অনেক দূরে দূরে জেলে নৌকার আলো দেখা যাচ্ছে। জোবালো মনোরম বাতাসে শায়কের গায়ের পোশাক উড়ছে পতপত করে। গাল্ পাখিগুলো, যাবা সারাদিন সমুদ্রে খাবার খোঁজে. তারা এখন কোথায় বিশ্রাম করছে? তীরের কোনও পাথরের উপরে, নাকি ঢেউয়ের মাথায়, ঠোঁট পাখনায় গোঁজা, চোখে ঘুম ঢেউয়ের দোলায়। শায়ক ভাবল। এখানে দাঁড়ালে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। নাতাশাকে ভারি সুন্দর দেখতে। অন্যদের সঙ্গে সে যখন কথা বলে তখন তাব নিখুঁত ম্যানার্স, বলার ভঙ্গিমা, শব্দচয়ন, সব দেখে মুগ্ধ হবার মতো। কিন্তু শায়কের বেলা যেন সব ভুলে যায়। শায়ক কারণ খুঁজে পায় না। বাসায় ফিরে দেখল নাতাশা ডাইনিং টেবিলে বসে একটা বই পডছে — একা। আর সবাই বোধহয় ঘুমোতে গিয়েছে। নাতাশা চোখ তুলে শায়ককে দেখল। কিন্তু শায়ক কোন কথা না বলে উপবে চলে গেল।

পাল্কার দলত্যাগ ও শঙ্খচিলের নখ

পরের দিন থেকে পাল্কা ও সমুদ্রতত্ত্ববিদ্ গৌতম খুব বন্ধু হয়ে গেল। সকালে পুরনো ফবেস্ট বাংলোতে যাবার সময় (পুবো এক ঘণ্টা) ওরা খুব গল্প করতে করতে হাঁটল। পাল্কার এত কথা বলা, মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসা, চোখে পড়ার মতো। কত দ্রুত বদলেছে ও। যখন কর্নেলের সঙ্গে চলত, তখন ও এত কম কথা বলত যে সবাই ভেবেছিল পাল্কা বুঝি স্বল্পভাষী।

কর্নেলকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছিল। যদিও তিনি সেটা ঢাকার চেষ্টা করছিলেন। নাতাশা পুরনো বার্ড-ওয়াচার বলে কর্নেল দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। বৃদ্ধ হয়ত একটু বেশি কথা বলছিলেন যা পাল্কাকে বিরক্ত করে তুলছিল। ফলে এই 'বিদ্রোহ'। শায়ক ভাবল।

নাতাশাকেও একটু উদাস উদাস লাগছিল। কর্নেলের সঙ্গে সে হাঁটছিল ঠিকই কিন্তু কথা হাচ্ছল খুবই কম। পাল্কার 'দলত্যাগের' প্রভাব পড়েছে।

পুরনো ফরেস্ট বাংলো চত্বরে অনেকগুলো বিশ-পঁচিশ ফুট লম্বা গাছ। এই সব গাছে শঙ্খচিলেরা বিশ্রাম নেয়। এখন শঙ্খচিল ধরে আংটি পরানো হবে। কুড়ি ফুট লম্বা চার ফুট চওড়া দুটো জাল মাটির উপরে গাছের গায়ে বাঁধা হল। তারপর গাছে বিশ্রামরত শঙ্খচিলদের বালাচন্দ্রন আর পনীর তাড়াতে লাগল। হঠাৎ তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে আটটা শঙ্খচিল একসঙ্গে জালে আটকে গেল। তাড়াতাড়ি জালে ধরে না ফেললে আবার ওরা পালিয়ে যায়। কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে ধরতে হয়, নইলে ওদের ধারালো নখ অত্যন্ত ভয়ের। শায়কের ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটল। ও দু হাতে দুটো পাখিকে চেপে ধরতে গিয়েছিল নইলে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাড়াহুড়োয় যথেষ্ট সাবধান হয়নি। একটা শঙ্খচিল তার এক পায়ের বাঁকা নখরগুলো ডুবিয়ে দিল শায়কের বাঁ হাতের তালুতে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল সে। সবাই ছুটে এল। বালাচন্দ্রন ও পনীর শরীরের সব শক্তি দিয়ে টেনে একটা একটা করে নখগুলো বার করল। পাখিটা উদাসীনভাবে তাকিয়ে থাকে।

সবাই শায়কের রক্তাক্ত হাত দেখে সমবেদনা জানায়। পাঙ্কা তো কাঁদো কাঁদো। হাতের তালুতে হাত রেখে সহজভাবে জিজ্ঞেস করল, এখনও যন্ত্রণা করছে?

হ্যাঁ, অল্প অল্প।

শঙ্খচিলটা খুব শয়তান. তাই না?

কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু হাসল শায়ক। পাঙ্কার মনটা বড় নরম।

সবাই শায়কের কাছ থেকে সরে গেলে নাতাশা এল। ওর সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাতটা ভাল করে দেখল। পরনে নীল জিন্‌সের প্যান্ট আর হাল্কা নীল রংয়ের টি শার্ট। মাথায় বারান্দাওয়ালা টুপি। শায়কের বুকের দপদপানি বেড়ে গেল। মুখে জোর করে একটু হাসি টেনে এনে নাতাশার চোখের দিকে তাকাল।

নাতাশা চোখে চোখ না মিলিয়ে বলে গেল, দ্য প্রাইস অব কেয়ারলেসনেস। ডোন্ট ট্রাই টু অ্যাক্ট ভেরি স্মার্ট। কথাটা বলেই পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল।

আই ডোন্ট ওয়েলকাম আনসলিসিটেড অ্যাডভাইস। চটপট শুনিয়ে দেয় শায়ক।

নাতাশা একবার কয়েক সেকেন্ডের জন্য পিছন ফিরে শায়কেব চোখেব দিকে তাকালো। শায়ক বুঝল না সে তাকানোর অর্থ। তবে ওব মনে হল নাতাশার কথাগুলো মোটেই ভর্ৎসনার মতো শোনায়নি। তাড়াহুড়ো করে ওভাবে কথা শোনানো উচিত হয়নি তার। আংটি পরাবার সময় পাঙ্কার হাত থেকে একটা শঙ্খচিল পালাল। সঙ্গে সঙ্গে শর্তমতো সবাইকে বিয়ার পান করাবার জরিমানা হল তার।

হ্যামলিননের বাঁশিওয়ালা

দুপুরে খেতে খেতে ক্রিস জানাল, আজ ওর জন্মদিন। তাই রাতে এক বিশেষ পানাহার ও স্পনসর করবে।

বালাচন্দ্রনই ক্রিসের হয়ে সব আয়োজন করল। ক্রিসের কাছে দুটো বিদেশি স্কচের বোতল ছিল। এর সঙ্গে আরও একটি দিশি হুইস্কি ও কয়েকটি বিয়ার বোতল যোগ করা হল, ভেদ্দারানিয়ম থেকে আনিয়ে। পাঙ্কা ও নাতাশার জন্য থাকল অনেকগুলো সফট ড্রিঙ্কস।

সন্ধ্যাবেলা প্রথাগত অভিনন্দনের পালা শেষ করে "হ্যাপি বার্থ ডে টু য়্যু" গাইল সবাই। মোমবাতি জ্বালানো, নেবানো হল, কেক কাটা হল। ক্রিস বুঝতেই পারছে না সে নরফোকের বাইরে আছে।

আহারপূর্ব স্বাস্থ্যপানের আসরে এক এক করে ধনঞ্জয় ও প্রতাপ হিন্দি গান গাইল। গৌতম গাইল রড স্টুয়ার্টের একটি জনপ্রিয় গান ও সবশেষে ইংরেজি ভাবানুবাদ সমেত রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল শায়ক। পাঙ্কা ও নাতাশা অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুই গাইল না। বলল ওরা গাইতে পারে না।

তুমি কি এই প্রথম ভারতে এলে? শায়ক ক্রিসকে জিজ্ঞেস করে।

না। বলতে গেলে গত বার বছর ধরে প্রতি বছর সাত মাস আমার প্রাচ্যে কাটছে, যার বেশির ভাগটা ভারতে।

বাকি পাঁচ মাস কি কর?

এপ্রিল থেকে অগাস্ট অবধি ইয়োরোপে ট্যুরিস্ট গাইড হিসাবে কাজ করি।

তারপর পরিযায়ী পাখিদের সঙ্গে তুমিও দক্ষিণ গোলার্ধে চলে আস?

ঠিক তাই। ক্রিস হাসল। সেদিক থেকে ওদের আসার সঙ্গে আমার আসার মিল আছে। শীতকালের খারাপ আবহাওয়ায় যেমন পাখিরা খাবার জোগাড় করতে পারে না বলে দক্ষিণে চলে আসে, তেমনি আমার ভ্রমণ ব্যবসায়েও মন্দা দেখা দেয়। তাই এখানে চলে আসি। ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ এবং সব কিছুই সুন্দর আর খুব সস্তাও বটে। ব্রিটেনে বাড়ি ভাড়া করে বাঁচার যা খরচ তার চেয়ে অনেক কম খরচে এখানে থাকতে পারি। তারপর আবার বসন্ত শুরু হলে পাখিদের সঙ্গে আমিও ফিরে যাই।

কী জীবন! পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হল, ঘর-সংসার নেই, পাখিদের পিছু-পিছু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য করে বেড়াচ্ছে। শায়ক ভেবে অবাক হয়।

তুমি বিয়ে করেছ শায়ক? ধনঞ্জয় জিজ্ঞেস করে।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে শায়ক রহস্যময় হাসল। তারপর গ্লাসটা ধীরে তুলে নিয়ে আস্তে করে একটা চুমুক দেয়। ওর উত্তর না পেয়ে সবাই ওর দিকে তাকালো। নাতাশা সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়েও থেমে গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকল শায়কের উত্তরের অপেক্ষায়।

না। তুমি করেছ?

নাতাশা গ্লাসে চুমুক লাগায়।

না করে উপায় কি! জঙ্গলে থাকি বউ না হলে বাঁচব কেমন করে। কী বল প্রতাপ?

প্রতাপ সম্মতির হাসি হাসল। তারপর বলল, তবে আমার খুব ইচ্ছে ছিল একটি বাঙালি মেয়ে বিয়ে করার।

আমারও। ধনঞ্জয় সায় দেয়। আমাকে বাঙালির মতো দেখতে না? দিল্লিতে আমাকে অনেকে 'বাঙালিবাবু' বলত। খানিকটা গর্বের সঙ্গেই বলল ধনঞ্জয়।

কিন্তু বাঙালি মেয়েদের এত পছন্দ কেন? শায়ক হেসে প্রশ্ন করে।

বাঙালি মেয়েরা খুব সুন্দরী হয়। মানে খুব লাবণ্যময়ী। ওদের মূল্যবোধ বেশ উঁচু, আর কালচারালি দারুণ অ্যাকটিভ।

শায়কের মনে পড়ল ও যখন বোম্বাইতে ওদের সংস্থার ট্রেনিংসেন্টারে ট্রেনিং-এ ছিল তখনও এরকম ডিনার টেবিলে ভিন রাজ্যের ছেলেদের মুখে বাঙালি মেয়েদের সম্বন্ধে গুণগান শুনেছে।

শায়ক হঠাৎ লক্ষ করল নাতাশা ও পাঙ্কার মুখ গম্ভীর। চলমান আলোচনায় যোগ না দিয়ে তারা একদৃষ্টে নিজেদের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের সামনে বাঙালি মেয়েদের প্রশংসা তারা ভালভাবে নিচ্ছিল .

এই পক্ষপাতিত্বের সত্যিই কোন ভিত্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। মারাঠি, গুজরাটির মতো অন্যান্য সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যেও ওইসব গুণ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। শায়ক হেসে যোগ করে। কিন্তু বলার মধ্যে যেন আন্তরিকতার অভাব ছিল। তার কারণও ছিল।

'মারাঠি' নয় 'মাহারাষ্ট্রীয়'। 'মারাঠি' ভাষা 'মাহারাষ্ট্রীয়' সম্প্রদায়। ধমকে শুধরে দিয়ে রাগী চোখে তাকায় নাতাশা শায়কের দিকে।

থুড়ি, মহারাষ্ট্রীয়।

'মহারাষ্ট্রীয়' নয় 'মাহারাষ্ট্রীয়'।

ওহ্, দুঃখিত। মহারাষ্ট্রীয়। শায়ক ইচ্ছা করেই 'মাহা' না বলে 'মহা'ই উচ্চারণ করে। পেটে মদ কাজ করতে শুরু করেছে।

নাতাশা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এক্সকিউজ মী। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা না বলে নীরবে গান করে যেতে লাগল। নাতাশা চলে যাওয়ায় শায়কের মনে একটু অপরাধবোধ জাগল। সবাই হয়ত মনে মনে ওকে দুষছে। তবে ওর কথা বলার ধরনও নিশ্চই সবাই লক্ষ করেছে।

হঠাৎ নাতাশার ঘর থেকে সিন্থেসাইজারের পিয়ানোয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ভেসে এল, 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে'। মদের নেশা সত্ত্বেও সবাই সচকিত হয়ে উঠল। বাইরে সত্যিই জ্যোৎস্না। বনে যাবার কথাও ছিল। কিন্তু ক্রিসের জন্মদিন বলে বাতিল হয়েছে। শায়ক খুব চমকে উঠেছে। ও কি সত্যিই শুনছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর মারাঠা মেয়ে নাতাশা বাজাচ্ছে? নাকি মদের নেশায় অলীক কল্পনা! এ তো নেশার উপরে নেশা। গ্লাসে আরও ঘন ঘন চুমুক দিতে লাগল শায়ক। নাতাশা এবার বাজাচ্ছে? 'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল্'। প্রতাপ তার সঙ্গে গলা মেলাল হিন্দিতে কিশোরকুমারের গাওয়া 'রাহি মতবালে' দিয়ে, যা ওই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে গাওয়া। প্রতাপ কি তা জানে। শায়ক ভাবল। সে গলা মেলাতে গিয়েও সামলে নিল। কারণ ওর মনে পড়ে গেল মদ খেয়ে গাইতে গেলে ওর কথা জড়িয়ে যায়। যদিও এখন সেটা খুব অপরাধের হত না।

নাতাশা এবার রবীন্দ্রসঙ্গীত ছেড়ে সিন্থেসাইজারের বাঁশিতে কোন পশ্চিমী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজাতে লাগল। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে। নাতাশা বাঁশি বাজাতে বাজাতে হেঁটে চলেছে কোন রূপকথার রাজপুরীর রাজপথ দিয়ে। নির্জন রাজপথ। দুপাশে সুদৃশ্য হর্ম্যরাজি কোন যাদুমন্ত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাজকন্যা, রূপসী, দীর্ঘাঙ্গী, রাজকন্যা নাতাশা, শুভ্র শেমিজে ঢাকা শরীর, খোলা চুল বাতাসে উড়ছে। নাতাশা বাঁশি বাজিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। পিছনে সম্মোহিতের মতো হাঁটছে সেই নির্জন রাজপথ দিয়ে শায়ক। ওকে বাঁশিতে ডেকেছে নাতাশা — নাকি হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। ওকে কোথায় নিয়ে চলেছে? হঠাৎ মনে হল, সে ডুবে যাচ্ছে কোনো অতল মহাসাগরে — ডুবছে — ডুবছে। ভীষণ গতিতে তলিয়ে যাচ্ছে সে।

শায়ক, ডিনার দেওয়া হয়েছে। ক্রিস কাঁধে মৃদু টোকা দিয়ে বলল। শায়ক ভারী চোখের পাতা তুলে দেখল সবাই খাওয়া শুরু করার জন্য প্রস্তুত। নাতাশা পোশাক বদলে নকশা করা ঘিয়ে রংয়ের শালোয়ার-কামিজ পরে এসেছে। বাজানো শেষ করে ও সাজছিল নাকি? সবাই ওর অসাধারণ বাজনার খুব প্রশংসা করল। প্রায় ঘুমোতে ঘুমোতে খাচ্ছিল শায়ক। কি খাচ্ছে কে জানে! খণ্ড খণ্ড দু একটা কথা কানে আসছিল কিন্তু মনে থাকছিল না। একটু পরে খাওয়া অসমাপ্ত রেখে এবং অন্যদের অনুমতি না নিয়ে ডিনার টেবিল থেকে উঠে এসে মুখ ধুয়ে নিল সে। তারপর প্রাণপণে নিজেকে সোজা রাখার চেষ্টা করে সিঁড়ির রেলিং ধরে

উপরে চলে গেল। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থেকে বমনেচ্ছা দমন করবার চেষ্টা চালাল। কিন্তু বেশীক্ষণ পারল না আটকাতে। বাথরুমে গিয়ে হালকা হল। তারপর বেশি পান করার জন্য নিজেকে শাপান্ত করে ঘণ্টা তিনেক ঘুমোল সে। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার পিছনে ছুটছে সে বাঁশি শুনছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। বাঁশিওয়ালা, তুমি কোথায় গেলে? ঘণ্টা তিনেক পরে আবার বমি করল সে — বাথরুমের দরজা বন্ধ করে, যথা-সম্ভব কম শব্দ করে। কিন্তু গৌতমের বিছানা খালি কেন? কিছুক্ষণ পরে মনে পড়ল গৌতম বলছিল সে আর পাপ্পা এম. জি. রামচন্দ্রনের ছবি দেখতে যাবে স্থানীয় ক্লাবে। রাত নটা থেকে দুখানা ছবি পর পর দেখানো হবে। তা গৌতম-পাপ্পা কি সত্যি সত্যি সিনেমা দেখতে গেছে — নাকি এই মরা চাঁদের আলোয় সমুদ্রতীরে বসে আছে? জলাভূমির মধ্যকার রাস্তা দিয়ে ওরা দিগন্তের দিকেও হেঁটে যেতে পারে। নাতাশা ঘরে একা ঘুমোচ্ছে — ঘুমোচ্ছে তো? শায়কের আর ঘুম এলো না। সারা শরীরে প্রচণ্ড অস্বস্তি। মদের কথা মনে এলেই গা গুলোচ্ছে। গৌতম ভোরের দিকে ফিরে খুব ঘুমোচ্ছে। সকালের দিকে আরও দুবার বমি হল। এবার নাতাশা ও পাপ্পা ছাড়া সবাই দেখতে এল। ক্রিস প্রথমেই শায়ককে প্রচুর জল খাওয়ালো। তারপর কিছুটা উপ্‌মা এনে জোর করে খাইয়ে ঠাণ্ডা জলে স্নান করালো। এরপর পায়চারি করার জন্য ঠেলে বাইরে বের করে দিল। ওর মোটেই হাঁটতে ইচ্ছে করছিল না, অথচ বিছানায় শুয়ে থাকাও কষ্টকর।

আধঘণ্টা পরে ঘরে ফিরে এল শায়ক। সবাই 'মিস্ট নেটে' ধরা পড়া পাখিদের আংটি পরাতে গেছে। গৌতম বিছানায় অকাতরে ঘুমোচ্ছে, সম্ভবত পাপ্পাও। শায়ক প্রতিজ্ঞা করল আর কোনোদিন মদ ছোঁবে না। ছি ছি কী কেলেঙ্কারী! সবাই কী ভাবছে। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা নিশ্চয়ই খুশি। প্রতিশোধটা বেশ ভালই নিয়েছে। উপরে ওর না আসাটা লক্ষণীয়। কিন্তু ও এত ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বাজাল কেমন করে। ওই গান দুটো অবশ্য হিন্দিতেও আছে — কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে ওর আগ্রহ জন্মালো কী করে? ও কি জানে এগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীত? না জানলে বেছে বেছে ওই দুটো গানই বাজাতো না।

ফাঁদে বদ্ধ সোনাজঙ্ঘা

বিকেলে মুনিয়াপ্পান লেকে ফাঁস পেতে পাখি ধরার কৌশল শিখতে এল সবাই। রাস্তার পাশেই ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদে ঘেরা এই লেকে প্রচুর হাঁস জাতীয় পরিযায়ী পাখি শীত কাটাতে আসে। এছাড়াও আছে সোনাজঙ্ঘা, পেলিকান, কখনও ফ্লেমিংগো, ব্ল্যাক-উইংগড্ স্টিল্ট ইত্যাদি পাখিরা। মিনিট কুড়ি তীর বরাবর হেঁটে ফাঁস পাতবার উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেল। তীরের কাছেই অগভীর জলে ছোট ছোট ঘাস। তার সঙ্গে মিশিয়ে ফাঁস পাতা হল। এরপর সবাই রাস্তায় ফিরে এল। শুধু শিকারি দুজন কাছাকাছি লুকিয়ে থাকল পাখি ধরা পড়লে ছাড়িয়ে আনার জন্য।

বাস রাস্তার উপরে সবাই অপেক্ষা করছিল সন্ধের মধ্যে যদি কোনো পাখি ধরা পড়ে সেই আশায়। শিকারিরা অবশ্য আরও একটু রাত অবধি থাকবে। পাখি ধরা পড়লে বাসায় নিয়ে যাবে, সেখানেই আংটি পরানো হবে।

হঠাৎ প্রতাপ পাপ্পার জরিমানার কথা তুলল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, শায়ক ও নাতাশা ছাড়া সবাই ভেদারানিয়মে বিয়ার পান করতে যাবে ঠিক করে নিল। পয়েন্ট ক্যালিমিয়রে মদ বিক্রি হয় না।

তাহলে নাতাশাকে তুমি বাসাতে নিয়ে যেও শায়ক। কর্নেল পয়েন্ট ক্যালিমিয়র থেকে আসা ভেদারানিয়মগামী একটি বাসে অন্য সবার সঙ্গে উঠতে উঠতে বললেন।

তুমি গেলে না কেন? বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ত চাওয়ার সুরে নাতাশার প্রশ্ন।

কারণ আমার হ্যাঙওভারের ভয় আছে। শুরু করলে অনেকটা পান করে ফেলি, যার অনিবার্য ফল হয় হ্যাঙওভার। শায়ক সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে। যখনই বুঝেছে ও আর নাতাশা এই সন্ধ্যেবেলা জঙ্গলের মধ্যে লেকের পাশে একলা থাকছে, তখন থেকেই ও অস্বস্তিতে ভুগছে। মেয়েটার যা স্বভাব আবার ভেবে না বসে তার সঙ্গ পাবার জন্যই সে থেকে গেছে। সন্ধে হয়ে গেল, শায়ক গেলে নাতাশাকেও যেতে হত — নইলে শিকারিদের সঙ্গে লেকের ধারে বসে থাকতে হত। এ রাস্তায় বাস চলে অনেকক্ষণ অন্তর অন্তর। দু কিলোমিটার রাস্তা বনপথ দিয়ে একজন উনিশ-কুড়ি বছরের সুন্দরী তরুণীর হেঁটে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। ঘটনা যাই হোক, সে আর নাতাশা এখন এই পরিবেশে একলা এটা ওর মনে যথেষ্ট শিহরন জাগাচ্ছে।

হোয়েন দ্য ওয়েস্টারনস সিপ, ইন্ডিয়ানস্ ড্রিংক। নাতাশা তার স্বভাবোচিত গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করে। চলো তো দেখা যাক 'নুস-ট্র্যাপে' কোন পাখি ধরা পড়ল কিনা। কথাটা বলেই গাছের ফাঁক দিয়ে গলে লেকের তীর বরাবর হাঁটতে শুরু করল। নাতাশার কণ্ঠস্বর হঠাৎ খুব মোলায়েম।

দিন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আকাশে চাঁদ আছে। শাযক ভাবছিল ফিরতে হলে চটপট ফেরাই ভালো। বিশেষ করে এমন একজন সুন্দরী তরুণী যখন তার দায়িত্বে। সে একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে নাতাশার পাশে এসে বলল, এবাব বাসায় ফিরলে হত না — রাত হচ্ছে?

কেন তোমার ভয় করছে? নাতাশা তার জিনসের স্কার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল —। শায়কের দিকে তাকালোই না।

শায়ক কোনো উত্তর না দিয়ে পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। তীর বরাবর ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের ভিড় থাকায় বান-গেঁয়োর ডাল সরিয়ে তাড়াতাড়ি এগোনো যাচ্ছিল না। তবু আকাশে চাঁদ আছে বলে রক্ষে। দেখা যাক হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা এবার কোথায় নিয়ে যায়। শায়ক ভাবে।

মিনিট দুয়েক পরে হঠাৎ খুব কাছে কোথাও "বু ম্-ম্-ম্-ম্ ও বু ম্-ম্-ম্-ম্" শব্দ তিনবার বেজে উঠল। অদ্ভুত গম্ভীর, ভৌতিক, সে স্বর। ঠিক বোঝাও যায় না কোথা থেকে আসছে। নাতাশা 'ও মা' বলে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। শায়কের শিঁরদাড়া বেয়ে বয়ে গেল ঠাণ্ডা স্রোত। নাতাশার পাশে এসে দাঁড়ালো সে।

ওটা কি শায়ক? আমার খুব ভয় করছে।

ও কিছু না। ভূত-টুত হবে। কাছেই মনে হয় শ্মশান। পোড়া কাঠ পড়েছিল দেখেছিলাম। ভূতেদের আবার এমন সময়ে মাথায় বদবুদ্ধি চাপে।

বাজে কথা বোলো না। ভূত বলে কিছুই নেই। নাতাশা উঠে শায়কের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলে।

কে তোমাকে বিশ্বাস করার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। সরে যাও; দেখি শিকারিরা কোনো পাখি পেল কিনা। শায়ক পা বাড়াতে যায়।

না, ফিরে চল। আমার ইচ্ছে করছে না। অনুনয়ের সুরে বলে নাতাশা।

আমার ইচ্ছে করছে। বলে শায়ক পা বাড়ায়।

ঠিক তখনই আবার সেই ভৌতিক শব্দ 'বু ম্-ম্-ম্-ম্ ও বু ম্-ম্-ম্-ম্' লেকের উপরে ছড়িয়ে গেল। নাতাশা দৌড়ে এগিয়ে এসে শায়কের হাত চেপে ধরে প্রায় কান্নার সুরে বলে, ডোন্ট গো শায়ক, আই অ্যাম স্কেয়ার্ড।

পুরো ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করছিল শায়ক। নাতাশা ওর হাত চেপে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। রূপসী নাতাশা। অদ্ভুত এক শিহরন জাগাচ্ছে দেহে-মনে। শায়ক কাঁপছে। নাতাশা কাঁপছে।

হাত ছাড় নাতাশা। আমাকে যেতেই হবে শিকারিদের কাছে। ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে কথাটা বলে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে শায়ক। নাতাশা বুঝতে পারে সে মজা করছে।

ঠিক আছে যাও। হাত ছেড়ে দিয়ে নাতাশা পরিষ্কার বাংলায় বলে যায়, আমি ভেবেছিলাম বাঙালি ছেলেরা ভালো হয়।

ভীষণ চমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় শায়ক। খানিকক্ষণ নাতাশার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে (নাতাশা মিটিমিটি হাসছিল) আস্তে করে বাংলায় জিজ্ঞেস করল, আমি কি তোমাকে বাংলায় কথা বলতে শুনলাম?

বাংলায়? আমি? ক্ষেপেছ নাকি? আবার ইংরেজিতেই বলে কাঁধ ঝাঁকায় নাতাশা।

না, আমি ঠিকই শুনেছি। নইলে তুমি আমার বাংলা কথা বুঝলে কী করে। দুজনে খুব হাসল।

আমি তোমার বাংলা কথা শুনে খুবই খুশি হয়েছি। তাই তোমাকে জানিয়ে দিই ওই আওয়াজটা ছিল 'ব্রাউন ফিস আউলের' ডাক। দিনের আশ্রয় ছেড়ে সন্ধেবেলা শিকারে বেরোবার সময় ওরা এমন ডেকে থাকে। পুরনো বার্ড ওয়াচার হিসেবে তোমার এটা জানা উচিত ছিল।

কী অসভ্য! আর বলে কিনা ভূতের বদবুদ্ধি চেপেছে। জান আমি ভূতকে কত ভয় করি। শায়কের বাহুতে চিমটি কাটল নাতাশা।

ওরা দুজন আবার 'নুস-ট্র্যাপ' পাতার জায়গার দিকে এগিয়ে চলল।

কিন্তু তুমি অত সুন্দর বাংলা শিখলে কী করে, নাতাশা?

আমার আট থেকে পনের বছর বয়স অবধি আমি কলকাতায় ছিলাম। সল্টলেকে। তখনই শিখি। আমার বাবার বদলির চাকরি তো। বম্বেতেও আমার বাঙালি বান্ধবী আছে। ফলে বলার অভ্যাসটা যায়নি।

গতরাতে সিন্থেসাইজারে তুমি খুব ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বাজিয়েছিলে।

সত্যি! ধন্যবাদ। ওগুলো কলকাতাতেই শেখা। বাবার খুব ইচ্ছা ছিল আমি শান্তিনিকেতনে পড়ি — রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখি। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। নাতাশা দু হাত দিয়ে শায়কের বাঁ বাহু আঁকড়ে ধরে হাঁটছে।

শায়ক কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে চলেছে। অথচ নাতাশা কত সহজ। ওর সন্দেহ হয় যা কিছু ঘটছে সব সত্যি তো। এই জোছনায় ভেসে যাওয়া মুনিয়াপ্পান লেকের তীর বরাবর আলো-আঁধারির মধ্য দিয়ে রূপসী নাতাশার সংস্পর্শ নিয়ে হেঁটে যাওয়া। তার শরীরের রহস্যময় গন্ধ। একটু আগেও এই মেয়ে তার পয়েন্ট ক্যালিমিয়রের সুসময়ে কাঁটা হয়ে বিঁধে ছিল। সব কিছু এত ভাল যে বিশ্বাস হয় না।

কদিন ধরে আমাকে এত বকছিলে কেন?

জানি না। তুমি যদি বোকা হও আমি সবকিছু বসে বসে ব্যাখ্যা করতে পারব না। তোমার হাতটা কেমন আছে দেখি। এ মা, এ তো এখনও ফুলে আছে দেখছি! একটা 'টেড-ভ্যাক' পর্যন্ত নিলে না। দাঁড়িয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় শায়কের হাতটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে নাতাশা বলে। ক্ষতস্থানে নাতাশার উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করে শায়ক।

শঙ্খচিলটা কী প্রচণ্ড জোরে গেঁথে রেখেছিল নখগুলো। পনীর ও বালাকে অনেক কষ্টে একটা একটা করে বের করে আনতে হচ্ছিল। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, না? তালুতে আস্তে করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল নাতাশা।

কিছু না বলে শায়ক শুধু হাসল। মনে মনে শঙ্খচিলটাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলল না। ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল। নাতাশা ডান হাত দিয়ে শায়কের বাঁ বাহু আঁকড়ে থাকে।

কাল অতটা মদ খাবার কী দরকার ছিল। কী অবস্থা হয়েছিল বাব্বাঃ। বাহুতে একটু চাপ দিয়ে প্রশ্ন।

সে জন্য তুমিই দায়ী। কেন তুমি অত দারুণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বাজাচ্ছিলে? তারপরে ওই বাঁশিতে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক — সেকি আমাকে মাতাল করার জন্য নয়।

আহা, এমন কিছু ভাল বাজাইনি। বাঙালি মেয়েরা তো আরও ভাল বাজায় তাই না? শায়ক ইঙ্গিতটা উপেক্ষা করল। ওর মনে হল নাতাশার ডান স্তন একবার ওর বাহু ছুঁয়ে গেল। শায়ক সব কথা হারিয়ে মনে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে লাগল নাতাশাকে বুকে জড়িয়ে আদর করার। কিন্তু কিছুতেই পারল না।

নাতাশা কত সহজভাবে ওকে ধরে হাঁটছে। শায়ক কিন্তু কখনও প্রথমে ওকে ছুঁতে পারত না।

মুরুগ্গান তোমরা কোথায়? আরও একটু এগিয়ে হাঁক পাড়ে শায়ক।

আমরা এখানে স্যার। কাছ থেকেই মুরুগ্গানের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

কিছু ধরা পড়ল? শম্ভু ও মুরুগ্গানের কাছে এগিয়ে গিয়ে নাতাশা শুধোয়।

চলুন ম্যাডাম গিয়ে দেখা যাক। অনেকক্ষণ দেখিনি। শম্ভু বলে। সবাই গিয়ে দেখল একটা সোনাজঙ্ঘা (পেন্টেড স্টর্ক) ফাঁসে আটকে পড়ে আছে। বোধহয় সন্ধে থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে ক্লান্ত।

পেন্টেড স্টর্ক, স্যার। মুরুগ্গান উত্তেজিত।

স্বভাবতই। কারণ এই তিন ফুটেরও বেশি উচ্চতার খুব সুন্দর পাখিটাকে ধরা খুবই দুরূহ কাজ। কদাচিৎ কখনও ধরা পড়ে। শায়ক ও নাতাশা পুরু হাওয়াই চপ্পল তীরে খুলে অগভীর জলে পাতা ফাঁস থেকে পাখিটিকে মুক্ত করার কাজে লেগে যায়। বাঁ হাতে ঠোঁট দুটো মুঠো করে, ডান হাত দিয়ে পা দুটো ধরে সোনাজঙ্ঘাকে বগলদাবা করল শায়ক। নাতাশা মুরুগ্গানের টর্চের আলোয় পাখিটার পা থেকে ফাঁস খুলে ফেলল।

মুক্ত হবার তো কোনো চেষ্টাই করছে না। তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে মনে হচ্ছে। পাখিটাকে আদর করতে করতে শায়কের চোখে চোখ রেখে নাতাশা বলে।

একে তুমিই আংটি পরিয়ো।

সেলসম্যান

দেবদত্ত রায়

পুলক অনুভব করল বিক্রেতার চেয়ে সেলসম্যান কথাটা ভারি। বেশ ভারি। দক্ষ, দক্ষতা, প্রতিনিধি, ছিমছাম, স্মার্টনেস, শার্প — সব শব্দগুলো এপাশে ওপাশে এঁটে যায়। এঁটে যায় সেলসম্যানের সঙ্গে অনায়াসেই। পবিচ্ছন্ন পোশাক। পেটাই চেহারা। টিকোলো নাক। গলায় ম্যাচিং টাই। চকচকে জুতো। শ্যাম্পু করা কুচকুচে চুল। ব্যাকব্রাশ। নিজেকে তৈরি করতে করতে স্মার্টনেস কথাটার ঠিক বাংলা খুঁজে পেল না পুলক। পরক্ষণেই মনে চলে এল, নাকে মুখে তুখোড় কথা বলা।

পুলক একটু থমকে যায়। মুখেটার মানে হয়। কিন্তু নাকে কথা বলাটা কি জুতসই? ধ্যুস! ঠোঁট চেপে নাকে কিছু শব্দ বার করতে চেষ্টা কবল পুলক। অসম্ভব নাকি নাকি কিছু খোনা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বের হল না। রাবিশ। আগু-পিছু কিছু না ভেবেই আমরা অনেক কথা বলি। বলতে তো ট্যাক্স লাগে না মুখে। বললেও কিছু যায় আসে না। দুম করে মেরে দিলুম, বছরে দিয়ে দোব এক কোটি বেকারের চাকরি। বলে তো দিলুম, তা হোক আর না হোক।

— এক-কোটি — চাকরি। ভাবতে গিয়েই পুলকের হাসি পেয়ে গেল। পরক্ষণেই মগজে এল চাকরি, মানে কর্মসন্ধান, কর্মসঞ্চার... এই, এই আর কী!

দায়িত্ব তো নেই, সুতরাং বলতে দোষ কী? এক্ষুনি পুলকের মনে দায়িত্ব কথাটা এসে যাওয়ায় সে টান টান হল। আসলে ও ভাবছিল তার নিজের কাজটা সম্বন্ধে। মানে সেলসম্যানের পেশাটার কথা। এ পেশার সঙ্গে দায়িত্ব কথাটা লেপটে আছে। কিন্তু দায়িত্বের চেয়ে রেসপনসিবিলিট কথাটা আরো ভারিক্কি। দায়িত্ব কথাটা কেমন যেন ইয়ে ইয়ে। মানে বুড়ো বুড়ো। দায়িত্ব, দায়বদ্ধতা — কেমন যেন বুড়োটে বুড়োটে। এই বাপ কাকা নিদেন বড়োরা এবং সি পি এম লিডাররা যা বলে। তার চেয়ে 'রেসপনসিবিলিটি' কথাটা বলতেও সুখ। বোধ করলে তো কথাই নেই।

পুলক কিন্তু এ ব্যাপারে দারুণ সিরিয়াস। তাকে কেউ ইরেসপনসিবল বললে একদম সইতে পারে না পুলক। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যায়। রি রি করে ওঠে গা। অসহ্য রক্তচাপ। সে চাপ বহন করতে পারে না শিরা-উপশিরা। এই বুঝি ফেটে গেল ফেটেগেল একটা ভাব।

চৈতীর সঙ্গে এই নিয়ে একবার তো প্রায় হয়েই গিয়েছিল। অথচ চৈতী তার প্রাণকুসুম। চৈতী তার শুভ। অশুভ। চৈতীর কাছে সারাদিন পুলক বসে থাকতে পারে। চায়। শুধু সারাক্ষণ দেখবে বলে রাত জাগতে পারে। ওর পলকহীন চোখ, গ্রীবা, ঠোঁট কিংবা কালো চুল। নিটোল বাহু, বুক — সবকিছুতেই পুলক হিজল ফুলের গন্ধ পায়। সোঁদা গন্ধ। মৃদু মৃদু। মাদকের মতো। সব নিয়ে চৈতী পুলকের কাছে সীমার মাঝে অসীম। চৈতী বয়ে চলা নদীর স্বচ্ছ স্রোত। তার দু'পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে যেন। পাড়ে বসে পুলক তন্ময় হয়ে তা-ই দেখে।

চৈতী হাঁটলে পুলক দেখতে পায় আলতা পরা সোনালী দু'পা। লক্ষ্মীর মতো পায়ের ছাপ এঁকে এঁকে চৈতী ছবি হয়ে যাচ্ছে। হাসছে মুখ টিপে টিপে। হাসলে চৈতীর দাঁত দেখা যায় না। গেলেই মুক্তোঝরা দেখতে পেত পুলক। ঝরামুক্তো ধরবে বলে অনেক দিন শুধু মুখই দেখেছে ও।

সেই পুলক প্রায় খেপে গিয়েছিল চৈতীর ওপর। যাকে বলে ষাঁড়ের মতো খ্যাপা।

অনেক, অনেক সময় লেগেছিল নিজেকে সামলাতে। কী কষ্টই যে হয়েছিল! রীতিমতো লড়াই। নিজের সঙ্গে নিজের দাঁত-চাপা সে এক অসাধ্য কসরৎ। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে মেজাজটা বশে এসেছিল। চোখ বুজে অনেকক্ষণ বসে ছিল চেয়ারে। মাথা ঝুঁকিয়ে দেখছিল মেঝে। জানলা দিয়ে অমল আকাশ। দু'এক টুকরো ধূসর মেঘ। হালকা। উড়ে উড়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে নেতিয়ে পড়েছিল পুলক চেয়ারেই!

চৈতী থ'! কোনোদিন তো এমনটা দেখেনি। এত দিশেহারা! রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও।

পুলক শান্ত হলে চৈতী জিজ্ঞেস করে, তাও ভয়ে ভয়ে, কী হয়েছিল বলো দেখি। এমন করছিলে কেন?

পুলক ম্লান হাসে। চৈতীর হাত ছোঁয়। বলে, নাহ, ও কিছু না। ছাড়ো ওসব।

চৈতী ছাড়ে না — কিছু না মানে? তারপর জোর করে, বলো না হঠাৎ কী হয়ে গেল এমন? মনে হচ্ছিল তুমি, তুমি না ভী-ষ-ণ রেগে গেছ! তুমি কথা বলতে পারছিলে না। মুখ চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল।

— তা-ই নাকি?

— তা-ই নাকি কি গো? সত্যি বলছি, একদম তা-ই —

পুলক চৈতীকে কাছে টানে। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বলে, তুমি জোর করছ, বলছি। আসলে কী জান, আমাকে কেউ, মানে আমাকে কেউ ইরেসপনসিবল বললে একদম টলারেট করতে পারিনে। দুম করে মাথায় রক্ত চেপে যায়। আর, তখন তুমি শুধু শুধু আমাকে ইরেসপনসিবল বললে। বললে তো? কী যে হয়ে গেল কিছু বুঝতে পারলুম না।

— ও মা! সে কী গো? চৈতীর গালে হাত — সে তো একেবারেই হালকাভাবে বলেছিলুম। তুমি সিরিয়াসলি নিলে? যা বাব্বা! এই দেখো কান মুলছি, নাক মুলছি। আর কোনোদিন ভুলেও বলি তো আমি যেন.......

— ছিঃ। পুলক সঙ্গে সঙ্গে আগের পুলক হয়ে যায়। চৈতীকে ধরে টেনে আনে। এবং এরপর স্বভাব-অশান্ত সোয়ামি হিসাবে ইত্যাদি, ইত্যাদি যা করা চলে সব করে। সবটাই যায় পালটে। একেবা :া স্বাভাবিক। পুলক হয়ে গেল বশংবদ স্বামী। যেমন বশংবদ এখন মিঃ ভি. ভি-র।

এইসব পুলকের কাছে দূরদর্শনের পর্দার মতো সব ভাসছিল। যেন পর্দায় মন্তাজ। পুলকের এমন হয়। শুধু এখন বলে নয়। আগেও। অনেক সময়েই। সতর্ক অসতর্ক যে কোনো মুহূর্তে। কোত্থেকে যে কোথায় চলে যায় ঠিক থাকে না। একটা শব্দ, কথা, বাক্য যা হোক হলে কিংবা মনে পড়লেই হল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করতে থাকবে হাজারো শব্দ, হাজারো কথা, হাজারো বাক্য। কখনকার ঘটনা, সব ঢেউ তুলে তুলে মিছিলে যোগ দেবে। আসলে ভাষাটাই হল গিয়ে সব কিছুর মূল। ভাষাটা আছে বলেই ভাবনা-চিন্তাগুলো সব মগজে গেঁথে যায়।

কিন্তু পুলক ভাবছিল তো ওর পেশাটা নিয়ে। ভাবছিল একজন দক্ষ সেলসম্যানের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ কিন্তু ফেলনা নয়। বরং অপরিসীম। তবে নিশ্চয়ই ওকে আরো গভীরভাবে লেপটে থাকতে হবে। ফাঁক থাকলে ভবিষ্যৎ গোল্লা। গোল্লা অবশ্য পুলক অনেক পেয়েছে। বিশেষ করে অঙ্কে। তারপর জিদ গেল চড়ে। নিজেকেও ধরল চেপে। এমন চেপে যে, খেয়ে না খেয়ে, শুয়ে না শুয়ে, কাঠখড় অনেক পুড়িয়ে শেষতক্ অঙ্কেতে একশোতে একশো। আর সেই যে একশো পেতে শুরু আর নামেনি। সুতরাং তৈরি তাকে সেভাবেই হতে হবে। তাহলেই ভবিষ্যৎ সোনা।

বিষয়টা হল, তুমি বেচছ। কিন্তু তুমি বেচছ তোমার মালিকের মাল। বেচতে বেচতে নিজেকেও বেচে দিতে হতে পারে। কিন্তু নিজেকে বেচো না বাবা! একটু সতর্ক থেকো। যে কিনছে সে যেন তোমাকে একদম বুঝতে না পারে। কিন্তু ক্রেতাকে, তোমাকে পুরো চিনতে হবে। চিনতে হবে হাড়ে হাড়ে। ক্রেতা কতটা বোকা, কতটা চালাক — চোখের পলকে আঁচ করে ফেলতে হবে। চাই কী, দু'হাত তুলে নমস্কার করার আগেই এক ঝলক বুলিয়ে ফেলতে হবে চোখ। বুলিয়ে ফেলতে হবে পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত। তারপর স্বর নিক্ষেপ।

এসব ভাবনা-চিন্তার জাল বুনতে বুনতে পৌঁছে গেল শো-রুমটার সামনে। ঘুরে ঘুরে দেখল। এদিকে হাঁটল ওদিকে হাঁটল। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে ঠেলল দরজা। স্বর নিক্ষেপ, নমস্কার। হাত উঠে এল কপালে। উঠে এল দক্ষ সেলসম্যান পুলকের। পুলক, মানে পুলক বিশ্বাসের।

—নমস্কার। বলুন। চোখ না তুলেই প্রত্যুত্তর। ঘাড়টা স্প্রিং-এর মতো একটু নড়েছিল মাত্র।

পুলক বুঝল, ওকে গুরুত্ব কম দিচ্ছেন। পুলক এবার অসাধারণ হাসল। সত্যিই অসাধারণ। একেবারে উত্তমকুমারের নকল। প্রথমে চোখের কোণে, তারপর ঠোঁট এবং যত্ন করে ছাঁটা গোঁফের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে নাকে মুখে ছড়িয়ে পড়ল তার অসাধারণ হাসি। বিকশিত হল ধবধবে সাদা ব্রাশে মাজা দাঁত। কণ্ঠস্বরে বিনম্র দীনতা, আপনার একটু সময় নষ্ট করছি, প্লিজ, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। বাংলার চেয়ে ইংরেজি কথা ক'টা গুরুত্ব বাড়িয়ে দিল পুলকের। ভদ্রলোক চোখ তুললেন। বিব্রতভাবে বললেন, না-না মনে করার কী আছে! বলুন না আপনার জন্য কী করতে পারি। বসুন, বসুন তো আগে।

— থ্যাঙ্কস। মেনি থ্যাঙ্কস। ধন্যবাদ জানিয়েই পুলক তার বড়ো বড়ো চোখ দু'টো সারা ঘরটায় বুলিয়ে নেয়। সপ্রশংস কণ্ঠে বলে ওঠে — দারুণ, দারুণ কালার কম্বিনেশন তো — নিশ্চয়ই এশিয়ান পেইন্টস!

— একদম ঠিক। দু'বছর হয়ে গেল। বোঝা যায়?

পুলক চোখে মুখে বিস্ময় প্রকাশ করে। গলায় স্বর টেনে ঢেউ তোলে, দু' বছর? কী বলছেন? মাই গড। আমার আইডিয়া বড়ো জোর দু'-তিন মাস। সরি, রিয়েলি সরি।

— না, না। ওটা কোনো ব্যাপারই নয়। ভুল হতেই পারে। সত্যিই দু'বছরের কিছু বেশি।

— থ্যাঙ্ক গড। এ একেবারে অবিশ্বাস্য সত্য। বলেই একটু সময় নেয়, পরক্ষণেই আবার তারিফ করে — আপনার শোরুম, সেলস কাউন্টার দেখে এসেছি। সেও তো দারুণ মডার্ন। বেশ ভালোই ঢালতে হয়েছে বলুন!

— তা বলতে পারেন। ছয়ের ঘরে পৌঁছে গিয়েছে!

— ছয় ঘর! তাতেই এত চোখ ধাঁধাচ্ছে। ইয়া, রিয়েলি এপ্রিশিয়েবল!

অনেকটা স্বগতোক্তির মতো মাথা দোলায় পুলক। মনে মনে বুঝতে পারে, টোপ কিছুটা গিলছে। ঠিক এ সময়ে বেয়ারা চা নিয়ে আসে। র'। লেমন মেশানো। পুলক আবার বিস্ময় প্রকাশ করে, আপনিও র'? আমি তো দুধের চা খেতেই পারিনে। বেইজিং -এ তো চায়ে দুধ দেয়ই না। রাশিয়ানরাও না। চায়ে দুধটা হল ব্রিটিশ কালচার।

পুলক হামাগুড়ি দিতে থাকে। শনৈঃ শনৈঃ। মেপে মেপে চার ফেলতে থাকে। তার সাফল্য দরকার। এই সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল ওর পকেট। রোজগারের স্থায়িত্ব। বৃদ্ধি। জীবনধারণ। সুখ, আহ্লাদ এবং আত্মসুখ। চৈতীর হাসিমুখ। পুলকের ওপর চৈতীর আস্থা। পুলকের পৌরুষ।

এই সাফল্যের জন্য সে কী করেনি? তাকে রীতিমতো শিখতে হয়েছে। শিখতে হয়েছে কৌশল। ক্রেতা-বিক্রেতা এখানে কে কাকে জয় করতে পারছে তা ওপরই নির্ভর করছে সাফল্য-ব্যর্থতা। তাকে তো পারতেই হবে। কোম্পানিকে বোঝাতেই হবে পুলকই হবে ওদের প্রধান ভরসা। তার চেয়ে আর কেউ ভারত ইন্টারন্যাশনালের বন্ধু হতে পারে না। থাকতে পারে না। ভারত ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি তাকে ছাড়া চলতে পারে না।

তবে ভারত ইন্টারন্যাশানালের লোকাল ম্যানেজার স্বর্ণ মৈত্রও হেঁজিপেঁজি নন। পুলক তা বুঝতে পারে। শুধু চার ফেললেই টোপ পুরো গিলে ফেলবে, অত সহজ নয়। ও মালও বেশ ঘাগু।

পুলকের দেওয়া কার্ডটার ওপর এক পলক ফ্ল্যাশ মেরেই থম্ মেরে গেলেন স্বর্ণ মৈত্র। পুলকের নজর এড়াল না। কিন্তু স্বর্ণ মৈত্র যত ঘাগুই হোন আপাতত তাঁকে জয় করতে চায় পুলক। ধানবাদে প্রথম চার্জ নিয়ে এসেছে।

পুরো বেল্টটার ওভারঅল চার্জ। ভারত ইন্টারন্যাশনাল তার প্রথম টার্গেট। আর এই প্রথম সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল বাকি বাজার ধরা। এদের স্টকিস্ট করতে পারলে বাকি বাজার দেবে ভারত ইন্টারন্যাশনালই। আসার আগেই সব সংগ্রহ করে এসেছে পুলক। কোম্পানিই ওকে সব ব্রিফ করে দিয়েছে। বাকিটা জানতে পেরেছে এলাকায় বসে। বিভিন্ন সোর্স থেকে। সাকুচি গ্লোবাল, তাদের ওয়াশিং মেশিন, ওয়াটার ফিল্টার ছাড়াও আরো কিছু কিছু হাউসহোল্ডের মার্কেট চাইছে। যদিও জাপানি কনসার্ন, স্থানীয় কর্মীসংখ্যাও নেহাত কম নয়। পুলক বেশ ঝুঁকি নিয়েই তার পুরোনো কোম্পানি ছেড়ে সাকুচি গ্লোবালে এসেছে। অফারটা আসলে প্রায় দ্বিগুণ। জমিয়ে দিতে পারলে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। বিদেশি কনসার্ন, এসেই ছেয়ে দিতে চাইছে পুরো বাজারটা। দেশের এ-প্রান্ত ও-প্রান্তথেকে সব গিলে ফেলতে চায় কোম্পানি। লাখ লাখ ডলারের কনসার্ন। আপাতত ঢেলে চলেছে। পুলক বুঝতে পেরেছে অনেক আগেই — ঠিক সব গুটিয়ে নেবে। অবশ্য বিদেশি ব্যাপারটা ওর কাজের পক্ষেও দারুণ লাগসই। লাইনটাই এই! বিদেশি বিদেশি গন্ধ থাকলেই কেমন যেন বেশ একটা ইয়ে ইয়ে ভাব এসে যায়। এইসব সাতপাঁচ ভেবেই পুলক বেছে নিয়েছিল সাকুচি গ্লোবাল। মার্কেটিং ম্যানেজার দক্ষিণের লোক। যদিও বাংলা শিখে ফেলেছেন এর মধ্যেই। দক্ষিণী টানটা কিন্তু ছাড়তে পারেননি। কথার মাঝে মাঝেই টাল খান। সেই সময়েই হাসি চাপতে হয়।

পুলকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই খুশি। চেহারার আকর্ষণ, তার ওপর চোস্ত ইংরেজি বলা। ছেলেমেয়ে সবাইকেই টানতে পারে পলকের মধ্যেই। চৈতীও তো প্রথম দর্শনেই — একেবারে যাকে বলে কাত।

দিদির বাড়িতে দেখা। কার বিয়েতে যেন গিয়েছিল পুলক। পুলকেরও ভালো লেগে গিয়েছিল। তারপর, সমস্ত সময়টাতেই চোখ তাকাতাকি, বুকের ভেতরে শিস-ওঠা তাপ।

একটু কাছাকাছি। একটু ঘুরঘুর। হেতুক-অহেতুক মুখ টেপাটেপি। হাসি-মশকরা। কিছু স্মার্ট কথাবার্তা। সেই শুরু। আর সেই শুরুর শেষ দিদির ওকালতি এবং পাকা সিদ্ধান্তে।

মিঃ ভি. ভি.ও আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। ভি.ভি. মানে ভি. ভেঙ্কটেশ্বরম্। দায় এবং দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন — গো মিস্টার, ধানবাদ এরিয়ার অবারঅল চার্জ ইজ ইওরস্। ছেলারির ওপর ওয়ন পারসেন্ট অন টোটাল নেট। সাধারণত আমরা দি'না। ধানবাদ আমাদের নিউ মার্কেট। কম্পানি পয়সা ঢালচে, রিটর্ন তো চাই। বিজনেস চাই। কম্পানি তো হাসপাতাল খুলতে আসে নাই। আপনি কী বলছ?

পুলক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, সিও', তা তো বটেই। আই মাস্ট রিমেম্বর এভরি ইন্টারেস্ট। এনি লেংথ—বলেই শ্বাস নিয়েছিল পুলক, আই উইল এস্টাব্লিশ সাকুচি গ্লোবাল।

ও কে। পেন্ডুলামের মতো মাথা দুলিয়ে চোখ তুলেছিলেন মিঃ ভি. ভি., সেই-ই চুক্তি।

দায়িত্ব নিয়ে চলে আসে পুলক। দেহে মনে তখন অন্য এক অনুভব। ছোটো বড়ো অনেক ঢেউ। উঠছে নামছে। নামছে উঠছে। এবং অনবরত।

বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন মিঃ ভি.ভি. আমরা বাজার চাই। নতুন নতুন বাজার — সেল চাই। কোম্পানির কাছে ইট্‌স এ মাস্ট। আর এর ওপরই ওদের অস্তিত্ব। আমাদের ভবিষ্যৎ। ফিউচার। কখনো দক্ষিণী উচ্চারণ, কখনো ইংরেজি, কখনো টাল খাওয়া বাংলা — সব মিলিয়ে, চোখ ঠিকরে, কপালে ভাঁজ ফেলে, মোদ্দা কথা, পুলকের কানে প্রায় গরম জল ঢেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন দুটি শব্দ — বাজার আর সেল।

পুলককে তা বুঝতেই হয়েছিল। এখন প্রমাণ দিতে হবে। প্রমাণ দিতে হবে সে দক্ষ, সৎ এবং নিষ্ঠায় শীর্ষবিন্দুতে। বিনিময়ে সাকুচি গ্লোবাল পাবে বাজার। পাবে লাভ। সাকুচিকে তুলতে হবে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে। কোম্পানি হবে ধনভাণ্ডার। পুলক ঘুঁটি। এসে অবধি এসবই পুলকের মাথায় কাজ করছে। কাজ করছে অহরহ। নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে তার দক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে। লাইনটাই তা-ই। এখানে নিজেকে বিকিয়েই নাম অর্জন করতে হয়। কিনতে হয়।

পুলকের অনুভব তাকে প্রায় নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়ে দিল। এখন তার মাথায় শুধু বাজার আর সেল। সেল আর বাজার। পুলক যেন পাগল হয়ে গেল। হারিয়ে ফেলল নিজেকে। মাথায় এখন এক চিন্তা — সাকুচি গ্লোবাল। সারাক্ষণ কেবল সাকুচি সাকুচি। সাকুচির মাল নিয়ে এখান থেকে ওখান। এ-ঘর থেকে সে-ঘর। পুরো ধানবাদটা সে চষে ফেলল ছ'মাসের মধ্যেই। মিঃ ভি. ভি. ওকে পরামর্শ দিলেন, এবার একটু সাবডিভিশনগুলোতে ঢোকো। একটু একটু করে। পুলক জানায়, তা তার মাথায় আছে। প্ল্যানও চক-আউট করে ফেলেছে। আশা প্রকাশ করেছেন ভি. ভি. তাতে। উৎসাহ জুগিয়েছেন, বেরিগুড। আউটপুট সেটিসপেক্টরি। কোম্পানি তোমার কথা ভাববে পুলক। গো এহিড।

পুলক আরো উৎসাহিত হয়।

সকাল নেই সন্ধে নেই, ওই এক মন্ত্র। শিরায় শিরায় রক্তের উষ্ণতায় সাকুচির দোলা, অনবরত দোলাচ্ছে পুলককে।

ভারত ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি নিয়ে ঠকেনি। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্বর্ণ মৈত্র এখন পুলক এলে সারা মুখ হেসে চার্মস এগিয়ে দেয়। পারলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানায়।

একদিন তো বলেই বসল, এ করছেন কী? আপনি তো ভিডিওকনকে মার্কেট থেকে প্রায় আউট করে দিলেন।

পুলক মৃদু হাসে, দাঁড়ান না। আর একটু বছর যেতে দিন — তারপর দেখবেন আমাদের থ্রি ফোল্ড ওয়ার্ডরোব একাই মার্কেট নেবে। শুধু এক নয় একচেটিয়া। কেউ আটকাতে পারবে না। দেশি যা দেখছেন সব জমা হবে গোডাউনে।

— তবে একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না। আপনাদের কিন্তু পাবলিসিটি আরো বাড়াতে হবে!

পুলক কপালে চোখ তোলে — কেন? আমাদের পাবলিসিটি তো কম নয়। এটা আপনার মনে এল কেন বলুন তো? মাস মিডিয়ায় লাখ লাখ টাকা ঢালছে কোম্পানি। টি.ভি, রেডিও, বড়ো বড়ো কাগজ। তা ছাড়া হোর্ডিং। শুধু এই শহরে কটা বিগ হোর্ডিং করেছি জানেন? বেশ জোর দিয়েই পুলক শেষ করে, ওয়ান হানড্রেড। ইয়েস, ওয়ান হানড্রেড।

—স্বর্ণ মৈত্র সঙ্গে সঙ্গে সামলে নেন — না, হচ্ছে না তা বলছি না। তাহলে মালের এত চাহিদাই বা হবে কেন? তবু ইয়ে, মানে যত বেশি পাবলিসিটি বাড়বে আপনাদেরই লাভ। আসলে আমি সেটাই বোঝাতে চাইছিলুম আর কী।

— সে ঠিক আছে! আপনার অ্যাডভাইস তো আমাদের মনে থাকবেই। তবে আপনাকে কিন্তু আমাদের থ্রি-ফোল্ড ওয়ার্ডরোবটা একটু বেশি ঠেলতে হবে। দরকার হয় টু পারসেন্ট কমিশন বাড়িয়ে দেব, থ্রি-ফোল্ড বাজারে কারো নেই!

— সেটা আমি দেখছি।

বাজারটা এই করে প্রায় গিলে এনেছে পুলক। আরো ভেতরে যেতে পারলে পুরোটা গিলে ফেলতে পারবে।

কিন্তু পুলক যা বুঝতে পারছে না — তা হল সাকুচি আর মিঃ ভি. ভি. ও তাকে গিলতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে — আস্তে আস্তে।

আগে সপ্তাহে একদিন করে বাড়ি আসত। এখন তা বন্ধ। গত কয়েকটা মাস তো যেতেই পারেনি। কাজের চাপ তাকে প্রায় নেশায় ফেলে দিয়েছে। টাকাটা পর্যন্ত পাঠায় মেসের কলিগদের দিয়ে। ভাগ্যিস অলক ছিল!

চৈতীর কয়েকটা চিঠি এসে পড়ে আছে। আগে তবু রাতের দিকে খুলে সব চিঠিটা পড়ত। এখন সে সময়ও তার হাতে নেই। খামগুলো জমছে। উত্তর দেওয়া দূরে থাক খুলতেই ইচ্ছে করছে না।

এই খুলব এই খুলব করে ক্লান্ত শরীরে এলিয়ে যায় ঘুমের বিছানায়। টেবিলের ওপর ছবি আঁকা প্যাডের পাতায় ধুলো জমছে। বিছানায় গা এলিয়েই নাক ডাকে।

মেসের ঠাকুর এসে প্রায়ই টেনে তোলে পুলককে — কী হল, খাবেন না নাকি? সবার তো খাওয়া হয়ে গেল। সব যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সঙ্গীরা একবার দু'বার তুলতে চেষ্টা করে। পারে না তুলতে। তো ছেড়ে দেয় — যা শালা মরগে। কাজ যেন আর কেউ করছে না! অলকও বিরক্ত হয়ে যায়।

কখনো ধরতে পারলে ঠাট্টা করে অন্য সহ-বাসিন্দারা, কাজ তুই একাই করছিস! কোম্পানি যে তোকে খেয়ে ফেলল রে বোকারাম! নিজের সবকিছু বেচে দিলি?

আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চায় অপ্রতিভ পুলক, না না ঠিক তা নয়। তোরা যা ভাবছিস মোটেই তা নয়।

— তা নয় কী রে? ভেবে দেখ্ দিকিনি, প্রথম যখন এসেছিলি তখন, আর বছর দুই ঘুরতে না ঘুরতে এখন তোর কী অবস্থা? কতদিন ছাদে যাসনি। কতদিন গলা ছেড়ে গান ধরিসনি।

কথাটা আদৌ মিথ্যে নয়। প্রথম যখন মেসে এসে উঠেছিল, সন্ধের পর ফিরেই ছাদে জটলা বসত। চাঁদ উঠলে তো কথাই ছিল না। গলা ছেড়ে গান। আবৃত্তি। কত আলোচনা। দেশের, বিদেশের। পুলক রবীন্দ্রসংগীত ভালোই গাইত। বছর তিনেক শিখেছিল কলেজ জীবনে। তারপরও অভ্যাসটা রেখেছিল। দু'একবার তো জেলা প্রতিযোগিতায় প্রাইজ-ট্রাইজও পেয়েছিল।

এখন সেসব অতীত।

এক সময়ে চর্চা করত। তর্ক করত — অর্থনীতি-উৎপাদন-উপাদান আরো কত কী নিয়ে। এখন আলোচনায় তো অংশ নেয়ই না, নিলে শুধু সাকুচি আর সাকুচি। মার্কেট আর সেল।

প্রথম সন্তান তার ভূমিষ্ঠ হয়েছে মাস চারেক হল। সেই যে একবার গিয়ে দেখে এসেছিল তারপর আর যেতেই পারেনি। পুলক যেন কী রকম হয়ে যাচ্ছে, যেন কী রকম হয়ে গেল!

মেসের বন্ধুদের মধ্যে অলকই ওর সবচেয়ে কাছের লোক। প্রায়ই ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে পুলক। কোনো কোনোদিন বেশ উচ্চমাত্রায়। কয়েকদিনই ঠুকেছে অলক — কী রে, তুই কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সাকুচি দেখিস নাকি? কী সব বলছিলি থ্রি ফোল্ড ওয়ার্ডরোব, ওয়াশিং মেসিন, স্টিল বেসিন — না, না, হ্যাঁ-হ্যাঁ — এইসব কত কী? ব্যাপারটা কী বল দিকিনি?

পুলক কিছু বুঝতে পারে না। চোখ বড়ো করে, তা-ই নাকি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না রে!

— তুই আর বুঝবি কী করে? তুই তো ঘুমের মধ্যেই এইসব বলছিস। ভাবছিস। আসলে সাকুচি তোকে গিলে খেয়েছে। সব সময়ে যদি মাথায় থাকে তোর সাকুচি তাহলে অন্যকিছু ভাববি কী করে?

তবু আমতা আমতা করে পুলক। কিন্তু একেবারে উড়িয়েও দিতে পারে না। ভেতরে গজানো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হলেও হতে পারে, এ রকম আচ্ছন্ন মনোভাব ওকে টান টান হতে দেয় না। অনেকটা স্বাভাবিক হওয়ার জন্যই বলে, দে একটা চার্মস দে।

— দিচ্ছি, তার আগে একটা কথা বল্ দিকিনি। এ মাসের টাকাও আমাকে দিয়েই ড্রাফ্ট করালি! নিজে যেতে পারলি না। গত চারমাসের মধ্যে একবার বাড়ি গেলি। আসলে সত্যিটা কী বল্‌তো? মিএঞা-বিবিতে কিছু হয়-টয় নি তো?

প্রায় চমকে ওঠার মতো লাফিয়ে ওঠে পুলক, না না! কখনোই না। চৈতী আর আমার রিলেশন তুই কল্পনাই করতে পারবি না। দেখ, কোনো একটা মাইনাস পয়েন্টে গিয়ে গতি থেমে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের একের প্রতি অন্যের টান মাধ্যাকর্ষণের মতো গভীর, বুঝলি ব্যাটা। ওখানে চিড় ধরাতে পারবি না।

— বেশ, তা-ই যদি হয় তো এতদিন ওকে ছেড়ে, তোর বাচ্চাটাকে না দেখে থাকিস কী করে!

এই জায়গায় এসেই দমে যায় পুলক। দমে যায় ভীষণভাবে। ও যে চেষ্টা করে না তা তো নয়। কিন্তু সারাক্ষণ ভি. ভি.-র কপালে ভাঁজ আঁকা মুখ। সব গলিয়ে ফেলা হাসি! পিঠে তার বিশাল হাতের চাপ। সব মিলে ওকে শুধু সমান্তরাল এক সরলরেখায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে! অনেকটা রেল লাইনের মতো। ওর বিশাল বিস্তৃত চারধারে খোলামেলা দুনিয়াটা ক্রমশই যেন এই এত্তটুকুন হয়ে গিয়েছে। পুলকের ভাবনাগুলো ঘুরছে এক বৃত্তের মধ্যে। সব সময়ে কার যেন অদৃশ্য স্পর্শ ওকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এ পাশে ছোঁয়া, ও পাশে ছোঁয়া। পেছনেও সেই ছোঁয়া। সামনে ছোঁয়া। বাকি সব ঘন অন্ধকার।

অথচ পুলক দেখতে চায়। আলো পেতে চায়। দু'হাত আকাশে তুলে সূর্যটা ধরতে চায়। হতে চায় একটু স্বাধীন। কিন্তু ভাবতে গিয়েও ও যেন কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবসন্ন অবসন্ন। যত দিন যায় ততই পুলক পেছোতে থাকে।

একবার ভাবে — ধ্যুৎ, রইল এসব। সকাল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে রাত, খেটেখুটে তো ফোলাচ্ছি শালা সাকুচির পেট। দু'পয়সা পকেটে আসছে ঠিকই। কিন্তু এটা তো সব নয়। আবার পরক্ষণেই সেই ভি. ভি.-র মুখ। স্বর্ণ মৈত্রের পিঠ চাপড়ানি। তার দক্ষতার প্রমাণ। নিজের প্রতিষ্ঠা। আশু ভবিষ্যৎ। সব খামচে-খুমচে তাকে নামিয়ে দেয় পথে। পুলক হাঁটতে থাকে সেই সরলরেখায়। হাঁটতে থাকে অবসন্ন দুই পা ফেলে ফেলে।

পুলক যেন যন্ত্র। কলের চাবি দিয়ে কেউ তাকে চালাচ্ছে। পুলক চলছে। ইচ্ছে থাকলেও এ থেকে আর সে বেরিয়ে আসতে পারবে না। সাকুচির অক্টোপাস তাকে গিলছে, গিলছে...... তাদের সবাইকে গিলছে।

॥ ১ ॥

বাসে দাঁড়ানোর জায়গা পায় নি অনন্ত। মেজাজ তেতেই ছিল। তার ওপর যদি জুলাই মাস-এর ঠা ঠা করা বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়া রোদে উর্বশীর সামনে শো শুরু হয়ে যাবার পরও টিকিট হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঝাড়া পনেরো মিনিট, মেজাজকে দোষ দেয়া যায় না। বিশাখা দূর থেকেই আবহাওয়ার জানকারী আঁচ করতে পেরেছিল, চালু জিনিষ তো, প্রতিরক্ষার জন্যে পাল্টা চাল হিসেবে স্যাকারিন মাখানো একফালি হাসি উর্বশীর গলির মুখ থেকেই ছুঁড়ে রেখেছিল। এখন কাছে এসে ব্যস্ত গলায় বলল — ইশ দেরি হয়ে গেছে, না! চলো চলো ঢুকে পড়ি, না হলে প্রথম গানটা মিস করে যাবো! অনন্ত এতো রেগে গিয়েছিল যে উত্তরে তার মুখ দিয়ে কথাই বেরোল না। বিশাখা বীরদর্পে অনন্তের হাত ধরে ব্যালকনির সীট খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল।

ভেতরে পাখার বাতাসে আর ব্যালকনির সীটের পা ছড়িয়ে দেয়া আরামে অনন্তের মেজাজ আস্তে আস্তে জুড়িয়ে এল। বিশাখা কায়দা করে তার ডান হাতটা অনন্তের কোলের ওপর ফেলে রেখেছিল, সেটাও কিছুটা সাহায্য করল বলা যায়। পর্দায় রাজেন্দ্রকুমার যখন সাধনার থুঁৎনিতে আঙুল ছুঁইয়ে গাইছে অ্যায়, ফুলোঁ কি রানী বাহারো কি মালিকা, অনন্ত তখন বিশাখার সমর্পিত হাতে আলতো আঙুল বোলাতে আরম্ভ করল। আঃ কি সিল্ক মসৃণ। আঃ কি মাখন নরম। অনন্তের আঙুল বেহালায় ছড় টানার মতো উঠে নেমে আসছিল বিশাখার ব্লাউজের হাতার প্রান্ত থেকে নিরাবরণ নিরাভরণ (একগোছা কাচের চুড়ি কি আভরণ হিসেবে গ্রাহ্য?) হাতের এমাথা থেকে ওমাথা। সিনেমায় রাজেন্দ্রকুমার প্রেমের জন্যে আত্মত্যাগের খাতিরে সাধনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দূরে, অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল অনন্ত টের পাচ্ছিল অন্ধকারে বিশাখার চোখ ভিজে এসেছে। বড়ো নরম মন বিশাখার, তুলতুলে, যেমন পাকা টম্যাটো। বিশাখার হাতের তালুতে অনন্তের আঙুলগুলো ডুবে যাচ্ছিল। বেহালায় বাজছিল মালকোষ। আলাপ যখন ঝালায় এসে পৌঁছেছে, বিশাখার হাতের অপর দিকের সোনালী রোমরাজি কেঁপে উঠল, শক্ত হয়ে এল। সাধনার সুন্দর মুখে সেসময় ঘনিয়ে এসেছে দুঃখ। বেদরদি বালমা তুঝকো মেরা মন ইয়াদ করতা হ্যায়। অনন্ত বিশাখার হাতের তালু তুলে নিল নিজের মুঠোয়, ঠোঁটের সামনে নিয়ে এল, চুমু দিল আশ্লেষে। কি দারুণ ঘুমপাড়ানি গন্ধ উঠে আসছে বিশাখার হাতের তালু থেকে। ঝিমঝিম করে উঠল অনন্তের মাথা। পেছন থেকে আওয়াজ উঠল। বিশাখা চট করে হাতটা সরিয়ে নিল। আবার কেউ খিক করে হেসে উঠল পেছন থেকে। বিশাখা নিচু গলায় বলল — চলো, চলে যাই। অন্ধকারে ঢেউ-এর মতো পা-এর পর পা ডিঙিয়ে তারা বেরিয়ে যাচ্ছে, পেছনের সীট থেকে

কেউ সিটি মারল। অনন্ত ঘুরে দাঁড়ায় নি, কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়াতেই চেয়েছিল, বলতে চেয়েছিল আ রে বোকারা, উই ওয়্যার মিয়ারলি সেলিব্রেটিং দ্য বডি। আজ থেকে পঁচিশ বছর পর তোরাও বুঝতে পারবি দ্যাট ইজ দ্য ওনলি থিং ওয়ার্থ সেলিব্রেটিং।

পঁচিশ বছর অনেক বড়ো সময়। পঁচিশ বছরে পৃথিবী বদলে যেতে পারে।

।। ২ ।।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তার ছ তলা অফিসের কাচের জানালা দিয়ে সে রোজই দেখতে পায় ব্রহ্মপুত্রের ওপারে সূর্য নদী ও আকাশ রঙ থৈ থৈ করে অস্ত যাচ্ছে। প্রথম দিকে সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত অনেকক্ষণ, ফাইল পড়ে থাকত টেবিলে। আজকাল সে আর তাকায় না, নেহাৎ চোখ পড়ে গেলে দু এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে, এই যা। সুন্দর জিনিষ প্রতিদিনের হয়ে গেলে তা আর সুন্দর থাকে না। আর তা ছাড়া দেখার চোখও তো পাল্টে যায় মানুষের। অনন্ত কি সেই অনন্তই আছে না কি এখনো? তাকাও, তাকিয়ে দ্যাখো তার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, কপালে বলিরেখা, চোখের পাওয়ার সে গত তিন বছরে দুবার পাল্টেছে। আর অর্শের ব্যথাটা যখন চাগাড় দেয় তখন তার কাছে জগৎ সংসার তেতো হয়ে যায়। এছাড়া অ্যাসিডিটির প্রবলেম তো আছেই। অনন্ত দত্ত এক সময়ে ত্রিভুবন চষে বেড়িয়েছে। আজ সে বাইরের জলটুকু পর্যন্ত খায় না।

সামনের টেবিলের হাজারিকা ফাইল গোছাচ্ছিল। ডেকে বলল — কি অনন্তদা, ইউনিয়ন অফিসে তো যাবেন না আজ? অনন্ত অন্যমনস্ক মাথা নাড়ল। ইউনিয়ন অফিসে তো যেতেই হবে। যেমন সে প্রতিদিন সকালে উঠে দাঁত মাজে, পায়খানায় যায় তেমনি রবিবার ছাড়া প্রতিদিন সন্ধে থেকে সে ইউনিযন অফিসে বসবেই। এটা অভ্যেসের ব্যাপার, অন্যরকম হলেই তার অস্বস্তি হবে। আর রবিবারেও কি রেহাই আছে? বাইরের ব্রাঞ্চ অফিসগুলো থেকে নানান আবেদন, মিনতি, অনুরোধ নিয়ে সকাল থেকে অনেকেই তার বাড়ির ড্রইংরুমে বসে থাকে। তার স্ত্রী গজগজ করে। ছেলেপুলের পড়াশোনা আছে, রান্নাবান্না হরেকরকম কতো কি ঝামেলা আছে, তার ওপর দফায় দফায় চা করো। অনন্তর অবশ্য খারাপ লাগে না। টিভি সে বড়ো একটা দেখে না, রাত নটার সিরিয়াল ছাড়া, আর বইটই পড়াও সে বহুদিন হলো ছেড়ে দিয়েছে। লেখা? সেটা একটা রহস্য, কেন না বাঁধানো একটা জাবদা খাতায় সে মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে কি সব লেখে। কী লেখে অনন্ত? গল্প লেখে আগে যেমন লিখত? নাকি দাঁত মাজার মতো, পায়খানায় যাওয়ার মতো ইউনিয়ন করার মতো এও একটা অভ্যেস?

ইউনিয়ন অফিসে ঢুকতেই সে দেখতে পেল তার টেবিলের সামনের চেয়ারে তিন চারজন ইতিমধ্যে এসে বসে আছে। সে চেয়ারে বসতে বসতে সামনে উপবিষ্ট একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল — কি রে ব্যানার্জি, চৌধুরীসাহেব নাকি আবার ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করছে? ব্যানার্জি বত্রিশ পাটি দাঁত বিকশিত করে বলল — সেজন্যই তো তোমার কাছে এলাম অনন্তদা। চৌধুরী হারামজাদাকে একটু টাইট না দিলে চলছে না। অনন্ত আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে হাতটা একটু তুলে বলল — হবে হবে। চিন্তা করিস না। এমন টাইট দেবো বাছাধন বাপের নাম ভুলে যাবে। ব্যানার্জি বিগলিত ভাবে হাসল — তুমিই তো আমাদের ভরসা অনন্তদা।

এসবই অনন্তর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। সে কাউকেই ফেরায় না, সবার কাজই করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কাজ আর কি কারো ট্রান্সফার, কারো পোস্টিং, কারো উপরঅলার

সাথে মনান্তর, সেটা মিটিয়ে দেয়া এইসব। সবার কাজ অবশ্যই সে করে দেয় না, সেটা সম্ভবও নয়। ইউনিয়নের কাজ পার্সেন্টেজ গেমের মতো — কতো দিলে ফিরে কতো পাবার আশা আছে সেটা আগেভাগে মেপে নেয়া অত্যন্ত দরকার। ফিরে পাওয়া মানে টাকাকড়ির ব্যাপার নয়, অনন্ত অন্তত এদিকে সৎ। দু বছর পরপর ভোটাভুটির ব্যাপার আছে, রাইভ্যাল গ্রুপের শক্তির কথা হিসেবে রাখার ব্যাপার আছে। অনন্তকে তাই সুবিধে পাইয়ে দেবার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পাওয়ার সেন্টারগুলিকে খুশি রাখার দিকটা বিবেচনায় রাখতে হয়। এটার মধ্যে নিজস্ব স্বার্থ জড়িত নেই, সে অন্তত ব্যাপারটা সেভাবে দেখে না। এটার সঙ্গে, যাকে বলে বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত. সে যে গোষ্ঠীর সঙ্গে ইউনিয়ন করছে তার সারভাইভ্যালের প্রশ্ন এখানে জড়িত।

ব্যানার্জি ও অন্য যারা বসেছিল ওদের সাথে কথাবার্তা আধঘণ্টার ভেতরে সেরে ফেলল অনন্ত। এর ভেতরে চা এসেছে। হেডকোয়ার্টারে পোস্টিং করানো হয়েছিল একজনের, সে সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়ে গেল। কিছু চিঠিপত্র লেখার ব্যাপার ছিল, দুটো সার্কুলার ইস্যু করার ছিল — এসবেও কিছুটা সময় গেল। তারপর তার দুই সহকারী কাকতি আর রায় তার সামনে এসে বসল। ডিসেম্বরে ভোট আসছে, এখনই আট-বাট [illegible] দরকার। কাকতি বলল অনন্তদা শুনেছেন তো ডিব্রুগড় রিজিয়নে ওবা কী স্ট্যাটেজি নিচ্ছে? অনন্ত ঘাড় নাড়ল। রায় বলল অচিন্ত্য সরকাব মহা ধড়িবাজ লোক। সে ডিব্রুগড়ে ট্রান্সফাব নিয়েছে কেবল ডিব্রুগড় রিজিয়নটা কব্জা করার জন্য। যতীন গোস্বামী তো আগে থেকেই ট্রাবল ক্রিয়েট করে আসছে ওখানে। নন্দীর কেসটা নিয়ে ওবা যা করল। এখন থেকে স্টেপ না নিলে ডিব্রুগড় নিয়ে আমাদের মুশকিলে পড়তে হবে। অনন্ত সিগারেটে দুটো জোর টান মারল, তারপর বলল — তুই শর্মাকে কাল ফোন করে বলে দে ওদের ওপর ওয়াচ রাখতে। আর ব্যানার্জির সঙ্গে চৌধুরী সাহেবের কেসটা নিয়ে লেটস ক্রিয়েট সাম রিয়েল হার্ড নয়েজ। দরকার হলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে পেন ডাউন স্ট্রাইকে যেতে হবে। শর্মাকে বলে দে ওরা দু পা গেলে আমরা চার পা যাবো।

সাড়ে আটটা নাগাদ অনন্ত ইউনিয়ন অফিস থেকে বেরোল। ভূপেন দাস রোজই স্কুটারে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়, আজও তার কাজকর্ম শেষ হবার পরেও অনন্তর জন্যই বসে ছিল। ভূপেন বয়সে ছোকরা, ইউনিয়নের খুব উৎসাহী কর্মী। চিঠিপত্র টাইপ করা, খাতায় হিসেব তোলা — এসব ও-ই করে।

ভূপেন স্কুটার বেশ জোরে চালায়। দশ মিনিটের ভেতর অনন্ত তাব বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। ভূপেনকে শুভরাত্রি জানিয়ে অনন্ত বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে, ভূপেন পেছন থেকে ডাকল — অনন্তদা! অনন্ত ফিরল, ভূপেনের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। ভূপেন একটু ইতস্তত করছিল, তারপর বলেই ফেলল — একটা জিনিষ আমি ক'দিন ধরে খুব ভাবছি জানেন অনন্তদা। আমাদের ইউনিয়ন তো একটা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সাথে অ্যাফিলিয়েটেড, যাদের একটা রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে। এই যে আমরা ট্রান্সফার পোস্টিং ডি এ বাড়ানো নিয়ে কেবল ব্যস্ত থাকছি, শ্রমিকদের পোলিটিক্যালি এডুকেট করার যে মূল উদ্দেশ্য আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার পেছনে রয়েছে, সেটাই কি আমরা ভুলে থাকছি না?

ভাগ্যিস অনন্ত [illegible] নি, নির্ঘাৎ সেই রাত্রে রাস্তার ওপরেই কেঁদে ফেল[illegible]

।। ৩ ।।

অনেকখানি পথ দৌড়ে এসেছে সঞ্জীব, হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল —সর্বনাশ হয়েছে, অনন্ত। ডি এস পি ত্রিবেদী পুলিশ ফৌজ নিয়ে এসেছে নবীন নগরে রেল লাইনের পাশে রেফুজি ঝুপড়িগুলো উচ্ছেদ করার জন্য। ছেলেবুড়ো সবাইকে লাঠিয়েছে। বস্তির মেয়েরা বহুত কান্নাকাটি করছে।

অনন্ত কলেজ ফেরতা দাসদার দোকানে চায়ে সবেমাত্র প্রথম চুমুক দিয়েছিল, লাফিয়ে উঠল। গভর্মেন্টি বহুদিন ধরেই চেষ্টা করে যাচ্ছে, ইনজাংশন- ফাংশন আনিয়ে এতোদিন কোনমতে আটকে রাখা গিয়েছিল। এখন গত মার্চে ভোটে আবার জিতে এসেই নতুন করে বদমাইশি শুরু করেছে। সে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল চল, তোরাও যাবি তো? রঞ্জন বলল — বড়দা তো নেই, একটু ওয়েট করে গেলে হয় না। বড়দা মানে প্রোঃ ধর, তাদের লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। অনন্ত বলল — শালা ত্রিবেদী তো তোর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবে, গেলে বসিয়ে চা বিস্কুট খাওয়াবে। চল চল, বড়দা খবর পেলে স্পটে চলে যাবে।

ওরা পাঁচজনই গেল। একটা স্কুটার ছিল, দুটো সাইকেল। ওরা যখন জায়গায় পৌঁছল, ত্রিবেদী ততোক্ষণে প্রায় আধখানা কাজ সেরে এনেছে। রেললাইনের পাশে নীচু জমিটায় ছুঁড়ে ফেলা ঘরোয়া জিনিসপত্রে টাল হয়ে আছে। জিনিসপত্র মানে আর কি, কটা শস্তা কাঠের খাট আর টেবিল, কিছু মোড়া, হাঁড়ি কুড়ি, কেরোসিনের বোতল, টিনের তোবড়ানো ট্রাঙ্ক এইসব। কয়েকটা কালী আর রামকৃষ্ণের বাঁধানো ফটোও ঘাসজমিতে গড়াচ্ছিল। অনন্তের মাথার ভেতরে টং করে উঠল। হারামি পুলিশ! মেয়ে আর বাচ্চাদের কান্নাকাটিতে কান পাতা যাচ্ছিল না। মরদগুলো একদিকে জটলা বেঁধে থাকা জনতাকে উদ্দেশ করে বলল — ভাইসব চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? তোমাদের ঘরদোর ভাঙছে, তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো? জনতার ভেতর মৃদু গুঞ্জন উঠল। ছেঁড়া লুঙ্গি পরা মধ্যবয়স্ক একটা লোক জনতার মধ্য থেকে বলল — কি করমু কন, আমাগো দশডারে ভ্যানে উঠাইয়া নিয়া গেল। বেঁটে খাটো একটা লোক খ্যানখেনে গলায় বলল — পুলিশ খালি ডাণ্ডা দিয়া পিটাইলে কথা আছিল। জেলে ভর‍্যা দিলে আমাগো বউ বাচ্চাগুলার কি অইব?

জয়নাল বিবি অনন্তের পায়ে কেঁদে পড়ল। আমার ঘর পোড়ারমুখাগুলি ভ্যাঙ্গা ফালাইতাছে। পোলাপানগুলারে নিয়া অখন আমি কই যামু। আপনে কন এই পুলিশগুলারে। জয়নালের স্বামী বউকে তালাক দিয়ে অন্য বিবি নিয়ে শহরের আরেক প্রান্তে থাকে, জয়নালের পাঁচ অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে। জয়নাল বাবুদের বাড়ি বাড়ি ঠিকে ঝি-এর কাজ করে পেট চালায়। অনন্ত দৌড়ে গেল জয়নালের ঘরের দিকে। একটা পুলিশ ঘরের হাঁড়ি আর সানকি হাতে তুলেছিল ছুঁড়ে ফেলার জন্যে, অনন্ত ওর হাত চেপে ধরল। আপনাদের অর্ডার কোথায় দেখান, এভাবে গরীব মানুষের ঘরদোর ভাঙছেন কেন? ততক্ষণে বাকি চারজনও পৌঁছে গিয়েছে, পুলিশগুলো একটু ভড়কে গেল। ওরা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করছিল কী করা যায়, অনন্ত আওয়াজ দিল — গরীবের ওপর জুলুমবাজী চলবে না! ওরা চারজন অভ্যস্ত গলায় কোরাস ধরল — চলবে না চলবে না! অনন্ত বলল — বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ করো। চারজনের গলায় আওয়াজ উঠল — বন্ধ করো বন্ধ করো!

ত্রিবেদী জীপের ভেতর বসেছিল, গোলমাল শুনে নেমে এদিকে এগিয়ে এল। জনতা নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইল, এবারে কি রগড় জমে! ত্রিবেদী অনন্তের পেটে ব্যাটন ঠেকিয়ে বলল — কী হলো, গোলমাল করছো কেন? একটা পুলিশ বলল — স্যার আমরা কাজ করছিলাম, আমাদের অবস্ট্রাকশন দিচ্ছে। অনন্ত বলল — আপনারা ঘরদোর কোন অধিকারে ভাঙছেন?

বাকি চারজন অনন্ত থেকে একটু তফাৎএ দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল ত্রিবেদীর দিকে। ত্রিবেদী ব্যাটন নামিয়েই শান্ত গলায় বলল — কোর্ট অর্ডার আছে। অনন্ত বলল — তাই বলে আপনি এই মানুষগুলোকে প্রস্তুতিরও সময় দেবেন না? মানবিকতাও নেই আপনাদের? ত্রিবেদী এবার কঠিন গলায় বলল — ঘরদোর ভাঙছি ওদের ভাঙছি, তোমার কি? তুমি কেন ইন্টারফিয়ার করছো? অনন্ত হাঁ-হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার দিকে তাকাল। আমি জনতার প্রতিনিধি। ত্রিবেদী ব্যাটন দিয়ে সপাটে বাড়ি মারল অনন্তের গালে। টাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে গেল মাটিতে, তার নাকের কাছটায় কেটে রক্ত পড়ছিল। ত্রিবেদী পুলিশগুলোর দিকে ফিরে বলল — এই পাঁচটাকে ভ্যানে তুলে দাও। জনতা দেখাচ্ছে বাঞ্চোত।

ভ্যানে অনন্ত ডানহাতে নাকের কাছটা চেপে বসেছিল। সঞ্জীব বলল — হঠাৎ মারল শালা, বুঝতেই পারি নি। শান্তনু বলল — তুই কিন্তু ভালো টক্কর দিয়েছিস ত্রিবেদীর সাথে। রঞ্জন ভ্যানের জানালা দিয়ে চলমান বাইরেটা দেখছিল, মুখ ফিরিয়ে বলল — এইজন্য আমি বলেছিলাম বড়দার জন্য ওয়েট করতে, বড়দা লোকগুলোকে অর্গানাইজ করতে পারত। শান্তনু বলল — ও হারামজাদা জনগণ দিয়ে কিস্যু হবে না। কেমন চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকল দেখলি, যেন শালা সিনেমা দেখছে! অনন্ত বলল — নারে জনগণকে আণ্ডার এস্টিমেট করিস না। আজ ওরা বুঝতে পারছে না, কিন্তু আমরা যদি জনগণের সঙ্গে থাকি, ওদের অভাব-অভিযোগগুলোকে তুলে ধরি, একদিন ওরা ঠিক বুঝে নেবে ওদের বন্ধু কারা আর শত্রু কারা। আর সেদিন — !

ভ্যানের ভেতর থেকে কোরাস উঠল। উই শ্যাল ওভারকাম। উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে!

॥ ৪ ॥

মিলান কুন্দেরার 'অমরত্ব' বইটিতে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ঘটনাটি টাইকো ব্রাহে বিষয়ে, যিনি ছিলেন একজন খুব বড়ো জ্যোতির্বিদ। কোন উৎসব উপলক্ষে সম্রাট রুডলফ অন্য অনেকের সাথে ব্রাহেকেও এক রাতে ডিনারে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রাসাদে রাজকীয় টেবিলের চারপাশ ঘিরে বসেছেন সবাই। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, খাওয়া-দাওয়া চলছে, কিন্তু এদিকে ব্রাহের অবস্থা সঙ্গীন, তাঁর, শিশুর ভাষায় বলতে গেলে, হিসি পেয়েছে প্রচণ্ড। অথচ লজ্জায় ব্রাহে না পারলেন কথাটা কাউকে বলতে, না পারলেন উঠে গিয়ে নিজেকে হালকা করে আসতে। ফলে পণ্ডিত জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে রাজসভায় খানাপিনার হুল্লোড়ের ভেতর বেঘোরে মূত্রনালী ফেটে মারা গেলেন!

মূত্রের কথায় অনন্তর মনে পড়ল তার এক ছোট ভাই ছিল। দিগন্ত। পড়াশোনায় মোটামুটি ভালোই ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা সে ছিল একটি গোপালের মতো সুবোধ বালক। সেই সুবোধ বালকটি একদিন পিকিং রেডিওতে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ শুনে ঘর ছেড়েছিল। বাড়ির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না বহুদিন। তখন চারদিকে রামমোহন বিদ্যাসাগরের মাথা কাটা পড়ছে, ট্রাফিক কনস্টেবল থেকে শুরু করে জোতদার — একের পর এক শ্রেণীশত্রু খতম হয়ে চলেছে, 'সংশোধনবাদী', 'নব্য-সাম্রাজ্যবাদী', 'মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া' এইসব শব্দের ধাক্কায় আকাদেমিয়ার দরজা জানালা কেঁপে কেঁপে উঠছে, বিপ্লব মানে তখন শুধুমাত্র একটি ভোরের অপেক্ষা। দিগন্ত তার কলেজের আরো কারো কারো সঙ্গে গিয়েছিল গ্রামে, বিপ্লবের অগ্রগামী সেনা হিসেবে শোষিত নিপীড়িত কৃষক সমাজের সংগ্রামী চেতনাকে জাগিয়ে দেয়ার মহান উদ্দেশ্যে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কথা বলেছিলেন চেয়ারম্যান মাও।

প্রচুর কষ্ট সয়েছিল তারা, দিগন্ত ও তার বন্ধুরা, তাদের চেষ্টাতেও কোন খাদ ছিল না, কিন্তু আমাদের মহান ভারতবর্ষের ধর্মীয়-সামাজিক পরম্পরা, যা সহস্র বৎসরের ধুরন্ধর শ্রেণীস্বার্থচিন্তার ফসল, তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল বিশাল গ্রানাইট পর্বতের মতো। ডন কিহোটের মতো উইণ্ডমিলের সাথে লড়াই করে করে গা হাত পা ব্যথা করে তিন বছর পর দিগন্ত এক রাতে ফিরে এসেছিল ঘরে। অনন্ত সে সময় 'মিসায়' আটকা পড়ে জেলে। পরে মায়ের কাছে শুনেছে দিগন্ত কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে মাকে বলেছিল — বড্ডো খিদে পেয়েছে মা, ভাত খাওয়াবে? দরজায় দুমদাম ধাক্কা পড়েছিল, গণতন্ত্রের ধাক্কা, দিগন্তকে মা বোনের সামনে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, পরদিন সকালে সামনের পার্কে তার ডেড বডি পাওয়া যায়। অনন্ত জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন বাড়ি ফিরে এসেছিল, দেখেছিল তাদের বাড়ির উল্টোদিকের দেয়ালে লাল কালিতে বড়ো বড়ো করে কারা লিখে রেখেছে — কমরেড দিগন্ত অমর রহে। অনেকদিন ছিল লেখাটা, তারপর ক্রমশঃ রোদ ও বৃষ্টিতে ফিকে হয়ে আসতে থাকে। সে সময় একদিন বিকেলে অনন্ত দেখতে পায় একটা নেড়ি কুকুর পেছনের পা তুলে অমর রহের ওপর মূত্রত্যাগ করছে।

মূত্র, যা একদিন টাইকো ব্রাহেকেও অমরত্ব দিয়েছিল!

।। ৫ ।।

সেদিন রাত্রে সিরিয়াল, ইংরেজি খবর দেখা শেষ, আলো নিবিয়ে শুয়ে আছে, হঠাৎ অনন্তর মনে হলো শরীর কি তাকে ভুলে গিয়েছে, না কি সে-ই শরীরকে ভুলে থেকেছে এতোদিন। তার স্ত্রী পাশ ফিরে শুয়েছিল, অনন্ত বাহুতে হাত রেখে আলতোভাবে টানল নিজের দিকে। স্ত্রী ঘুমের আমেজ-লাগা গলায় বলল — উঁ! অনন্ত বিছানায় কনুই-এর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে স্ত্রীর মুখ চুম্বন করল। স্ত্রীর ঘুম চটে গিয়েছিল, বিরক্তির গলায় বলল — কি হচ্ছে, পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা আছে না!

— থাকুক। অনন্ত স্ত্রীর ব্লাউজে হাত দিল।

— ব্যাপার কি! হঠাৎ যে আজ এতো সোহাগ উথলে উঠল। বলল স্ত্রী।

অনন্ত স্ত্রীর স্তন দুহাতে চটকাচ্ছিল। পুরনো বিদ্যুচ্চমক তো ফিরে এল না! হাতের মুঠোয় মাংস উঠে আসছিল শুধু, শরীর কোথায়, শরীর?

শরীর খুঁজতে পৃথিবী তোলপাড় করে ফেলল অনন্ত। তার স্ত্রীর শরীরের প্রতি ইঞ্চি জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজল। আসলে সে কি খুঁজছিল? তার বিস্মৃতির ভেতর, তার অবসাদের ভেতর, তারপর হয়ে আসা দিন ও রাতের ভেতর ছায়া গোপন হয়ে আছে যে জলকল্লোল, মিছিলের মুখ আর হাতে হাত রাখার উজ্জ্বল উত্তাপ, হয়তো অনন্ত আশা করছিল তার দুহাতের মুঠোয় উঠে আসবে তার হারিয়ে যাওয়া ইচ্ছার, ভালো লাগার, ঘৃণার তীব্রতা। কিছুই ফিরে আসে না, কিছুই ফিরিয়ে দেয় না সময়, এমন কি আশাও নয়। তার স্ত্রী বলল — যা করার তাড়াতাড়ি করো আমার ঘুম পাচ্ছে।

স্ত্রীর ছড়ানো, আলুথালু, চেষ্টাহীন শরীরের পর হাপরের মতো উঠছিল আর নামছিল অনন্ত, নামছিল আর উঠছিল। কিন্তু কিছুতেই পেরোতে পারছিল না দুই শরীরের মাঝের সহস্র যোজন দূরত্ব। বাইরে বৃষ্টি কাচের জানালায় ধাক্কা দিচ্ছে, এদিকে সমস্ত শরীর বেয়ে ঘাম পড়ছিল অনন্তের। কিন্তু কোথায় সেই আগুন? চুল সাদা হয়ে গেল অনন্তের, কপালে দীর্ঘ বলিরেখা, হাড়গুলো একে একে খুলে পড়তে থাকল কিন্তু ঘামে স্যাঁতসেঁতে দুই শরীরের মাঝখানে আগুন জ্বলে উঠল না। অনন্ত তাকিয়ে দেখল তার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে।

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল অনন্ত। কাচ বেয়ে বড়ো বড়ো ফোঁটায় নামছে বৃষ্টি। দূরে ঝাপসা হয়ে আছে মধ্যরাতের রাজপথ, একটা গাড়ি বৃষ্টির বুক চিরে নিঃশব্দে ছুটে গেল। অনন্ত তাকিয়ে দেখল তার পরাজিত, অপমানিত লিঙ্গ দুপায়ের মাঝখানে ভারী সঙ্কুচিত, বিষণ্ণ হয়ে ঝুলে আছে। মহাযুদ্ধের সমাপন। দেবতারা পাণ্ডবদের দিব্যাস্ত্র একে একে সব ফিরিয়ে নিয়েছেন। বীর অর্জুন গাণ্ডীব তুলতে পারলেন না, অসহায়ের মতো দেখলেন দস্যুরা পাণ্ডব কুলবধূদের হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে অনন্ত আস্তে আস্তে মেঝের ওপর বসে পড়ল।

মস্কোয় তখন লেনিনের স্ট্যাচু ক্রেন দিয়ে নামানো হচ্ছে। উপস্থিত জনতার হাততালিতে কানে তালা লেগে যাচ্ছিল আমাদের।

৬

আজ বসন্ত। ফুল ফুটুক না ফুটুক।

দাদা মহাশয়

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

।। ১ ।।

"মেন্‌কি, ও মেনি লক্ষ্মীছাড়ি!"

"কেন গা, দাদামশায়?"

দাদামশায়ের সরোষ আহ্বানে মেনকা ছুটিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল। দাদামশায় কাঁধের চাদরটা দাওয়ার এক পাশে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "মেনা? তোকে না রাস্তায় ছুটে বেড়াতে পই পই বারণ ক'রে দিইছি? তবু তুই রাস্তায় যাবি? হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে!"

মেনকা ঘাড় নীচু করিয়া ভারী গলায় বলিল, "আমি তো আর রাস্তায় যাইনে।"

দাদামশায় বলিলেন, "আবার মিথ্যে কথা! কাল রাস্তায় যাস্ নি?"

মেনকা সঙ্কুচিত-কণ্ঠে বলিল, 'সে ত একবার গিয়েছিলাম, রাধী আমায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।"

"রাধী তোর মাথা খেয়েছিল" বলিয়া দাদামহাশয় দাওয়ায় বসিয়া পড়িলেন; চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "বৌমা! বৌমা!"

বধূ রমা রন্ধনশালায় ছিল। সে সক্‌ড়ী ডানহাতটা উঁচু করিয়া, বাঁ হাতে মাথার কাপড় টানিতে টানিতে বাহিরে আসিল। শ্বশুর তাহার দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "ঐ হতভাগা মেয়েটার তরে আমি গলায় দড়ি দেব, না দেশান্তরী হব বল দেখি? একে তো ঐ রূপের ধ্বজা মেয়ে, তার উপর যদি নেংটা কালীর মত রাস্তায় নেচে বেড়ায়, তা হ'লে কে ওকে নেবে বল দেখি? আমার যে চারদিকে শত্রু!"

রমা কোনও উত্তর করিল না, শুধু একবার বক্র সরোষ দৃষ্টিতে মেনকার দিকে চাহিল। শ্বশুর বলিতে লাগিলেন, "তাই তো বলি, ঘোষপুরের রাজীব ঘোষাল এক কথার মানুষ, কাল মেয়ে দেখে আশীর্বাদ ক'রে যাবার কথা, সে মানুষ কেন এলো না? ভোরে উঠেই ছুটেছিলাম। ব্যাপার কি জান বৌমা, তারা এসেছিল। তারপর নিতে চক্রবর্তী রাস্তার মাঝে ঐ রূপের ধুচুনীকে দেখিয়ে দেয়। ঐ নেংটা কালী-মূর্তি দেখেই তারা আস্তে আস্তে স'রে পড়েছে। আমি এখন কি করি বল তো বৌমা, তুমি কোথা হ'তে এ ফাঁসি এনে বুড়োর গলায় দিলে?"

রমা নিরুত্তরে বাঁ হাতে গাড়ুটা লইয়া শ্বশুরের কাছে আগাইয়া দিল। শ্বশুর পা ধুইয়া ঘরে ঢুকিয়া তেল মাখিতে বসিলেন।

ভরাহাটেই যজ্ঞেশ্বর বাপুলীর হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যাহাদের লইয়া কেনা-বেচা, তাহারা একে একে চলিয়া গেল, শোকজীর্ণ বুকে কর্মভোগের বোঝা লইয়া বৃদ্ধ ভাঙ্গাহাটে বসিয়া রহিলেন; আর কতক্ষণে সূর্য অস্ত যায়, কতক্ষণে কালসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু শুধু সেই সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে

পারিলেন না, ভাঙ্গাহাটেও দোকান খুলিয়া তাঁহাকে কেনা-বেচা করিতে হইল। সাধ্বী সহধর্মিণী চলিয়া গিয়াছিলেন, উপযুক্ত পুত্র নির্মল, ঘর-আলো-করা পৌত্র গোপাল, কন্যা সরস্বতী সব চলিয়া গিয়াছিল, শুধু স্বামীপুত্রহীনা পুত্রবধূ রমা তাঁহারই মত শোকদীর্ণ হৃদয় লইয়া তাঁহার পাশে পড়িয়া রহিল। সুতরাং বাপুলী মহাশয়কে ভাঙ্গাহাটেও আবার দোকান পাতিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

বাপুলী মহাশয়ের মত সাদাসিধা লোক গ্রামে ছিল না বলিলেই হয়, কিন্তু ইদানীং তাঁহার মেজাজটা বড় রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, একটুতেই রাগিয়া আগুন হইতেন। সংসারের আঘাতের পর আঘাতে হৃদয়টা এতই ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল যে, সেখানে একটু ঘা লাগিলেই তিনি অধীর হইয়া উঠিতেন। এ অধীরতা স্থায়ী না হইলেও সেই আঘাতের মুহূর্তটি কিন্তু এমন ভয়ানক হইয়া উঠিত যে, বুড়া বুঝি এবার পাগল হইবে।

বুড়া কিন্তু পাগল হইলেন না; শোকের ভারটা শোকতাপহারীর চরণে নিবেদন করিয়া, অনাথা বধূর মুখ চাহিয়া, সংসারের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন; বধূও শোকাকুল জরাজীর্ণ শ্বশুরের সেবাকেই ইহলোকের একমাত্র কর্তব্য ভাবিয়া লইল। উভয়েই ভাবিল, এইরূপে চলিতে চলিতেই একদিন এই শুষ্ক মরুময় পথের প্রান্তসীমায় উপনীত হইবে। কিন্তু যাহা ভাবিল, তাহা হইল না। সহসা আর একটি ক্ষুদ্র হৃদয় তাহাদেরই মত সংসারচক্রের চাপে দলিত নিষ্পিষ্ট হইয়া, তাহাদের শূন্য বুকের এক পাশে স্থান হইল। সে রমার ভ্রাতুষ্পুত্রী মেনকা।

ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ যখন মারা গেল, তখন রমা পাঁচ বছরের মেয়ে। দেখিবার কেহ ছিল না, অগত্যা রমা তাহাকে আনিয়া নিজের কাছে রাখিল। শ্বশুর বলিলেন, "এ আপদ্ আবার জড়ালে কেন বৌমা?"

রমা উত্তর করিল, "দেখবার কেউ নেই ব'লে এনেছি, দিনকতক থাক্।"

কিন্তু দিনকতক পরে রমা যখন বলিল, "মেয়েটাকে আমার পিস্তুত বোনের কাছে পাঠিয়ে দেব বাবা?" তখন বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "যখন এনেছ, তখন কি আর পাঠিয়ে দেওয়া ভাল দেখায়? বল্‌বে, এক মুঠো ভাত দিতে পার্‌লে না। কুটুম্বের কাছে একটা লজ্জার কথা। আর তোমারও তো মনবুঝ্ একটা থাকা দরকার।"

শ্বশুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া রমা মৃদু হাসিল। মেনকা পিসীমা ও দাদামশায়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

এক এক সময় বাপুলী মহাশয় মেনকার ক্রন্দনে, উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিরক্তভাবে বলিতেন, "তুমি কেন এ আপদ্ জোটালে বৌমা, আমার সোনার সংসার ছারখারে গেল, শেষে কি না এই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে নিয়ে কর্মভোগ। দূর ক'রে দাও, দূর ক'রে দাও!"

আবার কখন বা রমা মেয়েটাকে গালাগালি দিলে বা মারিলে বাপুলী মহাশয় বলিতেন, "আহা, কেন ওকে গালমন্দ দাও, মারধর দাও বউমা, ওর আর মুখ চাইতে কে আছে?"

রমা রাগিয়া বলিত, "কেউ যখন নেই, তখন হতভাগী চুলোয় যাক্ না।"

বিষাদ-গম্ভীর-স্বরে বাপুলি মহাশয় বলিতেন, "চুলোয় তো সকলেই গেছে বৌমা, একটা পরের মেয়ে, সেও যদি চুলোয় যায়, তবে সংসারে আর থাক্‌বে কি?"

এমনই আদর ও অনাদরের মধ্যে দিয়া মেনকা যখন একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল তখন বাপুলী মহাশয়ের চমক ভাঙ্গিল, মেনকার যে বিবাহ দিতে হইবে।

বিবাহ দেওয়া কিন্তু সহজ হইল না। একে কালো মেয়ে, তাহার উপর মা বাপ মরা। সুতরাং এরূপ কুরূপা লক্ষণহীনা মেয়েকে সহজে কেহ গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। যে

রাজী হইল, সে তাহার বিনিময়ে এরূপ কাঞ্চনমূল্য চাহিয়া বসিল যে বাপুলী মহাশয় ভয়ে তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতেই সাহসী হইলেন না। তিনি গ্রামের পর গ্রাম ঘুরিয়া পাত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে মেয়ে বারো বছরে পড়িল, তথাপি বাপুলী মহাশয় তাহার বিবাহ দিতে পারিলেন না। যতই অকৃতকার্য হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিল।

।। ২ ।।

শ্বশুর ঘরে ঢুকিলে রমা একবার তীব্র দৃষ্টিতে মেনকার দিকে চাহিল; তারপর দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কঠোরস্বরে ডাকিল, "মেন্‌কি!"

মেনকা শঙ্কিত-দৃষ্টিতে পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। রমা ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "পোড়াকপালি, তোর কি মরণ নেই? সব খেয়ে শেষে আমাকে জ্বালাতে এসেছিস্? তোর জন্যে আমাকে কথা শুন্‌তে হয়?"

মেনকা মৃদু-গম্ভীর-স্বরে উত্তর দিল, "তা আমি কি কর্‌বো?"

গর্জন করিয়া রমা বলিল, "তুই কি কর্‌বি? আমার শ্রাদ্ধ কর্‌বি। খ্যাংরা মেরে বিদেয় কর্‌বো, তা জানিস্?"

মেনকা মুখ তুলিয়া উদ্ধত কণ্ঠে বলিল, "কৈ, মার দেখি খ্যাংরা। যদি না মার। —"

"তবে লা আবাগী' বলিয়া রমা ছুটিয়া আসিল এবং বাঁ হাত দিয়া মেনকার পিঠে কিল-চড় বসাইয়া দিল। মেনকা মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল, রমা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

বাপুলী মহাশয় ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং মেনকার দিকে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ধীর গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "মেনীকে মার্‌লে বৌমা?"

রমা রন্ধনশালা হইতেই ক্রোধগম্ভীর-স্বরে উত্তর দিল, 'মার্‌বো না তো কি কর্‌বো? পোড়াকপালী সকলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে।"

বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "জ্বালালে আর কাকে বৌমা, — আমাকে? তা হ'লে ওটা তোমার মেনীকে মারা হ'লো, আমাকেই মারা হ'লো। আমি রাগের মাথায় দু'কথা বলেছি ব'লেই তো মেয়েটাকে মার্‌লে।"

রমা আর কোনও উত্তর করিল না, আপন মনে গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল। বাপুলী মহাশয় অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ঘুরে ফিরে এসে বড় রাগটা হয়েছিল ব'লেই দু'কথা ব'লেছিলাম। তাতে তুমি এত রাগ কর্‌বে জান্‌লে বল্‌তাম না। তা বৌমা, এবার যদি কখনো কিছু বলি, তা হ'লে আমি বামুন হ'তে খারিজ।"

বাপুলী মহাশয় গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। মেনকা দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিল, তার পরে আঁচলে চোখ্ মুছিয়া দাদামশায়ের খড়ম, প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

বাপুলী মহাশয় স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলেন। ঠাকুর-ঘরে কোনও দিনই তাঁহার এক ঘণ্টার বেশি দেরী হইত না; আজ কিন্তু মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার পূজা শেষ হইল না। রমা রাঁধাবাড়া শেষ করিয়া শ্বশুরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মেনকা গিয়া ঠাকুরঘরের দরজায় দাঁড়াইল। দেখিল, তখনও দাদামশায়ের পূজা শেষ হয় নাই, পূজাই হয় নাই; পুষ্পপাত্রে ফুল, চন্দন, তুলসী সব সাজানো রহিয়াছে। দাদামশায়

শুধু উভয় জানুর উপর উভয় করতল স্থাপন করিয়া নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আছেন। মেনকা যে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছে, তাহাও যেন তিনি জানিতে পারেন নাই।

মেনকা ধ্যানমগ্ন দাদামশায়ের নিশ্চল মূর্তির দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে ডাকিল, "দাদামশায়, অ দাদামশায়!"

বাপুলী মহাশয় চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন। মেনকা বলিল, "দুপুর যে গড়িয়ে গেল দাদামশায়!"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত "হুম্" শব্দ উচ্চারণ করিয়া, বাপুলী মহাশয় পুনরায় আচমন করিলেন এবং ফুল-চন্দন লইয়া ব্যগ্র হস্তে ঠাকুরের মাথায় চাপাইতে লাগিলেন। মেনকা দরজার বাজু ধরিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

ফুল, চন্দন, তুলসী সব যখন নিঃশেষ হইল, তখন বাপুলী মহাশয় বাষ্পসজল-দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে গভীর বেদনাপ্লুতকণ্ঠে বলিলেন, "দামোদর! মেয়েটার একটা গতি ক'রে দাও, এ অভাগা বুড়োকে শেষ ছুটি দাও ঠাকুর!"

বৃদ্ধের শোকদীর্ণ হৃদয়নিঃসৃত একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস সশব্দে গিয়া দামোদরের চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িল। মেনকা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল।

।। ৩ ।।

"হ্যাঁরে মেনি!"

"কেন?"

"তোর বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেল?"

"হোক্ না হোক্, তোমার সে কথায় দরকার কি?"

কথাটা হইতেছিল, নিতাই চক্রবর্তীর ভাগিনেয় ক্ষেত্রনাথ বা খেতুর সঙ্গে। খেতু ছিপ ফেলিতেছিল, আর মেনকা তাহার পাশে বসিয়া দুর্বাঘাস খুঁটিতেছিল। খেতু মেনকার একজন প্রধান সঙ্গী ছিল। সে খেতুর নিকট মার খাইত, গালি খাইত, খেতুকে গালি দিত, অথচ দিনের অধিকাংশ সময় তাহার পাছু পাছু ছুটিয়া বেড়াইত। খেতুও মেনকাকে মারিত, গালি দিত, কিন্তু আর কেহ মেনীকে একটা কথা বলিলে তাহার উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িত। যদি সঙ্গীদের কেহ উপহাস করিয়া বলিত, "হ্যাঁরে খেতু, তুই মেনীকে বিয়ে কর্‌বি?" তাহা হইলে খেতু রাগিয়া বলিত, "বোয়ে গেছে আমার বিয়ে কর্‌তে। এমন স্যাওড়াতলার পেত্নীকেও আবার বিয়ে করে?"

আপনাকে পেত্নী বলিতে শুনিয়া মেনকাও রাগিয়া উঠিত। সে খেতুকে সম্বোধন করিয়া বলিত, "আমি যদি স্যাওড়াতলার পেত্নী, তবে তুই কি আমড়াগাছের ভূত?"

খেতু বলিত, "আমি ভূতই হই আর যা হই, তাই ব'লে তোমার মত কালপেঁচাকে বৌ কর্‌ব না।"

মেনকা রাগে চোখ কপালে তুলিয়া বলিত, "তোর বৌ যদি আমার চেয়ে কালপেঁচা না হয়, তবে আমার নাম মেনকাই নয়।"

খেতু হাসিয়া বলিত, "তোর নাম তো মেনকা নয়ই, মেনী।"

এ সব আগেকার কথা। এখন খেতুর বয়স হইয়াছিল, মেনকাও বড় হইয়াছিল। এখন আর বিবাহের কথা উঠিত না। মেনকাও আর সর্বদা খেতুর সঙ্গে বেড়াইত না। তবে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হইত; ঝগড়াও যে না হইত, এমন নয়।

খেতুর মামা একে বড়লোক, তাহার উপর বাপুলী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বনি-বনাও ছিল না। আগে অনেক মামলা-মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। এখন দলাদলি, ঘরোয়া ঝগড়া মাঝে মাঝে চলিত। সুতরাং খেতুর সহিত মেনকার বিবাহের সম্ভাবনা কোনও পক্ষেরই মনে একবারও উঠে নাই। উঠিলেও কোনও ফল হইত কিনা বলা যায় না। কেন না, খেতুর মামা ভাগিনেয়ের বিবাহ দিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

খেতু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কা'ল না তোকে দেখতে এসেছিল? দে'খে কি বল্‌লে?"

মেনকা উবু হইয়া বসিয়া ঘাসের ডগা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল, "বল্‌লে দিব্যি মেয়ে।"

জলের উপর কাতলা নড়িতেছিল; খেতু তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সহাস্যে বলিল, "তারপর?"

মেনকা। তারপর আর কি, খেয়ে দেয়ে চ'লে গেল।

খেতু। কি খেলে? তোর মাথা?

মেনকা। না, একটা বড় রুইমাছের মাথা।

খেতু। রুইমাছটা কত বড় মেনি?

চারের কাছে একটা মাছ ঘাই দিল; মেনকা সেইখানে একটা বড় ঢিল ফেলিয়া সহাস্যে বলিল, "ঐ রকম বড়।"

খেতু ছিপ ছাড়িয়া মেনকার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "চারে ঢিল ফেল্‌লি যে?"

মেনকাও গলায় জোর দিয়া উত্তর দিল, "তুমিও কা'ল লোকগুলাকে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে দিলে যে?"

খেতু বলিল, "বেশ ক'রেছি, আমার খুশি।"

মেনকা বলিল, 'আমিও ঢিল ফেলেছি, আমার খুশি।"

হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া খেতু বলিল, "আচ্ছা কেমন তোর খুশি দেখবি?"

মেনকা বলিল, "মার্‌বে না কি?"

খেতু বলিল, "মার্‌বো না তো তোকে ভয় ক'র্‌বো না কি?"

মেনকা তাহার মুখের দিকে অতি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

খেতু একবার তাকাইয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল এবং ছিপ তুলিয়া বঁড়শীতে নতুন টোপ গাঁথিতে লাগিল।

মেনকা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তীব্রকণ্ঠে বলিল, "লজ্জা করে না? একটা বুড়ো মানুষ দায় থেকে উদ্ধার হবার জন্যে সারা দেশটা ছুটে বেড়াচ্চে, আর তুমি গেলে কি না তাতে ভাংচি দিতে? মুখ নেড়ে আজ আমায় আবার জিজ্ঞেসা কচ্চো? ছিঃ —"

খেতু দাঁত দিয়া ঠোঁটটা জোরে চাপিয়া ধরিল। মেনকা জোরে জোরে পা ফেলিয়া পুকুরধার হইতে চলিয়া গেল। কিছু দূর চলিয়া গেলে খেতু একবার ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিল। তার পর চার, টোপ, সব জলে ফেলিয়া দিয়া, ছিপ গুটাইতে লাগিল।

।। ৪ ।।

অপরাহ্নে, বাপুলী মহাশয় ফুলগাছের বেড়া বাঁধিতেছিলেন। মেনকা বেড়ার অপরপাশে বসিয়া দড়ি গলাইয়া, বেড়ার বাখারিটাকে সোজা করিয়া ধরিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেছিল। সহসা মেনকা বলিল, "দাদামশায়?"

দাদামশায় উত্তর দিলেন, "কেন মেনি?"

মেনকা। আজ তোমার বড্ড বেশি রাগ হয়েছে, না দাদামশায়?

বাপুলী। বড্ড বেশি।

মেনকা। কেন এত রাগ হয়েছে দাদামশায়?

বাপুলী মহাশয় ঈষৎ হাসিলেন; বলিলেন, "সাধে কি রাগ হয় রে দিদি, একে তো শোকে তাপে বুকের হাড়-পাঁজরাগুলো পর্যন্ত জ'লে খাক্ হ'য়ে আছে। তার উপর তোর বয়স বাড়্ছে, তোর একটা গতি কত্তে পাচ্চি না। চারদিকে শত্রু, তারা হাস্ছে। সারা দেশটা খুঁজে একটা পাত্র পাই না। এর উপর যদি আপনাদের দোষে হাতছাড়া হয়ে যায়, তা হ'লে রাগ হয় কি না বল্ দেখি?"

মেনকাও মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা হয় দাদামশায়।"

বাপুলী। তবে?

মেনকা। তা তুমি রেগেছিলে, বেশ ক'রেছিলে।

বাপুলী। রাগ চণ্ডাল, কি করি বল্, বুড়ো হ'য়েছি, এখন আর মাথার ঠিক রাখতে পারি না।

মেনকা কোনও উত্তর দিল না। বাপুলী মহাশয় দড়ির ফাঁসটা টানিতে টানিতে বলিলেন, "আচ্ছা মেনি!"

মেনকা। কি দাদামশায়?

বাপুলী। আমার কথায় তোর সে দিন খুব দুঃখ হ'য়েছিল?

মেনকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "একটুও না।"

বাপুলী। সত্যি?

মেনকা। সত্যি। পিসীমা খুব রেগে উঠেছিল।

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "ও বেটীর কথা ছেড়ে দে। শোকে তাপে ও ভাজা-ভাজা হ'য়ে আছে।"

মেনকা একটু অভিমানের সুরে বলিল, "তা ভাজা হ'য়ে আছে ব'লে বুঝি আমাকে মার্বে?"

সহাস্যে বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "সে তোকে মারে না মেনি, নিজে নিজেকে মারে। তুই জানিস্ না, কিন্তু আমি জানি; তোর পিঠে যে মারটা পড়ে, তার দশগুণ মার পড়ে ওর উপর। ঐ যা, ফাঁসটা খুলে গেল, দে দিদি, দড়িটা ভাল ক'রে দে।"

মেনকা দড়িটা পুনরায় লাগাইয়া দিতে দিতে, বলিল, "দেখ দাদামশায়!"

বাপুলী। কি?

মেনকা। সে দিন তাদের কে ফিরিয়ে দিয়েছিল, জান?

বাপুলী। বোধ হয় ঐ চক্রবর্তী, নয় তো সাধন ঘোষ।

মেনকা। না দাদামশায়, ওরা নয়।

বাপুলী। তবে কে?

মেনকা। ঐ খেতা ছোঁড়া।

মাথা নাড়িতে নাড়িতে বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "না না, ও এমন কাজ কর্তে যাবে কেন?"

মেনকা দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ দাদামশায়, আমি তোমায় দিব্যি ক'রে বল্তে পারি।"

বাপুলী। বটে, তা হ'লে কেউ বোধ হয় শিখিয়ে দিয়েছিল। নইলে ক্ষেত্তর তো তেমন ছেলে নয়।

মেনকা রাগত-স্বরে বলিল, "না, খুব ভাল ছেলে! তোমার কাছে সবাই খুব ভাল!"

বাপুলী মহাশয় নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। মেনকা বলিল, "কিন্তু দাদামশায়, তুমি আর অত ছুটোছুটি কত্তে পাবে না তা ব'লে দিচ্চি।"

বাপুলী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ছুটোছুটি না করলে বর জুট্‌বে কোথা হ'তে রে পাগ্‌লি!"

জোরে মাথা নাড়িয়া মেনকা বলিল, "তা না জোটে না জুট্‌বে।"

বাপুলী। বর না জুট্‌লে বিয়ে হবে কেমন ক'রে?

মেনকা। যেমন ক'রে হয় হবে।

বাপুলী। কেমন ক'রে হবে বল্‌। তবে কি আমার গলাতেই মালা দিবি?

মেনকা। তাই দেব।

বাপুলী মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মেনকা লজ্জায় মুখ নীচু করিল। বাপুলী মহাশয় সহাস্য কণ্ঠে বলিলেন, "আরে ভাই, তুই যেন এই বুড়োর গলায় মালা দিলি, আমার কি আর সে সময় আছে দিদি, এখন যাত্রা করিলেই হয়।"

অন্তর্নিহিত পুঞ্জীভূত বেদনা একটা দীর্ঘনিশ্বাস রূপে বাহির হইয়া পড়িল। মেনকাও একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বাপুলী মহাশয় তখন বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে গুন্‌-গুন্‌ করিয়া গান ধরিলেন,—

"অবেলায় হাট ভাঙলি শ্যামা, কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি।
ভরা হাটের হেটো যারা, একে একে গেল তারা,
আমি কর্ম্মদোষে রইলাম ব'সে পাপের বোঝা শিরে ধরি।"

মেনকা বলিল, "তুমি ত বেশ গাইতে পার দাদামশায়!"

বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "আর ভাই, এমন একদিন ছিল, যখন তোর দাদামশায়ের গান শুন্‌বার জন্য কত লোক হাঁ ক'রে থাক্‌তো।"

মেনকা। কৈ, এদ্দিনের ভিতর একদিনও তো তোমাকে গান গাইতে শুনিনি।"

বাপুলী। শুন্‌বি আর কোথা থেকে বল্‌, নিমে ছোঁড়া কি কিছু রেখে গিয়েছে, গান সুর তাল সব ভুলিয়ে দিয়ে চ'লে গেছে। আজ তোর সঙ্গে কথায় কথায় হঠাৎ মনটা কেমন হয়ে উঠ্‌লো, তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মেনকা আগ্রহের সহিত বলিল, "বেশ মিষ্টি গান, তুমি গাও দাদামশায়।"

"মিষ্টি!" বলিয়া বাপুলী মহাশয় মৃদু হাসিয়া গাহিতে লাগিলেন, —

"রবি যে বসেছে পাটে, কি কর্‌বো এই ভাঙ্গা হাটে,
নে মা কোলে অভাগারে, দে মা তোর ঐ চরণ-তরী।"

অস্তোন্মুখ রবি শেষ রক্তিমচ্ছটায় বৃদ্ধের গণ্ড রঞ্জিত করিয়া চক্রবালপ্রান্তে অদৃশ্য হইল। বৃদ্ধ উদ্বেল-প্রাণে বিহ্বল-কণ্ঠে বার বার আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিলেন, —

"নে মা কোলে অভাগারে, দে মা তোর ঐ চরণ-তরী।"

।। ৫ ।।

"নমস্কার মশায়, আপনারই নাম বোধ হয় যজ্ঞেশ্বর বাপুলী? এই বুঝি আপনার দৌহিত্রী? তা দেখতে এমন মন্দই বা কি, রংটা একটু ময়লা, তা এর চেয়েও — বুঝলেন কি না — কালো মেয়ে অনেক আছে। আমি কিন্তু — বুঝলেন কি না — কাল মেয়েই পছন্দ করি; গেরস্ত-ঘরে সুন্দুরী নিয়ে কি হবে? কথাতেই আছে — 'গাই কিন্‌বে ঝাঁপড়ি, বৌ আন্‌বে' — বুঝলেন কি না, — হা হা হা হা!"

এক নিশ্বাসে এতগুলা কথা বলিয়া ফেলিয়া আগন্তুক হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বাপুলী মহাশয় বিস্ময় বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে এই নবাগতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মেনকা দড়ি ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

আগন্তুক তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "দিব্যি মেয়েটি, কালো হইলে কি হয়, লক্ষণযুক্ত।" তার পর বাপুলী মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমাকে বোধ হয় চিন্‌তে পার্‌বেন না, চিন্‌বেন বা কেমন ক'রে? দেশে ত থাকি না, ক্বচিৎ কখনো যাই আসি। কল্‌কাতায় চাকরী করি, সেইখানেই এক প্রকার বসবাস। আমার নাম — বুঝ্‌লেন কি না — প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, ঠাকুরের নাম ধনকৃষ্ণ গাঙ্গুলী।"

বাপুলী মহাশয় ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক হাত নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা হা, ব্যস্ত হবেন না, আমি এইখানেই বস্‌ছি, — বুঝলেন কি না — দিব্বি জায়গা, হা হা হা হা?"

হাসিতে হাসিতে আগন্তুক সেইখানে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। বাপুলী মহাশয় ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "না না, এখানে বসাটা কি ভাল দেখায়।"

আগন্তুক সহাস্যে বলিলেন, "মন্দই বা কি, আপনি বসুন, এইখানে বসেই কথাবার্তা স্থির হ'য়ে যাক্। আপনারও দেখছি আমার মত ফুল গাছের সখ। তা কল্‌কাতায় এমন ফাঁকা জায়গা কোথায় পাই বলুন, কাজেই — বুঝ্‌লেন কি না — টবেই বসাতে হয়েচে। দুধের স্বাদ —বুঝলেন, কি না ঘোলেই মেটাতে হয়, হা হা হা হা !"

এই অদ্ভুত-প্রকৃতির লোকটিকে লইয়া বাপুলী মহাশয় যে কি করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। আগন্তুক কিন্তু আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আপনি না কি নাতনীটি নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। তা আপনার কোনও চিন্তে নাই। আমারও এক ছেলে, পাশ টাশ নাই বটে, কিন্তু লেখা-পড়ায় হিসাব-নিকাশে একেবারে হুনুরী। কত জায়গা থেকে সম্বন্ধ আস্‌ছে। তা বুঝলেন কি না — সম্বন্ধ কি এলেই হোল? মেয়েটি লক্ষ্মণযুক্ত, মনের মত, বংশটি ভাল, এ সকল চাইতো। টাকা — ছাই টাকা, — টাকায় — বুঝলেন কি না — কি আসে যায়। এই বয়সে কত টাকা রোজগার, কত টাকা খরচ কর্‌লাম। হা হা হা হা?"

বাপুলী মহাশয় এই নবাগতের সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; বলিলেন, "তা উঠে বৈঠকখানায় চলুন, একটু তামাক-টামাক'—

বাধা দিয়া আগন্তুক বলিলেন, "বল্‌ছি তো, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি তামাক খাই না। কোনও নেশারই — বুঝলেন কি না — বশ হওয়া ভাল নয়। তামাক যে খেতাম না তা নয়; বল্‌লে না বিশ্বাস কর্‌বেন, দিনে একশ' ছিলিম তামাক, রাতে ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে তামাক খেতাম। তার পরে একদিন বুঝলেন কি না — ইষ্টিমারে কলকাতায় যাচ্ছি, এক বেটা চাষা নারকেল-ছোবড়ায় আগুন ধরিয়ে তামাক খাচ্চে। বড়ই ইচ্ছে হলো। গিয়ে হাত বাড়ালাম। তা বেটা চাষা বললো কি জানেন 'থামো ঠাকুর, তোমার লেগে সাজা হয় নি।' মনে বড়ই ধিক্কার হলো। সেই দিন থেকে বুঝলেন কি না — একেবারে ত্যাগ — হুঁকো কল্‌কে টিকে তামাক সব গঙ্গার জলে — "হা হা হা হা!"

অতঃপর বাপুলী মহাশয়ের অনুরোধে আগন্তুক প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলীকে উঠিয়া আসিয়া বৈঠকখানায় বসিতে হইল। সন্ধ্যার পর আর একবার মেয়ে দেখা হইল; মেয়ে দেখিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। আদান-প্রদানের কথা উঠিলে বলিলেন, বিবাহের আবার চুক্তি কি, যারা ইতর, যাদের টাকার খাঁই — তারাই বুঝলেন কিনা — আগাম হ'তে চুক্তি করে নেয়। আপনার আশীর্বাদে আমার অভাব কি? আপনার যেমন

ক্ষমতা তেমনি দেবেন; একটি হরীতকী দিয়ে — বুঝলেন কি না — কন্যা উৎসর্গ করবেন। আমাকে কি সেই রকম চামার পেয়েছেন! হা হা হা হা।"

পাঁজি খুলিয়া বিবাহের দিন দেখা হইল। মাঘের ২৭শে, ২৮শে ছাড়া আর দিন নাই। ২৮শে যজুর্ব্বিবাহ — ফাল্গুন মাস অকাল। গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "তা হ'লে এই ২৭শে তারিখে, শুভকার্য নির্বাহ কর্‌তে হবে। ফাল্গুনমাস অকাল, অকালে বিবাহ হ'তেই পারে না। আজকাল আর এ সব মানে না, কিন্তু আমি — বুঝলেন কি না — এ সকল খুব মেনে চলি। আমাদের আর্য ঋষিরা যে সব ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, তার একটিও বাজে নয়। আজকালকার লোক সব মুখ্যু কি না, এ সকলের কি বুঝবে? হা হা হা হা।"

অগত্যা ২৭শে তারিখেই দিনস্থির হইয়া গেল। মাঝে শুধু একটা দিন। পরদিন সকালেই বাপুলী মহাশয় বরের বাপের সঙ্গে গিয়া পাত্র দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিলেন। বিবাহের দিন সকালে গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেল।

॥ ৬ ॥

"বোষ্টম, বোষ্টম, — বেটা বোষ্টমের ছেলে।"

বাপুলী মহাশয় তখন হাতে আলোচাল লইয়া বরের হাঁটু ধরিয়া বরণ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় একটা গোল উঠিল, — "বোষ্টম, বোষ্টম, — বেটা বোষ্টমের ছেলে।"

কলরব করিতে করিতে গ্রামের একপাল লোক সম্প্রদানস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাপুলী মহাশয়ের হাত হইতে চালগুলা মাটিতে পড়িয়া গেল। একজন বরের হাত টানিয়া বলিল, "তবে রে বেটা বৈরাগী!"

বাপুলী মহাশয় বিস্ময়রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "থাম, এ বোষ্টম নয়, প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর ছেলে অমরনাথ —"

যোগীন পাল চীৎকার করিয়া বলিল, "ওর কোন পুরুষে প্রাণকেষ্ট গাঙ্গুলীর ছেলে নয়, বেটা ডাহা বোষ্টমের ছেলে।"

বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "তার প্রমাণ?"

ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া খেতু বলিল, "তার প্রমাণ — আমি। এ সব আমার মামার কারসাজি বাপুলী মশায়, আপনাকে জাত পাত করবার ফন্দী। দেখুন দেখি, আপনি এই বেটাকেই আশীর্ব্বাদ ক'রে এসেছিলেন কি না?"

একজন আলোটা সরাইয়া আনিয়া বরের মুখের কাছে ধরিল, বাপুলী মহাশয় বেশ করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "উঁহু, বোধ হয় যেন সে নয়, যেন একটু তফাৎ—"

খেতু উচ্চকণ্ঠে বলিল, "একটু কি, অনেকটা তফাৎ। সে বামুনের ছেলে, আর এ বেটা বৈরিগীর পুত। গয়ারাম বৈরিগীর ছেলে কেনারাম বৈরিগী। বেটা নাম গেয়ে বেড়ায়, আমি ওর সাত পুরুষের খবর জানি। আর প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলীটা কে জানেন? মামার বেয়াই তারাচাঁদ আকুলি।"

জনকয়েক লোক কেনারাম বৈরাগীকে টানিয়া লইয়া গেল। প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলী বা বরযাত্রীদের কোনই উদ্দেশ মিলিল না। বাপুলী মহাশয় কুশাঙ্গুরী হস্তে বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

সহসা বাপুলী মহাশয় উঠিয়া দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘরে মেনকা নবপট্টবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তখনও বসিয়াছিল। বাপুলী মহাশয় গিয়া তাহার হাত ধরিলেন। পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আয় মেনকি, তোকে আজ দামোদরের হাতে প্রদান কর্‌বো।"

বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে মেনকাকে টানিয়া আনিয়া কন্যার আসনে বসাইলেন। পুরোহিতকে বলিলেন, "মন্ত্র পড়ান।"

বৃদ্ধের উন্মাদভাব দেখিয়া পুরোহিত ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বাপুলী মহাশয় পুনরায় বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি মন্ত্র পাঠ করান। লগ্ন অতীত হইয়া যায়।"

পশ্চাৎ হইতে খেতু বলিল, "দামোদর তো আর মন্ত্র বল্‌তে পারবে না, তাঁর হয়ে মন্ত্র বল্‌বে কে?"

বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "আমি বল্‌বো।"

খেতু বলিল, "তার চেয়ে আমিই বলি না কেন।"

খেতু ফস্‌ করিয়া বরের আসনে বসিয়া পড়িল। সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত, নির্বাক্‌। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বাপুলী মহাশয় বলিলেন, "খেতু!"

খেতু হাসিতে হাসিতে বলিল, "যা বল্‌বার পরে বল্‌বেন এখন লগ্ন বয়ে যায়।" শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। খেতু মেনকার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তোর কথা রইল না মেনী, তোর চেয়ে কালপেঁচা আমার বৌ হ'ল না।"

অসুখ

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

নিজের ফ্ল্যাটের সামনে এসে ডোর-বেল-এ চাপ দিল মানব।

নন্দিনী দরজা খুলল। কিন্তু তার মুখ ভার।

— হ্যাঁগো — সন্ধে হয়ে গেল এখনও মিলি বাড়ি ঢুকল না!

— সে কি!...এখনও মেয়েটা ফেরেনি?

অবাক হল মানব। একটু বিরক্তও হল।

— আচ্ছা —আমি দেখছি।...... দরজাটা বন্ধ কর।

সিঁড়িতে চটির শব্দ উঠল। নীচে নেমে গেল মানব।

সুদৃশ্য, পরিচ্ছন্ন এবং ঝাঁ-চকচকে এই আবাসনটির নাম — স্বপ্নময়। এখানে সাতশো-আশি বর্গফুটের একটা ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছে মানব বেশিদিন নয়, মাত্র এক বছর কয়েক মাস। আবাসনের বাসিন্দারা স্বভাবগতভাবেই বোধহয় তেমন আলাপি হয় না। অনেক সময় সামনাসামনি দেখা হলেও মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। সে কারণেই বোধহয় আশেপাশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে এখনও মানব বা নন্দিনী; — কারওই ভাবসাব তেমন জমে ওঠেনি। কিন্তু তাদের একমাত্র মেয়ে মিলি এখানে বেশ কিছু বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছে। তাদের মধ্যে সব থেকে বেশি ভাব তার শুভশ্রীর সঙ্গে। এই আবাসনের 'এম' ব্লকের দোতলায় থাকে। মিলির মতো শুভশ্রীও ক্লাস সিক্সে পড়ে। তবে একই স্কুলে নয়। অন্য স্কুলে। মিলি পড়ে ইংরেজি-মাধ্যমের এক নামী স্কুলে। যেখানে বছরখানেক আগে তাকে ভর্তি করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল মানবকে।

শুভশ্রীদের ফ্ল্যাটে অবশ্য রোজই খেলতে যায় মিলি। কিন্তু কোনও দিনই বাড়ি ফিরতে তার এত দেরি হয় না। তাহলে আজ দেরি হচ্ছে কেন? আবাসনের পিচ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মেয়ের প্রতি মৃদু রাগ অনুভব করে মানব। নন্দিনী যে মাঝেমাঝে মিলির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সেটা ঠিক। বাইরের দিকে আজকাল যেন বড় মন হয়েছে মিলির। এবং পড়াশোনাতেও সে তেমন মনোযোগ দিচ্ছে না।

অবশ্য মিলির পড়াশোনার ব্যাপারে মানব নিজে যে খুব একটা খোঁজখবর রাখতে পারে তা নয়। ক্লাস সিক্সের পড়ুয়াকে পড়ানোর মতো ধৈর্য তার নেই। মিলির পড়াশোনা নন্দিনী সামলায়।

নন্দিনী একটা কথা মানবকে প্রায়ই বলে। মিলি নাকি স্কুলের হোম-টাস্ক থাকলে মা-কে ঠিকমতো জানায় না। কয়েকদিন আগে ক্লাস-টিচার মিলির খাতায় 'অ্যাডভার্স কমেন্ট' করেছেন। মানব ঠিক বুঝতে পারে না কেন এমন হচ্ছে। সে তো অনেক আশা করে মিলিকে একটা দামি স্কুলে ভর্তি করেছে। কিন্তু তাতে ফল ভাল হওয়ার বদলে এরকম হচ্ছে কেন।...... আজ রবিবার। পরশুদিন মিলি খামের মধ্যে আঁটা এক চিঠি নিয়ে এসেছে স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের কাছ থেকে। খামের ওপর লেখা ছিল— 'আরজেন্ট' এবং 'কনফিডেনসিয়াল' —।

চিঠি খুলে মানব দেখেছিল, লেখা আছে — 'ওয়ার্ড'-এর ব্যাপারে 'পেরেন্টস'-এর কোনও একজনের সঙ্গে হেডমিস্ট্রেস আলোচনা করতে চান।

আলোচনার বিষয়বস্তু কী হতে পারে! মানব নন্দিনীকে জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু নন্দিনী জানাল যে, সে কিছু বুঝতে পারছে না। মিলিকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। সে কী করে জানবে? .....ঠিক হয়েছিল যে, মানব নিজেই যাবে স্কুলে কথা বলতে। সোমবার। তার মানে আগামীকালই মিলির স্কুলে যেতে হবে তাকে। হাঁটতে হাঁটতে মানবের মনে পড়ল। অফিসে সে বলেও রেখেছে। সোমবার তার আসতে একটু দেরি হবে।

রবিবারের সন্ধে বলেই বোধহয় আবাসন চত্বর একেবারে ফাঁকা, শুনশান। বাসিন্দারা সবাই নিজের নিজের কোটরের মধ্যে ঢুকে ছুটির দিনের শেষ তলানিটুকু যতটা পারে আশ মিটিয়ে উপভোগ করে নিতে চাইছে। টিভি-তে বোধহয় উত্তম-সুচিত্রার কোনও পুরনো ফিল্ম চলছে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গলায় গানের টুকরো মানবের কানে আসছে। সুরটা খুবই চেনা। কিন্তু তবুও এই মুহূর্তে ফিল্মের নামটা মনে পড়ছে না! তখন কলেজে সেকেন্ড ইয়ার।..... সম্ভবত মিত্রা-য় ছবিটা দেখেছিল। দুজন বন্ধু ছিল সঙ্গে। শিশির আর কমল। আর একজনও ছিল। কমলের বান্ধবী। কী আশ্চর্য! সেই মেয়েটার নামও মনে আসছে না, শ্রাবণী কী? নাহ্ — শুক্লা! হ্যাঁ — শুক্লাই। পরে ওরই সঙ্গে কমলের প্রেম জমে ওঠে। এবং ওরা বিয়েও করে। কিন্তু বহুদিন কমলের সঙ্গে তো আব যোগাযোগই নেই। সে ব্যাঙ্কের বড় চাকরি নিয়ে বাঙ্গালোরে চলে গেছে।

আজ বিকেলের দিকে টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনতে একটু বাজাবের দিকে যেতে হয়েছিল মানবকে। পাঁউরুটি, মাখনের প্যাকেট, সেভিংক্রিম, এসব কেনার দরকার ছিল। তখনই সে মিলি-কে 'এম' ব্লকে পৌঁছে দিয়েছিল। মিলি ব্লকের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। মানব আর দাঁড়ায়নি। হেঁটে গিয়েছিল বাজারের দিকে। জিনিসগুলো কিনতে যে তার খুব দেরি হয়েছে তা না। রাস্তায় তার সহকর্মী দিলীপের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দিলীপও এই আবাসনের বাসিন্দা। অনেক আগে থেকে সে এখানে আছে। বস্তুত, তারই উৎসাহে মানব এখানে ফ্ল্যাট কেনায় আগ্রহী হয়। দেখা হতে দিলীপ দোকান থেকে চা খাবার প্রস্তাব দিল। বাজারেই একটা চায়ের দোকানে বসল তারা। চায়ের দোকানে তো আজকাল বসার সুযোগই হয় না। ওখানে বসলেই তার কলেজ-জীবন এবং বেকারত্বের দিনগুলো মনে পড়ে। দিলীপ চা নিল। সিগারেট। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডায় মেতেছিল। তারপর কখন নিঃশব্দে সন্ধে নেমে এল আর খেয়াল নেই।

শুভশ্রীদের ব্লকের দোতলায় উঠেই যেন একটা ধাক্কা খেল মানব। ওদের ফ্ল্যাটে তো তালা! মিলি যখন ঘণ্টাখানেকেরও আগে এসেছিল এখানে; তখনও কী এরকম তালাবন্ধই ছিল এই ফ্ল্যাট?...... সিঁড়ির জমাট আঁধার টিমটিমে বাল্বের আলোয় কীরকম কুয়াশার মতো লাগছে। মানবের নাকের সামনে দেওয়ালে একটা পেটমোটা টিকটিকি গভীর মনোযোগে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সিঁড়িতে অস্পষ্ট চটির শব্দ। কে যেন উঠে আসছে। কে? লোকটা একেবারে কাছাকাছি এলে বুঝতে পারল মানব। রমেনবাবু। অফিস যাওয়ার সময় প্রায়ই দেখা হয়। মৌখিক আলাপও আছে। সেই সূত্রেই মানব ওঁকে নামে চেনে।

— এঁরা কতক্ষণ বাইরে গেছেন?......জানেন?

— কতক্ষণ? হাতে জিনিসে বোঝাই বিগ্-শপার। কপাল কুঁচকে ভাবছিলেন রমেনবাবু। 'আমি তো তিনটে নাগাদ বেরিয়েছিলাম। সন্তোষপুর গিয়েছিলাম। সম্বন্ধীর বাড়ি। তখনও দেখেছিলাম — তালাই ঝুলছে।'

— সে কী। বুকটা মুহূর্তে ধক্ করে উঠল মানবের। সে একরকম উড়েই সিঁড়ি টপকে বাইরে এল। কিছু না বুঝে রমেনবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

তার মানে মিলি তো শুভশ্রীদের বাড়ি ঢুকতেই পারেনি। তাহলে বাড়ি না ফিরে কোথায় গেল? আরও এক বন্ধু তাপসীদের বাড়ি? সেখানে গিয়ে জানা গেল, তাপসীর ইনফ্লুয়েঞ্জা। নাহ্, মিলি আসেনি। তাহলে তানিয়াদের বাড়ি? মৌমিতাদের? পরপর খোঁজ নিল মানব। নাহ্ এঁদের কারও বাড়িতেই মিলি যায়নি। তাহলে গেল কোথায়। কোথায়? এতক্ষণ অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ি চলে যায়নি তো! কিংবা মানব যখন এদিকে আসছিল, তখনই হয়তো মিলি তার পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। আবাসনের রাস্তার আলোগুলো অধিকাংশই জ্বলে না। সুতরাং কেউ কাউকে হয়তো দেখতে পায়নি। কিন্তু সেটা জানা যাবে কীভাবে? বাড়ি ফিরে যাবে মানব? অনেকটা হাঁটতে হবে। এদিকটা আবাসনের শেষ। আর ক-পা হাঁটলেই বড় রাস্তা। সেখানে আবাসনের গেটের ঠিক বিপরীতেই ফোনের বুথ। সুতরাং...

সুতরাং হাস্যকর মনে হলেও মানব পা চালিয়ে পাবলিক বুথে এল। এবং নিজের বাড়িতেই ফোন করল।

— হ্যালো? নন্দিনীর গলা।

— আমি বলছি। মিলি ফিরেছে?

— মিলি? .... না তো। তুমি যে বললে শুভশ্রীদের বাড়ি যাচ্ছ?....

— শুভশ্রীরা দুপুর থেকে নেই। ওদের ফ্ল্যাটে তালা.....।

— সে কী। তাহলে মেয়ে কোথায় গেল?

— দেখি আর একবার খোঁজ করে। ব্যস্ত হয়ো না।

রিসিভার নামিয়ে রাখল মানব। কট্ কট্ কট্ কট্.....। মেশিন থেকে বিলের প্রিন্ট আউট বেরিয়ে এল। দু টাকার একটা কয়েন এগিয়ে দিয়ে মানব আবার রাস্তায় নামল।

কিন্তু এই আবাসনের সত্তরটি ফ্ল্যাটের প্রতিটিতে মিলির খোঁজ করা সম্ভব নয়। তাই মানবের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। উচিত-অনুচিতের তোয়াক্কা না করে সে আবাসনের পিচ-রাস্তা ধরে হাঁটছিল আর গলা খুলে চেঁচাচ্ছিল — মিলি! মিলি!...যদি কোনও ফ্ল্যাটে ঘটনাচক্রে মিলি থেকেও থাকে; তাহলে বাবার এই ডাকে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে!

মিলির সাড়া নেই। যদিও মানবের সেই বেপরোয়া চিৎকার আবাসনের ঘরে ঘরে রবিবাসরীয় এবং সান্ধ্য আলসেমিতে তীক্ষ্ণ পাথরখণ্ডের মতো বিঁধছিল যেন। জ্যামিতিক ছকে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্ল্যাটগুলোর বারান্দায় — একটা.....দুটো.....তিনটে......; ক্রমে অনেক মুখের কৌতূহলী সমাবেশ।

— কী ব্যাপার!.....ওভাবে চেঁচাচ্ছেন কেন?

— মেয়েকে পাচ্ছেন না?.... সে কী। কোথায় গেল?.........

— ওমা সে কী কাণ্ড! এই যাও-যাও। নীচে নেমে দ্যাখো।

— হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি আমরা। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

আরও আধঘন্টার মতো সময় লাগল নিশ্চিত হতে যে মিলি সত্যি সত্যিই নিখোঁজ। আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল খবরটা। আবাসনের সবাই জানল যে, 'সি' ব্লকের মানব রায়-এর এগারো বছরের মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মানবদের ফ্ল্যাটে এখন প্রচুর মানুষের ভিড়। কাউকে কাউকে সে চেনে। অনেককেই চেনে না। অনেক মহিলাদেরও দেখতে পাচ্ছে মানব। আকুল হয়ে কাঁদতে থাকা নন্দিনীকে তারা সামলাবার চেষ্টা করছে। অনেক রকমের প্রস্তাব.. প্রশ্ন......। মানব শুধু একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। তার মাথায় কিছুই তেমন ঢুকছে না।

— থানায় ফোন করি। কী বল? দিলীপ জিজ্ঞেস করল।

থানা? এই মুহূর্তে মানবের খেয়াল হল যে, মিলির খোঁজ করতে হলে থানারই শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। থানায় যতবার রিং করল দিলীপ; ততবারই এনগেজড্ সাউন্ড। থানা, ফায়ার-ব্রিগেড, গ্যাসের দোকান, কর্পোরেশন অফিস, পাওয়ার স্টেশন-এর অফিস; এসব জায়গায় ফোন করলে বোধহয় কখনও চট করে পাওয়া যায় না।

ধুস! বিরক্ত হয়ে সে হাল ছেড়ে দিল। থানার ফোন হয় খারাপ। নাহয় রিসিভার তুলে রেখেছে। থানার ব্যাপার-স্যাপার তো!

— কী করা যায় বল তো? প্রশ্নটা করে মানবের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে ধরাল দিলীপ।

— আপনারা সিওর তো যে অন্য কোথাও মেয়ে যেতে পারে না? একজন প্রতিবেশীর জিজ্ঞাসা।

— অন্য কোথাও মানে! মানব মুখ তুলল।

— ধরুন — একটু দূরে অন্য কোনও বন্ধু-টন্ধুর বাড়ি? কিংবা কোনও আত্মীয়স্বজনের কাছে.....?

— আমাদের না জানিয়ে হাউসিং-এর বাইরে যেতে মেয়ে অভ্যস্তই নয়।

ঘরের মধ্যে আবার অস্বস্তিকর নীরবতা। শুধু পারলারের ওপাশ থেকে নন্দিনীর কান্নার মৃদু শব্দ।

শেষ-হয়ে-আসা সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল দিলীপ। তারপর উঠে দাঁড়াল। মানবকে বলল — আর বোধহয় দেরি করা ঠিক নয়। .....থানাতেই যেতে হবে।

থানা এখান থেকে বেশি দূর নয়। হেঁটে মিনিট কুড়ি। মানব, দিলীপ এবং আবাসনের আরও কয়েকজন দ্রুত থানার দিকেই হাঁটছিল। শিব-মন্দিরের বাঁকটা ঘুরতেই দিলীপ আচমকা বলল — আরে! ওই মেয়েটা কে আসছে? আমাদের মিলি না?

কে মিলি? .... কোথায় মিলি? আশ্চর্য! হ্যাঁ — মিলিই তো!

প্রবল আবেগের হাঁচড়পাঁচড় মানবের বুকে। সে ছুটে গেল।

গলির আলো খুব যে জোরালো তা না। তবুও কী রকম আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হেঁটে আসা নিজের মেয়েকে কী চিনতে ভুল হয়! এক ঝটকায় মিলিকে কোলে তুলে নিল মানব।

অনেকদিন পরে মেয়েকে কোলে তুলল।

— কোথায় গিয়েছিলি মিলি? কোথায়?....... বল মা। পাগলের মতো মানবের চুমো মেয়ের কপালে। অ্যাতো তাড়াতাড়ি সে মিলিকে ফিরে পাবে — ভাবেইনি!

— হ্যাঁরে? কোথায় গিয়েছিলি? আমাদের না বলে?

— আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বাবা। মৃদু স্বরে বলল মিলি।

—ধরে নিয়ে গিয়েছিল!....কারা?

শুধু মানবের একার নয়। অনেকেরই প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কোনটার উত্তর দেবে একরত্তি মেয়েটা!

দিলীপ বুঝল ব্যাপারটা। বলল — এই মুহূর্তে খুব ঘাবড়ে গেছে ও। এখনই এভাবে জেরা করা ওকে ঠিক না। আগে বাড়ি চলুক। মায়ের কাছে ওকে বিশ্রাম নিতে দে। তারপর না হয় শোনা যাবে কী হয়েছিল......।

একটু ধাতস্থ হবার পর মিলি অবশ্য সবই বলল। রীতিমতো চাঞ্চল্যকর কাহিনী।

শুভশ্রীদের ফ্ল্যাটে তালা দেখে সে রাস্তায় নেমে আসে। কোথায় যাওয়া যায় ভাবছিল। এমন সময় পিচ রাস্তা ধরে একটা নীল অ্যামবাসাডর তার ঠিক পাশটিতে এসে দাঁড়ায়। সে

কিছু বুঝবার আগেই দুজন লোক গাড়ি থেকে নেমে আসে। তাকে টেনে হিঁচড়ে জোর করে গাড়িতে তোলে।

— চেঁচালি না কেন? চিৎকার শুনলেই তো কেউ না কেউ ছুটে আসত? নন্দিনী বলল।

— আমি তো চেঁচাতেই যাচ্ছিলুম। কিন্তু একটা লোক আমার মুখটা অ্যাতো জোরে চেপে ধরল যে চেঁচাতে পারলুম না। খুব লাগছিল মুখে!

— আহা! দেখি। ঠোঁটটায় লেগেছে? নন্দিনী মিলির ঠোঁট দেখতে লাগল। মানবও তাকাল। কিন্তু তেমন কোনও আঘাতের চিহ্ন অবশ্য দেখতে পেল না।

— ঠিক আছে। তারপর? তোকে নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করল?

মিলি যা জানাল তা হল সংক্ষেপে এরকম।

মিলিকে জোর করে তুলে নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করল। দুজনের একজন তার মুখ সমানে চেপে ধরে আছে। আর একজনও তাকে জাপটে ধরে আছে। যাতে সে বেশি ছটফট না করতে পারে। কিন্তু কিছু দূর যাবার পরই ওদের মধ্যে তর্কাতর্কি বেধে যায়। যে গাড়ি চালাচ্ছিল সে বলে যে, যাকে ধরে আনার কথা হয়েছে সে এই মেয়েটি নয়। ভুল মেয়েকে ধরে আনা হয়েছে। .....তারপর খানিক বাদেই ওরা গাড়ি থামিয়ে মিলিকে নামিয়ে দেয়।

— কোথায় নামিয়ে দিল? ..... হ্যাঁরে কোথায়?

— বেশি দূরে নয়। চৌরাস্তার মোড়ে — বাসস্ট্যান্ডে।

— ওমা! সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে এলি? একা একা অতটা পারলি আসতে! ট্রাক, বাস, ম্যাটাডোর, অটো — সর্বক্ষণই তো যাতায়াত করছে ওখান দিয়ে! — নন্দিনী মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নেয়।

ভয় যে মিলির করছিল না তা নয়। কারণ একা একা ওই রাস্তা দিয়ে সে কোনওদিনই হাঁটেনি। কিন্তু রাস্তাটা সে চেনে। কারণ ওই রাস্তা ধরেই সে প্রতিদিন স্কুলবাসে স্কুলে যায়। একটু ভয় করছিলই। কিন্তু যা হোক চলে আসতে পেরেছে।

— তোকে যখন গাড়ি থেকে রাস্তায় নামিয়ে দিল, তুই তখন চেঁচালি না কেন? জিজ্ঞেস করল মানব।

— তখন আর চেঁচাবার কথা মনে হয়নি বাবা। মনে হচ্ছিল কখন তোমাদের কাছে ফিরব।

নন্দিনী এবার মিলিকে জড়িয়ে ধরল বুকে। তা বটে! — আর আমি তোকে একা একা কোথাও বেরোতে দিচ্ছি না। উঃ আজ ভগবান ছিল! নইলে কী যে হত!

এই সময় দিলীপ এসে মানবকে একবার ডাকল। মানব তাঁর সঙ্গে নেমে গেল নীচে। পিচ-রাস্তায় আবাসিকদের বেশ বড় জটলা। মিলি- কে ওরা ভুল করে ধবে নিয়ে গিয়েছিল। না-হয় ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটাতে এখান থেকেই ইতি টানলে চলবে না। আবাসনের মাঝখান দিয়ে এই পিচের রাস্তাটাই হল যত অনর্থের মূল। এই রাস্তাটা আসলে কমন-থরোফেয়ার। কত রকমের লোকজন সারাদিন যাতায়াত করছে এই আবাসনের মাঝখান দিয়ে। তাদের কার মনে কী মতলব আছে কে জানে! মিলি হয়তো নয়। কিন্তু তারই বয়সী অন্য কোনও মেয়ে হয়তো ওই দুষ্কৃতিদের টার্গেট। সুতরাং ওরকম বয়সের মেয়ে যাদের আছে তাদের সকলকেই সাবধান হতে হবে। কিন্তু সবকিছুর আগে — মিলিকে ধরে নিয়ে যাওয়া এবং ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা থানায় জানিয়ে একটা ডায়েরি করে রাখা উচিত।

জনা পনেরোর একটা বড় দল গেল থানায়। মানবও গেল। তাকে তো থাকতেই হবে। থানার ও. সি. ছুটিতে। ভারপ্রাপ্ত অফিসার ডায়েরি নিলেন।

বাড়ি ফিরতে অনেক রাত। মিলি ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা! ঘুমোবেই তো! ওর শরীরের এবং মনের ওপর দিয়ে কী কম ধকল গেছে!

ডাইনিং-টেবিলে মুখোমুখি দুজনে। রুটির টুকরো ছিঁড়ে তরকারি দিয়ে মুখে দেবার সময় মানব লক্ষ করল যে, খাবারের প্লেট সামনে নিয়ে নন্দিনী কী ভাবছে। খাচ্ছে না।

— কী হল? খাচ্ছ না?

— ভাবছি আজ যদি মেয়েটা এভাবে না ফিরে আসত এতক্ষণ কী করতাম বলো তো আমরা?

— কীসে কী হত, এটা নিয়ে ভেবো না। দুশ্চিন্তা বাড়বে।

— আজকের ঘটনায় মিলি বেশ ঘাবড়ে গেছে। ও বলছিল.......

— কী বলছিল? মানব কৌতূহলী হয়।

— ঘুমুতে যাবার আগে আমাকে মিলি বলছিল যে, দূরের স্কুলে ও আর পড়বে না। তার থেকে কাছাকাছি কোনও স্কুলে— । যেখানে আমি কিংবা তুমি দিয়ে আসতে পারব। নিয়েও আসতে পারব আমি।

নন্দিনী খেতে শুরু করেছে। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছে। মানবের খাওয়া প্রায় শেষ।

জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে মানব এবার বলল — কাছাকাছি স্কুল আর কোথায়? প্রভাবতী দেবী উচ্চ মাধ্যমিক। সে তো বাংলা মিডিয়ম......।

— তা হোক। শুনেছি স্কুল খারাপ না। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে কুড়ি জন পরীক্ষা দিয়েছিল। আঠারোটাই ফার্স্ট ডিভিসান পেয়েছে।

— কিন্তু অ্যাতো কাঠখড় পুড়িয়ে রেপিউটেড স্কুলে, ইংলিশ-মিডিয়মে মেয়েকে ভর্তি করলাম। সেখান থেকে ছাড়িয়ে আবার বাংলা মিডিয়ম! এ তো তুঘলকি ডিভিসন হয়ে যাবে!

— তুমি তো ওকে পড়াও না। আমি পড়াই। মিলি প্রায়ই বলে এই স্কুলে ওর ভাল লাগছে না। ক্লাস-টিচারের নাকি ওকে খুব অপছন্দ। হেডমিস্ট্রেসকেও নাকি ও খুব ভয় পায়।

— কিন্তু কেন?

— তা বলতে পারব না। তবে এটা লক্ষ করেছি যে স্কুলে যেতে ওর যেন উৎসাহের অভাব।

— আগামীকালই তো ওর স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কী জন্যে উনি ডেকেছেন তাও স্পষ্ট নয়।

— দেখ গিয়ে কী বলেন।.....

এঁটো হাত শুকিয়ে প্রায় কড়কড়ে। মানব উঠে পড়ে। হাত ধুতে হবে। নন্দিনীর খাওয়াও প্রায় শেষের দিকে।

।। দুই ।।

— কী বলছেন আপনি! এসব বিশ্বাস করা শক্ত আমার পক্ষে! হেডমিস্ট্রেস মধুরিমা বসু-র হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে বসে মানব বলল।

মধ্যবয়সী হলেও মধুরিমার চেহারার ধার এখনও যথেষ্ট। ওভাল শেপ মুখ। ফরসা। ডান হাতে শুধু একটা ঘড়ি। কানের পাতলা লতিতে খরগোশের চোখের মত দুটো লাল ছোট ছোট পাথর। — উজ্জয়িনীর ক্লাস টেস্টের পেপারস আপনাকে দেখালাম মি. রায়। — মধুরিমার গলার স্বর হাস্কি। চোখ থেকে রিমলেস চশমা খুলে তিনি টেবিলে রাখলেন। যা দেখলেন, — অ্যাজ আ ফাদার, — আপনার তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে — আই নো—। বাট আই অ্যাম অলসো হেল্পলেস।

মানবের সামনে টেবিলের স্বচ্ছ কাচের ওপর কয়েকটা খাতা ছড়ানো। মিলির ক্লাস টেস্টের পেপারস। অঙ্ক এবং ইংরেজির পাতলা খাতা দুটো তুলে নিয়ে আবার উলটে দেখল মানব। খুবই 'পুওর পারফরম্যান্স'। তিরিশ নাম্বারের টেস্ট। অঙ্কে মিলি পেয়েছে পাঁচ। ইংরেজিতে ছয়। অন্যান্য বিষয়েও খুবই হতাশাব্যঞ্জক নম্বর পেয়েছে মিলি। কোনওটাতেই দশের ওপরে উঠতে পারেনি। হঠাৎ এরকম খারাপ কেন করল মেয়েটা। পড়াশোনায় মন নেই? নাকি নন্দিনী ঠিকমতো পড়াতে পারছে না। ভাল টিউটরের প্রয়োজন মিলির? কিন্তু তার থেকেও যা দুশ্চিন্তার — তা হল।

— মার্কস কম পেয়েছে — দ্যাট ইজ নট মাই পয়েন্ট। বলছিলেন মধুরিমা। — সেটা একটু ট্রাই করলেই যে কোনও স্টুডেন্ট হয়তো পরের টার্মিনালে মেক-আপ করে ফেলতে পারবে। কিন্তু পেরেন্টসের কাউকে পেপারস না দেখিয়ে ও যে আপনার সই হুবহু নকল করে আমাদের কাছে আবার জমা দিয়েছে এটাই — আ ম্যাটার অব গ্রেট কনসার্ন....।

একবর্ণও ভুল বলছেন না মধুরিমা। এই স্কুলের নিয়ম হল, ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস-টেস্টের খাতা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গার্জেনদের দেখাবে। গার্জেন তাতে সই করে দেবেন।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খাতাগুলো আরও একবার দেখল মানব। আশ্চর্য। কী নিখুঁতভাবেই না তার নিজের মেয়ে তার সই নকল করেছে! দেখতে দেখতে বুক কীরকম কেঁপে উঠল মানবের। মাথার ওপর তুরন্ত গতিতে ফ্যান। আজ যে খুব গরম, তাও নয়। তবুও মানব অনুভব করল শার্ট আর গেঞ্জির নীচে সে বেশ ঘামছে।

— শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করেই আমি আপনাদেব দুজনের যে কোনও একজনকে ডেকেছিলাম। — আবার কথা বলছেন মধুরিমা।

মানব তাকিয়েছিল ওঁর মুখের দিকে।

এক মুহূর্ত শাড়ির আঁচল ঠিক করে নিলেন মধুরিমা। তারপর আবার বললেন — উজ্জয়িনী যে বেশ কিছুদিন ধরে ক্লাস টেস্টে পুওর পারফরম্যান্স করছে এবং তার ফলে গার্জেনকে খাতা দেখাচ্ছে না — নিজেই গার্জেনের সই হুবহু নকল করে ক্লাশে জমা দিচ্ছে; কীভাবে এটা ডিটেক্ট করলাম বলুন্ তো?

মানবের কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, আমার এসব শোনার দরকার নেই। কিন্তু সে বলার মতো জোর কই তার? মুখখানাকে যতখানি পারা যায় থমথমে করে রেখে সে তাকিয়েই রইল মধুরিমার মুখের দিকে।

— বেশিদিন নয়..... এই তো কিছুদিন আগেই ওদের ক্লাশ-টিচার আমার কাছে গল্প করছিল যে, ক্লাশে এক স্টুডেন্ট নাকি অদ্ভুতভাবে সই নকল করতে পারে। মাঝে মাঝেই বন্ধুদের রিকোয়েস্টে সে নাকি অনেক টিচারের সই নকল করে দেখায়। জানলাম মেয়েটির নাম — উজ্জয়িনী.....। আমি তখন সেই ক্লাস-টিচারকে বলেছিলাম, একবার পাঠিয়ে দিও তো মেয়েটিকে। যা বলছ তাতে খুবই ইনটারেসটিং লাগছে।

রিসিভার বেজে উঠল। কথা বললেন মধুরিমা। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে মৃদু হাসলেন — সরি ফর ডিসরাপসান। কী ব্যাপারটা যেন বলছিলাম?....... ও হ্যাঁ হ্যাঁ.... পরের দিনই ওর ক্লাসটিচার আপনার মেয়ে উজ্জয়িনীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে আমি ওর ক্লাসটেস্টের পারফরম্যান্স দেখে নিয়েছিলাম। পেপারসও দেখেছিলাম। দেখলাম আপনার সিগনেচার রয়েছে। তবুও কীরকম সন্দেহ হল।.... সাম ডাউট। এটা টোয়েন্টি ইয়ারস টিচিং-এর এক্সপিরিয়েন্সই বলতে পারেন।

— আপনার মেয়ে এলে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি নাকি এনি সিগনেচার এগজ্যাক্টলি কপি করতে পার?..... নো আনসার। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম — তুমি ক্লাস-টেস্টের পেপারস পেরেন্টসকে দেখিয়েছ? ও ঘাড় নাড়ল। কিন্তু আমার চোখের দিকে একটি বারের জন্যেও তাকাচ্ছিল না। কীরকম পিকিউলিয়ার ভঙ্গিতে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল। আর তাতেই — আই হ্যাড সাম সাসপিসিয়ান। তারপর আমার চিঠি পেয়ে আজ আপনি এসেছেন।

অস্বস্তির অনুভব মানবের। সে-ও এখন ঠিক চোখ তুলে তাকাতে পারছে না মধুরিমার দিকে। কী বলবে সে? এ তো সত্যি যে মিলি তাকে ক্লাসটেস্টের পেপারস দেখায়নি। আর সে সইও করেনি। নন্দিনীকেও যে দেখায়নি এ ব্যাপারেও মানব পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। কারণ সেক্ষেত্রে নন্দিনী চুপ করে থাকত নাকি!

— শুধু সই নকল করা না। মিথ্যে বানিয়ে বলাও অভ্যাস আছে আপনার মেয়ের। শী ইমাজিনস্ থিংস......।

— কীরকম? বুকে হাতুড়ির ঘা মানবের।

— আপনি তো কোম্পানি এক্সিকিউটিভ?

— ইয়েস?

— ইফ উফ ডোন্ট মাইন্ড মি. রায় — আপনি কী কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর?

— অফ কোর্স নট। আমি ডেপুটি ম্যানেজার। আমার মতো আরও দুজন অফিসে আছেন। কিন্তু এই প্রশ্ন আপনি কেন করছেন?

— এই স্কুলে অ্যাডমিশানের সময় পার্টিকুলারসে আপনি আপনার অফিসিয়াল ডেজিগনেসান ঠিকই লিখেছেন। কিন্তু আপনার মেয়ে ওর ক্লাস-মেটদের বলে যে, তার বাবা একটা খুব বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর!

— হাউ স্ট্রেঞ্জ। কিন্তু কেন ও এরকম বলে বলুন তো? আমি কিংবা ওর মা; — কেউ ওকে কোনওদিন এসব শেখাইনি।

— আই নো।........ আই নো মি. রয়।..... প্লিজ ডোন্ট মিসআনডারস্ট্যান্ড মি। ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল......। মানব মুখ নিচু করে বসে থাকে। রীতিমতো উত্তেজিত সে নিজের ভেতরে। স্কুলে কেন এরকম অদ্ভুত ব্যবহার করছে মেয়েটা! অ্যাতো যে গুণবতী হয়েছে তা তো সে কিছুই জানতে পারেনি। যে জিনিসটাকে মানব আগাগোড়া ঘৃণা করে এসেছে, সেই মিথ্যে কথা বলার স্বভাব হয়েছে তারই মেয়ের। ডেপুটি ম্যানেজার বাবাকে লোকের কাছে ম্যানেজিং-ডিরেক্টর বানিয়ে দেওয়া কেন?...... কেন?....... কেন...... অদৃশ্য গুলতি থেকে ছোঁড়া ঢিল যেমন অতর্কিতে কপালে এসে লাগে; তেমনই একটা কথা হঠাৎ ছল্‌কে ওঠে মানবের মনে। কয়েক মাস আগে নন্দিনী মিলির সামনে। থাক, এ বোঝাপড়া বাড়ি ফিরে নন্দিনীর সঙ্গেই হবে!

মধুরিমা আবার কী বলছিলেন। মানব নিজের সঙ্গে মগ্ন ছিল বলে ঠিক শুনতে পায়নি। তাই সে জিজ্ঞেস করল — কিছু বলছেন ম্যাডাম?

— বলছি যে কাগজে গতকাল কী একটা পড়লাম মনে হল? আমি তিনটে পেপারস রাখি। দুটো ইংলিশ। একটা বেঙ্গলি। সব পেপারস-এ দেখলাম নিউজটা এসেছে। আপনার মেয়েকে নাকি কিডন্যাপাররা পিক-আপ করে নিয়ে গিয়েছিল; আবার নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে?

— হ্যাঁ। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। এক ভীষণ বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে আমার মেয়ে। যেন প্রসঙ্গ পালটাবার সুযোগ পেয়েই মানব হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সে বেশ সবিস্তারে, সচেতনভাবে নাটকীয়তা মিশিয়ে বিবরণ দেয় ঘটনার। কিন্তু মধুরিমার মুখে কোনও কম্পনের আভাস নেই। চোখেও নেই কৌতূহল কিংবা ভয়ের প্রকাশ। ঠাণ্ডা চোখে মানবের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মধুরিমা।

— মেয়ের মুখে এসব শুনে আপনার মনে কোনো প্রশ্ন আসেনি ? জিজ্ঞেস করলেন মধুরিমা।

— প্রশ্ন ? হোয়াট ডু ইউ মিন।

— এগারো-বারো বছরের একটা মেয়েকে কয়েকজন তুলে নিয়ে গেল। আবার নামিয়েও দিয়ে গেল। কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পেল না। তখন তো রাস্তায় লোক চলাচল ভালই ছিল। অথচ কারোর চোখে কিছু পড়ল না। হাউ স্ট্রেঞ্জ! এসব ক্ষেত্রে ছেলে হোক, মেয়ে হোক, রীতিমতো ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা। গাড়ি থেকে আবার লোকগুলো যখন ওকে নামিয়ে দিল; তখন কিন্তু নরম্যাল সারকামস্টান্সে আপনার মেয়ের কেঁদে ফেলার কথা। কী ঘটছে জানবার জন্যে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। বাচ্চা যাতে আরও ঘাবড়ে না যায়, সে কারণে সহৃদয় পথচারীরাই এসব ক্ষেত্রে বাড়ি অবধি তাকে সঙ্গ দেয়।..... কিন্তু সেসব কিছুই হল না। আপনার মেয়ে নিজে নিজেই কিডন্যাপড হল, আবার নিজে নিজেই বাড়ি ফিরে এল! আমার কিন্তু কেমন খটকা লাগছে!

— আপনি কী বলতে চাইছেন। এটুকু মেয়ে সব বানিয়ে বলেছে? আসলে ওরকম কিছু ঘটেনি ?

— সেরকম একটা সন্দেহ যে আমার হচ্ছে সেটা আমি অস্বীকার করব না।

— দিস ইজ টু মাচ! — উত্তেজনায় মানব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। — আমার ধারণা আমার মেয়েকে আপনি মিসআনডারস্ট্যান্ড করছেন। — রাগে মৃদু কাঁপছিল মানব।

— তাই কি? আপনি যেন একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন মি. রায়। আপনি আপনার মতো ভাবছেন। কিন্তু আমি ভাবছি এরকম.... আপনার মেয়ের স্টোরি ফেবরিকেট করা হ্যাবিট আছে। ও জানে আজ আপনি স্কুলে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন। এবং এলেই সব জানতে পারবেন। সেই.কারণে এরকম একটা কিডন্যাপিং-এর গল্প ফেঁদে ও আপনাদের সিমপ্যাথি আগে-ভাগেই হয়তো আদায় করে নিতে চাইছে। হয়তো আপনাদের অ্যাটেনশন অন্য দিকে ডাইভার্ট করতেও চাইছে। চাইল্ড সাইকোলজি খুব জটিল মি. রায়। আমি এ ব্যাপারে অনেক স্টাডি করেছি....।

— কিন্তু আপনি যা বলছেন এক্ষেত্রে এরকম হতে পারে না। অ্যাতোটা ভেবে নেওয়া মানে বোধহয় ওর ওপর অবিচার করাই হবে। বিশ্বাস করুন — আমরা ওকে সবসময় ভাল শিক্ষাই দিতে চাই। কথাগুলো বলছিল মানব। আর উত্তেজনায় কাঁপছিল। রাগ, আবেগ, অনুকম্পা — সবকিছু মিশে তার গলা কীরকম অদ্ভুত লাগছিল শুনতে।

মধুরিমা মানবকে বলছিলেন — কিপ ইয়োর কুল — মি. রায়। যদি আমার কথা আপনাকে হার্ট করে থাকে, — বিশ্বাস করুন, — আমি দুঃখিত।

তিন

দেরিতে অফিসে পৌঁছে নিজের চেম্বারে ঢুকে সবেমাত্র একটা ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছিল মানব; পিয়ন এসে জানাল যে, এম. ডি. ডাকছেন। এম. ডি.-র ঘরে সে দেখল উনি একা নন; সাফারি-সুট পরিহিত গোলগাল চেহারার এক ভদ্রলোকও আছেন। ভদ্রলোক হলেন,

— এম. ডি. আলাপ করিয়ে দিলেন, — মি. ওমপ্রকাশ। দিল্লি থেকে আসছেন। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি। হিন্দ-মোটরের ফ্যাক্টরিতে এখন প্রোডাকসনের কী অবস্থা তা নিজের চোখে দেখতে এসেছেন। হিন্দ-মোটরের ফ্যাক্টরি একস্‌প্যানসনের জন্যে মানবদের কোম্পানি বিশ্ব-ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের আবেদন করেছে।

কাজটা এম. ডি. মানবকেই দিলেন। ওমপ্রকাশকে নিয়ে তাকে গাড়িতে বেরিয়ে পড়তে হল, — হিন্দমোটর। কাজ শেষ করে ওমপ্রকাশকে হোটেল-হিন্দুস্থানে গুডনাইট জানিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে দশটা। তখন মিলি ঘুমিয়ে পড়েছে।

গম্ভীর মুখে মানব জুতো খুলছিল।

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল — স্কুলে গিয়েছিলে? কী বলল গো হেডমিস্ট্রেস?

রুক্ষ গলায় মানব বলল — এখনই শুনবে? নাকি একটু ফ্রেস হয়ে আসার সুযোগ দেবে? রাস্তার ধুলো আর ঘামে জামা বোধহয় পিঠের সঙ্গে সেঁটে বসেছে।

নন্দিনী নিজের জিভকে সংযত করল। এখন কিছু বলতে যাওয়া মানেই ঠোকাঠুকি হবে।

আধ ঘণ্টা বাদে। বসার ঘরে সোফায় শরীরের অনেকটা ভার ছেড়ে দিয়ে বসেছে মানব। সিগারেট টানছে। নন্দিনী তাকে লক্ষ করছিল। কিছু জিজ্ঞেস করেনি। ক্রমশ মানব নিজেই সব বলল। যতটা সংক্ষেপে পারা যায়। মধুরিমার সঙ্গে মিলিকে নিয়ে কী ধরনের কথা হয়েছে তা শুনে নন্দিনী উত্তেজিত হয়ে উঠল।

-- এসব কী বলছ তুমি! ভেতরে ভেতরে মেয়ের যে এই অবনতি হয়েছে তা তো আমি বুঝতেই পারিনি। আর মিলিকে কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারটা কী বললে আমার তো মাথাতেই ঢুকছে না।

শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা মানব দু-আঙুল অ্যাশট্রেতে ঢুকিয়ে দিল। গরম কি বেশি লাগছে তার। হঠাৎ উঠে ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিল।

তারপর নন্দিনীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল — ওর পড়াশোনার ব্যাপারটা পুরোপুরি তুমি দেখো। অথচ তুমি কোনও খবরই রাখ না — কবে ওর ক্লাস টেস্ট; কবে ওর খাতা বাড়িতে আসে। আবার আমাদের অজান্তেই স্কুলে ফিরে যায়!

— কী করে জানব? ও যদি নিজে না বলে? দরকারি কথা ও যে চেপে রাখতে শিখেছে তা আমি —

— শুধু মেয়ের দোষ দিলে হবে না। নিজের দিকেও তাকাতে হবে। মেয়ের দিকে মনোযোগ কতটা তোমার? শুধু তো স্কিনের চর্চা, বিউটি পারলার — এসব নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত আছ।

— কী বলতে চাইছ তুমি! আমি —

— [illegible]পুটি ম্যানেজার বাবাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বানাতে মেয়ে মায়ের কাছ থেকে[illegible]খছে।

-- মানে!

— তোমার সেই স্টেটসে থাকা মাসতুতো দাদা আর তার রূপসী বউ গতবার যখন এ বাড়িতে এসেছিল, — তখন তো স্বামীকে তুমি ম্যানেজিং ডিরেক্টরই বানিয়েছিলে। মিলি তো সামনেই দাঁড়িয়েছিল। সেও বাহবা নেবার জন্যে সত্যিকে বিকৃত করতে শিখেছে।

— আমি মিথ্যে বানাই। আর তুমি সব সময়েই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির তাই না? — ফুঁসে উঠল নন্দিনী।

— কী বলতে চাইছ?

— বলতে চাইছি দরকার পড়লে তুমিও মিথ্যের আশ্রয় নাও। কিছু কম যাও নাকি।

— আমি! মিথ্যের আশ্রয় নিই? মুখ সামলে কথা বলবে নন্দিনী। মানব জোরে চেঁচিয়ে ওঠে।

— আমার সঙ্গে ওরকম চোখ রাঙিয়ে কথা বলবে না। নন্দিনীর গলাও এবার সপ্তমে চড়ল। রাত অনেক। নৈঃশব্দ্য ঘন হয়ে আসছে ক্রমশ। বাড়ির কাছাকাছি একটা কুকুর বিশ্রীভাবে ডাকছে। কীরকম কান্নার মতো সেই ডাক.....।

নন্দিনী যেন স্বগতোক্তির মতো বলে যাচ্ছে — এই ফ্ল্যাট কেনার ব্যাপারে প্রথম যেদিন প্রমোটারের সঙ্গে কথা হয়; আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম। ফ্ল্যাটের দাম প্রমোটার হেঁকেছিল সাত লাখ টাকা। তার মধ্যে এক লাখ টাকা কোনও ভণিতা না করেই সে চেয়েছিল ব্ল্যাকে। অফিস থেকে তোমার লোন পাবার কথা ছিল ছ'লাখের মতন। এন. এস. সি., পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড—এসবের কাগজপত্র ভাঙিয়ে পঞ্চাশ হাজার তুমি জোগাড় করবে বলেছিলে। কিন্তু বাকি পঞ্চাশ হাজার কোথা থেকে আসবে সে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলে।

— দুশ্চিন্তা যাই থাক। দান তো আমি ছাড়িনি। যেভাবেই হোক জোগাড় করেছি টাকা। কিনেছি ফ্ল্যাট। সুখী হয়েছি। বাস্। এসব পুরনো কথা এখন তোলার দরকার কী?

কিন্তু কীভাবে অত টাকা, — মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা জোগাড় হল? সেটা তো জানতে পারলাম না। যতবার জিজ্ঞেস করেছি; প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছ তুমি। কীভাবে টাকা জোগাড় করলে এটা জানার কী অধিকার নেই আমার?

— কেন! লোন নিতে পারি না? অন্য কোনও সোর্স থেকে?

— সেটা তুমি করনি। তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই বলতে। আমরা ধারণা এ ব্যাপারে তোমার মনে একটা অপরাধবোধ আছে। নাহলে তুমি প্রশ্নটা ওভাবে এড়িয়ে যাও কেন?

— একেবারে গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয় শুরু করলে যে! অপরাধবোধ-টোধ এসব কী বলছ? নাহ — আমি এ যুগের মানুষ। সময় যা চায় আমি সেরকমই হতে চাই। সফলতার জন্যে যে কোনও আবর্জনার স্তূপে পা পড়ুক; — আমার তাতে অস্বস্তি হয় না। ওসব ভ্যালুজ-ট্যালুজ নিয়ে সারাজীবন বসে থেকে কী হয়! একজন বিষণ্ণ, অসফল মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। অনুকম্পা আদায় করতে হয় অন্যদের। আজ যখন এভাবে জিজ্ঞেস করলে তখন জানাই যে টাকাটা আমি ঘুষই নিয়েছিলাম। মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানি আমাদের। সারা বছরে কোটি কোটি টাকার ট্রানজাকসন। পারচেজের ব্যাপার তো আমিই দেখি। পঞ্চাশ হাজার ঘুষ নেওয়া কোনও ব্যাপারই নয়। কিন্তু ওই একবারই। ফ্যামিলির স্বার্থে আমি একবারই নিজেকে নামিয়েছি। তাতে কী হয়েছে।

— কী হয়েছে! — বিদ্রূপের গলা নন্দিনীর। — ওরকম ভাবে কেন কিনলে এই ফ্ল্যাট? আরও কিছুদন নাহয় ভাড়া বাড়িতেই কাটাতাম। ছিঃ ছিঃ! মেয়েটা আর এরকম মিথ্যে বলতে শিখবে না!..... এখন আর নন্দিনীর গলায় বিদ্রূপের ঝাঁঝ নেই। বরং সে হাতের চেটোয় মুখ ডুবিয়ে বসে আছে। শরীরটা মৃদু ফুলে ফুলে উঠছে। ও কি কাঁদছে? মানব ঠিক বুঝতে পারে না। ব্যাপারটা এরকম ঘটবে বলেই না সে একটা নিষ্ঠুর সত্যিকে নিজের বুকের অন্ধকারে লুকিয়ে রেখেছিল। মাঝে মাঝে সেও তো এক প্রবল জিজ্ঞাসায় ক্ষতবিক্ষত হয় নিজের ভেতরে। এক দিকে পরিবারের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। অন্য দিকে সাময়িক পতন। সেই সময়ে জটিল ধন্দে পড়েছিল মানব। যদিও সেই আলোড়ন, সেই কষ্টের কথা নন্দিনীকে জানায়নি। কী হবে জানিয়ে? মানবের ধারণা নিজের যন্ত্রণা, নিজের কষ্ট কারও সঙ্গে, এমনকি স্ত্রীর সঙ্গেও ভাগ করে নেওয়া যায় না। তাই সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যাবা

তার ওপর নির্ভর করে আছে; সুখের জন্যে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে; তাদের নির্ভরতা দিতে, মুখে হাসি ফোটাতেই তো সে ওই কাজটা করেছিল। জীবনে ওই একবারই। কিন্তু তবুও তো সে অপরাধী। সেই অপরাধের শাস্তি কি নন্দিনী যা বলল তাই?.... ভেবে শিউরে উঠল মানব। সে নন্দিনীর কাঁধে আলতো হাত রাখল।

হঠাৎই পাশের ঘর থেকে মিলির অস্ফুট আর্ত-ডাক কানে আসে। — মা?......মা?......

— কী হল? কান্না ভুলে পাশের ঘরে হুড়মুড়িয়ে ছোটে নন্দিনী। মানবও এগিয়ে যায়।

মশারির ভেতর ঢুকে নন্দিনী শায়িত মিলির বুকের ওপর হামলে পড়ে।

— কী হয়েছে মা। কী? কোনও খারাপ স্বপ্ন দেখেছ?

— জানালা দিয়ে কে যে মুখ বাড়াচ্ছিল। বিচ্ছিরি দেখতে একটা মুখ।

মানব সুইচ টিপে আলো জ্বালে। একবার জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে। পাশের ফ্ল্যাটের আবছা দেওয়াল। তাছাড়া এটা তো দোতলা বাড়ি। কারও পক্ষেই জানালা দিয়ে উঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। কেন এরকম হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা? ওকে কি সত্যিই কোনও মনোরোগবিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যেতে হবে?

— মা — জল খাব। — বলে মিলি।

— আসছি মা। এখনই জল নিয়ে আসছি। এই শুনছো? একটু দেখো তো মেয়েটাকে। মশা-টশা ঢোকে না যেন। মানব সন্তর্পণে মশারির ভেতরে যায়।

মিলির মাথাটা বালিশের ওপর একটু তুলে দেয়। খুব নরমভাবে হাত বুলোতে থাকে মিলির মাথায়। আর ভাবে — সত্যিই কি অসুস্থ মিলি। এই অসুখ কীভাবে সারবে তার? বানিয়ে কথা বলা, মিথ্যে বলা সেটাও তো অসুখের পর্যায়েই পড়ে।.....

ওয়াটার-ফিল্টার থেকে গ্লাসে জল নিচ্ছে নন্দিনী। জল পড়ার আওয়াজ হচ্ছে।

......ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝপ্ করে অন্ধকার নেমে আসে।

অন্ধকারের একটা কঠিন, নিরেট দেওয়াল চোখের সামনে। মিলি তাকে জড়িয়ে ধরে। আর মানবের মনে একটা প্রশ্ন আচমকা ঘুলিয়ে ওঠে — অসুখটা কি একা মিলির......?

— যখন তখন আজকাল পাওয়ার-কাট হচ্ছে। দেশলাইটাও খুঁজে পাচ্ছি না। এত অন্ধকার....!

ডাইনিং-স্পেস থেকে নন্দিনীর বিরক্ত কণ্ঠস্বর মানবের কানে আসছে।

জীবিষা

পল্লব সেনগুপ্ত

লজ্জার মাথা খেয়ে শেষ পর্যন্ত নবদুর্গাও ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বড় ইস্কুলের সামনেকার লাইনে এসে বসল। ডান পাশের ধুঁকতে থাকা আধবুড়ো লোকটা কোটরে-বসা চোখদুটো দিয়ে ওর দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়-বিড় করে কি যেন বলল আপনমনেই। বোধহয় শাপ-শাপান্তই করল লপ্‌সির ভাগে কম পড়বে ভেবে।

কিন্তু নবদুর্গা, যার ডাকনাম দুগ্‌গো, তার পক্ষে আর এভাবে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। ওর স্বামী পতিতপাবন মরীয়া হয়ে ঘর ছেড়েছে এক মাস হল। এই একটা মাস দেড় বছবের ডিগ্‌ডিগে হ্যাংলা ছেলেটাকে নিয়ে কি ভাবে যে দুগ্‌গোর দিন কেটেছে, তা শুধু ও নিজেই জানে। আর জানতে পারে ভগমান, যদিচ তাঁর ক্যাঁতায় আগুন দিয়েছে ও এই একটা মাসের সকাল-বিকাল।

প্রথম কটা দিন কোনো মতে চেয়ে-চিন্তে, থালাটা, কম্বলটা বেচে-বুচে চলেছে। সে ত আটদিন-দশদিনের ব্যাপার। তারপরে চাইবার লোকই বা আর কই? পাড়াপড়শি সবারই ত এক হাল। দেবেই বা কে, আর কেমন করেই বা দেবে? বকুলতলার মোড়ে ভোটের সময় যে বাবুরা আপিস করেছিল, ভোটে জেতার পরও তারা যে ঘরটার দখল ছাড়ে নি। সারাক্ষণই হৈ-হাই করে বসে বসে সেখানে। পাড়ার কম্‌লির মার কাছে শুনেছিল দুগ্‌গো যে ওরা নাকি গরীব দুঃখীদের পয়সা-টয়সা দেয়-টেয়, এম্‌লে বাবু যখন একদিন বসেন ঐ আপিসে, গিয়ে পড়লে কিছু হতে পারে যাহোক একটা। তা দুগ্‌গো গিয়েছিলও একদিন। এম্‌লেবাবু অব্‌দি আর পৌঁছন সম্ভব হয় নি, ব্যাপার দেখেই ভয়ে ভয়ে চলে এসেছিল ও। বিশেষত, বড় জুলফিওলা দুটো হাম্‌দো-হুমদো লালচোখো দুটো ছোকরা যখন ওকে ডেকে বলেছিল, "এত ভিড়ের মধ্যে আর কি দুঃখের কথা বলবি দাদাকে, সন্ধ্যের পর আসিস, তখন লোকজন থাকবে না, দাদাকে দিয়ে তোকে কিছু খয়রাতি পাইয়ে দোব। বুঝলি?"

বুঝল ত দুগ্‌গো সবই। লেখাপড়া না শিখলেও এ সব কথার মানে বুঝতে একটা সোমত্ত মেয়েমানুষের দেরী হয় না। তাছাড়া না খেয়ে শুকিয়ে গেলেও ওর শরীরে এখনো একটা আন্‌খা চটক আছে, কাঙাল-দুঃখীর ঘরের বৌয়ের যা না থাকাই মঙ্গল। ফলে ওদিকে কিছু সুবিধে হল না দুগ্‌গোর কিন্তু উপায়টাই বা কি? বাপের বাড়ির বালাইও ত ঢের দিন হল চুকেছে, বিধবা মাটা সেবার বর্ষার সময়ে চোখ বোঁজার পর থেকেই। আর বাপের বাড়ি ব্যাপারটা থাকলেই বা হতটা কি? মা বুড়ীই বা এ দুর্দিনে খাওয়াত কি ওকে?

সাতপাঁচ এইসব ভাবতে ভাবতেই দুগ্‌গো দেখে গরমেন্টের বাবুরা লাইনের সামনে একখানা করে শালপাতা দিয়ে যাচ্ছে, আর তার ওপর দু-হাতা করে খিচুড়ি। ওর কাছাকাছি আসবার একটু আগেই দুগ্‌গোর মাথায় বুদ্ধির ঝিলিক দিয়ে গেল — চারপাঁচদিন পেটে দানা না পড়লে, মানুষ বোধহয় খাবার দেখলেই খুব বেশি রকমের বোকা কিংবা বেশি রকমের চালাক হয়ে যায় — নিজের শীর্ণ বিশুষ্ক স্তনের বোঁটা থেকে ছেলের মুখটা সরিয়ে দিয়েই থপ্ করে পাশে বসিয়ে

দিল ওটাকে। ছেলেটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকে। পাশের বুড়োটা আবার একবার বিড়বিড়িয়ে গালমন্দ করে ওকে, ওর ছেলেকে।

যে ছেলেরা খিচুড়ি দিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল তারা বুড়োকে দিয়েই দুগ্‌গোর সামনে একখানা পাতা ফেলে দু-হাতা চালে-ডালে সেদ্ধ ঘ্যাঁট ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল। দুগ্‌গো তাড়াতাড়ি আর্তগলায় বলে ওঠে ঃ

"বাবু, বাবু উয়াকেও দ্যান, উয়াকে দ্যান......" ছেলেটা পিছনে তাকিয়ে, সামনের ছেলেটির হাত থেকে একখানা শালপাতা নিয়ে দুগ্‌গোর ছেলের সামনে রেখে তার ওপর একহাতা ঢেলে দিয়েই হন্‌হনিয়ে এগিয়ে চলে। দুগ্‌গোর ছেলে কথা না বলতে পারলেও জিনিষটা যে খাদ্যবস্তু সেটা তার জৈবিক বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারে, কংকালসার দুটো ক্ষুদ্র লোলুপ হাতে খাবারটা তুলে মুখে দেবার চেষ্টায় অভিনিবিষ্ট হয়। দুর্গা বিচিত্র চোখে চেয়ে থাকে সন্তানের খাওয়ার দিকে। বুড়োটা খায় আর গজ্‌গজ্‌ করে।

....

শালপাতাগুলো চেটে চেটে পরিষ্কার করে ফেলবার আগেই রিলিফের বাবুদের তাড়া খেয়ে উঠতে বাধ্য হয় ওরা। দুর্গা ছেলেটাকে কাঁখে নেয় আবার; ওঠবার মুখে ছেলের ভুক্তাবশেষগুলো চেঁছে ওকে মুখে তুলতে দেখে রিলিফের দলের একজন আরেকজনকে ঠেলে ঠেলে বলে ঃ

"মাগীর রকম দেখ একবার......!"

"তুইও যেমন!" নিরাসক্ত উত্তর দেয় অন্যজন, "ওরা কি আর মানুষ আছে? খিদেয় সব জন্তু হয়ে গেছে, বুঝলি, জন্তু!"

ভোজনের প্রহসন অন্তে জন্তু-হয়ে-যাওয়া বুভুক্ষু মানুষগুলো ততক্ষণে ওপাশের রাস্তায় পা বাড়িয়েছে নতুন অন্নসত্রের সন্ধানে। নবদুর্গাও ছেলে কাঁকালে ওদের পিছু নেয়।

....

ওবেলা ওদের কিন্তু আর কোথাও কিছু জোটে নি। আর একটা খিচুড়ির ছত্তর নাকি খুলেছিল যুগীপাড়ার বড়বাড়ির চাতালে, তা ওরা সেখানে পৌঁছনর আগেই সব ধুয়ে-মুছে সাফ। শুধু ক-টা কুকুর ডাস্টবিনের ভেতর শালপাতাগুলো শুঁকোশুঁকি করছে অনর্থক।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। দুগ্‌গো ছেলে নিয়ে ইস্টিশনের দিকে যায়, যদি দু-চারটে পয়সা বরাতে জোটে ভিক্ষে-সিক্ষে করে। একে দুয়ে ভিড় বাড়ে। গাড়ি যত আসে, লোকও তত। জমজমাট গম্‌গমে স্টেশনের চারদিকেই অবশ্য তার মতো আরও অনেকে শুয়ে-বসে। হ্যাংলা-প্যাংলা ছেলেপুলেগুলোর নোংরায় ভর্তি। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের কেউ কেউ মায়াদয়া করে, কেউ নাকমুখও সিঁটিকোয় আবার।

বিকেল থেকে একপ'র রাত অব্‌দি দুগগোর কপালে জুটল মাত্তর আনা ছয়েক। মফঃস্বল শহর, লোকের দেবার ক্ষমতাও কম; তার ওপর এই আকাল। আর দেবেই বা কতজনকে। তা এরি মধ্যে আবার দু-একটা উনিশ-বিশ কথাও শুনতে হয়েছে দুগগোকে। ঐ আন্‌খা চেকনাইটুকুই ওর কাল হয়েছে! আরে বাবা ছেলেটাকে ফেলে, মুন্সিপাড়ার বাজারের পেছনে গেলে এই সময়ের মধ্যে না হক পাঁচটা টাকা তার হাতে আসত। ঐ পাঁচু সা'র দোকানের আশেপাশে ঘুরলেই হয়ে যেত একটা কিছু।

এত ব্যাপার দুগ্‌গো বুঝতও না আগে। সেবারে যখন পটলের বোনটা বেরিয়ে গেল, তখনই ওদের বস্তিতে এসব ব্যাপার-স্যাপার শুনেছিল ও। পতিতকে শুধোনোতে ঠাস্‌ করে এক চড় লাগিয়েছিল ওর গালে। ছেলেটার ঠিক বোঝার বয়স না হলেও গুঙিয়ে কেঁদে উঠেছিল। ঠিক এখনকার মতোই শব্দ করে।

আঃ, ছেলেটা এখনও আবার কাঁদছে। একটু তাকিয়েই দুগ্গোর মনে হল এটা ঠিক খিদের কান্না নয়। পেটটা ওর এমনেই ডাবা, কিন্তু এখন যেন একেবারে জয়ঢাক। আঙুল দিয়ে ডগ্‌রা পেটটায় টোকা দিল দুর্গা। ঢ্যাব্‌ ঢ্যাব্‌ ঢব্‌ ঢব্‌। চোখ-দুটো কি রকম পাঙাশ-মারা। আর থেকে থেকেই কেঁদে উঠছে। কান্নাটা শোনাচ্ছে গোঙানির মতো।

ভয় পেয়ে যায় দুর্গা। কি করবে ও? কার কাছে যাবে? ওষুধ দিলে হত। কিন্তু ছ-আনা-পয়সায় কি ওষুধ হবে? আর পয়সাটা বাজে খরচ করে ফেলবে? ভাবতেই ওর বুকটা শুকিয়ে যায়। ছেলেকে ভোলাবার জন্যে ওর মুখে দুধ-না-থাকা-স্তনের বোঁটাটাই গুঁজে দেয়, আর ডানহাতের মুঠোয় চেপে ধরে পয়সাকটা। ঠিক যাকে ভিক্ষে-করা বলা যায়, সেই পেশায় ঝাঁপ দেবার পর ওর প্রথম রোজগারের পযসা। ফালতু এগুলো ও খরচ করতে পারবে না।

....

গোটা রাতটা দুগ্গোর কাটল ছেলেকে কোলে করে বসে। পেশাদার ভিখিরিদের একটা বিরাট দঙ্গলেব মধ্যে প্ল্যাটফর্মের পাশে। এ লাইনে এই হল ওর প্রথম দিন; বা প্রথম রাত। মুমূর্ষু ছেলেকে নিয়ে বিব্রত থাকলেও মাঝে মাঝেই ওর চোখ কান চলে যাচ্ছিল নতুন এই অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে। বরাবর বস্তিতে থাকলেও গেরস্ত ঘরেব বৌ সে। বেকার হবার আগে পতিতপাবনও গেঞ্জীকলে কাজ করত। আজকে খিদের জ্বালায় পথে নেমে পড়ে যাদের সঙ্গে ও বাত কাটাচ্ছে, তাদের দুগ্গো ঠিক চেনে না। তাদের ক্ষুধা, লোভ, কলহ, জৈবধর্মাচরণ এবং সমস্ত কিছুরই একটা প্রবল নির্লজ্জতা ওকে বিমূঢ় করে তোলে ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে।

ভোরের প্রথম ট্রেন আসাব শব্দে ঘুমের চট্‌কা ভাঙলো দুগ্গোর। প্ল্যাটফর্মের একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকতে শেষ রাত্রের দিকে ঘুমিযে পড়েছিল ক্লান্তিতে। ছেলেটা ঘুমিয়েছিল আগেই। এখন ঘুম ভাঙতেই আবার দু সহ খিদেয় আন্‌চান্‌ করে উঠল দুর্গার শরীর। আঁচলে বাঁধা পয়সাগুলো দেখতে গিয়ে দেখল গিঁট খোলা, পয়সা নেই।

মাথার মধ্যে চন্‌মন্‌ করে উঠল দুর্গাব। খিদেব চন্‌চনানিব সঙ্গে সেটা মিশে গিয়ে ওর শবীর কি রকম করতে লাগল! আস্তে আস্তে ঘুমন্ত ছেলের পাশে শুল ও। একটা আচ্ছন্ন ভাব। খিদে, ক্লান্তি ভয়, খিদে, চিন্তা, ছোটবেলার কথা, খিদে, পতিতের সঙ্গে বিয়েব কথা, বাবার মারা যাওয়া, খিদে, ক্লান্তি, চিন্তা, ভয, খিদে, কাল রাতের দৃশ্যগুলো, ছেলের জন্যে ভাবনা, খিদে......

কতক্ষণ এভাবে শুয়েছিল ও নিজেই জানে না। হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের ভিখিরি-পট্টিতে এক তুমুল ব্যস্ততা আর হইচইতে চট্‌কা ভাঙে। সকলকে হুড়োহুড়ি করে ছুটতে দেখে দুগ্গোও ছোটে ওদের পিছু পিছু একটা ঘোরের মাথায়। ছেলেটাকে ফেলে রেখেই। তক্ষুনি মনে পড়ে ওর ছেলের কথা। টলতে টলতে এসে ছেলেটাকে টেনে তুলে নেয় কাঁকালে।

রিলিফের লঙ্গরখানার দিকে ধাবমান বুভুক্ষু ভিখারী জনতার পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে দুর্গার একবারও খেয়াল হল না ওর ছেলেটা আর বেঁচে নেই। খেয়াল হল অনেক পরে। কালকের মতো ছেলেটাকে পাশে বসাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল যখন ওটার হাড় জিরজিরে হ্যাংলা শরীরটা, তখন। গায়ে হাত দিয়ে বুকে হাত দিয়ে দুগ্গো বুঝল সব শেষ হয়ে গেছে। দুগ্গো বুঝতে পারল না ওর কান্না পাচ্ছে কি-না।

কিন্তু কাঁদতে একটুও সময় পেল না ও। কাবণ ততক্ষণে শালপাতা বিলোনো শুরু হয়ে গেছে। ছেলেটার মরা শরীরটাই বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ও বসল শক্ত করে। আজকে দুগ্গো একটু বেশি খেতে পাবে। বরাদ্দের চেয়ে আরো এক হাতা বেশি। সেই কথা ভেবে ওর জিভের জল আর চোখের জল একাকার হতে লাগল নিজের অজান্তেই।

ফসল

পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়

ভর নামা মেয়েছেলের ক্লান্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়া মাথার চুলের মত হয় যখন পড়ন্ত বিকেলের মুখে গাছগুলোর মাথা, ম'টা রহস্যগন্ধী হয়ে ওঠে। পাখপাখালীরা এই বাঁধা পুকুরের চারপাশে গোল হয়ে দাঁ' 'য় থাকা ঝাঁকুর-ঝুঁকুর বড় গাছগুলোর মাথায় বসে সূর্যের মুখ দ্যাখে কি দ্যাখে না। কাকেবা ঘরে ফেরার পথে হাওয়ার ধাক্কায় দু একটা টাল খেয়ে এ পাশ ও পাশ হয়ে বাউণ্ডুলে স্বরে ক্কা ক্কা কবে উড়ে যায়। দু চারটে লম্বা ঠেঙ্গে বক কোন কোন গাছের ডালে বসে। বাঁধা পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে তখনো হয়তো মাছের স্বপ্ন দ্যাখে। ঝুপ করে নেমেও পড়ে কোন এক সময়, আবার শন্‌শন্‌ করে ওড়েও। আগাছা ভর্ত্তি গাছের তলাগুলোয় অন্ধকাব হাঁটু গাড়তে থাকে। তখন বাঁধা পুকুরের এপাশে বিশাল ঝাঁকড়া ফণীমনসার গাছের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে কান্ত হাড়ি এক পা এক পা করে বেশ রহস্যময় ভঙ্গীতে ঝামা ইঁটে বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে জলে পা রাখে। পায়ের পাতা ডোবা জলে তার প্রতিচ্ছবি। নিজের বিচিত্র মুখটা অস্পষ্ট দেখতে পায় এই আধো আধারীতে। দেখে খুশী হয়। চোখ দুটো সেই রকমই জ্বলজ্বলে আছে। মুখে ভয় খেলানো ছবিটা ঠিকই আছে। সেই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মায়ের দয়া অর্থাৎ গুটি বসন্ত হয়েছিল তারপর সারা মুখ গর্ত গর্ত হয়ে যাওয়ায় বেশ ভয়ঙ্কর দ্যাখায়। বিশাল স্বাস্থ্যে বসন্তের দাগ ঢাকেনি। জলে ডান হাত চুবিয়ে. এক আঁজলা জল নিয়ে ফিসফিস করে কি সব আওড়ে মুখ নীচু করে ওপর দিকে ছুঁড়ে দেয়। এক ঝলক বৃষ্টির মত জলগুলো কান্ত'র শরীর ও জলে পড়ে।

কান্ত জল থেকে উঠে আবার ফণীমনসার গাছের তলায় আসে। সে নিজে ও লোকে বলে গুঁসাইয়ের খান। গাছের তলাটা পরিষ্কার করে গোবর দিয়ে নিকোনো। গাছের গুঁড়িটার কাছে মাটির তৈরী প্রচুর ছোট ছোট ঘোড়া, মাটির একটা ধুনুচী, বাসি ফুল বেলপাতা। মাটির প্রদীপ একটা, ছোট শিশিতে সরষের তেল, গুঁড়ির কিছুটা সিঁদুরে লেপটি লাগা। চারদিক শুনশান, কোন রা-শব্দ নেই। এই মুখ আঁধারীতে কেন, দিনের বেলাতেও কোন লোকের হুট করে সাহস হয় না এই রাস্তায় আসতে। অজানা চরম এক ভয় ধোপাদের ঘরের কাছ থেকে এই পর্যন্ত ছড়ানো।

কান্ত গাছের তলায় এসে পরনের লাল টুকরো কাপড়ের খোঁটে বাঁধা দেশলাইটা বের করে মাটির প্রদীপটা জ্বেলে দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে। আস্তে আস্তে গাছতলা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন চতুর্দিক ঝুপসী আঁধারে দু চার হাত দূরের জিনিষও দ্যাখা যায় না। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনতে শুনতে কান্ত এগোতে থাকে পায়ের তলায় শুকনো পাতা ভেঙ্গে মুচমুচ শব্দে। পরনে লাল টুকরো কাপড় জড়ানো। পৌষের একদম শেষ বলে ঠাণ্ডাও যথেষ্ট। গায়ে লাল চাদর জড়ানো. গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় জটাসহ তাকে দেখলে শীতের এই ভর সন্ধ্যায় একটু গা ছমছম করে বৈ কি। কান্ত ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে এগোচ্ছিল। মানা ধোপার বাড়ীর কাছে আসতেই নজরে পড়ে সামনে কেউ আসছে। চোখ

দুটো কুঁচকে দ্যাখে একজন মেয়ে। কান্ত'র হাত খানেকের মধ্যে আসতেই মেয়েটি চমকে জিগ্যেস করে, 'কে?'

কান্ত বলে, 'আমি রে। কে মানার বো নাকি?'

বৌটি কাছে এসে, 'ও গুঁসাই?' কান্ত 'হঁ রে' বলতেই বৌটি কাঁখ থেকে জলের ঘড়া মাটিতে একধারে নামিয়ে রেখে বলে, 'টুকচি দাঁড়ান গুঁসাই — এই সাঁঝ বিলাতে আপনার দিখা পেলাম, গড় করে লিই।'

মানার বৌ গলায় আঁচল দিয়ে গুঁড়ি হয়ে প্রণাম করে কান্ত'র পা ছুঁয়ে। অন্ধকারে কান্ত'র চোখ দুটো চকচক করে ওঠে 'হঁয়েছে, হঁয়েছে উঠ, তুরা হলি যেয়ে..' বলতে বলতে মানার বৌয়ের কাঁধ দুটো ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়, জিগ্যেস করে, 'জল লিতে গেইছিলি বুঝি?' মানার বৌ কান্ত'র চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'টিপকল থিকে, যাই ঘরে সনঝে দিতে হবেক। চলি ঠাকুব।'

"যাবি নাই তো কি তুকে দাঁড় করিন রেখে দুবো নাকি? আচ্ছা, তুর সেই যি বেপারটো গড়বড়িন গেইছিল অখুন ঠিক হঁইয়ে গেইছে তো? আমি ভাবলম কি মানাও কিছু বললেক নাই। আমি হছি যেঁয়ে বাবার দ্যাশী। আমার কাছে লাজ করলে চলবেক?" মানার বৌ জলের ঘড়াটা মাটি থেকে তুলে কাঁখে রাখতে রাখতে বলে, "আপনার কাছে কি কুনো দিন কিছু লুকিনছি ঠাকুর? কেনে উ বলে আসে নাই?"

কান্ত বলে, 'ও-হঁ, হঁ জানিন ছিল, কত আর মুনে রাখবো বল্? এত ফরিদী। ব্যাতে ফেনা উঠিন দিবেক ইরা। হঁ-যা, তুর দেরী করিন দিছি, যা। দাঁড়া দাঁড়া আয় কাছিন্ আয়। ওই সাঁঝ বিলাতে বাবার পুষ্পু ঠেকিন দি তুর মাথায়।" বলে মানার বৌকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই কাঁখ থেকে ঘড়াটা নিজে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে কান্ত দুহাতে ধরে কাছে টানে। কান্তর চোখজোড়া অন্ধকারেও ধক্‌ধক্ করছে। আহ্! মানার বো'র কি গতর! তার কোমরটা বাঁ হাত দিয়ে টেনে ডান হাত দিয়ে গায়ের লাল চাদরের একটা খালি খোঁট মাথায় বুলিয়ে কপালে ঠোঁট দুটো ঠেকিয়ে বলে, 'ছামুতে শনিবার এক্ষেণ পূজো, পূজো দিতে ভুলিস না। যা, মানাকে বলবি যা।" মানার বৌ ভয়ে কেমন কাঠ হয়ে গেছিল, কিছুটা খুশীও। এই সনঝেবিলাতে গুঁসাইয়ের ফুল মাথায় ঠিকাতে পারল। পেটের ছেলেটোও তো গুঁসাইয়ের দেওয়া। গোঁসাইয়ের দ্যাশী কান্ত বলে, 'যা, সনঝে দিগা।' একথা শোনার পর মানার বৌ ঘড়াটা আবার তুলে বাঁ কাঁখে নিয়ে ঘরের দিকে এগোয়। কান্ত কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকে অন্ধকারে মিশে, মানার বৌয়ের চলে যাওয়া দ্যাখে। হাতখানেক গিয়ে বৌটি অন্ধকারে ঘুলেমিলে গেলেও কান্ত যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তার উপচানো শরীর। মাথার রক্ত গরম করে দেওয়া ওই শরীরটা সে ছিঁড়েখুঁড়ে রক্ত চেটে চেটে খাচ্ছে। কান্ত ভেতরে ঢেঁকির পাড় দেওয়ার শব্দ শুনতে শুনতে এগোতে এগোতে ভাবে তার ঘরের মাগিটো যেন লাটিন যাওয়া ঘাস, কুনো ত্যাজ নাই। গুঁসাইই জানে কেনে?

ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসে পরপর কয়েকটা হাঁই তোলে কান্ত। তখন ভোর হয়ে গ্যাছে। পৌষালী ভোরের ঠাণ্ডা চাবুক সপাং করে গায়ে লাগতেই মাথার গোড়ায় রাখা লাল চাদরটা জড়িয়ে নেয়। হাত বাড়িয়ে পাশের জানালাটা খোলে। দূরে ময়ূরাক্ষী চকচক করছে ভোরের আলোয়। জানালাটা বন্ধ করে স্ত্রী সনাতনীর দিকে নজর যায়। আপাদমস্তক লেপ ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছে গভীর ভাবে। বিছানা ছেড়ে উঠে কোঠার চাপা দুয়োর তুলে নেমে আসে কান্ত। সামনেই গোয়াল, গোয়ালের সামনে চটের বড় পর্দার মতন, শীতকাল বলে। উঠোনের একধারে স্তূপ করে রাখা নূতন খড়, তার পাশে ধানের মড়াই। কুঁয়ো থেকে জল

তুলে মুখে চোখে দিয়ে ছোট একটা বালতিতে সামান্য জল নিয়ে কিছুটা গোবর গুলে ধানের মড়াইয়ের নীচে মাড়ুলি দিচ্ছিল কান্ত এমন সময় তার একমাত্র ছেলে দুলুর বৌ, ঘুম থেকে উঠে আসে। 'বৌমা, বারদুয়োরটা লাগিন দাও, আমি আসছি, এখুনি ভুঁই থিকে।'

শেষ পৌষের ভোর-বেলায় সারা মাঠময় হিম ঝরছে, ছোট ছোট ঘাস, আগাছাগুলো শিশিরে ভিজে সপসপে। মাঠের পর মাঠ ধান কাটা হয়ে গ্যাছে। ধানগাছের গোড়াগুলো ন্যাড়া মাথায় সামান্য চুল গজিয়ে ওঠার মত হয়ে আছে। মাঠে পা দিতেই খোঁচা লাগে। ধানমাঠ ছেড়ে আলে উঠলে চলার সুবিধা হয়। কান্ত আল ধরে এগোয়। আজ আবার হু-হু করে হাওয়া দিচ্ছে। ভেতর পর্যন্ত ঠকঠক করে কেঁপে ওঠায় কান্ত লাল চাদরটা দিয়ে মাথা কান ঢেকে পা ফেলতে থাকে। কয়েকটা মাঠ পেরিয়ে আসার পর একটা মাঠে ত্যাওড়া ও খেঁসাড়ী কলাই বোনা হয়েছে। ত্যাওড়ার নীলচে রঙের ছোট ছোট ফুল সারা মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে। পাশের মাঠে দুজন লোক লাঙ্গল দিচ্ছিল। কান্তকে দেখে হাল বওয়া বন্ধ করে হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে বলে, "পেন্নাম গো ঠাকুর। তা ইদিকে কুথা যেছেন?" কান্ত আলের ওপর দাঁড়িয়ে বলে, 'লদীর গাবাতে, পাম বসাইতে হবেক, কুথা বসালে সুবিধে হবেক দেখতে যেছি। ভুঁয়ে জল নাই। দুলেকে বলেছিলম বসিন দিতে, তা উনাব আর হঁয়ে উঠছে না।" গলায় লাঙ্গল ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বলদ দুটোকে দেখে জিগ্যেস করে, "কি রে হেরো, বলদ দুটো কবে লিলিক রে? গতরটো তো বেশ তাগড়াই মুনে হচ্ছে, আমার দুটোও বুড়িন গেল, পাল্টাইতে হবেক। তা সাঁইথের হাটে যাওয়া হছে কই, ফবিদী ঠিলাতেই তো জ্ঞান্ কয়লা হঁয়ে যেছে, আর বাঁশঝুবের পাইকেরগুলোও আজকাল আমাদের লুমুদপুরের দিকে আসছে না। চলি রে হেরো।"

কান্ত চলে যেতেই হেরো অর্থাৎ হারু তাব সঙ্গীকে শুনিয়ে বলে, 'শালো ডান, কান্তর লজ্জর খুব খারাপ। দেখলি নাই, কেমুন করে ভেলেছিল। আমার বলদ দুটোকে যেন খেঁয়েই ফেলবে শালো।" হারু বলদ দুটোর গায়ে একটু থুথু লাগিয়ে দিয়ে বলদ দুটোর পাগুলোয় হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে, "খেমা করিস মা ভাগবতী, শালো ডানের লজ্জর থিকে তো তুদের বাঁচাইতে হবেক। পেরাণ থিকে তুদের গায়ে থুথু দিই নাই।" হারুর সঙ্গী জিতেন বলে, "তুমি যি গাল দিলে হারুদা, কান্ত যদি জানতে পারে?"

হারু ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "জিত্‌নে তু হলি যেঁয়ে একটো গাধা। কান্ত কি দ্যাব, দ্যাবতা ব্যাটে যি জানতে পারবেক? ডান ডুগুনীরা মুনের কথা কি করে জানবেক্?" হারু আবার লাঙ্গল জোড়ে।

কান্ত হাঁটতে হাঁটতে নিজের মাঠে এসে দাঁড়াতেই একটা আলের ধারে বসে থাকা দুটো ছোট ছেলে উঠে দৌড়ে পালায়। অবাক হয় সে। 'ছেলে দুটো পালিন গেল কেনে? কি করছিল উরা, আলে?' কাছে এসে বুঝতে পারে আলের গুগাল থেকে ধান বার করছিল ওরা। কিছু ধান গুগালের বাইরে পড়ে রয়েছে। ছেলেদুটোর দিকে কান্ত মাথা তুলে তাকাতেই দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে দুটো জোরে জোরে বলতে থাকে, 'কান্ত ডান, কান্ত ডান, ছিলে খেগো হারামী।' এই শীতের সাত সকালেও কান্তর গা গরম হয়ে ওঠে রাগে। একটা মাটির ঢেলা তুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারে, মুখে গাল দিতে থাকে, 'পাই তো খানকির বিটাদের মজা বুঝিন দুবো। তুদের মা'রা ডান।' কান্ত'র মেজাজ খিঁচড়ে যায়। পাম্প বসানোর জায়গা দ্যাখা মাথায় ওঠে। পেছন ফিরে হন হন করে ঘরের দিকে পা ফ্যালে।

চান করে পরিপাটি হয়ে যখন কোঠার ওপর থেকে নেমে আসে কান্ত তখন তার হাবভাবই পাল্টে গ্যাছে। কপালে সিঁদুরের ইয়াবড় একটা লাল টিপ। পরনে লাল টকটকে

কাপড়। খালি গায়ে লাল চাদর জড়ানো, তলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালাটা দ্যাখা যাচ্ছে। কান্ত কোঠা থেকে নামতেই মাটির উঠোনে বসে থাকা গোটা ছয়েক মেয়ে ফরিদী মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কান্তকে প্রণাম করে। সে গম্ভীরভাবে ডান হাত তুলে সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নেয়। আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের সব মেয়ে। এসেছে দূর দূরান্তর থেকে, নানান রোগ জ্বালার উপশম ঘটাতে গোঁসাইয়ের দ্যাশীর কাছে, দেবদত্ত ওষুধ, কবচ, জড়িবুটি নিতে, বেবাগা স্বামীকে বশে আনার উপায় সন্ধানে।

ফরিদীদের দিকে তাকিয়ে কান্তর চোখজোড়া চকচক করে ওঠে। সবাইকে পাশ কাটিয়ে গোয়ালের পাশে খড়ের ছাউনী দেওয়া কুঁড়ে ঘরের মত ঘরটায় এসে ঢোকে। ওখানে আছে গোঁসাইয়ের আটন, নানা ঠাকুর দেবতার ছবি, লাল সিঁদুরে ডোবা বড় একটা পাথর খণ্ড। একদিকে মাটির পাতনা ঢাকা কি যেন। যেটার ওপর কিছুক্ষণ কান পেতে থাকার পর ফরিদীদের প্রশ্নের উত্তর দেয়। কান্ত ওই ঘরে ঢুকে আসন পেতে বসতেই ছেলে দুলু এসে ফিসফিস করে কি সব বলে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে আসে স্ত্রী সনাতনী, হাতে কিছু ফুল বেলপাতা নিয়ে। স্বামীকে ফুল বেলপাতা দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে বসে থাকা ফরিদীদের উদ্দেশ্যে বলে, 'যিনারা পূজো লিয়ে এসেছেন গুঁসাইয়ের লেগে, কই দেন। উকে পূজোয় বসতে হবেক তো।' ফবিদীবা একে একে পূজোর ফলমূল, গাঁজার পুরিয়া সনাতনীর হাতে জমা দেয়। দ্যাশীব পূজো হয়ে গেলে ভর হবে তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পালা, একে একে নাম ধরে ডাকা হলে ভেতরে যাবে এক এক করে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে কান্ত পূজো করে। সনাতনী, ছেলে দুলু পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। কান্ত বলে, 'ভাল করে ধূনো দে সনাতনী।' তারপর গা ছমছমে পরিবেশে কান্ত প্রথমে চোখ দুটো বন্ধ করে ঢুলতে থাকে। সনাতনী মাটির বড় ধুনুচীতে এক মুঠো গুঁড়ো ধুনো গুগ্‌গুল ফেলে দিতেই অদ্ভুত একটা গন্ধে ও ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়। কান্ত রাজসাপের মত দুলতে থাকে, সঙ্গে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার ভারী জটাও। সনাতনী ও দুলু বেরিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর ওই ঘরের ভেতর থেকে কান্ত'র গলা ভেসে আসে, 'কড্ডের কে আছিস রে?' বাইরে হাতজোড় করে বসে থাকা মেয়ে ফরিদীদের মধ্যে চঞ্চলতা বাড়ে। সবাই কান খাড়া করে। উপস্থিত মেয়েগুলোর চোখ মুখও ক্যামন পাল্টে গ্যাছে। আবার কান্তর গলা ভেসে আসে, 'শুনতে পেছিস নাই, তুদের গরজ নাই, যত গরজ কি বাবার? কড্ডের কে আছিস?' এইবার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের একজন মহিলা উঠে দাঁড়ায়। মহিলাটির গায়ের রঙ কালো, লাল পেড়ে কোরা শাড়ী পরেছিল। পিঠ খোলা চুল এলো খোঁপা করতে করতে এগোয়। কুঁড়ের দরজায় একটা প্রণাম ঠুকে ভেতরে ঢোকে। ভেতরে রহস্যময় পরিবেশ। এই সকালেও ভেতরে মাটির একটা প্রদীপ জ্বলছে, একদম কোণার দিকে। ধুনোর ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন। কান্ত'র সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে একহাত ঘোমটা টেনে পাখালী কোলে বসে। কান্ত সাপের মত দুলছিল, চোখ দুটো আধবোজা। মেয়েটি বসতেই বলে, 'তু কড্ডের শেতল বাগ্দীর বো তো? বিটির বিয়ের লেগে এসেছিস?'

মহিলাটি হাত জোড় করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'হঁ, বাবা, বড়া বেপদে পড়ে এলম। আমার বিটির বিয়েটো বারবার ভেঙ্গে যেছেক ক্যানে? আমার বিটির বিয়ে কি হবেক নাই বাবা?' কান্তর ঢুলুনি কিছুটা কমে আসে, একসময় স্থির হয়ে যায়। চোখ খুলে তাকায় তার দিকে। মহিলাটি কান্তর ধকধকে চোখ দেখে ভযে ভয়ে আবাব বলে, 'তা বাবা, আমার

বিটির ....' কথা শেষ না হতেই কান্ত অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুচকি হেসে, 'দাঁড়া বাবাকে আর্জিটো জানিন দি।' বলে আবার চোখ বন্ধ করে পাশে উপুড় করে রাখা মাটির পাতনার ওপর কান পাতে। বেশ কিছুক্ষণ কান পেতে বসে থাকার পর মাথা তুলে বলে, 'হুঁ, তুর বিটির বিয়ে হঁয়ে যাবেক। ডরের কিছু নাই। তুর নিজের লুকে ভাঙ্গিন দিছে।'

মহিলাটি প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে জিগ্যেস করে, 'তাইলে কি হবেক বাবা?'

কান্ত দুলতে দুলতে বলে, 'গুঁসাইয়ের কাছে এলি কি হবেক চিন্তে করে? আমি রইছি না, তুর দুশমুনদের নাকে দড়ি দিঁয়ে ঘুরিন দুবো, ভাবিস না।'

মহিলাটি বলে, 'কিন্তু বাবা, যদি না হয়?'

কান্ত সাপের মতই ফোঁস করে ওঠে, 'কি বললি? তুর সন্দো হছে? আমাকে সন্দো হছে? যা, তুর কাজ হবেক নাই, যা।' শীতল বাগ্দীর বৌ কঁকিয়ে ওঠে এ কথা শুনে, কান্তর সামনে উপুড় হয়ে পড়ে। না, বাবা, ই কুথাটো ব্যাতে এনেন না বাবা। আপনার কাছে ই লেগেই ছুটে আইছি। ই রকম কুথা আর বলব নাই। নাক রগড়াইছি।' বলে মহিলাটি নাকে খত দিতেই কান্ত তার মাথাটা দু হাতে ধরে উঠিয়ে বলে, 'উঠে, বাবা তুকে ইবারের লেগে খেমা করে দিলেক উঠ। আয় এগিন আয়, তুর বিটির বিয়ে ই বছরেই হবেক, ভাবিস না। বাবার পুষ্পু দিছি। একটো তামার মাদুলিতে ভরে শনিবার সনঝে বিলাতে পড়িন দিবি ডান হাতে।' শীতল বাগ্দীর বৌ আর একটু এগিয়ে যায়। কান্ত পেছন দিকে হাত চালিয়ে সিঁদুরে ডোবা পাথর খণ্ডের নীচে পড়ে থাকা একটা গেঁদা ফুল তুলে তার ডান হাতটা ধরে টেনে দু হাতে শীতল বাগ্দীর বৌয়ের মুখটা ধরে তার ঠোঁটের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, 'গুঁসাই রঁয়েছে, আমি রইছি, তুর ডর কিসের রে অ্যাঁ? তুর বিটির বিয়ে হবেকই ইবার। লে হাত পাত। কাজ হঁয়ে গেলে পূজো দিবি ভাল করে।'

কড্ডের শীতল বাগ্দীর বউ কান্তর দুপায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে কাপড়ের খোঁটে পুষ্প বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে যেতেই কান্ত পাশে রাখা গাঁজার কল্কের টিকেটা ধরিয়ে দু-চার টান দিয়ে আসনের নীচে রাখা ছেলে দুলুর লুকিয়ে দিয়ে যাওয়া ফরিদীদের নামের তালিকাটা দেখে ডাকে, 'পাতাডাঙ্গের গঙ্গা ·আয়— ' কুঁড়ের দরজায় পায়ের শব্দ শুনতেই কান্ত কাগজটা চট্ করে আসনের তলায় চালান দিয়ে মৃদু মৃদু দুলতে থাকে। দুলুনির মাঝে সে দেখে নেয় বেশ স্বাস্থ্যবতী আইবুড়ো মেয়ে, টানটান শরীর। কান্তর ভেতরে কোথাও গুড় গুড় করে ওঠে। 'গঙ্গা, তুর কি চায়, বল বাবার কাছে। গঙ্গাকে দেখে কান্ত ভেতরে বেশ উত্তেজিত। কান্ত আর কিছু জিগ্যেস করার আগেই গঙ্গা গড় হয়ে প্রণাম করে বলে, 'আমার কিছু হাজুম হছে না বাবা। ই রুগটো আমাকে জ্বঁালাই খেলেক। সেই লেগেই তো আসা।' সামনে গঙ্গার ভরন্ত শরীর দেখে কান্ত উত্তেজনায় ছটফট করছিল। গাঁজার নেশা। নিঃশ্বাস ঘন হতে শুরু করেছে। কান্ত ধুনুচীতে কিছুটা ধুনো ছড়িয়ে দিতেই ভস্‌ভস্ করে ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়। গঙ্গার চোখে চোখ রেখে কান্ত বলে, 'বাবার কাছে কিছু লুকিন যাবি না। সত্যি করে বল্, তু আগে প্যাট খঁসাইছিলি কিনা?'

গঙ্গা চুপ করে থাকে। মুখ নীচু করে। গঙ্গা অশিক্ষিত মেয়ে। সে কি ছাই জানে যে তার অবৈধ প্রণয়ের ফসলের কথা মাসখানেক আগে চারপাশের দু-পাঁচটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা বীরভূমে নামকরা দ্যাশী এই কান্তর কানেও পৌঁছে গ্যাছে এবং তাকে দেখে চিনে ফেলবে। গঙ্গা চুপ করে থাকায় কান্ত বলে, 'গুঁসাইয়ের কাছে লুকিন যাবি না, বাবা সব জানে। নাইলে তুর এই অম্বলশূলটো ভাল হবেক নাই।' কান্ত পাতনায় [illegible] কান বাখে। মিনিটখানেক পর সোজা হয়ে বলে, 'তু আমা[illegible] তুকে [illegible] করে শুতে

বললেক। তু আমার কুলে শুয়ে পড়। আয়, ডরাস না। এত ডর লাগছে তো গুঁসাইয়ের কাছে এলি ক্যানে? বল তু প্যাট খসাস নাই?" গঙ্গা এগিয়ে আসতে আসতে, 'হুঁ বাবা, উটো বুঝতে লারি নাই।' কান্ত এই সুযোগেই ছিল। হাত বাড়িয়ে গঙ্গাকে কোলে টেনে নিয়ে কোলের ওপর শুইয়ে তাকে চটকাতে শুরু করে। গঙ্গার টইটম্বুর বুকে হাত রাখে। গঙ্গা ভয়ে প্রতিবাদ করে না। গুঁসাইয়ের দ্যাশী বলে কথা! সে জানে কান্ত দ্যাশী গোঁসাইকে দিয়ে মানুষের চরম সব্বোনাশ করতে পারে। মিনিট দশেক পর কান্ত গঙ্গাকে কোল থেকে নামিয়ে একটা কোটো থেকে সিঁদুরমাখা কয়েকটা বাতাসা দিয়ে বলে, 'ইগুলো লিতুই একটো করে খাবি সুকালে। সাতদিন পর দেখিন যাবি।'

সবশেষ ফরিদীকে ডাকার আগে কান্ত আবার দু-চার টান গাঁজা টেনে নেয়। মাথাটা পরিষ্কার। টগবগে হয়ে উঠেছে শরীর। ধুনুচীতে শেষবারের মত এক মুঠো ধুনো ফেলে হিসহিসে গলায় ডাকে, 'তিলপাড়ার হোরে মুচীর বিটি রাণী আয় ....' কান্তর গলা শুনে শেষ ফরিদী হরিহর মুচীর মেজ মেয়ে উঠে দাঁড়ায়। ধুনোর ধোঁয়ায় ভর্তি কুঁড়েটার ভেতর বসতে বসতে দ্যাখে কান্ত বড় বড় চোখে তাকিয়ে, চোখগুলো জবা ফুলের মত লাল। বিশাল স্বাস্থ্য ঘামে যেন চকচক করছে। কান্ত বেশ জোরে জোরে দুলতে শুরু করে। মিনিটখানেক দোলার পর থেমে বলে, 'বিয়ে হঁয়েছে তিন বছর হলো, ছিলে হছে নাই নাকি রে রাণী? বাবার কিপা তুর উপর নাই। তু গেঁজা আনিস নাই আজ। বাবাকে তুষ্টু করবি ত্যাবে তো তুর ছিলে হবেক।' তিলপাড়ার রাণী কেঁদে ওঠে, হেই বাবা, তুমার চরণে পড়ছি, গেঁজাট ভুলে গেইছি আনতে, কিনা হয়েছিল।' 'জানি রে জানি। বল্ কিসের লেগে গুঁসাইয়ের কাছে এলি?' 'আমি কি আর গাইবো বাবা, সব বেত্তান্তটো তো জানেন, ছিলে আপনাকে দিতেই হবেক।' 'হবেক রে হবেক, তুর ছিলে হবেক।' লে ই পাতনাটোর কাছে শুঁয়ে পড়। তুর প্যাটে পুষ্পু ঠেকিন দিই, বাবার পিদীমের ত্যাল মালিশ করে দিই, ত্যাবে তো তুর ঘরে পিদীম জ্বলবেক।'

হরিহর মুচীর মেয়ে রাণী ভক্তিভরে শুয়ে পড়ে। কান্তর মুখের ভেতরটা লালায় ভর্তি হয়ে যায়। শায়িত রাণীর ছিপছিপে শরীরটা দেখে লাফিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু সংযত হয়ে প্রদীপের তেলে হাত চুবিয়ে তেল নিতে নিতে বলে, 'প্যাটটো খুলা রাখ।' কান্ত রাণীর খোলা ঢেউ খেলানো পেটে তেল লাগাবার আগেই ফেটে পড়ে, ভেতরের আগুন ফেটে ছড়িয়ে যায়। দ্যাশী কান্ত যখন রাণীর শরীর থেকে উঠল ঘেমে নেয়ে একাকার এই শীতেও। পরিতৃপ্ত কান্ত লাল কাপড়টা জুত করে পরতে পরতে বলে, 'যা, বাবার আদেশে তুকে ছিলে দিলম। তুর কুপালটো ভাল। গুঁসাইকে কুনোদিন চটাস না। তুর ছিলে হবেকই বলে দিলম। আমি হছি যেঁয়ে গুঁসাইয়ের দ্যাশী।' রাণী লজ্জায়, ভয়ে অপমানে সন্ত্রস্ত। তা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ঠিক করতে করতে ভাবে উই পাতনা ঢাকা গুঁসাই আছে, সুবাই বলে। উই পাতনাতে কান পেতে শুনেতো দাশী ইটো করলেক। ইতে কাগ্‌পেখেও জানতে লারবেক। ছিলে তো চাই।

সনাতনী লেপটা টেনে শুধু মুখটা বের করে স্বামীর দিকে পাশ ফিরে শোয়। তার নিঃশ্বাস কান্তর মুখে এসে পড়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগতেই কান্ত বলে, 'মুখটা সরিন শু।' সনাতনী মাথাটা বালিশের ওপর আর একটু তুলে দিয়ে বলে, 'হুঁ, যা বলছিলম। হাঁ গো, অ্যাতো দিন হঁয়ে গেল, বো'মার কিছু হলো নাই। তুমার কাছে বিরেনে গাঁয়ের মাগীদের অ্যাতো কাজ হছে, ঘরের দিকে তুমার লজর নাই।' সনাতনী চুপ করতেই কান্ত বলে, 'ফুল চড়িনছি দুবার, মাদুলী দিয়েঁছি, দ্যাখ্ কি হয়। হেরিকেনটো চুখে লাগছে, কমিন্ দিঁয়ে আয়।' সনাতনী

হারিকেনের শিখা কমিয়ে দিয়ে এসে চিৎ হয়ে শুতে শুতে বলে, 'দুলোর বিয়ে দিয়েঁছি কতদিন হলো, বলো তো দিকিন?'

কান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকায় সনাতনী ডাকে, 'কি, ঘুমিন গেলে নাকি? তুমার গুঁসাইকে বলো, কিছু হছে না। লুকেই বা কি বলবেক, ঘরের বো'টো যি খালি কুলে ঘুরে বিড়াইছে, তুমার লজরে পড়ছেক নাই? আমাদের উই একটোই বিটা, বংশ লুপ পেঁয়ে যাবেক, গুঁসাইকে ধরো। গুঁসাইকে ধরেই তো হোরে মুচীর বিটি পো'তি হলো। ও হঁ, বলতে ভুলে গেইছিলম, বিকেলে যখন শালে গেইছিলে হোরে মুচী খবরটো দিঁয়ে গেল, একটো লাল পেড়ে শাড়ীও দিঁয়েছে।' কান্ত একটু বিরক্ত হয়। তার কথা বলতে ইচ্ছা করে না। দুশ্চিন্তায় তার ঘুম আসছে না, সত্যি কি তার বংশ লোপ পেয়ে যাবে?' দুলুর বৌয়ের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠায় উসখুস করে ওঠে। ভাবে, বৌটো বাঁজাগাছ লয় তো? ফল হবেক কিনা কে জানে? গুঁসাইয়ের কি যে ইচ্ছে! কান্ত জানে দুলুর বৌয়ের ছেলে হওয়ার ওপর নির্ভর করছে তার এই ঠাট ঠমক, বুজরুকী সব। ফরিদী এই মেয়েগুলোর শরীরে আহ্! কি যে সুখ লুকিয়ে আছে! দুলুর বৌয়ের ফল না হলেই ভয় তার এই কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। লোকে বলবে, 'যি লিজের ঘরের কাজ করতে লারলেক সি আবার দ্যাশী!' কিন্তু লোকে কি করে জানবে বাঁজা, দুর্নাম কিভাবে ঘোচায় কান্ত! ফুল মাদুলীতে কি ছেলে হয়? ভেতরে অস্থিরতা বাড়তে থাকে কান্তর। ব্যাটার বৌ, নিজের স্ত্রী সনাতনীর কাছে কি সে হেরে যাবে, ছোট হয়ে যাবে? শেষে কি ঘরের লোকেও তাব ব্যাপার স্যাপার ধরে ফেলবে? সনাতনী পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে, কান্তর ঘুম আসে না। ভয় পেতে পেতে সে এমন এক জগতে হারিয়ে যায় যেখানে আছে বীরভূমের সদর শহর সিউড়ি থেকে কয়েক মাইল উজানে লালমাটির পথ বেয়ে আসা এই ছোট্ট গ্রাম লম্বোদরপুর, যাকে গাঁ ঘরের মানুষজন লুমুদপুর বলে। লুমুদপুরের কাঁচা লাল ধুলো ওড়া রাস্তা। রাস্তার দুপাশে গুচ্ছ গুচ্ছ ঘর, এইসব ঘরের নানা ধরনের বাসিন্দা, যাদের মধ্যে আছে সংস্কার, কুসংস্কার, গোঁসাইয়ের দেয়াশীর প্রতি ভয়, ভক্তি। এই ভয় ভক্তি লুমুদপুর ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়া রণপুর, হুসনোবাদ, লাঙ্গুলে, কড্ডে, পাতাডাঙ্গ, সদর সিউড়ির অন্তজঃ শ্রেণীর মানুষজন। এদের মধ্যে আছে রোগ, জ্বালা, অবৈধ প্রণয়, বেবাগা স্বামীকে বশে আনার চিন্তা, কারো ছেলে না হওয়ার চিন্তা আর এইসব চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া মায়ের দয়ায় মুখ ভরে যাওয়া কান্ত, যার ঘর থেকে কিছুটা মাত্র তফাতে বাঁধাপুকুর, বাঁধাপুকুরের চারপাশে গোল হয়ে থাকা ঝাঁকড়া গাছের দল, এইসব ঝাঁকড়া গাছগুলোর মাঝে এপাশে ঝামাইটে বাঁধানো পুকুরঘাট ছাড়িয়ে ফণীমনসার বৃদ্ধ গাছ, গাছের নীচে গোঁসাইয়ের থান, আর এই থানের জোরেই কান্তর টিকেথাকা, শুধু টিকে থাকা নয়, তার প্রতি লোকের ভয় ভক্তি, ভক্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছেক কান্তর ভেতরে জন্ম নেওয়া মেয়ে শরীরের স্বাদ গন্ধ। এই স্বাদ গন্ধের জগতে আছে মেয়ে ফরিদীদের কান্তর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাসে ভর করে এই লুমুদপুরে ছুটে আসা, আর বিশ্বাস আছে বলেই মেয়ে ফরিদীদের গরম উপচানো শরীর কান্ত হাতের মুঠোয় পায়, তাকে দুর্বার ভাবে টানে, এই টানের জন্যই তাকে দেয়াশীর ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করে যেতে হয়। অভিনয়ে আছে ফুল, বেলপাতা, সিঁদুরমাখা বাতাসা, মাদুলি, ধুলোপড়া, জটাশুদ্ধ মাথা দোলানো যাকে লোকেরা ভরনামা বলে। যে ভর নামতেই মেয়েরা সন্ত্রস্ত হয়, গোঁসাইয়ের প্রতি বিশ্বাস বাড়ে। বিশ্বাস বাড়ার জন্যই কান্তর নিজেরও একটা ভয় আছে, যাতে আছে তার বুজরুকী ধরে ফেলার ভয় । কান্তর গর্ত গর্ত হয়ে যাওয়া কপাল, চোখ কুঁচকে যায়। সেই কোঁচকানো চোখে এখন সে ঘুমন্ত সনাতনীর

দিকে তাকায়, ভারী জটাতে হাত বোলায়। ভাবে এই জটা, রুদ্রাক্ষের মালা, আটন সব কি শেষে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে? তাহলে ওইসব নরম নরম শরীর এবং আর্থিক নিশ্চিন্ততা কে এনে দেবে? কান্ত ছটফট করে ওঠে, হোরে মুচীর বিটিও পো'তি হলো ....' অস্থির কান্ত বিছানা ছেড়ে, চাদর গায়ে জড়িয়ে কোঠার চাপা দুয়োর তুলে নেমে আসে। চতুর্দিকঅন্ধকার। কনকনে হাওয়া বয়। ঘরের উঠোন, ধানের মড়াই সব মিলেমিশে অন্ধকারকে ঘন করে তুলেছে। ওই অন্ধকারে মাটির উঁচু দাওয়ায় বসে সামনে গোয়াল ঘরের পাশের কুঁড়েটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় বিড়বিড় করে, 'হে গুঁসাই, মানটো বাঁচাও .. দুলের বো'র ছিলে দাও ....' চোখের সামনে ভেসে ওঠে দুলের বৌ ফরিদী হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কান্ত কঁকিয়ে ওঠে, 'না ...না...উটো লারবক .... উটো হয় না ....!'

ভিটের গন্ধ

প্রণব দত্ত

কর্কশ শব্দ তুলে স্টিম ইঞ্জিনের ট্রেনটা লেজের শেষ ঝাপটা দিয়ে পার হয়ে গেল ডিসন্যান্ট সিগনাল। এতক্ষণে যাত্রীরা চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালারা হর্ন বাজিয়ে সওয়ারি ডেকে চলেছে। সবজির খালি বজরা পাশে রেখে অলস ভঙ্গিতে গুলতানি করছে ভেন্ডাররা। তাদের এখন তাড়া নেই খুব একটা। কলকাতায় সবজি বিক্রি করে ফিরল সকলে। এতসময় পর সুজয় হালকা মেজাজে সিগারেট ধরিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল। এখানে কেউ তাকে চিনবে না। পুরনো দিনের কারও সঙ্গে দেখা হলে চট করে কেউ বুঝতে পারবে না তাকে। কুড়ি বছরের ব্যবধানে তার চেহারায় অনেক বদল হয়েছে।

স্টেশন এলাকায় এতদিন পর যে-বদলটা চোখে পডল সেটা হল রিকশার ছড়াছড়ি। টিকিট কাউন্টারের পাশে রিকশা ইউনিয়নের অফিস হয়েছে। আগে এত রিকশা ছিল না। সুজয়রা গোপালনগর থেকে স্কুল-ফিরতি-পথে দুপুরের ফাঁকা স্টেশন প্ল্যাটফরমে আড্ডা মারত। গজেনের ঘুগনির দোকান ছিল রিকশাস্ট্যান্ডেব কোনায়। সেটা ভেঙে এখন হয়েছে 'লক্ষ্মী অয়েল মিল'। সেখান থেকে তেলকলের শব্দ উঠছে। তখন স্টেশনে রিকশাওয়ালা বলতে ছিল একমাত্র রাধাদা। সন্ধ্যার পর নির্জন স্টেশনে কুপি জ্বালিয়ে যাত্রীর জন্য হাপিত্যেস করে বসে থাকত সে।

এখান থেকে বসবাস উঠিয়ে চলে যাওয়ার পরও কিছুদিন বাবা দমদম থেকে এখানে যাতায়াত করেছিল। তখন বাবার যাতায়াতের জন্য রাধাদাকেই ঠিক করে দিয়েছিল বড়দা।

বাবা দো-মনা করলে বড়দা বলেছিল, তোমার এখনও বছর তিনেক স্কুলমাস্টারি আছে। কোনও পাগলেও কি এখন চাকরি ছাড়বার কথা ভাবে। রাধাদার রিকশায় আরামে যাতায়াত করবে।

রাধাদাও উৎসাহ দেখিয়েছিল। লোকটা গুরুভক্ত। গলায় কণ্ঠী। বলেছিল, মাস্টারমশায়কে নিয়ে যাব এ আমার ভাগ্যি। আর বসতভিটের একটা টান আছে। নেশার মতো। ছেড়ে গেলেও আপনার মনটা ঘুরে বেড়াবে ফেলে আসা ভিটের চারপাশে।

তবুও বাবার যেটা বরাবরের স্বভাব তাই হল ; কয়েকদিন যাতায়াত করল পরম উৎসাহে। তারপর বেঁকে বসেছে। বলেছে, এভাবে চলে না। আর আমি চাকরি করব না। যে জায়গা ছেড়ে এসেছি একবার সেখানে আর ফিরব না। তার জন্য তোরা যদি না খেতে দিস, আমি এখানে টিউশনি করে খাব। এরপর শত অনুরোধেও বাবা তাঁর মত বদলায়নি। এই এক অভ্যাস বাবার। সাধারণ কথাগুলো এমনভাবে বলবে লোকের অপ্রিয় হতে বাধ্য। অথচ সুজয় বারবার লক্ষ করে দেখেছে, বা-বা আসলে খুব বোকা, সরল মানুষ। একটা অবাস্তব মানুষ। একটু মন জুগিয়ে চলে বড়দা কত সহজে বাবার রিটায়ারমেন্টের পর পাওয়া টাকাগুলো নিজের নামে ট্রান্সফার করিয়ে নিল। সেই টাকায ঘর উঠল তার।

সেবার বাবা কোথা থেকে শুনেছিল বড়দা অফিসের পার্টিতে মাঝেমধ্যে মদ্যপান করে থাকে। আর বাবার মাথায় ভূত চড়ল তো চড়লই। স্থানকালের পরোয়া না করে একদিন সকলের সামনে অবলীলায় বড়দাকে বলেছিল, হ্যা রে বাবলু, তুই নাকি মদ খাস?

কথাটায় বড়দা হকচকিয়ে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে কোনও উত্তর জোগায়নি মুখে। তখন মা সামনে এসে পরিস্থিতিটা সামলেছিল। ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, তোমার আমকাঠের নীচে যাওয়ার সময় হয়ে গেল, এখনও আক্কেল হল না। কাকে কি বলছ খেয়াল আছে? এভাবে বলে কেউ। আর যদি এসব খেয়েও থাকে তা তো নেশা করবার জন্যে নয়। বড় পদে কাজ করে অফিসে। ইচ্ছা না হলেও ওকে অনেক কিছু করতে হয়।

বাবা জ্বলন্ত চোখে তাকিয়েছিল মায়ের দিকে। মাকে কোনওদিন তেমন আমল দেয়নি বাবা। মায়ের ধর্ম-কর্মের বাতিক আছে। সারা দিন ঠাকুরঘরে গোপালের বিগ্রহ সাজাচ্ছে। কোনও অছিলায় ঠাকুরের সামনে কাটিয়ে দিচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাবার অহরহ ঝগড়া চলছে। বাবা বলে, এসব তোমার ধর্ম করা নয়, বুজরুকি। ধর্মবোধ আসবার জন্যও কিছু বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন। আর তুমি পুজো করছ মন পড়ে রয়েছে রান্নাঘরে।

একটু রাগারাগি হলেই মা ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করবে। স্বগতোক্তির মতো বলবে, শত্তুর, শত্তুর। লোকটা আমার জীবনটাকে জ্বালিয়ে ভাজা ভাজা করল। মায়ের কথায় আমল না দিয়ে বাবা বিড় বিড় করবে একা।

এদের কোনও সৎসাহস নেই। ইচ্ছা না হলেও মদ খেতে হবে সকলকে মানিয়ে। তাহলে আমার এতদিনকার জীবনচর্যা ব্যর্থ। নিশ্চয় কিছু ভুল ছিল।

এক একটা মানুষ থাকে অহেতুক এলোমেলো কথা বলে সংসারের পরিবেশকে নষ্ট করে দেয়। বাবা তেমনই। বড়দার ছেলের জন্মদিনে কী কাণ্ডটাই না করে বসল। বড়দা কেবল বলবার মধ্যে বলেছিল, বাবা, পোশাকটা বদলে এবার একটু ভাল জামাকাপড় পরে নাও। আমার অফিসের লোকজন আসবে।

বাবা কেমনভাবে বদলে গেল এ-কথায়। তার মাথায় আত্মসম্মানবোধটা ফন্‌ফনিয়ে উঠল হঠাৎই। বলেছিল, পোশাক বদলাব না আমি। এই পোশাকে তোর অফিসের বড় পোস্টে কাজ করা মানুষদের সামনে আমাকে যদি বাবা বলে পরিচয় দিতে বাধে, তবে পরিচয় দিস না।

এতবার বুঝিয়েও বাবাকে নিয়ন্ত্রণে আনা গেল না। বাবা নস্যির ছোপ লাগা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ঠায় বসে রইল সারা দিন। নিজেকে হাস্যকর করে তুলল।

এই নিয়ে বাড়ির পরিবেশটাই অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। বড়দার সংসারে দাম্পত্যকলহ শুরু হয়ে গেল। মাথা গরম হয়ে গেলে বউদির কথার ঠিক থাকে না। তার ঘর থেকে সে নানান আনসান কথা শুনিয়েছে।

একসময় রাগে ক্ষোভে বাবার কাছে এসে ফেটে পড়েছিল বড়দা, তুমি একটা ঘরজ্বালানো মানুষ। সারা জীবন মাকে অতিষ্ঠ করেছ। এখন আমাদের জ্বালাচ্ছ। তোমার কাছ থেকে পরিত্রাণ চাই।

বাবা কথা বলেনি সারা দিন। গুম মেরে ঢুকে গিয়েছে মশারির ভিতরে তার রচিত বিবরে। চারপাশে নানা লোকজনকে রাগিয়ে দিয়ে ক্রমাগত নিজের সুড়ঙ্গে ঢুকে আক্র চেয়েছে বাবা। সেখানে তার সবসময়ের সঙ্গী একটা টর্চ আর ঠাকুরদার আমলের রেডিওটা। ওখানে বসে শূন্য দেওয়ালে দৃষ্টি মেলে সে কী যেন কথা বলে একা একা। সারা ঘরে বাল্‌বের ঘোলাটে আলো। মাঝে মাঝে কীসব ভাবতে ভাবতে গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রু নামে বাবার। ওখানে বসে স্বপ্ন ভাঙে, স্বপ্ন জোড়া লাগায়। স্মৃতির গ্রন্থি খুঁজে চলে আপ্রাণ।

তবুও এত কিছুর পরও সুজয়ের অদ্ভুত প্রশ্রয় আছে বাবার জন্য। ছোটবেলায় ওদের কারও জ্বর হলে বাবা শিয়রে বসে থাকত সারা রাত। বাইরে বেড়াতে গিয়ে কেউ তাকে কোনও ভাল খাবার দিলে নিজে খায়নি। তাদের ভাইদের জন্য নিয়ে এসেছে হাতে করে। ছেলেবেলাকার দৃশ্যগুলো মাঝে মাঝে রাত্রে অস্থির করে তোলে সুজয়কে। এত বছর পরেও সে চোখ বুজে বলে দিতে পারে গ্রামে ওদের বাড়ির কোন গাছটা কোথায় ছিল। স্মৃতিতে তখনকার দু-একটা দৃশ্য এখনও সতেজ, টাটকা। বাবার সঙ্গে হাট করে ফিরছে সুজয়। তার হাতে মাছের ছোট ব্যাগটা। একটা নীল-সাদা স্ট্রাইপের শার্ট পরত বাবা। ধুতি হাঁটুর ওপরে গোটানো। তাদের গ্রামে যেতে মাঝখানে গণেশপুরের বিস্তৃত মাঠ। ধানক্ষেত, সবজিক্ষেতের মাথায় ফড়িং উড়ছে। নালা দিয়ে ডিপটিউবওয়েলের জল যাওয়ার কুলকুল শব্দ। বর্দ্ধনবেড়ের ওপাশে গাছপালার পিছনে লাল বলের মতো সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে। বাবা বলছে, চল সুজয়, দেখি কে আগে যায়। সূর্য ডোবার আগেই পৌঁছাতে হবে বর্দ্ধনবেড়ের রাস্তায়। ওরা দুজন ছুটছে। কখনও সুজয় এগোচ্ছে কখনও বাবা। নির্জন শস্যক্ষেতের আল বেয়ে বাবা-ছেলের কানামাছি খেলা যেন। তারপর কোনও বাবলাগাছের নীচে থেমে দুজনার কী অনাবিল হাসি।

সেই প্রাণময় বাবা এখন জড়বৎ। সারা রাত স্মৃতির লাটাই ধরে ওড়ে রাতের বিপন্ন বাতাসে। তারপর হাসির বদলে অশ্রুপ্লাবিত হয়। অপেক্ষায় থাকে ভোর হওয়ার। তারপর ঠিক ভোরে উঠবে বাবা। নানান যোগাসন করবে। স্টোভ জ্বালিয়ে লাল চা করে খাবে। তারপর হামানদিস্তেয় পান ছেঁচতে বসে যাবে।

তখন ঘুম ভেঙে কথা শোনাবে মা, লোকটার জ্বালায় যদি কেউ ঘুমাতে পারে বিছানায়। পান ছেঁচবার শব্দে পাড়া অতিষ্ঠ করে রাখবে। কবে আশে পাশের বাড়ির লোক কথা শোনাবে। তখন আর এক বিপত্তির শুরু হবে।

সুজয়ও ভয় পায় আজকাল। বয়সের ভারে বাবা নানা ব্যাপার ভুলে যায়। কবে স্টোভের আগুনে পুড়ে মরবে সকলে।

রাগ হলেও বাবাকে কিছু বলতে পারে না সুজয়। এক এক দিন মন খারাপ লাগে খুব। বাবার খাটের পাশে এসে বসেছে সুজয়। গোটা ঘরে মশারির ঘেরে বাবা একদম একা। তার শূন্য আশাহীন দৃষ্টি দেওয়ালের দিকে মেলে ধরা। দীর্ঘদিন না পরিষ্কার করায় বাবার বিছানা থেকে একরকম বোটকা গন্ধ ওঠে। সুজয়ের মনে হয় ওটা বুঝি মৃত্যুরই গন্ধ। প্রবল হাহাকারে তোলপাড় হয়ে গিয়েছে বুকের মধ্যেটা। আবেগে সে বিলি কেটে দিয়েছে বাবার চুলে। বলেছে, এরকম করো কেন তুমি বাবা। তোমাকে ওরা কেউ বুঝবে না। কথাটাই মনে রাখবে সকলে। এসব এলোমেলো কথা বলো না যখন-তখন। তারপর গলার স্বরটা নামিয়ে বলেছে, তোমার কিছু প্রয়োজন হলে আমার কাছে বলবে। অত চিন্তা করবে না। আমি তো আছি।

এই সামান্য প্রশ্রয়ে কেমন গলে গিয়েছে বাবা। তুইই আমাকে একমাত্র বুঝিস সুজয়। আমি সংসার ভাল বুঝি না। এদের সঙ্গে পোষাবে না আমার। তুই বরং আমাকে একটা ঘর ভাড়া করে দে। আমি একা থাকব। কেমন ছেলেমানুষের মতো আবদার করে যাচ্ছে বাবা।

সুজয় উত্তরে হ্যাঁ বা না বলেনি। হেসে প্রসঙ্গ পাল্টে বাবার মন জুগিয়ে কথা বলেছে সে।

কিন্তু সকাল হলেই আবার যে কে সেই। কয়েক দিনের মধ্যে আবার একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে বাবা। ক্লাবের ছেলেরা পুজোর চাঁদা চাইতে এলে বাবা আনসান কথা শুনিয়েছে তাদের। বলেছে, তোমরা ক্লাবে তো অকাজে সময় কাটাও সারা দিন। কাজের মধ্যে কাজ এক পুজো করা। সমাজসেবা করবার জন্য কিছু ভাবনা ভাব। এই বয়সে আমরা দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

ছেলেদের দল বিরক্ত হয়েছে এ কথায়। একজন ভিড় থেকে ফোড়ন কেটেছে, আপনার ও লেকচারে আমাদের পেট ভরবে না। কবে আঙুল দিয়ে ঘি খেয়েছেন এখন গন্ধ শুঁকিয়ে লাভ কি?

ক্লাবের ছেলেরা চলে গিয়েছে হল্লা করতে করতে। এর পরে বাবা রাস্তায় বের হলে তার পেছনে ছেলেরা ছাগলের ডাক ডেকে উঠেছে ক্লাবঘর থেকে।

ঝামেলা মিটিয়েছে বড়দা। ক্লাবে গিয়ে সেধে দিয়ে এসেছে মোটা অঙ্কের চাঁদা। আর বাড়ি ফিরে সে বাবাকে তার মতো করে বীরত্বের গল্প বলেছে বানিয়ে।

বাবার চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আনন্দে বলেছে, এই তো আমার ছেলের মতো কাজ। সবচেয়ে বড় জিনিস হল চারিত্রিক দৃঢ়তা। তারপর আবেগে স্বাধীনতা সংগ্রামের নানান গল্প বলে চলেছে বাবা।

বড়দার এসব শুনবার ধৈর্য নেই। কাজের অছিলায় সরে পড়েছে।

কখনও একা থাকলে বাবাকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেয়েছে সুজয়। কোনও তল পায়নি। বাবার জীবনটা নানান বৈচিত্র্যে ভরা। স্বাধীনতা আন্দোলনে এত দামাল প্রাণময়তা ছিল মানুষটার। কত গল্প বলেছে বাবা ছোটবেলায়। শুরুতে সেই দামাল জীবনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ক্ষত দাগ। সেই মানুষটা এখন সকলকে রাগিয়ে দিয়ে, প্রত্যাখ্যাত হতে হতে এখন মশারির মধ্যে আড়াল খুঁজছে ক্রমাগত। নানান একগুঁয়েমিতে একের পর এক চাকরি ছেড়েছে সে। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছে উদ্বাস্তুর মতো। কেউ বোঝেনি তাকে। এমন মানুষকে কেউ বোঝে না সংসারে। এক এক সময় বাবার প্রতি রাগ হয়েছে, ক্ষোভ হয়েছে। সুজয় অনুভব করেছে তার শরীরেও বাবার অশুভ রক্তের চলাচল। অহরহ তীব্র একাকিত্ববোধ আসে তারও। কী যেন কারণে তার বন্ধু কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সুমিও তাকে বুঝল না। কখনও মনে হয়েছে বাবার এ অশুভ রক্ত থেকে তারও পরিত্রাণ চাই। কিন্তু ঘৃণারও একরকম টান আছে। তীব্র সে টান। বারবার বাবার কাছে ছুটে গিয়েছে সুজয় আর ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। চারপাশের মানুষজনকে বিরূপ করে দিয়েছে বাবা। কোনও আত্মীয়রাও আজকাল আসে না পারতপক্ষে। সুজয় তো নিজেই দেখেছে, পিসির বিয়ের সময় বাবা কী নিষ্ঠুরভাবে মায়ের গহনাগুলো বিলিয়ে দিল। আর সেই পিসিই সেদিন কেমন অহঙ্কারীর ঢঙে বলল, বারবার যাওয়ার কথা বলছিস। যেতে তো ইচ্ছে করে তোদের ওখানে। কিন্তু ও-বাড়ির কিম্ভূত মানুষটা না সরলে আর থুথু ফেলতেও যাব না ওখানে।

তখন কথাটায় খুব রাগ হয়েছিল পিসির ওপর। মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ। সেই মুহূর্তেই কেন জানি না মায়া উথলিয়ে উঠেছে বুকের ভিতর।

সেদিনকার দেখা দৃশ্যটা জীবনে ভুলবে না সুজয়। অসুস্থ বাবার হাত ধরে তাকে ফটো তুলবার জন্য ছাদে উঠিয়ে আনছিল বড়দা। তারা পুরী গিয়েছিল বেড়াতে। ওখানে ফটো তুলবার পর ফিল্মের কিছুটা বেঁচে গিয়েছে। সেগুলো এভাবে সদ্ব্যবহার করছিল বড়দা। বড়দার কাঁধে ভর রেখে উপরে উঠছিল বাবা। জরায় অথর্বপ্রায় শরীরে মাতালের মতো পা পড়ছিল তার। তারপর বাবাকে ছাদে এনে চেয়ারে বসানো হয়। পাশ থেকে সকলে সরে গেলে একসময় ক্যামেরার লেন্সের সামনে বাবা একদম একা হয়ে গিয়েছে। বাবার তখনকার দৃষ্টিতে কী অব্যক্ত বেদনা ছিল।

সুজয় জানে এ নিশ্চয় শখে ছবি তোলা নয়। বড়দা বরাবরের হিসাবী মানুষ। ঘরে বাবার ভাল ছবি না থাকায় এ ছবি তুলিয়ে রাখা হচ্ছিল। নিশ্চয় মৃত্যুর পর বাবার শ্রাদ্ধবাসরে কাজে লাগানো হবে।

এই ভীষণ নিষ্ঠুর একটা কাজেও সকলে কেমন সাবলীল। কর্তব্য সম্পাদনের ঢঙে কাজ করে যাচ্ছিল তারা। বাবা অবশ্যই বুঝতে পেরেছিল কিছু। না-হলে বাবার চোখেমুখে এক অন্য রকম ব্যথা ফুটে উঠেছিল কেন। সুজয় অপলক চোখে দেখেছে এ দৃশ্য। মনে হয়েছে এ যেন তারই সুদূর ভবিষ্যতের কোনও দৃশ্য। তার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত বাবার অশুভ রক্ত। এর নাম জীবন। সুজয়ের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমস্রোত নেমে গিয়েছে। সে আর স্থির থাকতে পারেনি। বড়দারা নেমে এলে চড়া গলায় বলেছিল, এটা তোমরা কী করছ? ঘটনাটার মানে বোঝ? বাবা ভীষণ স্পর্শকাতর। তোমরা বুঝবে না এ ঘটনায় তার মধ্যে কী ভীষণ তোলপাড় হচ্ছে।

বড়দার মুখে কেমন অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছে, যা তো বেশি লেকচার দিস না। তুই কী ভাবিস তুই একাই বুদ্ধিমান। ধরে নে পরের কথা ভেবেই ছবি তুলে রাখছি। তার জন্যে হয়েছেটা কি? টাকা তো সস্তা নয়?

কেমন সহজে কথাটা বলে গেল বড়দা। চোখেমুখে কোথাও মায়া-মমতার চিহ্নমাত্র নেই। একটা মোক্ষম উত্তর মুখে এসে গিয়েছিল। নিজেকে সংযত করল সুজয়। এসব কথা শুরু হলে আবার একটা নারকীয় পরিবেশ তৈরি হবে বাড়িতে। সেদিন এরকমই একটা ঝামেলার সময় তাকে কথা শুনিয়েছে বউদি। সংসারে আরও কিছু টাকা বাড়ানোর কথা ভাবো। শুধু বড় কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। সুজয় আমতা আমতা করে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, সবে পরীক্ষা গেল ছাত্র-ছাত্রীদের। এখন টিউশানির মল মাস। তার উপর নানা চাকরির পরীক্ষার জন্য পোস্টাল অর্ডার কিনতে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি।

বউদি যেন পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করবার জন্য তৈরি হয়েই আছে। কেমনভাবে বলল, তুমি কোথা থেকে টাকা জোগাড় করবে সেটা আমরা কী করে বলব। এদিকে কথা বলবার সময় তো ছাড় না। বাবার জন্য মাসে মাসে অতগুলো টাকার ওষুধ লাগছে। তোমার দাদারই কী একার দায় এসব। আমরা কী সব দায় নিয়ে বসে আছি। বউদির কথাগুলোর মধ্যে 'আমরা' কথাটা খট করে কানে লাগল সুজয়ের। এই কথাটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে বদলে যায়। এখনকার বউদির বলা 'আমরা' কথাটার মধ্যে সে, বাবা, মা, কারও স্থান নেই। এই যেমন। এখনই আবার বউদি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ঠেস মারা কথা শোনাল, এই জন্য তোমার জীবনে কিছু হল না।

আজকাল সুজয়ের মাঝে মধ্যে মনে হয় বাবা তখন টাকাগুলো হাতছাড়া না করলে অন্য রকম যত্ন পেত বাড়িতে। আসলে সে নিশ্চিত জানে বাবা সে সময় চাকরিটাও ছাড়তে চায়নি। যাতায়াতটা তার কাছে কোনও সমস্যা ছিল না। বস্তুত, রবাহূতের মতো ছেড়ে আসা গ্রামে আর ফিরে যেতে মন সায় দিচ্ছিল না বাবার। বাবা ভিটে ছেড়ে আসতে চায়নি। বড়দা তখন তারই প্রয়োজনে নানাভাবে বুঝিয়েছিল বাবাকে। বড়দার চাকরির জন্য কলকাতার কাছাকাছি থাকবার প্রয়োজন ছিল। বড়দা বলেছিল, গ্রামে আছেটা কী। শহরে গেলে তুমিও একটু ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারবে।

বাবা বলেছিল, এই বয়সে গ্রাম ছাড়তে ইচ্ছা করে না। এখানে সকলে কত সম্মান করে। রাস্তায় বের হলেই আমার হাতে গড়া ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয়। তার উপর চলে গেলে এতদিনকার বসত ভিটেয় প্রদীপ পড়বে না আর।

বড়দা প্রসঙ্গ বদলিয়ে নানান মন জুগিয়ে কথা বলে ঠিক কব্জা করেছিল বাবাকে। বলেছিল, তোমার কথা হয়তো ঠিক। তবুও ভেবে দেখ, তোমার একার আরাম দেখলেই তো চলবে না। সুজয়ের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। এখানে থেকে ভাল চাকরি-বাকারর চেষ্টা করা সম্ভব নয়।

বাবা আর অমত করেনি। তবে সুজয়ের মনে আছে, ক'দিন কেমন একটা ব্যথা জড়িয়ে ছিল বাবার চোখেমুখে। কয়েকদিন ভাল করে খেতে পর্যন্ত পারেনি বাবা। কেমন থম মেরে থেকেছে। এখন সুজয়ের মনে হয়, বাবাকে যেন বড়দা একরকম ছিঁড়ে এনেছে এতদিনকার ভিটে থেকে। অল্প টাকাতে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল জমিসহ বসতবাড়ি। তখন শুধু ফিরবার তাড়া ছিল।

এবারও গাঁয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাবার চোখেমুখে পুরনো আকুতি লক্ষ করেছে সুজয়। গত রাতে সুজয়ের ভাল ঘুম পর্যন্ত হয়নি। এতদিন পর গ্রামে যাচ্ছে সে। উপর থেকে এতদিন মনে হচ্ছিল গোটা গ্রামটাই হয়তো মুছে গিয়েছে তার স্মৃতি থেকে। কিন্তু সেখানে আবার যাওয়ার একটা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় ছোটবেলাকার নানান সুখস্মৃতি, দৃশ্যকল্প উদ্ভাসিত হয়েছে মনের পর্দায়। আর সেই স্মৃতির তারল্যে সুজয় সাঁতার কেটেছে সারা রাত। তাকে স্থির থাকতে দেয়নি এক তীব্র টান।

খামের উপর কাঁপা হাতে বন্ধুর ঠিকানা লিখে নিজেই চারপাশে আঁঠা দিয়ে খামটাকে বন্ধ করেছে বাবা। তারপর সেটা সুজয়ের হাতে দিয়ে কেমনভাবে বলেছিল, গিয়ে দেখ সে বেঁচে আছে না কি পরপারে গিয়েছে। এখন আমাদের তো কেবল যাওয়ারই পালা। আমাদের অবস্থা বাড়ির কার্নিশে গজিয়ে ওঠা বট চারাটার মতো। শেকড় বাকড়ে কোনও গভীরে প্রোথিত অথচ ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত, ক্ষতিকারক আমাদের এই জীবনযাপন।

তারপর বড়দার অসাক্ষাতে গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলেছিল বাবা, ওখানে যাবি তো আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে। একবার ভিটেবাড়িটা ঘুরে আসিস। পুরনো লোকজনের সঙ্গে দেখা করিস একবার।

তারপর একটু থেমে কেমন আর্তির মতো বলেছিল, দেখে আসিস তো কলতলার পাশে গোলাপখাস আমগাছটা কত বড় হল। কর্মকার বাড়ির বড়কর্তা এক বর্ষায় আমায় গাছের চারাটা দিয়েছিল। তখন ও বাড়িতে টিউশানি করতাম। ফল খাওয়া হয়নি। তার আগেই সব ছেড়ে চলে এলাম। পারলে আমগাছটার একটা ডাল ভেঙে নিয়ে আসিস আমার জন্য।

বাবার চোখেমুখে এক দুর্জ্ঞেয় ছায়া। সুজয় লক্ষ করে দেখল বাবার শ্যাওলাধরা দৃষ্টি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। এখন কিছুক্ষণ অদ্ভুত এক মৌতাতে স্মৃতির রাজত্বে ঘুরে বেড়াবে বাবা। বয়সের ভারে আজকাল তার সব স্মৃতি ঘুলিয়ে যায়। এ গল্প করতে করতে কখন পূর্ববঙ্গের দেশের বাড়ির গল্পে ঢুকে যাবে সে।

সুজয় আর দাঁড়ায়নি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজের অছিলায় চিঠিটা নিয়ে বের হয়ে এসেছে।

বের হওয়ার সময় বড়দা পইপই করে বলেছে, তোকে কাজ দিয়ে তো ভরসা হয় না। এবার অবশ্যই কাজটা মিটিয়ে আসবি। প্রয়োজন হলে ওখানে একরাত থেকে জোগাড় করে আনবি সব তথ্য।

এখন স্টেশন চত্বরের বাইরে আসতেই রিকশাওয়ালাদের মধ্যে সওয়ারি বাগানোর প্রতিযোগিতা শুরু হল। সুজয় কাউকে পাত্তা না দিয়ে নিজের ইচ্ছায় একটা রিকশায় উঠে বসে বলল, কনকপুর।

রিকশাচালকটা ছোকরামতো। ব্যাগিজ জামার পিছনে এক লাস্যময়ী নায়িকার মুখের ব্লো-আপ। তার অর্থ এদিকেও এসব সংস্কৃতি এসে গিয়েছে। ছোকরা সুজয়কে এখানে নবাগত ঠাউরেছে। উদাস গলায় জিজ্ঞাসা করল, আবার ফিরবেন তো?

চল। ফিরবার কথা পরে ভাবা যাবে।

ওদিকে রাস্তা খারাপ। রাস্তায় মোরাম পড়ছে। ভাড়া ছাড়া পাঁচ টাকা বেশি দিতে হবে কিন্তু।

সুজয়ের এখন কথা বাড়াতে ইচ্ছা করছে না। বাইরে দুপুরের কড়া রোদ্দুর রাজত্ব করছে। একটা হাওয়ার ঘূর্ণি কিছু ছেঁড়া কাগজপত্র নিয়ে উড়তে উড়তে চলে গেল অদৃশ্যতায়। সেদিকে তাকিয়ে রইল সুজয়। নানা কথা, স্মৃতি কলকল করে উঠছে বুকের ভিতর। কবেকার হারিয়ে যাওয়া জলছবিগুলো। রিকশাওয়ালা ছেলেটা বীরদর্পে প্যাডেল করছে। হাওয়ায় উড়ছে তার তেলহীন লম্বা চুল। একটা প্রজাপতি রিকশার সঙ্গে সঙ্গে উড়তে উড়তে আসছিল হাওয়ায়। গোত্তা খেয়ে উড়তে উড়তে চলে গেল পাশের নাবাল মাঠে। শস্যক্ষেত ছুঁয়ে হাওয়া আসছে।

ছোকরাটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, কোত্থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে। তারপর বাবার বন্ধুর নাম করে সুজয় বলল, কনকপুরের সনাতন হাজরাকে চেন?

ছেলেটা কেমন উদাসীনভাবে বলল, না, মনে পড়ছে না। এখন কত নতুন বসতি হয়েছে। রাস্তাটা নতুন হচ্ছে। পিচ পড়বে গণেশপুর পর্যন্ত। তখন আরও লোকজন বাড়বে। স্টেশনে যে তেলকল দেখলেন, তার মালিক হরিত ঘোষ রাস্তার পাশ বরাবর জমি কিনে রেখেছে। সময় হলে ডবল দামে ছাড়বে। তারপর থেমে বলল, এক কাজ করবেন। কনকপুর গিয়ে সূর্য সংঘের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করবেন। তারা এলাকার সব খবর রাখে।

বেশ নির্জন দুপুরটা। দু-একটা হাটুরে লোক মাথায় সবজির বজরা নিয়ে চলে যাচ্ছে। আজ মনে হয় গোপালনগরের হাটবার। হঠাৎ কেন জানি না এই নিঃসঙ্গ দুপুরে মনে হল, সুমিকে নিয়ে এলে বেশ হত। সে গ্রাম ভালবাসে। খুব আনন্দ পেত সে। ক্ষণিকইমাত্র এমন ভাব হল পরমুহূর্তেই হাঁটুর পুরনো ব্যথার মতো একটা ফিক ব্যথা উঠে হাহাকার করে উঠল বুকের মধ্যেটা। আর হয়তো সুমি থাকবে না। বিয়ে হয়ে হয়তো চলে যাবে অন্য কোথাও। সেদিন সুমির সঙ্গে দেখা হয়েছিল মিলনপল্লীর মাঠে। তখন খুব কেঁদেছিল সুমি। তার বাড়িতে সুজয়ের সঙ্গে মিশবার ব্যাপারে আপত্তি আছে। সুজয়কে বিয়ে করবার ব্যাপারে বলেছিল সুমি। কিন্তু এসব ভাবনা এখন সুজয়ের বাতুলতা। সংসারে যেভাবে ঘোঁট পাকছে যে কোনওদিন দাদা আলাদা হয়ে যেতে পারে। তা হলে সুজয় অথৈ জলে পড়বে। সুমি চিৎকার করেছে। রাগ করে চলে গিয়েছে। পরদিন সিনেমা যাওয়ার কথা ছিল। সুমি আসেনি। হঠাৎ চিন্তা কেটে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইছিল সুজয়। বলল, তোমার কি জমার রিকশা। নাকি নিজের? আয়পত্র কেমন হয়?

ছোকরার এ প্রসঙ্গে উৎসাহ নেই। দায়সারা উত্তর দিল, না, নিজের। তারপর থেমে বলল, আপনাদের ওদিকে ভোটের খবর কী?

সুজয় প্রশ্নটাকে তেমন আমল দিল না। কেবল বলল, একরকম।

ছেলেটা রিকশা চালাতে চালাতেই কত কথা বলে যাচ্ছে। আমাদের এদিকে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। খুব গণ্ডগোল হতে পারে ভোটের সময়। কনকপুরের মার্ডারটা নিয়েই এখন এলাকার মানুষ গরম হয়ে আছে।

সুজয়ের এসব কথার মন নেই। পিচ রাস্তা ছেড়ে গাঁয়ের রাস্তায় ঢুকতেই তার বুকের মধ্যে ঢাকের বাদ্যি বেজে উঠল। তার মনে হল সে যেন খুব ছোট হয়ে গিয়েছে হঠাৎই। কুড়ি বছরের ব্যবধান মুছে গেল নিমেষে। সামনে তার আজন্ম পরিচিত রাস্তাঘাট। মুসলমান পাড়ায় তার এক বন্ধু ছিল। একবার স্কুল ফিরতি পথে তার বাড়িতে খেজুরের রস খেতে গিয়েছিল ওরা ক'জন। ওখান থেকে হয়তার মাঠে তেল খুঁজবার কাজ দেখতে চলে গিয়েছিল

তারা। বাবা নানা জায়গা খুঁজেও হদিস পায়নি সুজয়ের। তারপর অনেক রাতে বাড়ি ফিরলে বাবার কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল সুজয়। তার স্কুলে 'গার্জিয়ান কল' হয়েছিল। এরকম কত স্মৃতি মস্তিষ্কের কোষে কোষে উড়ন্ত মেঘের মতো ছায়া ফেলে যাচ্ছিল।

রিকশার চেন পড়ে যেতেই ছেলেটা ঝুঁকে চেন তুলল। সুজয় বলল, ডানদিকে বাঁশবাগানের পিছনে হাজিবুড়ি থাকত না? দাঁতের ব্যথা সারানোর ওষুধ দিত সে। তার উঠোনে ছিল পীরের মাজার।

এখনও মাজারটা আছে। বুড়ি মারা গিয়েছে। হাজি মিঞারা বাস উঠিয়ে বাংলাদেশে চলে গিয়েছে। এখন সে জমি হাতবদল হয়ে গিয়েছে।

সুজয় যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বলল, আর ডাইনে ঘুরে গেলে ডিপটিউবওয়েলের ধার ঘেঁষে বাওনের বিলটা আছে? খুব পদ্মফুল ফুটত জলে।

ছোকরা ঘাম মুছতে মুছতে হাসল। সে গ্রাম আর নেই। বিলটা সংস্কার করে এখন জলকর হয়েছে। পদ্মফুল আর নেই। সেটা কিনেছে বনগাঁর হরেন সাহা। চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়। যার ছেলে টিভিতে সিরিয়াল করে। ছেলেটার বেশি কথা বলা স্বভাব।

একবার বলতে শুরু করলে প্রসঙ্গ পাল্টাতেই থাকবে। সে বলে চলেছে, গতবাব স্কুলমাঠে তার তত্ত্বাবধানে হোলনাইট ফাংসান হল। বম্বের শিল্পীতে ভরা ছিল অনুষ্ঠান। একসময় কেমনভাবে গলা নামিয়ে বলল, যে যতই বলুক এ সব কিছুই হয়েছে ধনুদারই যোগাযোগে। তারা দুজন এক দলেরই লোক। মাসকয়েক আগে ধনুদা তার বাবা-মাকে ঘুরিয়ে নিযে এসেছে সারা ভারত। এবার ধনুদা ভোটে জিততে পারলে দেখবেন গ্রামের চেহারা একদম বদলে দেবে। মানুষটা গ্রামের জন্য খুব করে। সুজয় এতক্ষণ আনমনা হয়েছিল। শেষের কথাটা কানে যেতেই সে বলে ফেলল, কোন ধনু? শ্রীকান্ত মাস্টারমশায়ের ছেলে কি?

এতক্ষণে ছোকরাটা শহরের নানা হালহকিকত জানবার জন্য প্রশ্নের অবতারণা করবার সুযোগ খুঁজছিল। এবার কৌতূহলী হয়ে কেমন কুতকুত করে তাকাল। কী ব্যাপার বলুন তো। সব কিছু জানেন দেখছি। আগে কি এদিকে কোথাও ছিলেন?

সুজয় প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল। বলল, না, না, স্বপ্নে হয়তো দেখেছি এসব। ছোকরাটা কী ভেবে আর কথা বাড়াল না। গাঁয়ের মানুষজনেরও আজকাল খুব সন্দেহবাতিক হয়েছে।

সুজয় ভাবছিল অন্য কথা। সেই ধনুদা এখানে এতসব কাণ্ড ঘটিয়ে বসে আছে। ছেলেটা ছিল রাজ্যের বকাটে। পরীক্ষার সময় হাতের ঘেরে কাগজ রেখে অদ্ভুত কায়দায় টুকতে পারত। একবার সুধাংশু স্যার ধরেছিলেন তাকে। তারপর কে বা কারা অন্ধকারে স্যারের জামায় পচা ডিম ছুঁড়ে মেরেছিল। এই নিয়ে তখন হইচই হয়েছিল খুব।

শ্রীকান্ত স্যার ছিলেন বাবার খুব বন্ধু। দুবেলা তাদের বাড়িতে আসতেন তিনি। ধনুদার জন্য তখন অহরহ অনুশোচনা করতেন শ্রীকান্ত স্যার।

সেই স্যার এখন ধনুদার টাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা ভারত। আর বাবা সকলকে রাগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে সরতে সরতে মশারির ঘেরে আড়াল খুঁজছেন। কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছে বাঁচবার জন্য।

বাবার কথাটা মনে আসতেই একজন খিন্ন চেহারার বৃদ্ধের মুখ ভেসে এল মনের পর্দায়। কী দারুণ বিপন্নতাবোধ। বাবার নিজের লালায় রচিত সুড়ঙ্গ থেকে বড়দা গত কয়েক দিনে একরকম টেনে বের করে এনেছে তাঁকে। তাঁর শান্তি বিঘ্নিত করে সময়-অসময়ে জেরা করছে বড়দা-বউদি। আর বাবা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে অসহায়ের মতো। তবুও ওরা ছাড়েনি।

বড়দা কোথা থেকে শুনে এসেছে বাবার স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন পাওয়ার সম্ভাবনার কথা। সেই থেকে উত্তেজিত হয়ে রয়েছে বড়দা-বউদি। মাঝে একবার একজন দালালমতো লোককে ধরে এনেছিল বড়দা। কিন্তু সে পর্যন্ত কিছু সাহায্য করতে পারেনি তখনই। বলেছে, এ ব্যাপারে আমার কিছু করবার নেই। পেনশন পাওয়ার জন্য সে সময়কার জেল সার্টিফিকেট, নেতার সার্টিফিকেট এমন নানা রকম কাগজপত্র প্রয়োজন। এসব জোগাড় করতে নানা রকম তদবিরের দরকার হবে।

বড়দা নানান দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে উঠছিল। লোকটা বলেছে, পেনশন বের হয়ে গেলে, এমন কি একলপ্তে মোটা টাকা এরিয়ার পেয়ে যেতে পারেন। এ কথায়, বউদির চোখমুখ চকচক করে উঠেছিল লোভে। বড়দার মাথায় এখন দোতলা ঘরগুলো ভেঙে আধুনিক ডিজাইনে করবার পরিকল্পনা আছে। বাড়ির প্লান পাস হয়ে পড়ে আছে।

বড়দার অসহায় ভাব দেখে ধমকে উঠেছিল লোকটা, আরে ধুর্। আপনারা সব ব্যাকডেটেড মানুষ। পয়সা ছড়ালে কি না হয়। এত সব আজেবাজে লোক পেনশন বাগিয়ে দিব্যি মাসের প্রথমে কচকচে টাকার নোট গুনছে। আর আপনার বাবারটা তো জেনুইন কেস।

তারপর একটু চুপ থেকে টিপস্ দিয়েছিল লোকটা। বলেছিল। আপনার কিছু করতে হবে না। একটা কাজ করবেন শুধু। মেসোমশায়ের একসঙ্গে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন পায় এমন একজনকে খুঁজে বের করুন। আমিই তাঁর সাহায্যে যা-কিছু ফরম-টরম সইসাবুদ করানোর করিয়ে নেব।

তখন থেকে দাদা-বউদি বাবার পিছনে লেগে আছে। অহরহ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। নিজের এতদিনকার তিল তিল করে গড়ে তোলা নিঃসঙ্গতার বিবরটা ভেঙে পড়তেই ভাষাহীন চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে বাবা। যেন বলতে চেয়েছে, খাটের পাশে ওরা কারা। তার পরিজন নাকি প্রতিপক্ষ।

এতদিন প্রায় অচ্ছুৎ থাকবার পর বাবা কিছুদিন সংসারে বড় প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে আজকাল। সকালের দিকটা বাবা খানিকটা সুস্থ, সাবলীল থাকে। কিন্তু বিকালের পর থেকে অন্য এক অবচেতনের জগতে ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে। সে জগতে পৌঁছানোর সাধ্য কারও নেই।।

অফিসে বের হওয়ার আগে বড়দা বাবার খাটের পাশে বসে পড়ে কখনও। পুলিশের জেরার ঢঙে একথা-সেকথার পর আসল কথায় ফিরে আসে সে। মনে করতে চেষ্টা করো বাবা। স্থির হয়ে স্মরণ করো। তুমি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজ করেছ এটা তো মিথ্যা নয়। তোমার ভ্রূতে সে সময়কার জ্বলজ্বলে ক্ষতচিহ্ন। ছোটবেলায় কতবার আমাদের এসব গল্প করেছ সে সময়কার।

প্রথম প্রথম বাবা এ ব্যাপারে বেঁকে বসেছিল। কিন্তু বয়সের ভারে, নিঃসঙ্গতার জন্য তাঁর ভিতরের জেদটাও অনেকটা ভাটা পড়ে দিয়েছে। দু-একটা মন জোগানো কথা বলে বড়দা অতি সহজেই তার মতে এনেছে বাবাকে।

আজকাল বাবা সত্যিই ভাবতে থাকে। শ্যাওলাধরা চোখ মেলে কোথায় যেন স্মৃতির গ্রন্থি খুঁজে বেড়ায়। ধূসর সে জগৎ। হয়তো এক সময় কেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বাবার চোখমুখ। আর্তির মতো বলেছে, আমার মনে পড়ে তো কতকিছু। মায়ের দাঁতে তামাক ঘষা। ঘরের চালে বীজ করতে রাখা লাউ। গোহালে লালীর ওলান উপচে পড়া দুধ। এখনই বউঠান দুধ দোহাতে যাবে। বড়দা অস্থির হয়ে উঠেছে। বউদি থমথমে মুখে স্থান ত্যাগ করেছে। যাবার সময় বাবাকে উদ্দেশ্য করে কথার হুল ফুটিয়েছে যেন, বোগাস। আপনি বরাবরের অকেজো মানুষ।

বড়দা বলেছে, এসব হাবিজাবি চিন্তা করে কী হবে। কাজের কথা ভাবো। তুমি আমাদের ভাল কোনওদিন চাও না। রেগে উঠেও প্রয়োজনে আবার কথার সুর নরম করে ফেলেছে বড়দা।

অনেক অনুরোধ উপরোধের পর বাবা গত পরশু একটা হদিস দিয়েছে। তার সঙ্গে দেশের কাজ করেছে এমন একজনের নাম বলেছে। সনাতন হাজরা। গ্রাম, কনকপুর। ভদ্রলোক আবার বাবার পূর্ববঙ্গের দেশের একই গাঁয়ের মানুষ। এখন তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন পান।

বড়দা বারবার নানান কায়দা করে বাবার কাছ থেকে লোকটার ব্যাপারে যথাসম্ভব তথ্য জোগাড় করেছে। তারপর আর দেরি করেনি সে। বাবাকে দিয়ে ভদ্রলোকের নামে চিঠি লিখিয়েছে। সুজয়কে আবেগে বলেছে আর দেরি করা যাবে না। বাবা সুস্থ থাকতে থাকতে যা করবার করে ফেলতে হবে। এমন কি পকেট থেকে যাতায়াতের গাড়িভাড়া পর্যন্ত সুজয়কে দিয়েছে বড়দা।

এখন রিকশার সিটে হেলান দিয়ে সুজয়ের হঠাৎ মনে হল, মানুষ বড় নিষ্ঠুর। মানুষে মানুষে সম্পর্ক এক মস্ত কুহেলিকা। না হলে এই সামনে তার আজন্ম পরিচিত গ্রাম। যে রাস্তার ধুলোর সে ছোট ছোট পায়ে একসময় বহুবার হেঁটে বেড়িয়েছে, যে-রাস্তার প্রতিটা ধূলিকণার সঙ্গে তার নাড়ির যোগ, কয়েক বছরের ব্যবধানে সেই গ্রামেই নিজেকে কীরকম অনাহূত মনে হচ্ছে। যত গ্রামের মধ্য দিয়ে রিকশা এগোচ্ছে একধরনের লজ্জা গ্রাস করছে সুজয়ের সমস্ত সত্তাকে। পুরনো মানুষজনের সঙ্গে দেখা হওয়ার একপ্রকার অস্বস্তি হচ্ছিল।

অথচ গোটা কনকপুর গ্রামটা চুঁড়েও সনাতন হাজরার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। সে যখন কনকপুরে পৌঁছাল তখন প্রায় বিকেল। আকাশ চুঁইয়ে একটা পেলব ছায়া নামছিল গাছগাছালির উপর। গ্রামটা বেশ বর্ধিষ্ণু এখন। যেতে যেতে গাছপালার ফাঁকে পাকা বাড়ির সামনে মোটরসাইকেল দাঁড় করানো দেখেছে সুজয়। রিকশাওয়ালা ছেলেটা ক্লাবের সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে নিজেই ডেকে আনল ছেলেদের। ক্লাবঘরে টিভি চলছিল গমগম করে। বেশ একটা মজার খোরাক পেতেই ছেলের দল এলোমেলো প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলল সুজয়কে। সুজয় সত্য বলেনি। লোকটার ব্যাপারে একটা দুঃখের গল্প বানিয়ে বলেছে ছেলেদের।

ক্লাবের ছেলেরা বিষয়টা নিয়ে নানান কথাবার্তা বলে চলল নিজেদের মধ্যে। তারপর কেমনভাবে ফোঁড়ন কাটল একজন, এভাবে নাম বললে কি চেনা যায়? লোকটা কি ভি. আই. পি.?

একজন বলল, সনাতন নামে একজন ছিল বৈরামপুরে। দাগী চোর ছিল লোকটা। আমরাই পিটিয়ে তাড়িয়েছি। এখন নাকি গোপালনগরে নিয়ে গুরুভক্ত হয়েছে খুব। হরিকীর্তন করে বেড়ায়।

কথাগুলো যেন ইচ্ছে করেই সুজয়কে উদ্দেশ্য করে বলা। সুজয়ের চেহারাতে ওদের রেগে যাওয়ার জন্য কোনও বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। সারাদিনের ধকলে পেটের মধ্যেটা খিদেতে মোচড় দিচ্ছে। তার উপর এখন এই বিপত্তি হল। প্রবল অস্বস্তিতে ভরে আছে শরীরমন। হঠাৎ সকলকে একরকম অবজ্ঞা করেই রিকশায় উঠে পড়ল সুজয়। বলল, অনেক খোঁজা হয়েছে। আর দরকার নেই। চল এবার ফিরব আমি।

রিকশা চলতে শুরু করতেই নানান শরীর জ্বালানো কথা ভেসে এল ক্লাবের সামনের জমায়েত থেকে। যে গ্রামীণ দৃশ্যকল্প এতদিন স্বপ্ন-কল্পনায় মিশে প্রোথিত ছিল সুজয়ের সত্তায়, যে স্মৃতির জগতে বিপন্নতার সময়ে ডানা মেলে উড়ত সে, বাঁচবার প্রেরণা পেত, সে জগৎটা যেন নিমেষে তছনচ হয়ে গেল।

উঁচুনিচু মোরাম বিছানো রাস্তায় রিকশার শব্দ উঠছে। রিকশাওয়ালা ছেলেটা এতক্ষণে বলল, আপনারা শহুরে লোকেরা খুব বোকা। এত সহজে কেউ হাল ছেড়ে দেয়!

সুজয় কথা বলল না। এমন কি নিজেদের পুরনো ভিটেতে যাওয়ার উৎসাহতেও ভাঁটা পড়ে গিয়েছে। একবার ভাবল এখান থেকেই ফিরে যাবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভিতরের এক তীব্র টান তাকে স্থির থাকতে দিল না। ঠিক করল একবার তাদের ফেলে যাওয়া বসতভিটেটো চোখের দেখা দেখে নেবে। কী মনে করে ওদের পুরনো পাড়ায় ঢুকবার মুখেই রিকশার হুড তুলে দিল সুজয়।

রিকশার শব্দে আশেপাশের বাড়ির লোকজন চকিতে তাকাচ্ছে, আবার পরমুহূর্তেই কাজে মন দিচ্ছে। রাস্তার পাশে একদল বাচ্চা ছোটাছুটি করে খেলছে। সুজয়ের ভিতরটা হু হু করে উঠল হঠাৎই। কোনও একসময় সেও অনেকের সঙ্গে এভাবেই খেলা করত। দাড়িয়াবান্দা, ছু খেলা। সে সময়কার সঙ্গীরা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে আজ। সেসব যেন অন্য জন্মের কথা। দত্তদের বাঁশবাগানের মাথায় একদল টি টি পাখি ডাকতে ডাকতে চলে গেল। সুজয়ের মনে হল তীব্র বেদনাময় সে ডাক।

নিজেদের ভিটের সামনে এসে একদম স্বপ্ন ভঙ্গ হল। সুজয় দেখল তাদের বাড়িঘরের চিহ্নমাত্র নেই। বাড়ি ভেঙে গোটা এলাকা জুড়ে সারসার মুরগির পোলট্রি হয়েছে। সেখান থেকে কিচ কিচ করে ডাকছে সদ্য চোখফোটা মুরগির ছানারা। পোলট্রির সামনেটায় অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গল্প করছে কয়েকজন। তাদের মধ্যে হরি বাগদিকে চিনতে পারল সু"য়। একসময় হরিদের বাড়িতে দুধ আনতে যেত সে। হরি বাবার কাছে প্রাইভেট পড়ত। টাকার বদলে দুধটা দিত তারা। সেই হরির এখন ভরাট চেহারা। তার চোখে স্টেনলেস স্টিল ফ্রেমের চশমা। কেমন বাবু বাবু লাগছে হরিকে।

এই মুহূর্তে সুজয়ের কীরকম অসহায় লাগছে নিজেকে। বুকের মধ্যে এক তীব্র বেদনা। হরি বাগদি রিকশার শব্দে তাকালো। নিশ্চয় তাকে চিনতে পারেনি হরি। আবার কথাবার্তায় মন দিয়েছে। তার মানে রিকশা আর এখানকার বিস্ময় নয়। এখন হরবকত যাতায়াত করে গ্রামের রাস্তায়।

কেমন দমবন্ধ হয়ে আসছিল সুজয়ের। ভিতর থেকে এক তীব্র পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। হঠাৎ রিকশাওয়ালাকে সুজয় বলল, জোর চালিয়ে স্টেশনেই চল। এমনিতে দেরি হয়ে গিয়েছে খুব।

স্টেশনে এল যখন তখন সন্ধ্যা। স্টেশন চত্বরটা সরগরম হয়ে আছে। একটা ট্রেন ঢুকছে স্টেশনে। সবজির বজরা নিয়ে ভেন্ডাররা পড়ি-কি-মরি ছুটছে ট্রেন ধরবার জন্য। এ ট্রেনটা না ধরতে পারলেও সুজয়ের কোনও ক্ষতি ছিল না। তবুও কী এক অজানা ভয়ে সে যেন পালাতে চাইছিল এখান থেকে। রিকশাভাড়া মিটিয়ে দ্রুততায় একরকম বিপজ্জনকভাবে লাফিয়ে ট্রেনের পাদানিতে উঠে পড়ল সুজয়।

ফিরতির ট্রেন বলে এখন ভিড় কম। কামরায় কেবল দু-চারজন যাত্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। এতক্ষণে বসে কেমন এক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সুজয়। আর তখনই প্রবল এক অবসাদ ঘিরে ধরল তাকে। এখন স্বপ্নের মধ্যেও কোনও আশ্রয় থাকল না। যে-গ্রামের স্মৃতি ছিল তার অবচেতনে আশ্রয়ের মতো সে তিল তিল গড়ে তোলা শান্তির জগৎটাও ছত্রখান হয়ে গিয়েছে। সারা দিনের ব্যস্ততায়, পরিশ্রমে শরীর আমসি হয়ে আছে। এমন কি সারা দিনে খাওয়া পর্যন্ত হয় নি। একজন কপট বাউল ইঁদুর মারা বিষ বিক্রি করবার অছিলায় রসালো দেহতত্ত্বের গান গাইছে নানান অঙ্গভঙ্গি করে। এখন সামনের টানটান বাস্তব

সমস্যাগুলো কিলবিল করে উঠছে মনে। বাড়ি ফিরলে তাকে বড়দার নানান অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। আর অপমানিত প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাবার মতোই আড়াল খুঁজতে হবে। ট্রেনের জানলার বাইরে রহস্যময় জমাট অন্ধকার থম মেরে আছে। গাছপালায় মাখামাখি হয়ে আছে।

হঠাৎ কী মনে করে সুজয় পকেট থেকে বাবার লেখা চিঠিটা বের করল। সামনে মেলে ধরল কামরার বাল্‌বের ঘোলাটে আলোয়। কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা বাবার চিঠিটা অস্পষ্ট। জনৈক সনাতন হাজরাকে ইনিয়ে বিনিয়ে নানান আবেগের স্মৃতিকথা লিখেছে বাবা। এখন মনে হল সনাতন হাজরা নামে হয়তো কেউ নেই পৃথিবীতে। ছিল না হয়তো কখনও। সনাতন নামটা যেন একটা প্রতীক। গভীর বিপন্নতার সময়ে আঁকড়ে ধরবার একটা আশ্রয়স্থল। এই অলীকপ্রায় এক অস্তিত্বকে জড়িয়ে আবেগে কত স্বপ্নের কথা লিখেছে বাবা।

এ কথা ভাবতেই প্রবল এক বেদনায় গুমড়ে উঠল সুজয়ের অন্তরাত্মা। চারপাশে ছড়িয়ে আছে কেবল বাল্‌বের পাণ্ডুর আশাহীন আলো। আর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা স্থবিরপ্রায় দু-চারজন যাত্রী। যেন একটা দমবন্ধ করা সময় থমকে গিয়েছে ট্রেনের কামরায়। হঠাৎ কী মনে করে সুজয় খামসহ গোটা চিঠিটাকে ফেলে দিল বাইরের চলমান অন্ধকারে।

কাজের মেয়েটা

বিপ্লব দাশগুপ্ত

এক

গরুর কালো চোখের মতো করুণ চাউনি মেয়েটার সব ভালো শুধু একটা দোষ। আগে ভালো দিকটা বলি। সকালে উঠতে না উঠতেই মর্নিং-টি দেবে তারপর কাগজ এলেই গুছিয়ে এনে হাতে তুলে দেবে। সেই থেকে শুরু করে রান্নাবান্না ঘরদোর পরিষ্কার রাখা সবকিছুতেই একটা ছিমছাম মার্জিত ভাব। মেয়েটা আসার পর বাড়ির শ্রী পালটে দিয়েছে।

খারাপের দিকটা এই যে মেয়েটা কথাই বলে না। না বোবা নয়। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলে না। মাঝে মধ্যে দু-একটা না বললে নয় এমন শব্দ। বাকিটা ঘাড় দুলিয়ে, মাথা নেড়ে, চোখের চাউনিতে বোঝায়। কথা বলতেই চায় না।

"এ মেয়ে যে কথাই বলে না। একে দিয়ে আমার চলবে কি করে?" শর্মিলার খেদোক্তি।

"তোমার তো খুশি হওয়া উচিত। ঘরের কথা বাইরে বলবে না। নিন্দেমন্দ করবে না। একজনের কথা আর একজনকে লাগাবে না। ছটফটে নয়, দুরন্ত নয়, লক্ষ্মী মেয়ে—এমন মেয়েই তো তুমি চেয়েছিলে।" সোমনাথ বলল।

কথাটা সত্যি। পছন্দমতো ঘরের লোক পাওয়া আজকাল এক বিরাট ঝামেলা। সেই ছেলেটা তো ভালোই কাজকর্ম করত, কিন্তু হঠাৎ একদিন ঘড়ি, কিছু টাকা, কয়েকটা জামা নিয়ে উধাও। সেই মেয়েটার সব ভালো, হঠাৎ একদিন পাড়ার একটা ছেলের হাত ধরে বিদায় নিল। সেই বুড়িটা, কত চমৎকার, কাজেকর্মে স্বভাবে, কিন্তু ভূতের ভয়ে পালাল। সারাদিন একলা একলা ফ্ল্যাট আগলে বসে থেকে ওর মনে যত প্রেত আর ব্রহ্মদত্যি এসে ভর করল, আর থাকতে চাইল না। এ তো গেল যারা ভালো ছিল তাদের কথা। বাদবাকিরা হয় কুঁড়ে, নয় কাজ জানে না, নয় অসুস্থ, মাঝেমধ্যে বাড়ি যায়। মোট কথা কাজের নয়।

"আমি বুঝতে পারছি না তোমার বাড়িতে কাজের লোক টেঁকে না কেন।" রুমাদির অভিযোগ।

"আমিও বুঝছি না রুমাদি। আমি তো কারো পিছনে লাগি না: বেশি খাটাই না, ভালো মায়না দিই, তবু কেন ভালো লোকপাব না, বা পেলেও ওরা কেন টিকবে না বুঝতে পারি না।"

আসল সমস্যাটা অন্য। শর্মিলা সোমনাথ কেউই বাড়ি থাকে না বেশিক্ষণ। সোমনাথ এক বড় মাইনিং কোম্পানির বড় গোছের অফিসার। প্রায়ই থাকতে হয় কলকাতার বাইরে। শর্মিলা স্কুলে পড়ায়, সমাজ সেবা করে, ওরও বা সময় কোথায়? ওরা দুজনেই খুব ব্যস্ত। সকালে বেরিয়ে রাত্রে যখন ফেরে—অফিসের কাজ সেরে বা সমাজসেবা করে—তখন ওরা দুজনই ক্লান্ত। বলতে গেলে গুড ইভনিং বলে খেয়ে গুড নাইট বলে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ে।

ফ্ল্যাটে সারা দিন না থাকলেও রাত্রিটা তো রয়েছে। সারাদিন ঘুরে এসে কতটাই-বা কাজ করত শর্মিলা। সোমনাথ মাঝে মাঝে বলত · আমাদের সংসার ছোট—আমরা নিজেরাই

তো পারি নিজেদের কাজ করতে। মৃণাল সেনের 'খারিজ' সোমনাথ তখনো দেখে নি, কিন্তু অন্য লোককে দিয়ে ঘরের কাজ করানো কখনোই ওর পছন্দ নয়। না, সোমনাথ কমিউনিস্ট নয়, কিন্তু বলা চলে 'প্রগতিশীল', 'আদর্শবাদী', 'সমাজ সচেতন'। শর্মিলা অবশ্য বলবে এই সমাজ চেতনার দায়িত্ব সোমনাথ পুরোপুরি নেয় না। বাড়িতে লোক না থাকলে সোমনাথ সাহায্য করে না এমন নয়, কিন্তু মূল ঝক্কিটা শেষ পর্যন্ত শর্মিলাকেই সামলাতে হয়। সোমনাথের মন যতই অগ্রগামী হোক, অভ্যাসটা খাঁটি মধ্যবিত্তের যা সহজে পালটানো শক্ত। পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামে, আলু কাটতে গিয়ে আঙুল কাটে। প্লেট পরিষ্কার করতে গিয়ে ভাঙে। দেখে শেষ অবধি শর্মিলারই মায়া হয়। সাধ আছে তো সাধ্য নেই, বেচারা কি করবে? শর্মিলার তাই লোক ছাড়া চলবে না।

কি ধরণের লোক চাই? এই নিয়ে রাতের পর রাত সিম্পোসিয়াম, নেতিবাচক ইতিবাচক উপাদানে দ্বান্দ্বিক আলোচনা। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়া বড় শক্ত।

ছেলে না মেয়ে?

'দ্যাখো, বাড়ির মধ্যে একটা গাট্টাগোট্টা লোক ঘুরে বেড়াবে সেটা হবে না। শাড়ি আলগা হয়ে গেল, ব্রার স্ট্রাপ আর শায়া দেখা যাচ্ছে, বাথরুমে যাব—আর ওই লোকটা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে দেখছে। অসম্ভব। সোজা বাংলা ইমপসিবল।" শর্মিলা স্পষ্টাস্পষ্টি বলে।

"অকাট্য যুক্তি। হিয়ার, হিয়ার, কিন্তু উলটো করে ভাব আমার কথা। গায়ে গেঞ্জি নেই, দরদর করে ঘাম পড়ছে, পাজামার দড়ি আলগা, একটা মেয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসম্ভব, আমার বাড়িতে আমি 'ইজি' থাকতে চাই।"

তারপর বয়েস। ষোলো বছরের কম হলে সোমনাথের ঘোর আপত্তি 'চাইল্ড লেবার' আমার বাড়িতে রাখা চলবে না। পঞ্চাশের বেশি হলেও সোমনাথের আপত্তি—অসুখ-বিসুখ হলে কে দেখবে? আমরা দুজনই তো বাইরে বাইরে ঘুরছি। এই ঝুঁকি নিয়ো না।

তারপর—বিবাহিত কিনা? বিবাহিত হলে সে একা আমাদের ফ্ল্যাটে থাকবে কেন? অবিবাহিতের নিয়ে তো ঝামেলা, যদি অল্পবয়স হয়। ছেলে হলে যে রোমিও হয়ে ঘুরবে না তার গ্যারান্টি কি? হয়তো-বা আমাদের ফ্ল্যাটেই হয়ে দাঁড়াল মধুচক্র। মেয়ে হলেও ঝামেলা। পাড়ার ছেলেরা সিটি দেবে, অসভ্যতা করবে—তাই নিয়ে দশরকমের ঝগড়া আর ঝামেলা।

তারপর ব্যবহারের প্রশ্ন। কাজের লোকের সঙ্গে সম্পর্কটা কি শুধু চুক্তির বা কাজের? না সম্পর্কটা পরিবারের লোকের মতো? পুরোনো সমাজে এই ঝামেলা ছিল না। এখন প্রগতিশীল হয়ে, আধুনিক হয়ে নানা সংশয় আর সমস্যা মাথায় ভিড় করে আসে। ও শোবে কোথায়? ও কি আমাদের সঙ্গেই খাবে। ও কি সোফায় বা চেয়ারে বসবে? সেক্ষেত্রে কি ও শুধু পরিবারের লোকই হয়ে উঠবে এবং কাজ বন্ধ করবে না? কাজও করাতে হবে, অথচ সংসারের একজনের মতো ব্যবহার পাবে—এ দুটো যেন একেবারেই মেলানো যাচ্ছে না।

লোক রাখা মানেই সমস্যা— সোমনাথের মত। তাহলেও লোক ছাড়া চলবে না— শর্মিলার দৃঢ় অভিমত। শেষ পর্যন্ত শর্মিলাই যোগাড় করে আনল, রুমাদির মারফত। রুমাদি এক স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মী মহিলাদের সংগঠনের সভানেত্রী। উনিই ব্যবস্থা করে আনলেন মেয়েটাকে—নাম সোনা। বয়স ষোলো-সতেরো—ভালো স্বাস্থ্য। মেয়েটার সব ভালো শুধু একটাই দোষ, একদম কথা বলে না।

মেয়েটা ওর ভাইয়ের সঙ্গে এল। ভাইটা গড়িয়াহাটার এক রেস্টুরেন্টে কাজ করে। নাম সত্য। দুই ভাইবোন কখনো কি এত আলাদা হতে পারে? সত্যের যেন সবসময় মুখে খই ফুটছে। এসেই প্রণাম করল সোমনাথ-শর্মিলাকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওদের জানতে বাকি

রইল না সত্য-সোনার গ্রামের ভূগোল, ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি। বাবার দু-বিঘে জমি, মেদিনীপুরের তমলুক থানায়। অথচ সংসার বড়। দিন মজুরি তেমন মিলছে না। পেট চলবে কি করে? ওদের ভাগ্য যে রুমাদির কৃপায় এই কাজটা জুটল, ইত্যাদি। বোঝা গেল সত্যচরণ সহজে ছাড়বে না। মাঝে মাঝে আসবে এবং গল্প শোনাবে।

সোমনাথের অবশ্য সত্যকে বেশ ভালোই লাগল। সরল সুন্দর গাঁয়ের ছেলে। প্রচুর খোঁজ খবর রাখে। এরপরও অনেকবার এসেছে। সঙ্গে মিষ্টি বা ফল। সোমনাথের সোফার পাশে বসে গালগল্প শুনিয়েছে। সোনার এখানে কাজ হওয়াতে মা কি বলল, বাবা কি বলল, পাড়া-পড়শীরা কি বলল। সোনা কত বড় বাড়িতে থাকে, সোনার বাবুর গাড়ির রং কি. মা কি করেন— এ সবই সত্যের মারফত গ্রামের লোকের এখন মুখস্থ। সঙ্গে নানা উপদেশ ও মন্তব্য।

"আমার বোনটা কিন্তু খুব ভালো বাবু। কথা কম বলে কিন্তু কাজ করে পুষিয়ে দেয়। একটু বোকা আছে—আমি এত শিখিয়েও ওকে চালাক করতে পারলাম না।"

'বাবু' ডাকটা সোমনাথের এমনিই অপছন্দ। তারপর মেয়েটাকে দেখে ওর কেন যেন সুজাতার কথা মনে পড়ে যায়। চার বছর হল সুজাতার ঘরটা ফাঁকা। ওর ফ্রক, ওর পুতুল, ওর খেলনা সব ঘরের মধ্যেই সাজানো। কিন্তু সুজাতা নেই। সোমনাথ-শর্মিলার কাজের লোক বাড়িতে না থাকার এটাও হয়তো একটা কারণ।

"আমাকে তুই 'বাবু' বলবি না। 'বাবা' বলবি।" বলতে গিয়ে সোমনাথের চোখে জল এল। মেয়েটার কালো করুণ চোখে কিন্তু আলো জ্বলে উঠল। ওর চোখ কথা বলে, হয়তো তাই ওর মুখ না খুললেও হয়।

'বাবা' ডাকটা শর্মিলার পছন্দ হয় নি, "যত বাড়াবাড়ি।"

"কেন, অতবড় মেয়ের মা ভাবলে কি তুমি মুশকিলে পড়বে?"

"ধ্যাৎ"—শর্মিলা হেসে উঠল। "আমার অত বয়সের কমপ্লেক্স নেই। কিন্তু সব কিছুর তো একটা সময় আছে, নিয়ম আছে। আগের ওই ছেলেটার কথা মনে নেই? প্রথম থেকেই চেয়ারে বসালে, আলাদা খাট দিলে, লেপ দিলে, মশারি দিলে, স্কুলে ভরতি করালে। তারপর কি হল? ছেলে মাথায় উঠল। পড়লও না, কাজও বন্ধ করল। শেষ অবধি ..."

সোনাকে চট করে নষ্ট হতে শর্মিলা দেবে না। আপাতত ভেতরের বারান্দায়ই তোষক পেতে শুক। আপাতত মেঝেতে চাটাই পেতে খাক। সোফায় আমাদের সামনে যেন এখনই না বসে। একটু ধাতস্থ হোক, তারপর ধীরে ধীরে অধিকার বাড়ুক। না হলে বদহজম হবে।

"তোমার ভুল একেবারে গোড়ায়।"

"মানে?"

"মানে এই যে সংসারে কি শুধু তোমার নিয়ম চলবে? না, আমার কথা বলছি না। আমি সবটাই মানছি। কিন্তু তুমি কতক্ষণই-বা বাড়িতে থাকো? তোমার কি ধারণা ও যখন একলা থাকবে তখনো মেঝেতে চাটাই পেতে খাবে? দুপুরবেলায় খাটে না শুয়ে মেঝেতে শোবে? তুমি নিয়ম করছ করো কিন্তু নিয়ম মানাবার কোনো ক্ষমতা তোমার নেই।"

"ঠিকই। কিন্তু আমার সামনে তো নিয়ম রাখবে। আপাতত সেটুকু হলেই আমি খুশি। আমিও কি চাই না মেয়েটা ভাল থাক? কিন্তু রয়ে সয়ে, আস্তে আস্তে, না হলে মেয়েটাই নষ্ট হয়ে যাবে। ওর ভালোর জন্যই একটুখানি শাসন থাক।"

এ সব তর্কের কোনো শেষ নেই। কিন্তু ঘুরে ফিরে একটা প্রশ্ন বারবার আসছে ; ও সারাদিন কি করবে? দুজন মানুষের সংসারে কাজ কতটাই-বা? তবু ভালো লক্ষ্মী মেয়ে ফ্ল্যাটের বাইরে যায় না, আড্ডা দেয় না, গালগল্প করে না। কিন্তু কতকিছু ঘটতে পারে—

অসুখ হতে পারে, আগুন লাগতে পারে। দুর্ঘটনার নানারকম সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে শর্মিলা-সোমনাথ কি করে দায়িত্ব এড়াবে? ওরাই তো অভিভাবক। তারপর যখন বাবা-মা ডাকছে।

একটা মীমাংসা হল সেই সমস্যারও। পার্টটাইম কাজের লোক, রামাবতার, বিহারে বাড়ি। বয়স পঞ্চাশের ওপর। ফরশা, রোগা চেহারা। কাঁচাপাকা চুল। একমুখ ছোট ছোট দাড়ি। ঘর সংসার ছেলেপুলে সব দেশে— কোলকাতায়ই দীর্ঘদিন, শর্মিলার 'ট্রাবল-স্যুটার', যখন যা পাওয়া যায় না সেটা জোগাড় করতে সিদ্ধহস্ত। গ্যাস সিলিন্ডার থেকে কেরোসিন, সর্ষের তেল, চাল সবকিছু শর্মিলাকে ঠিক সময় জুগিয়ে দেয়। এছাড়া বাসনকোসন মাজে সকালে এসে। ঠিক হল যে রামাবতার সোনা আসার পরও বাসনকোসন মাজবে এবং মাঝে মধ্যে সোনাকে দেখে যাবে। আশা ও ভরসা।

"তুমিও যেমন। রামাবতার দশ বাড়িতে পার্টটাইম কাজ। সময় কোথায় দেখবার?"

"তুমি সব কিছুতেই একটা 'কিন্তু' তুলবে। আপত্তি করাটা তোমার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তোমার আপত্তি 'রুল আউট' করলাম" বলে শর্মিলা সোমনাথের সাবানের ফেনা-মাখা অর্ধ-সেভিত গালে একটা আলগা চুমু খেলো।

"এখন তো এটাও বন্ধ হল। নিজের বাড়িতেও লুকিয়ে চুমু খেতে হবে। সেই জন্যই তো বলছিলাম, দ্যাখো না কাজের লোক না হলেও আমাদের চলে কিনা।" সোমনাথের কপট উষ্মা। শর্মিলার উষ্ণতার মুহুর্মুহু চুম্বন। সোনার প্রবেশ। চুম্বনের সমাপ্তি। সোনার চোখে কি দুষ্ট হাসি? না দেখার ভুল! ও হয়তো দেখতেই পায় নি। কিন্তু প্রাইভেসি যে কমল তাতে সন্দেহ কোথায়?

।। দুই ।।

কয়েক মাসের মধ্যেই সোনা যেন সংসারের এক অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল। খাবার পর মশলা হাতে দাঁড়িয়ে, অফিস যাবার মুখে হাতে ব্যাগ ধরিয়ে দেয়। জুতো কই, মোজা কই, চিরুনি কই, টাইটা কোথায় ফেললাম, চশমা ঘড়ি কোথায় যে রাখি—কিন্তু সোনার চোখ কিছুই এড়ায় না। ও যেন সোমনাথ আর শর্মিলাকে অলস করে দিচ্ছে—এখন এক গ্লাশ জলও ভরে খেতে হচ্ছে না।

গ্রামের মেয়ে। কিন্তু অনেক কিছুই শিখে উঠল। গ্যাস জ্বালায়, প্রেসার কুকারে করে মাংস রাঁধে, যন্ত্র দিয়ে আলু কাটে, ফলের রস তৈরি করে। কে বলে গ্রামের মানুষ টেকনোলজি বুঝবে না? জামা-ট্রাউজার ইস্ত্রি করতে পাকা হাত। টেলিভিশন খুললে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে বা মেঝেতে দুপা গুটিয়ে বসে গালে হাত দিয়ে দ্যাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

অনেক কিছু শিখল, কিন্তু সব কিছু না। টেলিফোন এখনো ধাতস্ত হল না। প্রথমে তো বেশ ভয়ই পেত কানে যন্ত্র চেপে অন্য মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে, শর্মিলা স্কুল থেকে ফোন করে বোঝাতেই পারল না যে গলার স্বর ওর। আর সোনার সে কি ভয়। ওর মুখে তো এমনি কথা কম, টেলিফোন কানে যেন মুখ তালা দিয়ে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। আধুনিক জীবনের এই একটা জিনিশ সোনা নিতে পারল না।

আর পড়াশুনো মাথায় ঢুকল না। শর্মিলার ইচ্ছে মেয়েটা পড়তে লিখতে শিখুক। বাইরে সমাজসেবা করছে, অথচ ওর বাড়িরই মেয়ে মুখ্যু হয়ে থাকবে এটা শর্মিলার কাছে খুবই আপত্তির ব্যাপার। কিন্তু পড়তে বললেই খিলখিল করে হাসে, বকলে চোখ মুছতে মুছতে মাথা নিচু করে বসে থাকে। পড়াশুনা ওর মাথায় ঢোকে না।

"মেয়েটা ভীষণ জেদী। কথা বলে না কিন্তু যা করতে চায় করবেই।" শর্মিলার অভিযোগ, 'মাংণ্টলথিসে' রাখা ছোট ছোট কয়েকটা ভাস্কর্যের নিদর্শন। শর্মিলা একভাবে সাজিয়েছে—কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখে সাজানো অন্যরকমের। হয়তো ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে সরে গিয়েছে—শর্মিলা প্রথম প্রথম ভাবত। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় ফিরে দেখবে আবার নতুন করে সাজানো, একইভাবে, যেমন আগের সন্ধ্যায় ছিল। বকাবকি করলেও মেয়েটা জবাব দেয় না। শর্মিলা কতবার সন্ধ্যায় এসে এই সাজানো পালটাবে? আর্ট, এ্যাস্থেটিকস্ এসব কি তর্ক করে বোঝাবার? মেয়েটা বুঝবে না, বুঝতে চাইবে না— ওর মতো করেই সাজাবে। শেষ পর্যন্ত শর্মিলাকেই হার মানতে হল, সোনার জিদই বজায় থাকল। এমনই জিদ নানা ছোটোখাটো ব্যাপারে—ও যা চাইবে করবেই। তর্ক নয়, কথার ওপর কথা নয়, ও করবেই।

হয়তো এটাও ওর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের এক অংশ। পরিবারের যখন মেয়ে, যখন বাবা-মা বলে, ওর পছন্দ-অপছন্দেরও তো একটা দাম আছে। সোমনাথ ভাবে, সোনা না হয়ে যদি সুজাতা হত—ওরও তো এইরকমের নানা পছন্দ বা জিদ থাকত। সেই জিদ কোন বাবা-মা না মেনে পারবে? তাছাড়া মেয়েটা তো কিছু চায় না, টাকা চায় না, শাড়ি চায় না, পাউডার চায় না, অবশ্য না চাইতেই অনেক কিছু পায়। শর্মিলার দরাজ হাত। কিন্তু লোভী হলে তো তবু চাইত।

মোটকথা মেয়েটার ওপর বড্ড মায়া পড়ে গেল ওদের দুজনের এবং রামাবতারের। আর পাঁচ ঘরের কাজ সেরে রামাবতার এসে সোনাকে সাহায্য করে—আনাজও কুটে দেয়, আলুর খোসা ছাড়ায়। নানা গল্প করে, বাড়ির গল্প, চাষের গল্প, বউ বাচ্চার গল্প। শহরে দীর্ঘদিন থেকেও রামাবতারের মনটা গ্রামের সবুজ খেতে আর উঁচুনিচু মাটির আলে বাঁধা। দুটি মানুষই কর্মজীবী গ্রামের, শহরে থেকেও ওরা শহুরে নয়। শহরের ভিড়ে ওরা নির্জনতার বলি। তাই সঙ্গ চায়। বয়সের ব্যবধান ওই কথাবার্তায় খসে পড়ে। রামাবতার বলে, সোনা তন্ময় হয়ে শোনে। এবং মাঝে মধ্যে সোনাও কথা বলে।

"দেখছ মেয়েটা রামাবতার এলে কেমন খুশি হয়। বেচারার তবু কথা বলার সঙ্গী থাকল একজন।" তাদের মন যেন একই ওয়েভ-লেংথে জড়ানো। ওরা পরস্পরকে বোঝে। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যে তাই সোনার কথা আর চাপা হাসি ভেসে আসে। সোনা হাসলে ভারি সুন্দর দেখায়—দৃষ্টি যেমন করুণ, হাসি তেমনই চঞ্চল, দুষ্টুমিতে ভরা।

।। তিন ।।

"মেয়েটা বড্ড বেশি খাচ্ছে আজকাল। এই রেটে খেলে আমার পয়সায় কুলোবে না। তুমি আমার টাকা বাড়াও", শর্মিলার অনুযোগ। ফ্রিজে বেশি মিষ্টি, মাছ, ডিম ইত্যাদি রাখবার যো নেই। পরদিনই উবে যাবে। কি হল, কোথায় গেল—এসব নিয়ে তর্ক বৃথা। সোনা কোনো জবাব দেবে না। তবে ব্যাপারটা পরিষ্কার। বাড়িতে তো মাত্র তিনটে প্রাণী—এমন নয় যে বাইরে থেকে বেড়াল এসে ফ্রিজ খুলে সব গুছিয়ে খাবে।

"মেয়েটা বড্ড মুটিয়ে যাচ্ছে", সত্যিই প্রথম যেদিন এল সেদিন কি সুন্দর স্বাস্থ্য—কিন্তু এখন যেন মুখ, পেট সব গোল হয়ে আসছে। আর ঘুমুচ্ছে বড্ড বেশি। শর্মিলা যখনই বাড়ি ফেরে তখনই বেল বাজিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয়। ওর চোখ দেখে সন্দেহ থাকে না যে ঘুম ভালো করে বাসা বেঁধেছে। "তোর হল কিরে? এত খাচ্ছিস, এত ঘুমোচ্ছিস পরে তো

ফুটবল হয়ে যাবি। কাজকর্মও পারবি না।" মেয়েটা হাসে, বা চুপ করে থাকে। ও শর্মিলাকে জেনে ফেলেছে। ও জানে শর্মিলা কখনো খাবার খোটা দেবে না, ওর ভালোর জন্যই বলছে।

সোমনাথ অবশ্য সোনার দোষ দেখতেই পারে না। "ও আর কি করবে বলো? সারাদিনটা কি করে একলা একলা কাটাবে? ঘরের কাজ তো সব ঠিক ঠিকই করে। রামাবতারের সঙ্গে গল্প আর কতক্ষণ? তোমার আমার সঙ্গে তো আর ওর আড্ডা জমবে না। না নয় ঘুমিয়েই কাটাল।" তারপর একটু ভেবে বলল, "তবে ওর মোটা হয়ে যাওয়াটা আমিও খুব পছন্দ করছি না। মেয়েটার শ্রী কমে যাচ্ছে।"

ওর সময় কাটাবার আর একটা ব্যবস্থা রয়েছে। ফ্ল্যাটের মধ্যেই। সেটা হঠাৎই একদিন শর্মিলার চোখে পড়ল। সেদিন রবিবার— সোমনাথের বাইরে প্রোগ্রাম ছিল না, এমনকি শর্মিলারও কোনো জনহিতকর সভা সমিতি বা কার্যক্রম ছিল না। দুপুরে ভরপেট খেয়ে দুজনের ঘুম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ শর্মিলার ঘুম ভাঙল। পড়ন্ত রোদ, সন্ধ্যার আভাস। পাশের ফ্ল্যাটে গানের টিচার এসেছে, তার সুর বা বেসুরো আওয়াজেই হয়তো ঘুম ভাঙল। শর্মিলা ডাকল : "সোনা, সোনা, কিন্তু সোনা কোথায়? ফ্ল্যাটের বাইরে তো ও যায় না। তবে কি বাথরুমে? না সেখানেও নেই। তবে কোথায়!"

পাশের ছোট্ট ঘরে, দিনের বেলাতেও কেন নিয়নের আলো? সব কিছু চার বছর ধরে যেমন আগে সাজানো ছিল, তেমনই রয়েছে। দেয়াল ভরতি সুজাতার ফটো—নানা বয়সের, নানা পোশাকের, নানা পরিবেশের। 'শো-কেস' ভরতি অসংখ্য খেলনা। একদিকে 'প্রাম' অন্যদিকে 'পুশ চেয়ার'— বেবিত্ব গেলেও ও দুটি জিনিস সুজাতা খুব ভালোবাসত। দুটোর ওপরই সাজানো, মখমলের ভাঁজে, দুটো বড় পুতুল, মনে হয় সত্যিকারের বাচ্চা! একটা টিপলেই শব্দ করে, অন্যটা শোয়ালে চোখ বন্ধ হয় কিন্তু দাঁড় করালেই বড় বড় চোখ করে তাকায়।

প্রামের পাশে সোনা দাঁড়িয়ে। কোলে পুশ চেয়ারে রাখা পুতুলটা। আর নিষ্পলক দৃষ্টিতে প্রামের পুতুলটার দিকে তাকিয়ে। কোলের পুতুলটাকে একটু পরই তুলে ধরে গাল টিপে আদর করল, সস্নেহে মাথায় হাত বুললে, একটা ছোট্ট চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে দিল। তারপরে সেটাকে পুশ চেয়ারে বসিয়ে প্রাম থেকে তুলে নিল অন্য পুতুলটা। ফিসফিস করে কি বলল। মুখে সেই কৌতুকের দুষ্টুমির হাসি। তারপর পুতুলটা নামিয়ে রেখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর আবার সেই মুখ টিপে টিপে হাসি।

"আচ্ছা মেয়েটা কি পাগল?" সোমনাথকে প্রায় জোর করে ঘুম থেকে তুলল শর্মিলা।

"দূর বোকা।" সোমনাথের সস্নেহ আশ্বাস। "আসলে মেয়েটা এখনো 'ম্যাচিওর' হয় নি, বয়স ষোলো-সতেরো যাই হোক, ও এখনো মনের দিক থেকে শিশুই রয়েছে, না হলে কি এই বয়সে পুতুল নিয়ে খেলে?" তারপর, শর্মিলার গালে আর ঠোঁটে আদর মাখিয়ে বলল, "ও জানে না যে ওর এখন বড় জীবন্ত পুতুল নিয়ে খেলা করবার বয়স।"

"ধ্যাৎ। তোমার যত অশ্লীল রসিকতা। মেয়ে বলছ, কিন্তু কথার লাগাম নেই।" সোমনাথের কানটি ভালো করে মলে দিল শর্মিলা।

"তোমার তো খুশি হবার কথা। সারাদিন ফ্ল্যাটে থেকে যদি পুতুল খেলে আর রামাবতারের গল্প শোনে তোমার আপত্তি কি? পাড়ার ছেলে তো ডাকছে না—ফস্টিনষ্টি তো করছে না। তুমি সবসময়ই শুধু নেগেটিভ দিকটা দেখ।'

কিন্তু নেগেটিভ দিকটাও পুরোপুরি অস্বীকার করবে কি করে? এমন তো নয় যে উটপাখির মতো মরুঝড়ের মুখে চোখ বন্ধ করে বালিতে গুঁজে পড়ে থাকবে? সোমনাথ না হয়

কাজপাগল, রাতদিন ওই নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু শর্মিলা শিক্ষিকা, সমাজসেবী। সমাজকর্মীরা যেমন মানুষের ভালো চায় তেমনই সমাজের নোংরা, বিকৃত দিকগুলোও ওদের নজর এড়ায় না। ওদের দুটো দিকই বুঝতে হয়।

তবু শর্মিলার চোখে নেগেটিভ দিকটা বহুদিন পড়ে নি। সত্যিই ও উটপাখির মতোই বালিতে মাথা ডুবিয়ে ছিল। চোখে পড়লেও যেন জোর করে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—যেহেতু সেটা অসম্ভব, ফ্ল্যাট বাড়িতে সারাদিন একা, বাইরের লোক আসে না, সেখানে কোনো জৈবিক নিয়মেই এটা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই চোখের ভুল, মনের ভুল।

কিন্তু পেট তো বাড়ছেই। শরীরেও বাড়ছে পেটও বাড়ছে। পেট কি একটু বেশি বাড়ছে না? কারণটা কি শুধু বেশি খাওয়া, ঘুম যায় নিশ্চিন্ত জীবন? সন্দেহের পোকাটা মাঝেমাঝেই মনে কামড়ায় শর্মিলাকে। কিন্তু সন্দেহটা ধরে এগোবার সাহস কোথায়? তার থেকে সহজ উত্তরই ভালো।

শেষ পর্যন্ত শর্মিলা ওকে না জিগ্যেস করে পারল না। সেদিন রাতে সোমনাথ বাড়ি নেই। শুধু ওরা দুজন। সোনা ওর মাথার চুল আঁচড়ে পরিপাটি করে বেঁধে দিচ্ছে।

"সোনা শোন। তুই তো আমার মেয়ের মতো, কিছু লুকোসনি আমার কাছে। সব ঠিক আছে তো।"

মেয়েটা মাথা নাড়ে।

"কোনো গণ্ডগোল নেই তো?"

মেয়েটা উলটো দিকে মাথা নাড়ে।

"তবে এত মোটা হচ্ছিস কেন?"

মেয়েটা মুখ টিপে হাসে। তারপর প্রায় ফিসফিস করেই বলে : "আর বেশি খাব না।"

শর্মিলা জেনে নেয় পিরিয়ড ঠিক মতো হচ্ছে কিনা। মেয়েটা মাথা নাড়ে। ও নিশ্চিন্ত।

তবু সোমনাথকে না বলে পারে না। সব কথাই তো সোমনাথকে ও বলে। সোমনাথ হেসে উড়িয়ে দেয়। "তোমাদের শুধু এক ভয়। মেয়েটার মনের বয়স পাঁচ বছরের বেশি না—ও সে সব বুঝবেই না," রুমাদিকেও বলল। কিন্তু রুমাদির উত্তর হল উলটো। "তুই সেসব ভাবিস না। গাঁয়ের মেয়ে। মায়েরা ছোটবেলা থেকেই সব শিখিয়ে রাখে। ফস্টিনস্টি করলেই বাচ্চা হবার অবস্থায় যাবে না।" রুমাদি অনেক কিছু জানেন—ওর সঙ্গে কথা বলে মনে ভরসা এল।

তবু যেন মেয়েটার ভাব-স্বভাব কেমন কেমন আজকাল। কাজ করতে করতে হঠাৎ উদাস হয়ে জানলা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন শত ডাকলেও কানে কথা ঢোকে না। সময় পেলেই সুজাতার ঘরে ঢোকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুতুল নিয়ে খেলে। আর শর্মিলার চোখে এটাও এড়ায় নি, রান্নাঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ও দেখেছে, কিভাবে মেঝেতে দু-পা ছড়িয়ে বসে ও নিজের পেট টিপেটিপে দেখে, নিজের মনে কি বলে। কিন্তু সেরকম কিছু হলে তো দুর্বল হবে, বমি করবে, আরো কত উপসর্গ। সেই সব কি শুধু মধ্যবিত্ত শহুরে মেয়েদের বেলায়?

এসব দুর্ভাবনা মন থেকে দুহাতে সজোরে ঠেলে সরিয়ে নেয় শর্মিলা। উপায় কি? এই কটা তো মানুষ—ওই দুর্ভাবনার সর্পিল পথে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত কোন নরকে গিয়ে পৌঁছবে? না, সেটা হতে পারে না।

।। চার ।।

শেষপর্যন্ত ওই ভীষণ জেদী, ছেলেমানুষ, স্বল্পবাক মেয়েটাও পারল না। ভোরবেলা। ওরা দুজনেই সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে। বলা যায় মেয়েটার যন্ত্রণার কান্নায় ঘুম ভেঙেছে। প্রচণ্ড ব্যথায় ও ছটফট করছে। চোখ বেয়ে জলের ধারা।

"কি হয়েছে রে?" শর্মিলার কণ্ঠে স্নেহ এবং আতঙ্কের এক বিচিত্র সমন্বয়।

সোনা দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা গুঁজে দিল।

শর্মিলা ওর চিবুকে হাত দিয়ে চোখে চোখ রেখে জিগ্যেস করল : "বল মা, আমায় বল। সব খুলে বল। খুব ব্যথা হচ্ছে?"

সোনা মাথা নাড়ল।

"হাসপাতাল যেতে হবে?"

সোনা মাথা নাড়ল।

তারপর যে প্রশ্ন না করি না করি ভেবেও না করে পারল না " কে তোর এই সর্বনাশ করল?"

সোমনাথ তখন বাথরুমে। কান খাড়া। প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্যের কয়েকটা সেকেন্ড যেন আকাশে ঝুলে রয়েছে— শেষ হতেই চায় না। সোনার অস্ফুট কণ্ঠস্বরে, "রামাবতার" শুনে যেমন সোমনাথ তেমনি শর্মিলার বুক থেকে যেন এক বিরাট পাথর সরে গেল। ও যদি অন্য কিছু বলত, মিথ্যে করেই বলত?

কিন্তু এখন কি করা? সোমনাথের পদস্থ চাকরি পদস্থতর ভবিষ্যৎ। শর্মিলা সমাজসেবী। অবিবাহিত বালিকা মেয়ের ফ্ল্যাটের মধ্যেই কিছু হলে পাড়ায়, বন্ধু এবং আত্মীয় মহলে টি-টি পড়বে। একটা কিছু করতেই হবে।

বিমর্ষ পাংশু মুখ নিয়ে রামাবতার দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। ওর শুকনো মুখেও কথা নেই—মুখভরতি অপরাধী চেতনার ছাপ। বোঝা গেল কয়েক রাত্রি ওরও ঘুম হয় নি। শর্মিলার নজরে পড়তে ও যেন জ্বলে উঠল : "বদমাস আদমি। তুমকো শরম ভি নেই হ্যায়।" রামাবতারের মুখে কোনো উত্তর নেই।

রামাবতারকে নিয়ে বকাবকির-সময় কোথায়? ওই অবস্থাতেই তাড়াহুড়ো করে ট্যাক্সি নিয়ে হাসপাতালে গেল শর্মিলা। সোমনাথের যাবার উপায় নেই, জটিলতা বাড়বে। কিন্তু শর্মিলার ঝামেলা কম?

"ওর বয়স" কত?

"আঠারো।"

"না। মনে হচ্ছে নাবালিকা— ষোলো-সতেরোর বেশি না। বিয়ে হয়েছে।"

"না!"

"এ আপনার কে হয়?"

"কেউ না। আমি সমাজকর্মী। সেই জন্য এসেছি।"

"কে এর সর্বনাশ করল? বাড়ির বাবু?"

"না। বাড়ির কাজের লোক।"

"ব্যাপারটা সহজ নয়। নাবালিকা, অবিবাহিতা। ক্রিমিনাল কেস হতে পারে। আপনি সেটা ভেবে দেখেছেন?"

"জানি।" ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিল শর্মিলা, পরে ও নিজেও অবাক হয়েছিল কিভাবে নার্ভ রেখে কথা বলেছে সেই কথা ভেবে। "কিন্তু আমরা সমাজকর্মীই। এরকম প্রায়ই হচ্ছে, কতই-বা আর থানাপুলিশ হবে।"

শর্মিলার চেহারা, ব্যক্তিত্ব, নার্ভ, সব কিছু মিলিয়ে মেয়েটা হাসপাতালে ভরতি হতে পারল। এনেছিল ঠিক সময়। পরদিনই বাচ্চা হল। সুন্দর টুকটুকে ফরশা গোলগাল চেহারা। সোনার মুখচোখ আর রামাবতারের রং। দুয়ে মিলিয়ে অপূর্ব।

তার পরদিন শর্মিলা রামাবতারকে সঙ্গে করে আনল। হাসপাতালে বেডে সোনা তখন ছেলেটাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। দেখেই হাসি পেল শর্মিলার—এতটুকু বাচ্চারও আবার বাচ্চা? তারপর, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে যাবার ছুতো করে ওদের দুজনকে একলা থাকবার সুযোগ দিয়ে চলে গেল।

ফিরে আসার মুখে ওয়ার্ডের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল সেই অবিস্মরণীয় ছবি। কাঁচাপাকা দাঁড়ি, অবিন্যস্ত চুল, কাঁধে গামছা, পরনে ফতুয়া, পঞ্চাশোর্ধ্ব গরিব মানুষটার মুখ যেন গর্বে আর পরিতৃপ্তিতে ভরে গিয়েছে। যে সোনার মুখে কথা নেই সেই মুখেও দু-একটা কথা, চোখের চাউনিতে বিষাদের চিহ্ন মাত্র নেই। দুজন দুজনকে দেখছে। চারপাশে ভিড়, হইচই, বাচ্চাদের চিৎকার সমস্তই যেন থেকেও নেই। বয়সের ব্যবধান যেন অদৃশ্য। ক্যামেরা সঙ্গে থাকলে ফটোটা তুলে রাখত শর্মিলা।

শর্মিলাকে দেখে সলজ্জভাবে একটু সরে দাঁড়াল রামাবতার। তারপর কিন্তু কিন্তু করে না বলে পারল না। যা বলল তার বাংলা হরফ : এমন খুপসরৎ গোরা ছেলে এই ওয়ার্ডে আর একটা নেই। পিতৃগর্বে গর্বিত রামাবতার যেন আর এক মানুষ।

।। পাঁচ ।।

এখন কি করা? তিনদিন পরেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। ততদিন রোজ খাবার নিয়ে যাওয়া, দেখাশোনা রামাবতারই করবে। কিন্তু তারপর?

এবার আর শুধু দুজনে বসে সমাধান করা যাবে না। রুমাদি এলেন। শহরে আর গ্রামে রুমাদি দু-ধরণের মানুষ। শহরে যাকে বলে 'স্মার্ট সেটে'র সদস্য। ক্যালকাটা ক্লাবে যান, ডগ শোতে পোষ্য পাঠান, 'ম্যানিকিওর' করা আঙুলের দশনখের পাশে সুশোভিত অজস্র, মূল্যবান আংটি। সেই রুমাদিই গ্রামে যান আটপৌরে শাড়ি পরে, প্রয়োজন হলে শাড়ি হাঁটু অবধি তুলে কাদায় হাঁটেন। যেখানেই যান একমুখ হাসি, চারপাশে ভিড়।

সব শুনে রুমাদি বললেন, "হু। ঝামেলা যথেষ্ট পাকিয়েছে বুঝছি। মেয়েটা যে এমন হবে বুঝি নি। দেখা যাক কি পথ আছে।"

এক নম্বর পথ, শর্মিলা-সোমনাথের ফ্ল্যাটে ফিরে আসা বাচ্চাসহ। "অসম্ভব।" এবার সোমনাথই বলল। "যা ঘটেছে তারপর আর ওকে রাখা যায় না।" ওর কণ্ঠে আতঙ্কের সুর। বলেই মনে হল হয়তো এভাবে বলা ঠিক হয় নি। তাই যোগ করল, "অবশ্য আমি কোনো 'মরালিস্ট যেশ্চার' নিচ্ছি না। কিন্তু ওই বাচ্চাকে নিয়ে যা প্রশ্ন উঠবে তার উত্তর কিভাবে দেব আমরা।"

রুমাদি বললেন, "কিন্তু তোমরাও তো দায়িত্ব এড়াতে পার না। অল্পবয়স্ক মেয়ে, তোমাদের হেফাজতে রাখলাম—বাবা, মাকে বোঝালাম যে ভালোই থাকবে। কিন্তু তোমরা কি সে দায়িত্ব পালন করেছ? মেয়েটা যে এখন এই অবস্থায় তার জন্য কি তোমরাও দায়ী নও?"

ওরা দুজন চুপচাপ।

"তারপর এটাও বুঝছি না শর্মিলা, তুমিও তো মা হয়েছিলে। তোমার কি একবারও সন্দেহ হল না?"

কিছুক্ষণ ভেবে শর্মিলা বলল : "সন্দেহ হয়নি এমন না। কিন্তু তিনজন মাত্র মানুষ। সোমনাথ নিশ্চয়ই না। রামাবতারের প্রায় নাতনীর বয়সী, ও যে এ জিনিস করতে পারে ভাবিই না।" তারপর দরজার ধারে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে সোনা টেলিভিশন দেখত সেদিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল : "তাছাড়া এতদিনের পোয়াতি, তবু একদিনের জন্যই কিছু বলবে না সেটা তো ভাবতেও পারছি না। ও যে কি করে মাসের পর মাস কাউকে না বলে এইভাবে নিজের মতো কাটাল বিশ্বাস হয় না।"

রুমাদি এবার নিজের হাসি হাসলেন : "তোমরা শহরের মেয়েরা এটা কখনোই বুঝবে না। যারা শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটা অনেক সহজ। তাছাড়া মেয়েটা বেশ শক্ত সামর্থ্য এমনিও—চাপাও খুব। আমি গ্রামে এমনও দেখেছি যে বাচ্চা হবার কয়েক ঘণ্টা আগেও ধান কেটেছে, এবং বাচ্চা হবার পরদিন থেকে আবার মাঠের কাজে হাত দিয়েছে।"

"কিন্তু আমাকে বলল না কেন? ও তো বুঝতে পেরেছিল বাচ্চা হবে। ও কি বোঝে নি বাচ্চা হবার মানে কি? কুমারী মেয়ে, এসব কি জানে না?"

"হয়তো পুরোটা বোঝে নি বা বুঝতে চায় নি। কিন্তু রামাবতার লোকটা তো বুঝেছিল। সে কেন কিছু করল না বা বলল না?"

রামাবতার যে বলে নি তাতে আশ্চর্য হবার নেই। বলতে যথেষ্ট সাহস লাগত। কিন্তু চেষ্টা করেছে—পাতাটাতা খাইয়েছে। ওর ধারণা ছিল তাতেই বন্ধ হবে। অথচ শর্মিলাকে জানালেই হত। কুমারী মেয়ের এই অবস্থা—আইনগতভাবেই কিছু একটা করানো যেত।

কি করা যেত ভেবে লাভ কি? প্রশ্ন · এখন কি করা? এক নম্বর প্রস্তাব ওকে বাচ্চাসহ ফ্ল্যাটে ফিরিয়ে আনা—চলবে না। দুই নম্বর, ওর নিজের গ্রামের বাড়িতে বাচ্চাসহ ফিরে যাক।

এবার রুমাদিরই আপত্তি : " সেটা অসম্ভব। তোমরা গ্রামের সমাজ চেনো না। মেয়েটাকে ওর বাড়ির লোকই পিটিয়ে মেরে ফেলবে। ওটা হয় না।"

"তাহলে আর কি উপায় আছে?" সোমনাথের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে।

শেষ অবধি রুমাদিই একটা উপায় বের করলেন। কোন এক বিদেশী চার্চ পরিচালিত মেয়েদের আশ্রম, কলকাতা থেকে একশো কিলোমিটার দূরে এক শহরতলিতে। এই ধরণের সমাজ বিতাড়িত মেয়েরাই মূলত থাকে, হাতের কাজ শেখে, চেষ্টা করে স্বাবলম্বী হতে। না হতে পারলেও আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেয় না। ওখানে জায়গা পেলে আর সারাজীবনের মতো কোনো ভাবনা নেই। রুটি কাপড় পাবে, মাথার ওপর ছাদ থাকবে।

কিন্তু পাওয়া যাবে কি? অথচ মাঝে সময় মাত্র তিনদিন।

রুমাদিই ভরসা। ক্যালকাটা ক্লাব, হাই সোসাইটিতে থাকবার অনেক সুবিধে। আশ্রম যারা চালায় সেই চার্চগোষ্ঠীর ডিরেক্টরের বন্ধুর বন্ধুকে ধরে শেষ অবধি উপায় হল। রুমাদি করিৎকর্মা মহিলা। সব বন্দোবস্ত করে ফেললেন। শুধু শর্মিলাকে দায়িত্ব নিতে হবে হাসপাতাল থেকে আশ্রম একশো কিলোমিটার পথ পৌঁছে দেয়া। সে পথ বাসে বা ট্রেনে যাওয়া যাবে না—গাড়ি ভাড়া করতে হবে। খরচ অনেক, কিন্তু খরচের কথা এখন ভেবে লাভ কি?

শর্মিলা সঙ্গে নিল রামাবতারকে। হাসপাতালে থেকে মেয়েটা কিছুটা শীর্ণ হয়েছে, কিন্তু মুখের শ্রী বেড়েছে বই কমে নি। ফুটফুটে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে যখন উঠল গাড়িতে তখন চোখের চাউনিতে একটা মজার বা চাপা দুষ্টুমির ভাব। সামনের আসনে রামাবতার বসল। সারা পথ শর্মিলা বোঝাল, কোথায় যাচ্ছে, কিভাবে থাকবে, কি করতে হবে। বোঝাল এত চিন্তার কিছু নেই — প্রয়োজন হলে সারাজীবনের মতোই ব্যবস্থা হল। ও কত সৌভাগ্যবতী। ওকে আর খেটে জীবন চালাতে হবে না।

আশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিসেস জয়েস উইলিয়ামস বেশ জবরদস্ত মহিলা। অবিবাহিত, বলা চলে আশ্রমই ওর জীবন। খানিকটা পুরুষবিদ্বেষীও বলে শর্মিলার মনে হল কথাবার্তায়। হয়তো কোনো ইতিহাস আছে তার পিছনে।

"এ্যানিমেল। না হলে এমন ছোট্ট মেয়েকে এই রকম করে। নিশ্চয়ই বাড়ির বাবু।"

"না না। ওই ফ্ল্যাট বাড়িরই এক কাজের লোক।" শর্মিলা আপত্তি করল। ও জেনে ফেলেছে সাধারণ মানুষ প্রথমেই কি ভাববে—তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই ও এসেছে। ভাগ্যিস রামাবতারকে গাড়িতে বসিয়ে রেখেছে, মিসেস উইলিয়ামস-এর জ্বলন্ত চোখের চাউনিতে ও বুঝেছে রামাবতারকে হাতের কাছে পেলে উনি কি করতেন।

পরিষ্কার ছিমছাম আশ্রম। বাগানও সবুজ ঘাসে ভরা। এক এক ঘরে চারজন করে মেয়ে। নিয়মকানুন খুব কড়া। সব কিছুই ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে চলছে, কোনো ব্যতিক্রম নেই। আশ্রমের মধ্যেই কুটির শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা। চারপাশে পাঁচিল, পাহারাদার গার্ড দিচ্ছে।

চলে আসার মুহূর্তে মেয়েটা শর্মিলার দুটো হাত চেপে ধরল। চোখে আবার সেই বিষণ্ণ চাউনি ফিরে এসেছে। অস্ফুট স্বরে বলল, "মা, আবার এসো। বাবাকে নিয়ে এসো।" দূরে গাড়িতে বসা রামাবতারের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

রামাবতার নিশ্চুপ। যেমন যাবার পথে তেমনি ফেরার মুখে একটি কথা বলল না। পথে একবার দাঁড়িয়ে রাস্তার ধার থেকে চা মিষ্টি খাওয়া হল। তখনো চুপ। বোঝবার উপায় নেই ওর মন কি বলছে।

।। ছয় ।।

"বুঝছি না ভালো হল কিনা। খাবে-দাবে ঠিকই, কিন্তু যেন কয়েদিখানা। জৈবিক প্রয়োজন মেটানোই কি জীবন! সারা জীবন কি এইরকম পরগাছা হয়েই কাটাবে মেয়েটা?" শর্মিলার জিজ্ঞাসা।

পোস্টমর্টেম শুরু হল। কিন্তু সহজতর পরিবেশে। মেঘ কেটে গিয়েছে। ওদের শান্তির নীড় আর ভাঙবে না। ওদের ঘুম কেউ কাড়বে না। অন্তত বাড়ি ফিরে সেই কথাই মনে হল শর্মিলার। এবং সোমনাথের। এখন নিশ্চিন্তে পোস্টমর্টেম হোক। বিচার-বিশ্লেষণ হোক।

সোমনাথই চা বানাল। আবার স্ব-নির্ভর হতে হবে। সাবধানে আলু কাটতে হবে। পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে চোখে জলের বন্যা নামা চলবে না। ভাতের ডেকচির ঢাকনি তুলতে গিয়ে যেন হাতে ফোসকা না পড়ে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের ব্যাগ পালটাতে হবে। নিজেদেরই এখন থেকে করতে হবে এই সব। ন্যাড়া বেলতলায় যায় কবার? সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। ঘাট হয়েছে লোক রেখে। আর না।

চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে শর্মিলা বলেই চলল : "ওর না হয় যা হোক হল। কিন্তু ছেলেটা? ও ছোটবেলা থেকে কি শিখবে? ওখানকার যা পরিবেশ— সেখেনে স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনের কি সুযোগ আছে? সব মেয়েরাই এক ধরণের—ওদের কাছ থেকে ওদের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কি শিক্ষা সোনার ছেলেটা পাবে?"

"তারপর ধরো সোনারই প্রয়োজনের কথা", এবার সোমনাথের পালা। 'আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ছেড়ে থাকা। বিয়ে হবে না। খাওয়া-দাওয়ার বাইরেও তো আরো জৈবিক প্রয়োজন রয়েছে। সেগুলো আর মিটবে না। ওর জীবনটা এখানেই শেষ হয়ে গেল।"

শর্মিলার যেন বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। গত কয়েকদিনের উত্তেজনা ও শঙ্কায় সে কথা মনে হয় নি। এখন যেন মনে হচ্ছে জীবনের একটা টুকরো খসে পড়ল। মেয়েটা যেন ওর আর সোমনাথের অভ্যাসের অংশ হয়ে গিয়েছিল।

"বুঝলে আমরা আসলে কাওয়ার্ড। সমাজকে বড্ড ভয় করি। না হলে ওই কচি মেয়েটাকে নিজেদের সম্মান বাঁচাবার জন্য আশ্রম নামে জেলখানায় ভরতি করি?" সোমনাথের খেদোক্তি চললই : "এরপর আর বড় কথা আমাদের মুখে মানায় না। আমার নিজের ওপর আর কোনো শ্রদ্ধা নেই।"

চলে আসার মুহূর্তে সোনার হাত চেপে ধরে অস্ফুট আবেদন এখনো শর্মিলার কানে বাজছে। কিন্তু যাওয়া তো যাবে না আর। সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। যত কষ্টই হোক, যতই মায়া পড়ুক মেয়েটার ওপর। এছাড়া উপায় নেই। না হলে হয়তো হঠাৎই একদিন বাচ্চা নিয়ে ফ্ল্যাটে এসে উঠবে। সুজাতার অভাব যখন একটু একটু করে ভুলছে, তখন এই মেয়েটাও একদিন নিশ্চয়ই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। এটাই নিয়ম। এইভাবেই জীবন চলে। জীবনে কতকিছু ঘটে—সবকিছু সবসময় মনে ভিড় করে থাকলে এক পাও এগোনো যায় না। সোনা ছিল, এখন নেই—এটাই সত্য। আজ, কাল কয়েকদিন ধরে হয়তো পোস্টমর্টেম চলবে। তারপর একদিন সেটাও বন্ধ হবে যখন নতুন কিছু আর বলবার বা ভাববার থাকবে না।

রামাবতারের কি হবে? কিছুই না। ও যেমন সকালে এসে বাসন মাজত ঘর মুছত—এখনো মুছবে। আর কোনো অতিরিক্ত দায়িত্ব নেই। এই ঘটনার কোনো চিহ্ন ওর শরীরে নেই। ও তো আর মেয়ে নয়। পুরুষদের এই একটা বড় সুবিধা। তবে মনে কি রয়েছে কে বলবে? ওর কি সোনার জন্য মন খারাপ হবে না। ওর কি ছোট ছেলেটার, নিজের ছেলেটার কথা ভেবে কান্না আসবে না? হয়তো ওদের কান্না পায় না।

কিন্তু কি ভেবে ওই বুড়ো লোকটা এক ফোঁটা এই মেয়ের সঙ্গে এমন করতে পারল? 'বুড়ো' কথাটায় সোমনাথের আপত্তি—একান্ন-বাহান্ন বছরে আজকাল কেউ বুড়ো হয় না। না হয় মেনে নেয়া গেল। কিন্তু ওর তো নিজের বউ, ছেলেমেয়ে মায় এক ছোট্ট নাতনি পর্যন্ত রয়েছে দেশে। সোনাকে দেখে ওর কি মনে হল না নিজের মেয়ের কথা—না যৌনক্ষুধাই বড় কথা?

"নীচতার কি কোনো শাশ্বত মানদণ্ড আছে? প্রেমের কি কোনো ফরমূলা আছে? ও যদি রামাবতার না হয়ে পাবলো পিকাসো হত তোমরা বলতে শিল্পীমন। তোমাদের সব ব্যাপারেই ডবল স্ট্যান্ডার্ড।" সোমনাথ সোফায় নড়েচড়ে বসল, আত্মগ্লানির বোঝা এতক্ষণে মন থেকে নেমেছে—পুরোনো কর্মে ফিরে এসেছে আবার।

রামাবতার তো একজন মানুষ নয়, একটা গোষ্ঠী। ওরা দূর দূর থেকে আসে কলকাতায়। গ্রামের খরা, বন্যা আর দারিদ্র্য ওদের ঠেলে বের করে দেয় গ্রাম থেকে। কলকাতার আলোকমালা, কারখানা, চাকরির সুযোগ ওদের হাতছানি দেয়। কিন্তু শহরে থেকেও ওরা যেন থাকে না। মনটা পড়ে থাকে গ্রামে। শহর ওদের গ্রহণ করেছে, ওরা শহরকে গ্রহণ করে নি। পরিবার তাই গ্রামেই থাকে—বছরে, দুবছরে যখন ফেরে তখন কিছুদিনের জন্য পারিবারিক জীবন ফিরে আসে। বাকি সময়টা কলকাতার হৃদয়হীন সমাজহীন কংক্রিটের জঙ্গলে পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়ায়—এক অস্বাভাবিক জীবন—বৃন্তচ্যুত ফুলের মতোই যেন শুকিয়ে আসে। সেই স্বাদহীন, বর্ণহীন, গন্ধহীন জীবনের আনাচেকানাচে যখন কোনো সোনা বা রুপোর সন্ধান পায় তখন লোভ সামলাতে পারে না। গরিব বলে তো সব প্রয়োজন ওদের ফুরিয়ে যায় নি।

তবু শর্মিলার ভাবতে ভালো লাগে। বিছানায় শুয়ে সোমনাথের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে, ওরা দুটো ছিন্নমূল মানুষ অন্তত কয়েকমাসের জন্যও তো নীড় বেঁধেছিল।

সকলের অজান্তে, নিঃশব্দে, বন্ধ দরজার এপাশে, সিঁড়ির পদধ্বনির দিকে এক কান খাড়া রেখে, ওরা তো দুজন দুজনকে ভালোবেসেছিল। একজন বিহারের একজন মেদিনীপুরের। একজন বয়স্ক একজন কিশোরী। কিন্তু এসব বিষয় তো অর্থহীন। মোট কথা একজন পুরুষ, একজন নারী—দুজন দুজনকে টেনেছিল। এবং এখানেই নীড় বেঁধেছিল।

হাসপাতালের বেডের দিকে তাকিয়ে রামাবতারের গর্বিত দৃষ্টি শর্মিলার এখনো চোখে ভাসছে।

সোমনাথের বিশ্লেষণ তখনো চলছে : 'এটা অবশ্য মানতেই হবে যে ওরা দুজনই খুব ভালো। ওরা যদি পাজি হত, তাহলে যুক্তি করে আমাদের 'ব্ল্যাক মেইল' করতে পারত। আমি যতই বলি না কেন, কারোকে বোঝাতে পারতাম না।" তারপর শর্মিলার ঘুমুঘুমু চোখে আলতো চুমু খেয়ে বলল, "অবশ্য তুমি ছাড়া। তোমাকে বোঝাবার দরকার হয় নি, কোনোদিন হবে না। তুমি আমার গর্ব। তুমি যেভাবে ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক ভেবে ব্যাপারটা ম্যানেজ করলে সেটা প্রায় অবিশ্বাস্য। আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে ক্রাইসিস এইভাবে কেটে গেল। তুমি সত্যিই সুপার্ব।"

শর্মিলা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল : "মিথ্যেবাদী কোথাকার! সব বানিয়ে বানিয়ে বলো। এখন ঘুমুতে দেবে তো?"

।। সাত ।।

সোমনাথ যেটা জানত না—ক্রাইসিস কাটে নি। সত্যকে ও হিসাবের মধ্যে আনে নি। সত্য। মানে সোনার ভাই, যে গড়িয়াহাটার রেস্টুরেন্টে কাজ করে।

ভোরবেলা দরজায় বেল বাজল। সোমনাথ পাজামার দড়িটা ভালো করে বেঁধে দরজা খুলেই দেখে সত্য। প্রথম প্রতিক্রিয়া হল দরজাটা সপাটে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সত্য তার মধ্যেই ঘরের মধ্যে এক পা ঢুকিয়ে ফেলেছে। ওকে না ঢুকতে দিয়ে আর উপায় থাকল না।

তবে ভয়টা খামোখাই পেল। সত্য কিছুই জানে না। বরং নিচু হয়ে প্রণাম কবল ওদের, সঙ্গে গ্রাম থেকে আনা বড় কাঁঠাল। বাড়ির খবর, জমির খবর, নানা আঞ্চলিক সামাজিক সমস্যার আলোচনা-অন্তে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "সোনা নেই বাড়িতে, মা?"

সোমনাথের মুখ থেকে জবাব বেরোল না। কিন্তু শর্মিলা ইতিমধ্যেই ওই প্রশ্নের জন্য নিজেকে তৈরি করে রেখেছে? "আমরা তো পুজোর সময় থেকে তিন মাস দিল্লিতে থাকব। তাই রুমাদি ওকে ওরই এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে রেখেছেন। তোমার কোনো চিন্তা নেই। ও খুব ভালো আছে।"

"সে তো জানি মা।" এক গাল হেসে সত্য বলল। "আমরা বলি ওর কত জন্মের ভাগ্যি যে এমন বাপমায়ের আশ্রয় পেল।" তারপর, যাবার মুখে জিজ্ঞেস করল : "ওর নতুন ঠিকানাটা কি দেবেন? আমি একটু দেখে আসতাম। বোনটাকে কতদিন দেখি না।"

"ঠিকানা?" শর্মিলার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। পরক্ষণেই সামলে উঠে বলল : "ঠিকানা তো আমার কাছে নেই। রুমাদি জানেন। তোমার কোনো চিন্তা নেই। তোমার বোন বেশ ভালোই আছে।"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সত্য একটু ইতস্তত করে বলল : "ও যেন পুজোর মধ্যে একবার গ্রামে যায়—একটু দেখবেন মা। আমি কয়েকদিন পরে ফোন করব—তখন যদি ঠিকানাটা জোগাড় করে বলে দেন, আমিই ওকে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যাব।"

ফ্ল্যাটের দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে শর্মিলা সোমনাথের মুখের দিকে তাকাল। সোমনাথের মুখ থেকে যেন রক্তবিন্দুটুকু মুছে গিয়েছে। গত রাত্রে নিশ্চিন্ত পোস্টমর্টেম বিলাসিতায় আসল সমস্যাটিই চোখে পড়ে নি। সোমা কোনো বিচ্ছিন্ন জীবকোষ নয়, একটা সমাজের প্রাণী—আশ্রমের বাইরের বড় জগৎটা সোনাকে ভোলে নি। এবং সোমনাথ-শর্মিলা ভুলতে চাইলেও ওরা ভুলতে দেবে না। ঠিকানা দিতে হবে। কিন্তু কোন ঠিকানা? একটা উপায় সোজাসুজি সত্যকে সবকিছু বলা। তারপর ওকে নিয়ে আশ্রমে যাওয়া। এবং আশ্রম থেকে সোনাকে ছাড়িয়ে ওর হাতে তুলে দেয়া। তারপর আর শর্মিলা-সোমনাথের কিছু করবার নেই। আর ওদের এত ভাববারই-বা কি? এত মাথাব্যথা কেন? ঝামেলা মেয়েটাই পাকিয়েছে, ও বুঝুক। বা রামাবতার বুঝুক।

একটু চিন্তা করতেই বোঝা গেল, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। সত্যর হাতে সঁপে দিলেই সত্য কি ওটা নেবে? সত্য নিলেও গ্রামের ওরা কি নেবে? কুমারী মেয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে গ্রামে ঢুকবে কি করে? আর এভাবে দায়িত্ব বা ঝামেলা তো ঝেড়ে ফেলা যায় না। কিন্তু তার থেকেও আগের কথা—সত্যকে কিভাবে বলবে? আর বলবার সঙ্গে সঙ্গে ও কি করবে? গাঁয়ের ছেলে—ও যদি হাউ-হাউ চিৎকার করে কেঁদে পাড়ার লোক জড়ো করে? ও যদি রামাবতারকে ছুটে মারতে যায়? বা যদি সোমনাথেরই ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকেই আসল দোষী ভেবে? কেলেঙ্কারি, কেলেঙ্কারি। এত কিছু করবার পরও পরিত্রাণ পাওয়া গেল না। শর্মিলা, তোমাব সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ।

অগত্যা অগতির গতি অকুলের কুল রুমাদিকে ফোন। কিন্তু রুমাদি নেই—'ডগশো'তে গিয়েছেন। পরদিন আবার ফোন করল—কিন্তু রুমাদি সিনেমা স্টারদের চ্যারিটি টিকিটের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত। দুদিন পর আবার ফোন—রুমাদি দিল্লিতে একটা ডেলিগেসনের সঙ্গে গিয়েছেন, এক সপ্তাহ পরে ফিরবেন।

তারপর একদিন ফোন এল, রুমাদির নয়। সেই ফোন। ও পাশে সত্যর গলা। সোনাব ঠিকানা চাইছে।

"রুমাদিকে তো পাচ্ছি না ভাই। তোমাকে আজ ঠিকানাটা দিতে পারলাম না। চিন্তা করো না"।

তবু ঠিকানা ওর চাই-ই।

"তুমি পরশু ফোন করো। দেখি এর মধ্যে জোগাড় করতে পারি কিনা।"

দুদিন পর আবার সত্যর ফোন এল। এবার ওর কণ্ঠে সংশয়। সোনা অন্য কারো বাড়িতে অথচ শর্মিলা জানে না—ওর যেন বিশ্বাস করতে বাধছে।

"সোনার কিছু হয় নি তো মা? ও কি হাসপাতালে? সত্যি বলুন মা, আমার বড্ড চিন্তা হচ্ছে।"

"দূর বোকা। সে সব কিচ্ছু না। তুমি একদম ভেব না। আমি ঠিক খোঁজখবর নেব, এবং দেখব যা'তে ও পুজোয় বাড়ি যায়।"

সত্যর তবু সংশয় গেল না। দু-একদিন পরপর ফোন। তারপর থেকে ফোন বাজলেই ওদের বুক কাঁপে। ফোনের তারে জড়িয়ে জড়িয়ে যেন এক বিষাক্ত সাপ। ফোনের বেল যেন র‍্যাটল স্নেকের নূপুর ধ্বনি। কানে গুঁজলেই মাথা ঝিমঝিম করে, গলা শুকিয়ে আসে। মিথ্যের জালে ওরা যেন ক্রমশই জড়িয়ে পড়ছে।

তারপর আবার সত্য এল। এবার কোনো সরল বিশ্বাস নিয়ে নয়। এবার দরজা খুলতেই যেন জোরে ঠেলে ঢুকল। প্রণাম করল ঠিকই। কিন্তু গলায় উৎকণ্ঠার ছাপ। এখনো ঠিকানা নেই? ও কি হারিয়ে গেল?

শর্মিলার গলার ঠাণ্ডা স্থির মেজাজ আর নেই। কিন্তু যত জোর দিয়ে বলছে তত যেন ফাঁকা লাগছে। তবু বলল : "তুমি ভাই সাতদিন পরে এসো। আমি কথা দিচ্ছি তোমার বোনের কাছে তোমায় নিয়ে যাব।"

না বলে উপায় ছিল না। সত্য নাছোড়বান্দা। কিন্তু এক সপ্তাহ পর কি হবে? আর তো মিথ্যার বেড়া দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না? উপায় কি? রুমাদি কোথায়?

সোমনাথ মনশ্চক্ষে দেখতে পেল কি ঘটবে। সাতদিন শেষ হতেই ও আবার আসবে। ভোরবেলাই আসবে, যেমন সাধারণত আসে। তারপর যখন শুনবে ঠিকানা নেই তখন সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করবে। লোকজন জুটবে, হয়তো-বা থানায় ছুটবে। কাগজে বেরুবে—কিশোরী পরিচারিকা নিরুদ্দেশ।

তবে কি ওরা পালিয়ে যাবে? কিন্তু পালাবে কোথায়? চাকরি, ফ্ল্যাট, সমাজ, জীবন ফেলে কোথায় যাবে ওরা? আর যাবেও-বা কেন? ওরা তো কোনো দোষ করে নি! কিন্তু এত মিথ্যের পর ওদের সত্যি কথাটা কেউ কি আর বিশ্বাস করবে?

রামাবতার কোথায়? সত্যর উপর্যুপরি দ্বিতীয় আবির্ভাবের পর থেকে ও যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। কাছে আসে না, পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু রামাবতারকে তো এই সংকটে পালাতে দিলে চলবে না। রামাবতার যখন মূর্তিমান সংকট, একাধারে অপরাধী ও সাক্ষী। ওর উপস্থিতির খুবই দরকার।

অনেক চেষ্টার পর, পাশের বাড়ির বউদের বলে-কয়ে রামাবতাবের খোঁজ মিলল। ও এল, কিন্তু মুখে আতঙ্কের ছাপ। চোখে চোখে তাকায় না। মাথা গুঁজে ঘবদোর মুছছে।

শর্মিলাই প্রথম রাগে ফেটে পড়ল। সোমনাথ তখন বিছানায় শুয়ে কাগজ পড়ছে—কিন্তু কান খাড়া রয়েছে। ও শুনল শর্মিলার চাপা ঝাঁঝালো গলা, "মেয়েটার তো সর্বনাশ করেছ। এখন পালিয়ে বেড়িয়ে কি করবে? ওব ভাই আবার আসবে—তখন কোথায় পালাবে শুনি?"

উত্তরে রামাবতার যা বলল তার জন্য ওরা দুজনই প্রস্তুত ছিল না : "হাম কো কেয়া হোগা? হাম তো কুছ নেহি কিয়া।'

"কি বললে?" শর্মিলার গলায় বিস্ময় ও ভয়। "তবে সব কিছু এমনি এমনি হল? মেয়েটাকে তুমি কিছু করো নি?"

"কুছ নেহি। উসকো ছুয়া ভি নেহি।" রামাবতারের কণ্ঠস্বর নির্বিকার। কোনোদিকে না তাকিয়ে ঘর মুছছে।

এবার আর সোমনাথ শুয়ে থাকতে পারল না। মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। বিদ্যুতের মতো ছুটে গিয়ে রামাবতারের গলার কাছে ফতুয়া চেপে ধরে ওকে দাঁড় করাল। এ এক অন্য সোমনাথ। এতদিন ঘর করেও ওর এই ভয়ঙ্কর উন্মত্ত রূপ শর্মিলা দেখে নি। কণ্ঠস্বর যেন স্বাভাবিক নয়। কোণঠাসা নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে রামাবতারের সর্ব শরীর ঝাঁকড়াচ্ছে।

"বদমাস, উল্লুক। তোর লজ্জা নেই? একটা নাতির বয়সী মেয়ের সঙ্গে এমন করলি। বলে কিনা ছুয়া ভি নেহি? চল, এখনই চল পুলিশের কাছে। চল, এখনই সবাইকে ডেকে বলছি তুই কতবড় শয়তান।"

সমস্ত শক্তি দিয়ে সোমনাথ রামাবতারকে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে গেল। তারপর যখন দরজার ছিটকানিতে হাত দিয়েছে রামাবতার ধুপ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বসে পড়ে ওর পা চেপে ধরল।

"কসুর হো গিয়া বাবু। মাফ কিজিয়ে।" একে পুলিশের ভয়, তার চেয়ে বড় ভয় ওই ফ্ল্যাট বাড়ির অন্য কাজের লোকদের। ওরা জানলে খবরটা গ্রামে পৌঁছতে দেরি হবে না। গ্রামে বউ আছে, ছেলেমেয়েরা আছে, নাতি আছে, বন্ধু আছে, আত্মীয় আছে। গ্রামের সমাজটাই তো আসল। ওরা জানলে আর গ্রামে যাওয়া যাবে না।

"ওঠ।"

আবার টেনে ওকে তুলল সোমনাথ।

"কান পাকড়ো।" রামাবতার কান ধরল।

"দশবার ওঠ বস কর।" রামাবতার দশবার উঠল বসল।

'মায়ের পা ধর।' ও শর্মিলার পা ধরতে গেলে শর্মিলা ছিটকে সরে দাঁড়াল।

"লোকটাকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।" সোমনাথ ইংরাজিতে শর্মিলাকে বলল, যাতে ও না বোঝে। "টেপরেকর্ডারটা আনো।"

টেপরেকর্ডারে নতুন টেপ ভরে সোমনাথ সোফায় বসল। রামাবতার ততক্ষণে ভয়ে হনুমানের মতো—দুহাত জোড় করে পাশে মেঝেতে বসে।

টেপরেকর্ডার 'অন' করে এবার সোমনাথ একটার পর একটা প্রশ্ন করল— রেকর্ড করল রামাবতারের ফিসফিস কণ্ঠের স্বীকারোক্তি।

ততক্ষণে সোমনাথের মেজাজ ভালো হয়ে উঠেছে। ওর মনের ভিতরের কুৎসিত জানোয়ারটা আবার মনের গভীরে লুকিয়েছে। 'তুই' থেকে আবার 'আপ' এ ফিরে এসেছে।

"আপ কাঁহে এইসা কিয়া?"

"মাথা খারাপ হো গিয়া।" রামাবতারের জবাব।

ইন্টারভিউ শেষে টেপটা বাজিয়ে দেখল। ঠিক আছে। রামাবতার পরম বিস্ময়ে জীবনে এই যন্ত্র-মারফত নিজের কণ্ঠস্বর শুনল। ও কি ভাবল ও-ই জানে। কিন্তু স্বীকারোক্তি করে, নিজেকেপুরোপুরি সমর্পণ করে ও হয়তো নিশ্চিন্তই হল। কারণ সকালের ত্রস্ত অথচ বেপরোয়া ভাবটা আর ও থাকল না। তারপরও ঘণ্টাখানেক ফ্ল্যাটে থেকে বাসন মাজল ঘরদোর পরিষ্কার করল। কাচাকাচি করল—যেমন অন্যদিন করে। ও যেন ধরেই নিল এরপর আর অন্য কোনো দায়িত্ব ওর নেই। শর্মিলা-সোমনাথই সব দেখবে, এমনকি ওর দায়িত্বও নেবে। দাসত্বের জীবনে স্বস্তি কম নয়। মেরুদণ্ডও ভেঙেছে। রুখে দাঁড়াবার শক্তি ওর নেই।

বাকি দিনটা সোমনাথের ভালো কাটল না। নানারকম আত্মজিজ্ঞাসা মনকে ঘিরে। তারপর শর্মিলা কথা বন্ধ করে দিয়েছে। এই লোক নিয়েই কি তাহলে এতদিন ঘর করেছে শর্মিলা? ও নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না সকালের ঘটনা।

পরে যখন কথা হল তখনো শর্মিলার রাগ যায় নি।

"তুমি কি করে পারলে ওই গরিব লোকটাকে কান ধরে ওঠবোস করাতে?"

সোমনাথ মাথা নিচু করে থাকল। রামাবতার না হয়ে ও নিজে কান ধরে ওঠবোস করলে হয়তো নিজের কাছে এত অপরাধী মনে হত না। একটা দরিদ্র ভিন রাজ্যের দুর্বল মানুষকে জোর দেখিয়ে কোন পৃথিবী জয় করল? আসলে ও ভীরু। 'আমি কাওয়ার্ড', 'আমি কাওয়ার্ড', মনে মনে বারকয়েক বলল সোমনাথ। এর থেকে মিথ্যে দোষে সকলের কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়াও বোধ হয় শ্রেয়।

"শর্মিলা, আমায় ক্ষমা করো। আমার মাথার ঠিক ছিল না। তাছাড়া জানো, বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যখন বলল 'ছুয়া নেহি'। আমি আমাতে ছিলাম না। তুমি যাকে সকালে দেখেছ সে আর ফিরবে না। তোমার আমি আবার ফিরে এসেছি।"

শর্মিলা কাছে এসে দাঁড়াল। ওর বুক দিয়ে চেপে ধরল সোমনাথের সোফায় বসা মাথা। আলতো করে এক ঝাঁক চুলের মধ্যে চালিয়ে দিল সরু সরু আঙুলগুলো।

।। আট ।।

একটু পরেই রুমাদির ফোন এল।

"সরি। তোদের মেসেজ সকালে ফিরে পেলাম। তারপর সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম বলে যোগাযোগ করতে পারি নি। আমি এক্ষুনি আসছি।"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রুমাদি এল। ঘর ভরে গেল দামি প্যারিসিয়ান পারফিউমের গন্ধে। কোন সদ্যসমাপ্ত 'ডগশো'তে বিজয়ী 'পুডল'।

সমস্ত শুনে বেশ খানিকক্ষণ চুপ থাকল। তারপর বলল। "উপায় অবশ্য একটা আছে।"

"আছে? আছে?" শর্মিলা-সোমনাথের গলার উত্তেজনার ভারে ঘরের বাতাস কাঁপছে।

উপায় একটাই। ওই আশ্রমই ব্যবস্থা করবে এ্যাডপশনের। অসংখ্য নিঃসন্তান পরিবার অপেক্ষা করে রয়েছে এমনই বাচ্চার জন্য। তাছাড়া ছেলেটা দেখতে শুনতে ভালো। ছেলেটাকে দিয়ে দিতে খুব সমস্যা হবে না। তারপর সোনা ফিরে যাক দেশের গ্রামে, অন্য কাজ শিখুক, বিয়ে করে সংসার পাতুক। সবচেয়ে বড় কথা, একবার গ্রামে ফিরে গেলে যেন "থ্যাংক উ স্কোয়ার ওয়ান'—তারপর ওদের কোনো দায়-দায়িত্ব থাকবে না। বাকিটা সোনার হাতে, ভাগ্যের হাতে।

কিন্তু এখানেও সমস্যা আছে।

"গ্রামের সমাজ তো আমি জানি," টিউবের আলোয় নেইল-পালিশের লালচে নখ দিয়ে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। রুমাদি বলল, "ওদের তো পেটই চলে না। আজ যে ওর ভাই এত উৎকণ্ঠা ভালোবাসা দেখাচ্ছে, দুমাস-তিন মাস যাক, তারপর ও-ই বলবে, ঘরের ভাত আর কত খাবি? তারপর ও-ই বোনকে ঠেলে আবার অন্য কোথাও কাজ করতে পাঠাবে, বা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। এর থেকে আশ্রমে আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে বাচ্চাটাকে নিয়ে সুখে রয়েছে—ওটাই বোধহয় ভালো ওর পক্ষে।"

কিন্তু সত্য এলে এরা কি বলবে?

"তারপর আরো একটা বড় সমস্যা। আমরা ধরে নিচ্ছি সোনা ওর ছেলেকে ছেড়ে দিতে রাজি হবে। কিন্তু যদি না রাজি হয়? যদি ও বলে আমার ছেলে আমি দেব না? ও না চাইলে তো এ্যাডপশন হবে না। ওকে তো কাগজপত্রে টিপ সই দিতে হবে।"

সমস্যা। সমস্যা। সমস্যা। কিন্তু সমাধান তো চাই-ই। কয়েকদিনের মধ্যেই চাই। সত্য ফিরে আসবার আগেই চাই। "রুমাদি, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একটা কিছু করে দাও, না হলে আমরা যে বড় মুশকিলে পড়ব।"

"তোর ভয় করবার কিছু নেই। আমি দেখব।" রুমাদির আশ্বাসে ওরা স্বস্তি পেল। "তাছাড়া আমিও ব্যাপারটায় জড়িয়ে, মেয়েটাকে তো আমিই নিয়ে এলাম তমলুক থেকে। ওর ব্যাপারটা জানাজানি হলে লোকে আমাকেই-বা কি বলবে?

যাবার আগে চোখ টিপে বলল : "আমরা সবাই একই নৌকোয়। আমার হাল না ধরে উপায় কি বল?"

প্রথম দরকার হল সোনাকে বোঝানো। এবার রুমাদিও গেল শর্মিলার সঙ্গে।

রুমাদি আস্তে আস্তে করে বোঝাল : "এই আশ্রমের জীবনটা তো ভালো নয়। তোকে গ্রামে ফিরতে হবে। বিয়ে করতে হবে, তাই না।"

মেয়েটা চুপচাপ।

"তুই গ্রামে ফিরবি?"

তবু চুপ।

"ফিরতে চাস না।"

তবু কথা নেই।

"তবে কি এখানেই থাকবি?"

এখনও নিঃশব্দ।

এবার শর্মিলা ধরল।

"গ্রাম ভালো লাগে তোর?"

ও মাথা নাড়ল।

"গ্রামে যাবি?"

আবার মাথা নাড়ল।

"কিন্তু বাচ্চাটা নিয়ে গেলে তো গ্রামে ঢুকতে দেবে না।" ও নিশ্চুপ।

"বিয়ে করতে চাস?" ও চুপ।

"শোন। বাচ্চাটাকে আমরা আর একজনকে দিয়ে দিচ্ছি। তুই গ্রামে যাবি, হ্যাঁ, তারপর বিয়ে করবি। আর তারপর আর একটা বাচ্চা হবে। ঠিক আছে তো?"

সোনা মাথা নাড়ল।

এই সম্মতির মানে ও কতটুকু বুঝল ও-ই জানে। কিন্তু সম্মতি তো পাওয়া গেল—সেটাই বড় কথা আপাতত।

কাগজপত্র তৈরি হল। উকিল কোর্ট যা যা করবার সব করা হল। তারপর একদিন ছেলেটাকে ওর কাছ থেকে নিয়ে দিয়ে দেওয়া হল কোনো এক পরিবারকে। ওরা ভাগ্যবান—একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে পেল। ছেলেটা ভাগ্যবান, মাটির ঘরে ফুটো ছাদ থেকে নামা জলে ভিজে আধপেটা খেয়ে জীবন কাটাতে হবে না। আর মেয়েটা?

ছেলে হস্তান্তরের সময় রুমা বা শর্মিলা ছিল না। কিন্তু পরে মিসেস উইলিয়াম-এর কাছে শুনেছে, মেয়েটা কোনো আপত্তি করে নি। কান্নাকাটি করেনি। শুধু তাকিয়ে ছিল অপলক দৃষ্টিতে বাচ্চাটার দিকে। যতদূর দেখা যায়।

মেয়েটাকে গ্রামে নিয়ে গেল রুমাই। শর্মিলাব না যাওয়াই সাব্যস্ত হল। সোনার মায়ের জেরার মুখে কি বলে বসে নার্ভাস হয়ে। গাড়িতে যেতে যেতে রুমা অজস্র উপদেশ দিল : কিভাবে থাকবে কি করবে। বলে দিল মা বা অন্যদের সামনে বুক না খোলে, ওরা দেখলেই বুঝবে বাচ্চা দুধ খেয়েছে কিনা। আশ্বাস দিল, বিয়ে যদি নাও হয়, অন্য কোথাও কাজের ব্যবস্থা করে দেবে রুমা।

"আমি বাবা-মার কাছে থাকব।" এতগুলো কথা একসঙ্গে কখনো ওকে আগে বলতে শোনে নি রুমা। খানিকটা হকচকিয়ে গেল। বুঝতে অসুবিধা হল না কোন বাবা-মার কথা বলছে। কিন্তু ও তো জানে না শর্মিলা-সোমনাথের দরজা ওর সামনে চিরতরে বন্ধ।

আসবার আগে রুমা জিগ্যেস করেছিল শর্মিলাকে, "যখন বাচ্চাটা আর নেই তোমাদের রাখতে আপত্তি কি?"

"না রুমাদি।" স্পষ্টই বলল শর্মিলা। "অনেক ঝামেলা তো হল। ও থাকলেই নানা ভয় মনে আসবে। একবার যখন করেছে তখন আবার করতে পারে। তখন আর কাকে বোঝাব? কে বিশ্বাস করবে? তাছাড়া রামাবতার তো এখান থেকে যায় নি। না রুমাদি, জীবনের এই

অধ্যায়টা পুরোপুরি ভুলে যেতে চাই। অবশ্য মেয়েটার জন্য যে মন খারাপ একটু-আধটু হবে না এমন নয়।"

সস্নেহে সোনার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল রুমা : "ওরা যে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। সেখানে তুই যেতে পারবি না। ওরা যদি ফিরে আসে, ওরাই আবার তোকে ডেকে নেবে। তুই কিচ্ছু ভাবিস না।"

বাকি পথ মেয়েটা আর কিছু বলল না। ছোট্ট মেয়ের মতো জানলার বাইরে মাথা বের করে অপসৃয়মাণ ধানের খেত, টেলিফোন আর বিদ্যুতের পোস্ট, গরু আর কুঁড়েঘর চোখ বড় বড় করে দেখল।

সেদিন মহালয়া। ভোর না হতেই বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠের "মহিষাসুরমর্দিনী' সমস্ত শহর ছড়িয়ে বাজছে। কোথাও ঢাকের বাজনা। দুর্গাপুজোর প্যাণ্ডেল তৈরি হচ্ছে—বিশাল বিশাল ব্যাপার। পুজোর চেয়েও বড় কথা আলোকসজ্জা, প্যান্ডেল এবং পূজা পরবর্তী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সারাদিন ঘরে গোছগাছ চলল ওদের দুজনের। বেড়ানোর থেকে বেড়ানোর উদ্যোগেই যেন আনন্দ বেশি। গত কয়েক সপ্তাহের দুশ্চিন্তা শেষ অবধি মন থেকে নেমেছে। এই দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে বেড়ানো সম্ভব ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন এক দুঃস্বপ্নের মতো।

দূরপাল্লার ট্রেনের গতিবেগ বাড়ছে। প্ল্যাটফর্মের আলোগুলো দ্রুত পিছু হটছে। কিছু পরেই একরাশ অন্ধকার ঘিরে ধরবে ট্রেনের বাইরেটা। হকারদের চিৎকারের রেশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। শর্মিলা একটা বই খুলে বসল। কিন্তু মন বসাতে পারল না। সুজাতার ঘরের বড় পুতুলটাকে কোলে নিয়ে দুষ্টু হাসি মেয়েটার মুখ যেন বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়ানো। সোমনাথ পড়বার চেষ্টাও করল না। শুধু ভাবছে। গরুর কালো চোখের চাউনিতে যেন বিষাদ আরো গভীর আরো ব্যঞ্জনাময়। সেই চোখের মণিতে প্রতিফলিত হবে ওই ভয়ংকর জানোয়ারটার ছবি, যে আসলে কাপুরুষ, দুর্বলকে অপমান করতে যার বাধে না।

ও ততক্ষণে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছেছে। আর মেয়েটা? চারপাশে কত জোনাকি, আকাশভরতি তারা। ও কথা বলছে না। ও শুনছে; ও শুনছে জোনাকির ডানা নাড়াবার শব্দ, ঝিঁঝিঁ পোকার ব্যাঙের ডাক। আর তারার কাহিনী পার হয়ে অনেক দূরের আকাশও দেখছে। কি দেখছে ও-ই জানে। ও তো কোনোদিনও বলবে না। ও বড্ড চাপা।

যযাতি

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

হৈমবতী পাশের ঘর থেকে বললেন, 'আর ঘুর-ঘুর করো না ত। শুয়ে পড়ো। এগারোটা বাজল।'

রাত্তিরের খাওয়ার পরে সত্যসাধন একবার হৈমর ঘরে যাবেন। ডাইনিং টেবিলের গল্প আরও কিছুক্ষণ চলবে। অবধারিত এসে পড়বে ছেলে-মেয়ের কথা। গজ গজ করবেন, 'যে-যার দিন কিনে নিয়েছে, আর কি! বেইমান, বেইমান সব। বৌ আনলাম ছেলের, এক থালা ভাত বেড়ে দেওয়া দূরস্থান, এক কাপ চা করে খাওয়াল না একদিন।'

তখন আর গল্প করার মেজাজ থাকে না। হৈমবতীর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন সত্যসাধন। লাগোয়া বারান্দায় নিঃশব্দে একটু পায়চারি করেন। তখন দশটা বাজে। খাওয়ার আগে পরে দুবেলা ওষুধ আছে। দু-জনেরই। বয়স হলে খাওয়াব খরচ কমে, ওষুধের খরচ বাড়ে। কয়েক বছর যাবত কত রকম ওষুধ যে খেতে হচ্ছে! ইচ্ছে করে না সত্যসাধনের, হৈম তবু জোর করে খাওয়াবেন। অবিবেচকের মতো বাঁচিয়ে রাখতে চায় বোধ হয়। সন্দেহটা অমূলক নয়। ইদানীং হৈম প্রায়ই বলেন, 'যা সব ছেলেমেয়ে, বাব্বা! তুমি মাথাব ওপর আছ তাইতেই এই। না থাকলে যে কি করবে—'। কথা শেষ না করে ফের বলেন, 'ভগবানকে রোজ বলি, আমাকে এই করুণাটুকু অন্তত কর—আমাকে আগে নিও।'

সত্যসাধন একদিন মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'সেটা উভয়ত। স্ত্রীর সবচেয়ে বেশি দরকার যৌবন গেলে। ঠিক আছে। ভগবানবাবু তোমাকে যদি আগেই নেন, আমি না-হয় সহমরণে যাব। সাট করে একসঙ্গে জন্মান যায় না, মরা যায়।'

শেষ ওষুধটা রাত্তিরের খাওয়াদাওয়ার বেশ খানিকটা পরে খান সত্যসাধন। ডাক্তারের সেই রকমই পরামর্শ। শোয়ার ঠিক আগে আগে। খাটের পাশে ছোট একটা টেবিলে সব গোছান আছে। স্টেইনলেস স্টিলের জগে শেষবারের মতো জল রেখে যান হৈম। জগ ধরে আলগা করে গলায় জল ঢেলে জল খাবার অভ্যাস সত্যসাধনের। তাতে ঢক ঢক করে শব্দ হয়, এবং একটু জোরে। পাশের ঘর থেকে টের পান হৈম। এই দিনের শেষ ওষুধটি খেলেন। ওটা ভিটামিন বড়ি, অল্প সিডেটিভ দেওয়া। শুলেই ঘুমিয়ে পড়বেন।

ওষুধ খেয়েও বসে রইলেন সত্যসাধন। এতক্ষণ ঘরের আলো নিভে যাবার কথা। নিভছে না দেখে একবার এসে উঁকি দিলেন হৈম। ঘরের দরজার পাল্লা হাট করে খোলা। ঘরের জানলার কাছে বেতের চেয়ারটায় বসে আছেন উনি। চোখ রাস্তার দিকে।

. আবার একটা গাড়ির শব্দ। অহেতুক টানা হর্ন বাজাচ্ছে। সচকিত হলেন সত্যসাধন। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। এই দিকেই ঘুরল গাড়িটা। স্পিডে আসছে। ড্রাইভারের খুব তাড়া। খ্যাঁচ করে এসে দাঁড়াবে বাড়ির সামনে। চমক। নাঃ, দাঁড়াল না। এগিয়ে গেল অন্য বাড়ির দিকে। হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছে সমানে। ফাঁকা রাস্তা, তবুও। সত্যসাধন বিরক্ত হলেন।

ফের চেয়ারে বসলেন। ঘড়ি দেখলেন। ঝিলমিলে মনে হয় অনেক রাত। এই সবে এগারোটা। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সত্যসাধন ভাবলেন। এবার হৈম ঠিক চলে আসবে। ডাক্তারের বিধান বর্ণে বর্ণে মেনে না চললে রক্ষে নেই। কোনো অজুহাত শুনবে না। জোর করে ঢুকিয়ে দেবে মশারির মধ্যে। ধারগুলো গুঁজে দেবে ভাল করে। খাটের সঙ্গে ঝোলান বেড সুইচ পুট করে টিপে দেবে। অন্ধকার ঘর থেকে সন্তর্পণে বেরুবে। বাইরে থেকে আলতো করে দরজার পাল্লা টেনে দিয়ে যাবে। হৈমর ঘরেও এই এক নিয়ম। পাশাপাশি ঘর স্বামী স্ত্রীর। ও ঘরেও দরজা রাতে ভেজান থাকবে। ওরা নিজেরাই পরামর্শ করে এটা ঠিক করেছেন। ভিতর থেকে খিল বা ছিটকিনি দেবেন না। সত্যসাধনের একাত্তর প্লাস, হৈমবতীর চৌষট্টি। দু-জনেরই ইস্কিমিক হার্ট। কখন কাকে কার ঘরে যেতে হয় কে বলতে পারে। ঘুমের মধ্যে এক-একদিন বিশ্রী শব্দ করেন হৈম। বোবায় ধরার মতোন। ঠিক ঘুম ভেঙে যাবে সত্যসাধনের। উঠে পাশের ঘরে গিয়ে কতবার জাগিয়েছেন হৈমকে। ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী গো, শরীর খারাপ লাগছে?'

লাগলেই বা কী। বাড়িতে আর কেউ আছে যে বেরিয়ে ডাক্তার ডাকতে যাবে এই রাত্তিরে! লোকে যে কেন ছেলে-ছেলে করে। তার চেয়ে জন্ম জন্ম বাঁজা থাকা ভাল। এগুলো হৈমর অনুচ্চারিত খেদ। মুখে বলেছেন, 'তুমি আবার উঠে এলে কেন? আমার তো এ-রকম হয় জানই।'

পি আর দাশ হাউস ফিজিশিয়ন। বাড়ির ছেলের মতোই। চেক আপ করতে এসে গল্পটল্প করে। দু-জনকেই দেখে, একটা ফি নেয়। একদিন বলল, 'আলাদা ঘরে থাকলে এখন থেকে দুটো ভিজিট দিতে হবে কিন্তু। আলাদা বেডরুম তুলে দিন। এই এজে এ-রকম সেপারেশন ভাল না। একঘরে থাকুন। সেটাই সেফ।'

'এখন তাহলে আবার নতুন করে অব্যেস করতে হয়।' হৈম বলেছিলেন। 'তুমি ডাক্তার,কিন্তু আমার শাশুড়ি ত এ-সব বুঝতেন না। তখন আর বয়স কত! প্রায়ই বলতেন, রাগ হোক, ঝাল হোক, স্বামী-স্ত্রীর খাটবিছানা আলাদা করো না বৌমা, এই আমি বলে রাখলাম।' তিনি থাকতেই এ-সব করেছেন হৈম। অন্য অজুহাত দেখিয়ে। ছেলেমেয়েদের একজনও ঠাকুরদা ঠাকুরমার সঙ্গে শুতে রাজি হয়নি।

সত্যসাধন ব্লাড প্রেসার মাপাবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ওসব কিছু না। বুঝলে ডাক্তার, সব কপাল। এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছি, ঘুমের বড়ি খেয়েছি, ঘুমিয়েও পড়েছি। একজন ঘুমের মধ্যে মরে রইলাম, পাশের জন টেরই পেল না। এ-রকম হয় না?'

কথাটা ভাল লাগেনি হৈমর। যত সব অলক্ষুণে কথা। বলেছিলেন, 'সে তো দু-জনেই মরে থাকতে পারে।'

'খুব একটা নর্মাল কোইনসিডেন্স নয়।' সত্যসাধন ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'খুব রেয়ার, কী বল!' পরক্ষণেই হৈমর দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'তবে হতে পারে। সাট থাকলে সহমরণ আজকাল এমন কিছু না।'

ইলেকট্রনিক ঘড়িতে মিনিটের ঘর আরও দশ মিনিট সরে গেল। হৈম পাশের ঘর থেকে অসহিষ্ণু গলায় মৃদু ধমকের সুরে বলল, 'কী গো, আর কতক্ষণ পথ চেয়ে বসে থাকবে!'

পাল্টা একই প্রশ্ন করতে পারেন সত্যসাধন। এতক্ষণে হৈমর ঘুমিয়ে পড়ার কথা। ভোর-ভোর উঠতে হয়। সপ্তমীকে দরজা খুলে দিতে হয়। আজ যেজন্যে সত্যসাধন জেগে বসে আছেন, সেই একই কারণে হৈমও ঘুমুতে পারছেন না। মুখে স্বীকার করবেন না, কিন্তু দু-জনেই লুকিয়ে পথ চেয়ে আছেন, উৎকর্ণ হয়ে আছেন। শব্দ হলেই সচকিত হচ্ছেন ঐ

বুঝি ওরা এল। রক্তমাংসের একটা পুঁটুলি সেই যে হৈমর কাছে জিম্মা করে দিয়েছিল, সেই এখন চার বছরের ছেলে। সুমি বলেছিল, 'সুন্দর একটা নাম দাও তো মা ওর।' নবজাতকের দিকে সস্নেহে একবার চেয়ে অস্ফুটে বলেছিলেন, 'সুন্দর। ওর নাম রাখ সুন্দর। আমার সুনু, আমার সোনা।'

সুমি বলেছিল, 'দারুন মাম। সুন্দর। ফ্যানটাসটিক।'

সুনুকে বলতে গেলে মানুষই করলেন হৈম। সত্যসাধন এসব ধকল সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু এখনও দুষ্টুবুদ্ধি আছে ষোল আনা। কানে মন্তর দিয়ে হৈমকে বুড়ি ডাকতে শিখিয়েছেন। সুনু দিদিমা ডাকে না, বুড়ি ডাকে। আবার আদর করে বুড়িমাও ডাকে কখনও কখনও। মায়ের জন্যে কান্নাকাটি নেই ছেলের, বুড়ি পাশে থাকলেই হল।

সুমি আর পাপু, দুটোর একটারও যদি একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকে! দুধের শিশুটাকে ছেড়ে এতক্ষণ বাইরে থাকে কী করে ওরা! একালের ছেলেমেয়েদের কি স্নেহ ভালাবাসাও দিনদিন কমে যাচ্ছে! মনে মনে সওয়াল—জবাব করেন সত্যসাধন। তাই বা বলেন কী করে! পাপু সুমিটার মতো অতটা আপন-আপন হতে পারেনি, বাবা-বাবা মা-মা করে হাসিগল্পে বাড়িটা ভরে রাখতে পারে না, সবই ঠিক। কিন্তু কর্তব্যে অবহেলা নেই একটুও। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ঠিক এসে দাঁড়াবে সত্যসাধনের কাছে, 'আপনার ওষুধপত্র কিছু আনতে হবে? ব্যাঙ্কট্যাঙ্কে কিছু কাজ থাকলে আমাকে দিতে পারেন।'

যেদিন-যেদিন সুমির থিয়েটার থাকে, বেস্পতি শনি রবি, সুমিকে নিয়ে আসতে যায় পাপু। আগে ছিল হাতিবাগানের স্টেজে; এখন কালীঘাটে, নতুন কী একটা থিয়েটার হয়েছে সেইখানে। দমদম থেকে কালীঘাট, কম দূর! নতুন নাটক খুলেছে। বড়সড় পার্ট পেয়েছে সুমি। ও বলে, 'সেকেণ্ড লিড।' নায়িকাব পরেই। অনেকবার বলেছে, 'চলো না বাবা একদিন, মাকে নিয়ে। আমি পাশ নিয়ে রাখব, দেখে আসবে।'

একালের থিয়েটার ভাল লাগে না সত্যসাধনের। উনি শিশির ভাদুড়ি—প্রভা দেবীর ভক্ত। আর দেখেছেন মহেন্দ্র গুপ্তের অভিনয়, স্টারে। ভাবি ভাল লাগত মহেন্দ্রবাবুর গলা। সেরকম আর হয় না আজকাল।

তারপর একসময় নাটক নিয়ে অশ্লীল চালাকি করতে গিয়ে প্রযোজক এ্যারেস্ট হল। থিয়েটার উঠে গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তখন বেকার। ওদের ফুটফুটে ছেলেটা ততদিনে আঁকড়ে ধরেছে হৈমকে। বুকের দুধ শুকিয়ে যাচ্ছে সুমির। পেটে ভাত পড়ে না বুকে দুধ আসবে কোত্থেকে? সত্যসাধন দামি বেবিফুড কিনে আনেন। প্রথম যেদিন না-বলতেই কৌটোর দুধ নিয়ে এলেন, হৈম বলেছিলেন, 'কে বলে তোমার সাংসারিক বুদ্ধি নেই! এটা তো ঠিক খেয়াল আছে।'

'ছেলের ছেলে কাছে থাকলেও ত করতাম।'

'তার কি কোনো অভাব আছে যে তুমি করবে!'

বিষণ্ন দেখাল সত্যসাধনকে। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আছে বৈ কী! ঠাকুর্দা-ঠাকুমার স্নেহস্পর্শ না পাওয়াটাও একটা অভাব।'

উঠে যে দরজা খুলে দেবে রাতবিরেতে এমন একটা লোক নেই বাড়িতে। সেইজন্যেই বাড়ির একতলা দোতলা একেবারে আলাদা করে দিয়েছেন সত্যসাধন। এ্যাডিশন অল্টারেশন করতে মোটা টাকা খরচ হয়েছে, তবুও। টাকার চিন্তা নেই সত্যসাধনের। ফরেন ব্যাঙ্ক মারফৎ এক বছর আগে পর্যন্ত শেখর ডলার পাঠাত। তা থেকে এক কপর্দকও তোলেননি সত্যসাধন। প্রয়োজন হয়নি। তবু হঠাৎ পাঠান বন্ধ করে দিল দেখে দুঃখও পেয়েছেন। আমার লাগবে কী

লাগবে-না সেটা তোর দেখার কথা না। তুই পাঠাবি। বাবা-মাকে দেখা তোর কর্তব্য না? এমনি একটা নিরুচ্চার অভিযোগ কোনোদিন যদি কথায় কথায় মুখে এসে গেছে, অমনি হৈম বলেছেন, 'সব ঐ বৌটার বুদ্ধি। টাকা জমাচ্ছে। গায়ের রঙটাই কটা, ভেতরটা কালিমাখা। অমন ছেলেটাকে আমার পর করে দিল। নাতনির মুখ দেখলাম ছবিতে। পোড়া কপাল আমার।' তবু সত্যসাধন একটা নাম পাঠিয়েছিলেন, মহাশ্বেতা, ওরা সে নাম রাখেনি।

সুমি-পাপু না থাকলে এ শূন্যতা আরো দুঃসহ হত। ক্রমশ আরো জড়িয়ে পড়ছেন সত্যসাধন-হৈমবতী। কোনোদিন এত দেরি হয় না ওদের। নাটকের লাস্ট সিন পর্যন্ত পার্ট সুমির। শেষ হতে বড় জোর সোয়া নটা কী সাড়ে নটা। ট্যাকসিতেই ফেরে। নতুন থিয়েটারে ওর স্টার পজিশন, সুমিই বলে। ছোট পর্দায় কাজ পাচ্ছে। ফিল্মেও পাবে। তাইতেই ট্যাক্সি ভাড়া থিয়েটারই দেয়। পাপুর কারখানা বেসব্রিজে। আবার খুলেছে। কারখানা ছুটি ছ-টায়। থিয়েটার যখন আধাআধি হয়ে গেছে তখন পাপু গিয়ে পৌঁছোয়। একসঙ্গে ট্যাক্সিতে ফেরে। এখন আবার সুদিন এসেছ ত। হয়তো বাইরে খেয়ে টেয়ে ফিরছে। এমনও হতে পারে, থিয়েটার কোম্পানির গাড়ি পৌঁছে দিতে আসছে. যেমন মাঝে মাঝে দেয়, বাবু-বিবি কলকাতার রাস্তায় পাক খাচ্ছেন। সাত পাঁচ ভেবে বিরক্ত হচ্ছেন সত্যসাধন। ওষুধের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ঘুম পাচ্ছে। তোমরা যখন ইচ্ছে বেরোও, যখন ইচ্ছে এস। ইচ্ছে না হয় এস না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে রাতের কলকাতা দেখ। এ-বয়সে আর কারো জন্যে ভাবতে পারব না। অনেক ভেবেছি। আমাদের জন্যে কে ভাবছে! আমাদের কাজ বুঝি শুধু নিরন্তর অপেক্ষা করা। কে কখন আসবে তোমরা, তার জন্যে দুয়ার খুলে বসে থাকা!

একটা কৌশল করলেন সত্যসাধন।

উঠে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন সশব্দে। ইচ্ছে করেই শব্দটা করলেন যাতে হৈমর কানে যায়। তারপর বিশ্বাসযোগ্য বিরতি। ঘরের লাইট নেভালেন। হৈম এবার নিশ্চিন্ত। উনি শুয়েছেন। অচিরেই ঘুমিয়ে পড়বেন এবার।

সত্যসাধন ফের গিয়ে চেয়ারে বসলেন। আগে এমন কত বসে থেকেছেন। ছেলের জন্যে, মেয়ের জন্যে। সেসব কি ওরা ভাবে?

।। দুই ।।

ফ্ল্যাট বাড়ির মতো। দোতলার সিঁড়ি আলাদা। একতলার দম্পতি টেরও পেলেন না পাপু কখন দুধ আনতে গেছে। রোজই যায়। ততক্ষণে কাজের মেয়ে সপ্তমী কাজে এসে গেছে। এসেই বন্ধ দরজার তালা টালা খুলেছে। একতলা থেকে দোতলায় যাবার সিঁড়ির কোলাপসিবল গেটও। কথা ছিল এটা বন্ধই থাকবে। উপরের সঙ্গে নিচের কোনো যোগাযোগ থাকবে না। ছিলও না অনেকদিন। সুমির পেটে বাচ্চা এল, হৈম আর থাকতে পারলেন না। বাতের ব্যথা নিয়ে শুরু হল উপর-নিচ। তখন ওদের যা অবস্থা! এই সময় ভালমন্দ খেতে হয়। খাবে যে পয়সা কোথায়! গাইনি দেখাবারই সংস্থান নেই। হৈম রন্ধন রসিক। কিছুতেই রাঁধুনি রাখতে দেবেন না। বলেন, 'বাড়ির কর্তা কি রকম রান্না পছন্দ করেন তা সে জানবে কি করে! রান্না একটা ডিউটি নাকি যে হুড়ুমদুড়ুম করে করে দিলাম! ভালবাসা হচ্ছে এর লবণ। মায়ের হাতের রান্না যে সব সন্তানের ভাললাগে সে এইজন্যে। জিরে পাঁচফোড়ন, এসব কিছু না, ঐ হাতের গন্ধটাই আসল মশলা।'' হৈমর রান্নার তরিজুত খুব। সুমির জন্যে সেটা বাড়ল। সপ্তমী আছে, তবু নতুন নতুন রান্না করে বাটিতে করে নিজে নিয়ে যাবেন দিতে। খাবার সময় গিয়ে বসবেন। অরুচি হলে লেবু নিতে নামবেন। বা একটু পুরনো

তেঁতুলের আচার। রাত্তিরে অবধারিত পায়ে ব্যথা। সত্যসাধন এর একটা সমাধান করলেন, 'বলে দাও, সুমি এসে আমাদের এখানে খেয়ে যাবে।'

'আর জামাইটা? ওর শুধু আলুভাতে ভাত? স্বামীকে ফেলে কোন মেয়ে এরকম করে খেতে পারে?'

পাপুর সম্পর্কে সত্যসাধনের একটা ক্ষোভ আছে। কোনদিন বাবা মা বলে ডাকল না। বললেন, 'ওনার যদি প্রেস্টিজ না যায় উনিও খেতে পারেন। ইন এনি কেস, তুমি ওপরে যাবে না।'

সেই থেকে রান্নাঘর এক হয়ে গেল। কিছুদিনের জন্যে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থার মতো।

দুধ নিয়ে ফিরল পাপু। বাড়ির কাছাকাছি এসে গেটের সামনে থমকে দাঁড়াল। নিচের তলায় কিছু একটা হয়েছে। এ-বাড়ির, নিষ্কোলাহল এ-বাড়ির পক্ষে অস্বাভাবিক মনে হল পাপুর। হৈমবতী, সুমির মা, নিচু গলায় কথা বলেন। সত্যসাধন রাশভারি মানুষ, গমগমে গলা, কদাচিৎ আসল গলা বেরিয়ে পড়ে। হার্টের অসুখ বলে অতি সতর্কতায় নিচু স্বরে কথা বলেন। কমও। সেই হৈম আর সত্যসাধনকে এত জোরে আগে কোনোদিন কথা বলতে শোনেনি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই পাপু টের পেল শাসনের মুখে পড়েছে সুমি। কাল রাত্তিরের ব্যাপারটা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছেন না ওঁরা। উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় দু-জনেই ভাল করে ঘুমুতে পারেননি।

গুটি গুটি কিচেনের কাছে এল পাপু। বাড়ির পিছন দিক দিয়ে। সদরে ডোরবেল বাজাতে সাহস হয়নি। দুধ আসে ওদের ছেলের জন্যে, ওঁরা ডাকেন কখনও সুনু, কখনও সোনা। সে আর কতটা খায়। তবু রোজ দু-লিটার। যাতে বুড়োবুড়িও খেতে পারেন। ওরা সকাল সন্ধ্যা খাওয়াচ্ছেন, টাকা নেবেন না। একবার দিতে গেছিল পাপু, 'সংসারে সবাইকে কিছু কিছু কনট্রিবিউট করতে হয়। অন্তত শ-পাঁচেক টাকা—।' সত্যসাধন বলেছিলেন, 'থাক। অব্যেস খারাপ হয়ে যাবে আমার। তোমাদের ঐ তো চাকরি, এই আছে, এই নেই। তখন দিতে পারবে না, আমার মনে হবে পাওনা টাকা পাচ্ছি না। তার চেয়ে এই বেশ।' কথাটা রূঢ় হয়ে গেল মনে করে একটু থেমে বলেছিলেন, 'এই যে তুমি অফার করতে পারলে খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। কনট্রিবিউট করতে চাও করো, সংসারে কত কিছু লাগে, যখন যেটা পারবে আনবে। ডোণ্ট বিহেভ লাইক এ্যান আউটসাইডার।'

সেই থেকেই মাঝে মধ্যে বাজার করা, সত্যসাধনের ওষুধ আনা, মাদার ডেয়ারি থেকে রোজ নিয়ম করে দু-লিটার দুধ আনা। একবার পুজোয় হৈমকে দামি শাড়ি, সত্যসাধনকে গরদের পাঞ্জাবি আর তাঁতের মিহি ধুতি দিয়েছে সুমি। সত্যসাধন সস্নেহে বলেছিলেন, 'পাগলি! এসব পরে আমি কি করব? আমি কি বেরুই?''

'পরে বাড়িতে বসে থাকবে।'

'লোকেই যদি না দেখল—'

কথা শেষ করতে দেয়নি সুমি। বলেছিল, 'একদম তর্ক করবে না বাপি। আমরা লোক না? পুজোর কটা দিন তুমি সেজেগুজে বসে থাকবে, আমরা দেখব, মা দেখবে।'

বলেই খিল খিল করে হেসেছিল।

দুধের ক্যানটা নামিয়ে রাখল পাপু নিঃশব্দে। সত্যসাধন বললেন, 'এই যে। তোমরা এবার দয়া করে অন্য বাড়ি দ্যাখো। আমরা অসুস্থ লোক। ছেলে বৌ মেয়ে জামাই কারো জন্যে আমাদের কোনো সিমপ্যাথি নেই। আমাদের দয়া নেই, মায়া নেই। উই আর হার্টলেস পেরেন্টস।'

মাঝে একবার একতলা-দোতলার ভিতর বাড়ির সিঁড়ি খোলা হয়েছিল, সুনু যখন মায়ের পেটে। হৈমর উপর-নিচ করা বন্ধ করতে সত্যসাধন আবার সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। সেই থেকে আবার ওদের যাতায়াত বাইরের নতুন সিঁড়ি দিয়ে। মাকে হাতে হাতে এগিয়ে পিছিয়ে দিতে রোজই সকালে একবার কিচেনে আসত সুমি। সুনু তখন কোলের শিশু। রেখে আসত পাপুর কাছে। হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে উঠত। হৈম বলতেন, 'দুগ্ধপোষ্য শিশু। ও কখনও রাখতে পারে। যা যা নিয়ে আয়। গলা শুকিয়ে গেছে। এনে মাই দে।'

এনে বুকের দুধ খাইয়ে যেই শান্ত করত অমনি হৈম বলতেন, 'দে দে, আমার কোলে দে।' সন্তর্পণে তুলে নিতেন সুনুকে। বাড়িময় ঘুরে বেড়াতেন। সত্যসাধনের কাছে গিয়ে বলতেন, 'সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এস। নাতি ধরতে হবে।'

সত্যসাধন একদিন বললেন, 'বেশ তো বিদ্যাসুন্দর পালা চলছে। এর মধ্যে আবার আমাকে কেন।'

কিচেন থেকে সুমি হেঁকে বলল, 'বাপি, তুমি চা খাবে-ত?'

'খাবে না আবার।' হৈম বললেন, 'ঘড়ি ঘড়ি চা করে খাওয়াস বলেই-ত তোর ওপর এত টান। পাপুর জন্যেও এক কাপ জল নিস।'

চা দিতে এসে সুমি দেখল ওর ছেলেটাকে নিয়ে বুড়োবুড়ি যেন খেলা করছেন। রান্নার দিকে যাবার ইচ্ছেই নেই হৈমর। বললেন, 'আজ তুই রাঁধ। দেখি তোর হাতের রান্না কেমন।'

সেইদিন থেকে রান্নাঘর এসে গেল সুমির হাতে। ভারি খুশি হয়েছিলেন হৈম। সব শেষে খেতে ডেকেছিল সুমি, 'মা এস, ভাত দিয়েছি।'

পরিপাটি করে সাজিয়ে খেতে দিয়েছিল সুমি। চোখে জল এসে গেল হৈমর। বললেন, 'কতকাল পরে অন্য কেউ বেড়ে ভাতের থালা এগিয়ে দিল আমি খাচ্ছি।'

নিয়ম মতো আজও রান্নাঘরে এসেছিল সুমি। একটা অপরাধবোধে কেমন অপ্রতিভ। ওরা কখন ফিরেছে টের পাননি হৈম। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সুনু ঘুমের মধ্যে একবার কেঁদে উঠেছিল। উঠতে হয়েছিল হৈমর। তখন ঘর থেকে বেরিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন দোতলায় আলো জ্বলছে কি-না। নাঃ, অন্ধকার। ভেবেছিলেন হয়তো আগেই এসেছে, বাইরের দিককার আলাদা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছে। চুপচাপ শুয়ে পড়েছে। খেল কী খেল-না কে জানে।

এসেই সুমি দেখল হৈম কিচেনে। পিছনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অপ্রস্তুত হয়ে। তারপর ইতস্তত করে কৈফিয়তের মতো করে বলল, 'কাল যা একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হল!'

'থাক, তুমি তোমার ছেলে নিয়ে যাও, আমাকে রেহাই দাও।' হৈমর গলায় অভিমান। 'সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। চিরকাল হাত পুড়িয়ে খেলাম, তুমি রেঁধেবেড়ে ভাতের থালা সামনে ধরবে, এমন কপাল করে কি আমি এসেছি!'

সুমির চোখে জল এসে গেল। বলল. 'আমরা কি ইচ্ছে করে দেরি করেছি! তুমি তো। আমার কোনো কথাই শুনবে না।'

সত্যসাধনও বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। বললেন, 'শোনাশুনির কিছু নেই। অহেতুক কেন আমরা টেনশন ভোগ করব তোমাদের জন্যে? হোয়াই? তোমরা তোমাদের মতো থাক, আমাদের আমাদের মতো থাকতে দাও।'

ঠিক এই সময়ই পাপু দুধ নিয়ে এল। ওকে সত্যসাধন অন্য বাড়ি দেখার কথা বলতেই চোখের জল বাধা মানল না সুমির। বলল, 'তোমরা তাহলে আমাদের আলাদা করে দিচ্ছ বাপি।' বলেই ছোঁ মেরে হৈমর ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেল সুনুকে। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। পাপুও চলে গেল পিছন পিছন।

খবরের কাগজ এসেছে অনেকক্ষণ। ভাঁজ করাই পড়ে আছে। মন খারাপ হয়ে গেছে সত্যসাধনের। রাগের মাথায় নিরীহ ছেলেটাকে কড়া কড়া কথা বললেন, এখন অনুতাপ হচ্ছে। কী হয়েছিল, কেন আসতে দেরি হল, কিছুই বলবার সুযোগ দিলেন না ওদের। বয়স হলে মানুষ বড় অধৈর্য হয়। মুখে লাগাম থাকে না।

পেপারটা তুলে নিয়ে চোখ বুলোতে শুরু করলেন সত্যসাধন। একটু যদি অন্যমনস্ক হওয়া যায়। এই বয়সটা বড় মারাত্মক। একা থাকাও যায় না, আবার অল্পবয়সীদের সঙ্গে মানিয়ে চলাও শক্ত। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা দেখছেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেল একদিন বেশি রাতে বুকে ব্যথা অনুভব করেছিলেন সত্যসাধন, পাপুই দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে এনেছিল। অসময়। কেউ টেলিফোন ধরত না। দমদম জংশনের কাছে একটা দোকান খুলিয়ে গ্যাস সিলিণ্ডার বয়ে এনেছিল নিজে। শেখর কোনোদিন এতটা করেনি বাবার জন্যে। ডলার পাঠাচ্ছে, ডলার। ইলেকট্রনিকস এনঞ্জিনিয়র। কলকাতায় ভাল চাকরি পেয়েছিল। বাড়ির ভাত খেয়ে চাকরি করছিল। বৌমার ফুসলানিতে চাকরি জোটাল আমেরিকায়। হান্টিংটন পার্ক, ক্যালিফোর্নিয়া। কাকপক্ষীতে টের পেল না, ফরেনে চাকরি ঠিক হয়ে গেল। এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়াও। ল্যান্ডলেডির নাম মিসেস মিলার। বাবামার বুদ্ধি-পরামর্শ নেবারও প্রয়োজন বোধ করেনি। দিনক্ষণ স্থির করে একদিন বলল, 'একটা অ্যানএক্সপেক্টেড এ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে গেলাম। যাচ্ছি।'

তারপর থেকে হৈম বলতেন, 'এক 'ব্যঞ্জন' নুনে পোড়া। আগেকার কালে পাঁচটা সাতটা ছেলে হত, সে অনেক ভাল ছিল। একটা দুটো তার নীরেস হত, বাড়িতে থাকত, বাপমাকে দেখত।'

এ-সব পুরনো কথা ভেবে লাভ নেই। খালি দূরবর্তী কুশীলবদের সঙ্গে কাল্পনিক যুদ্ধ চালান, আর বার বার হেরে যাওয়া। কাগজে মনঃসংযোগ করলেন সত্যসাধন। পৃষ্ঠার বাঁ দিকে মোটা হরফের কলমটা পড়তে পড়তে শেষের দিকে এসে চেঁচিয়ে ডাকলেন হৈমকে, "এই, শুনছ? একবার এ-ঘরে এস ত। তাড়াতাড়ি।'

হৈম চশমা আনেননি। নিজেরটা খুলে দিলেন সত্যসাধন। বললেন, 'এইখানটা পড়। পাপুর ভাল নাম জ্যোতিষ্মান না?'

জেনারেটরের গোলমালে থিয়েটারের শো শেষ হতে আধ ঘণ্টার ওপর দেরি হয়ে গেল। সুমি আর পাপু যখন কালীঘাটের রাস্তায় বেরুল তখন ব্যাপক লোডশেডিং। কোনো ট্যাক্সি ঝিলমিল আসবে না। দমদম অঞ্চলকে তাদের ভয় খুব। তাছাড়া গেলে এত রাতে ফেরার সওয়ারি পাবে না। অন্ধকার রাস্তা কাঁহাতক এমন দাঁড়িয়ে থাকা যায়। শেষ পর্যন্ত দু-পিঠের ভাড়া কবুল করে এক সর্দারজিকে রাজি করাতে পারল। পাপু বলল, 'রাসবিহারী ধরে বাইপাসে পড়ুন। উল্টোডাঙা হয়ে বেরিয়ে যাব।'

গল্পের মতো করে লিখেছে রিপোর্টার। নিউজ স্টোরি কথাটা চালু হয়েছে আজকাল। রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়ে যাচ্ছেন হৈম।

বাইপাস দিয়ে তীব্র বেগে ছুটছে ট্যাক্সি। পিছনের সিটে সুমি আর পাপু। কাগজওয়ালারা লিখেছে সুমিতা দেবী আর জ্যোতিষ্মানবাবু। উদ্বিগ্ন, ক্লান্ত, অবসন্ন। পুলিশের হাইওয়ে প্যাট্রলের গাড়ি তাড়া করে এল। থামাল ওদের। মুখের পেইন্টও তোলার ফুরসৎ হয়নি সুমির। অবসাদে মাথা এলিয়ে দিয়েছে পাপুর কাঁধে। গাড়ির মধ্যে উঁকি মেরে একজন পুলিশ বলল, 'হুঁ, এইসব হচ্ছে! থানায় যেতে হবে আপনাদের। অনেক কথা-কাটাকাটি হয়েছে। অশ্লীল মন্তব্য পুলিশের, 'মুখে রঙ মেখে বাড়ির বৌ। ঘোরাও গাড়ি।' মুখ তড়পাচ্ছে, থানায় যায় না। খালি বাহানা।

টাকা চায়, হাজার টাকা। সুমি রুখে দাঁড়িয়েছিল। 'থানায় নিয়ে যাচ্ছেন না কেন। চলুন।' দু-আড়াই ঘণ্টা অনেক হেনস্থা হয়েছে। ভাগ্যে একটা নজরদারি গাড়ি এসে পড়েছিল! উঁচু পদের একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন তাতে। সেই গাড়ি দেখেই নীতিরক্ষকরা হাওয়া।

ইস, কি ভোগান্তি রাত দুপুরে। হৈমকে বলতে গেছিল, শুনতে চাননি উনি। কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে অসহায় চোখে সত্যসাধনের দিকে তাকালেন।

সত্যসাধন খুব শান্তভাবে উঠলেন। বারান্দায় বাড়ির মধ্যেকার সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালেন। দোতলার উদ্দেশে কিছু বলবেন। ওরা হয়তো জানে না কাগজে খবরটা বেরিয়েছে। একবার ভাবলেন ডেকে দেখাবেন। তারপর কী ভেবে গলা চড়িয়ে বললেন, 'ও সুমি—সুমি, চা দিবি না আমাকে।'

।। তিন ।।

'ও মা, দাদা!' খুশি চলকে উঠল সুমির চোখে। 'এই, দেখবে এস, কে এসেছে।'

পাপু দোতলার জানলায় এসে দাঁড়াল।

'বৌদি আসেনি দাদা?'

পিছনে গাড়ির দিকে ইসারা করে শেখর বলল, 'ঐ ত।'

ডলি সবে গাড়ি থেকে নেমেছে। নেমেই আবার পিছন ফিরে গাড়ির ভেতর থেকে কি সব বার করছে। খাটো ব্লাউজ আর শাড়ির কটিপ্রান্তের মধ্যবর্তী অনাবৃত অংশটা সামনের মতো। সুমি একনজরে বুঝল বৌদির শাড়ি পরার তেমন অভ্যাস নেই। নিচু হতে গিয়ে বুকের আঁচল সামলাতে পারছে না।

সুমির পাশ কাটিয়ে শেখর বাড়িতে ঢুকে গেল। ডলি একটা সুটকেস, একটা ব্যাগ আর টুকিটাকি কিছু জিনিস বার করতে ঘেমে নেয়ে উঠল। শ্রমের অভ্যাস নেই। নিজের মনেই বলল, 'কী বিশ্রী গরম! হেল অফ এ সামার!' বলেই সুমিকে ডাকল। 'তোমার নাম সুমি না? এগুলো ধরো, ভেতরে নিয়ে যাও।'

বলার ভঙ্গিটা ভাল লাগল না সুমির। খুঁটিয়ে দেখল বৌদির সবাঙ্গ। মেকআপের অনেক কারিকুরি জানা আছে সুমির। ডলি নিয়মিত ফেসিয়াল করে, ত্বকের রুক্ষতা ঢাকে প্রসাধনে, কিন্তু দৃষ্টির খরতা ঢাকা যায় না। দেমাকি ভাবটা বানিয়ে তোলা। প্রথম দর্শনেই অপ্রসন্ন হল সুমি।

ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে ডলি খট খট শব্দ তুলে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে এসে রাখল সুমি।

বাবার ঘরে বসেছে শেখর। পিছন দরজা দিয়ে এসেছে পাপু। শেখর টুকটাক কথা বলছে পাপুর সঙ্গে। শেষ কথাটা কানে গেছে ডলির। ভুরু কুঁচকে বলল, "এই জন্যেই বলেছিলাম টেলিফোনে একটা খবর দিয়ে রাখতে। বাবা-মা-কে সাপ্রাইজ দেব! নাউ, উই আর সাপ্রাইজড। আমি তোমাকে বলিনি শেখর? ইওর পেরেন্টস আর মোস্ট আনপ্রেডিকটেবল!'

ডলির এসব কথা ভাল লাগে না শেখরের। আ ন্যাগিং উওম্যান। প্রতিবাদ করতে গেলে সিনক্রিয়েট করবে। তাই সহ্য করে নিতে হয়। দু-বার বাবা মাকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চেয়েছে শেখর। এয়ার টিকেট পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছে! ওঁরা যাননি। শেখর জানে সেটা ডলির জন্যেই। সত্যসাধন অবশ্য অন্য অজুহাত দেখিয়েছেন। লিখেছিলেন, 'এখানে ঝিলমিলে যখন বাড়ি করি, তখন আমার বাবা ছিলেন, মা ছিলেন। একে একে দু-জনেই গেলেন এই বাড়ি থেকেই। তাঁদের পবিত্র শেষ নিঃশ্বাস লেগে আছে এ-বাড়ির গায়ে। এ-বাড়িতে তোমার

বিয়ে হয়েছে, বৌমাকে বরণ করে তুলেছেন তোমার মা। তোমার বোনের বিয়ে হয়েছে। সে আনন্দের উষ্ণতা আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি এই বাড়িতে। এখান থেকেই শেষবারের মতো বেরিয়ে যেতে চাই। তোমার এ্যাপার্টমেন্টে আমাদের কষ্ট হবে না, সে আমি জানি। ওদেশে আরামের বিপুল আয়োজন। সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজির অগ্রগতি দারুণ। কিন্তু মৃত্যু কি ঠেকাতে পেরেছে? বলে দিতে পারবে মানুষের ডেট অব এক্সপায়ারি? সেটা যখন অনিশ্চিত, শেষ শয্যা পাতার আকাঙ্ক্ষা যেখানে, সেখানেই অপেক্ষা করে থাকা ভাল না? এই বয়সটাই ত অপেক্ষা করে থাকার। যদি কেউ এসে পড়ে? হঠাৎ?'

চিঠির শেষটা মনে পড়তেই মুখে একটা মৃদু হাসির আভাস দেখা গেল শেখরের। ওরা এসেছে, হঠাৎই ; বাবা কিন্তু অপেক্ষায় নেই।

ডলি বলল, 'হাসলে যে?'

অন্য একটা প্রসঙ্গ দিয়ে সেটা এড়িয়ে গেল শেখর। বলল, 'ইটস্ ফানি! সুমি আমাকে চিনল কী করে?'

অপ্রসন্ন ভাবটা কেটে গেল সুমির। বলল, 'বারে, তোমাকে চিনব না! কত ছবি দেখেছি তোমার। মায়ের এত্তো এ্যালবাম। তোমাদের বিয়ের ভিডিও দেখেছি। সুনুর ত দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছে।'

'সুনু কে?' ডলি জিগ্যেস করল।

'তোমাদের ভাগ্নে।' সুমি বলল। 'ভাল নাম সুন্দর। মা রেখেছে। এলে দেখবে কী বিচ্চু একটি।'

পাপু বলল, 'কথা ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না, পরে বলো। চা জলখাবার কিছু করো।'

ঠিক আজই সপ্তমী ডুব দিয়েছে।

ডলি বলল, 'আমরা এখন কিচ্ছু খাব না।' বলেই একটা জলের বোতল বের করে মুখের ঢাকনা খুলল।

সুমি বলল, 'পথে খাবার জন্যে এনেছ, রেখে দাও না ওটা, বৌদি। শুধু শুধু বাড়িতে খরচা করছ কেন! আনি খাবার জল এনে দিচ্ছি। ফ্রিজের জল খাও? না, হাফ হাফ মিশিয়ে দেব?'

ডলি বোতলের মুখ খুলে বলল, 'এটা মিনারেল ওয়াটার।'

জল খেয়ে জিগ্যেস করল, 'তোমরা ত ওপরে থাক? ছেলে কার কাছে?'

'ও বাড়িতে আছে নাকি!' সুমি বলল। 'বাপি-মা বেরুলে ও বাড়ি থাকবে। ওকে না নিয়ে মা কোথাও যেতে পারবে!'

এসব ডলির জানা। এ-বাড়ির সঙ্গে ওদের নিউ আলিপুরের বাড়ির সুসম্পর্ক নেই। যাতায়াতও না। টেলিফোনে কথাবার্তা হয় কালেভদ্রে। কিন্তু কী করে যেন ডলির মা সবই খবর পায়। এত ডিটেলে সব বলে, ডলির সন্দেহ হয় মা কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগ করেনি ত। আজকাল এটা কলকাতায় খুব চালু হয়েছে। শেষ চিঠিতে মা লিখেছিল, শেখরের সতর্ক হওয়া উচিত। ঝিলমিল আর আগের শেঠবাগান নেই, পশ্ এলাকা। সত্যসাধনের ঐ দোতলা বাড়ির দাম এখন কিছু না হলেও টুয়েন্টি ল্যাক্স। ভাড়াটে মেয়েটা সারাদিন শুধু এ্যাকটিং করছে। ছেলেটাকে চড়িয়ে দিয়েছে বুড়োবুড়ির কোলে। এ টকিং ডল। দুম করে চলে এসে একটা হেস্তনেস্ত না করলে ও বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাবে। মা বার বার বলেছে, 'থিয়েটারের মেয়ে, রঙ্গনটী, ওরা খুব সাংঘাতিক!'

এখন আসার কোনো প্ল্যান ছিল না। মায়ের প্ররোচনায় ডলি টেনে এনেছে শেখরকে। একমাত্র সন্তান ড্যাফোডিলকে রেখে এসেছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। গভর্নেস আছে, ল্যান্ডলেডিও খুব ডিপেন্ডেবল। ডলি নিজের নামের ধ্বনিসাম্যে নাম রেখেছে ড্যাফোডিল। ফুলের নাম।

সত্যসাধন বাইরের গাড়িটা চেনেন। শেখরের শ্বশুরের। বুঝলেন বাড়িতে কেউ এসেছে। বাড়িতে ঢুকে তাঁর ঘরে শেখর আর ডলিকে দেখে আকস্মিকতার একটা ধাক্কা অনুভব করলেন। বললেন, 'তোমরা। হঠাৎ?'

ডলির একবার মনে হল বলে, 'কেন, আসতে নেই?

হৈম অনেকদিন পরে ছেলেকে দেখে উৎফুল্ল হলেন। বললেন, 'তোরা আসবি জানলে বেরুই! কতক্ষণ এসেছিস? দিদিভাইকে আনিসনি? এবার এখানে থাকবি ত ক-দিন?'

হেসে ফেলল শেখর। বলল 'এ ত প্রশ্নমালা, মা। একটা একটা করে জিগ্যেস করো। কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বলো।'

সত্যসাধন এখন বুঝছেন সন্তান মানেই সারপ্রাইজ।

ডলি অবান্তর কথায় সময় নষ্ট করতে চায় না। বলল, 'আমরা কিন্তু আজই ফিরব মা। ওর অফিসের একটা জরুরি কাজ পড়ে গেল দেল্লিতে, তাই আমারও আসা হয়ে গেল। বাবাকে দেখে গেলাম। বাবার শরীরটা—'

হৈম বললেন, 'ওনার শরীর খুব ভাল আছে।'

পাশেই হৈমর গা ঘেঁসে সুনু। ওকে খোঁচা দিয়ে বললেন, 'কীরে, বল্ সেই কথাটা।'

সুনু অমনি সত্যসাধনের চেয়ারের কাছে গিয়ে বৃদ্ধের চিবুক ধরে আদর করার ভঙ্গিতে নেড়ে দিয়ে বলল, 'এ ইয়ংম্যান অব সেভেনটি থ্রি!'

সবাই হাসল, সত্যসাধন ছাড়া। তিনি বললেন, 'বৌমা বলছে ওর বাবার কথা।'

ডলি চোখের ইসারা করল শেখরকে।

সব আগে থেকে ছকা আছে।

শেখর বলল, ''সব্বাইকে এবার একটু বাবার ঘর থেকে যেতে হবে।'

ডলি প্রথমে উঠল। সুমি-পাপু চলে গেল।

শেখর বলল, 'মা, তুমিও'।

ডলি বলল, 'স্ট্রেঞ্জ! মা-ও থাকতে পারবে না! চলুন মা।'

সত্যসাধন সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন ছেলের দিকে। মোটা মাইনের বড় চাকরি না করলে এই ছেলের করুণাপ্রার্থী হয়ে বাঁচতে হত। রক্তের সন্তান, কিছুতেই অন্তরঙ্গ বোধ করতে পারছেন না। খুব শুষ্ক স্বরে বললেন, 'বলো।'

পরিবেশটা একটু স্বাভাবিক করে নেবার জন্যে শেখর বলল, 'আমরা এসেছি অনেকক্ষণ। তুমি মা কেউ বাড়ি থাকবে না ভাবতে পারিনি। সুমিকে জিগ্যেস করলাম, কোথায় গেছে? ও বলল, জানি না।' একটু থেমে সস্নেহ অভিযোগের সুরে বলল, 'কাউকে বলে ত যাবে।'

সত্যসাধন চোখ বুজে শুনছিলেন, এবার চোখ খুললেন, অপলক তাকালেন শেখরের দিকে। বললেন, 'কোথাও গেলে বলে কয়ে যেতে হয়, একথা তাহলে তোরা মানিস?'

কথাটার পিছনে বাবার একটা পুরনো দুঃখের নালিশ আছে। চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছে না শেখর। একটা যুক্তি হাতড়ে বলল, 'বয়স হলে—বাইরে পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে—অবশ্য শরীর স্বাস্থ্য তোমার বয়সের তুলনায় এখনও ভালোই আছে—'

সত্যসাধনও সেটা অনুভব করেন। কাবু হার্ট শক্ত হয়েছে। দম বেড়েছে। জোরে হাঁটতে পারেন। খিদে হয়, বড়ি না খেয়ে ঘুম হয়। মৃত্যু ভয়টা পর্যন্ত ফিকে হয়ে এসেছে। হৈমরও। যযাতির গল্পটা ইদানীং প্রায়ই মনে পড়ে। অনন্ত যৌবনের আকাঙ্ক্ষায় যযাতি পুত্রের যৌবন চেয়েছিল। ওটা রূপক, গল্প কথা। এর অন্য একটা মানে খুঁজে পেয়েছেন সত্যসাধন। সব পিতাই বৃদ্ধ হলেই যযাতি। যুবক পুত্রের সান্নিধ্য, তার প্রতি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা বৃদ্ধ পিতাকে

সঞ্জীব করে রাখে। যেন পুত্রের দেহমন পূর্ণ হয়েও যৌবনের যে বাড়তি অংশটা উপচে পড়ে, সেটাই পিতায় সঞ্চারিত হয়। এ তাৎপর্য শেখর কি বুঝবে? গল্পটা বলব-বলব করেও বললেন না। ও শুনতে আসেনি, কিছু বলতে এসেছে।

বললেন, 'সবাই তাই বলে। একচুয়াল এজ বললে বিশ্বাস করে না। বলে, মানুষ দু-রকম করে বয়স ভাঁড়ায়। এক কমিয়ে, আর-এক বাড়িয়ে। যে যেমন ভাবে। আমি যা, আমি তাই। ঐ সুমি আর পাপুটা—'

কথাটা শেষ করতে দিল না শেখর। আসল প্রসঙ্গটা এসে গেছে। বলল, 'ওরা ত শুনছি ভাড়াও দেয় না।'

'দেয় না নয়, আমি নিই না।'

'একসঙ্গে নাকি খাওয়া-দাওয়াও করে? খরচ দেয়?'

'না, ফ্রি।'

'তাহলে এ-বাড়িতে ওদের স্টাটাসটা কী?'

সত্যসাধন একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, ' সে তুমি ঠিক বুঝবে না। স্ট্যাটাস না, ভূমিকাটা হচ্ছে পুরুর।'

জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে আছে শেখর। সত্যসাধন বললেন, 'নামটা শোননি আগে? পুরু, সুমতির পুত্র।'

আর বেশি সময় দেওয়া যায় না বাবাকে। ডলির ছক অনুযায়ী এবার কথা শুরু করতে হয়। অন্যথা হলে লাইফ হেল করে দেবে। শেখর বলল, 'কোনো নাটক-টাটক নিশ্চয়ই। একটা কথা বলব বাবা? তোমরা যাদের ফ্রি খাওয়াচ্ছ, থাকতে দিয়েছে, কম্পলিট ফার্স্ট ফ্লোরটা ছেড়ে দিয়েছ,—'

'একেবারে ফ্রি দিইনি।' সত্যসাধন বললেন। 'বিনিময়ে ওরাও কিছু দিচ্ছে। বিনিময় মূল্য কি শুধু টাকায় হয়?'

'ওরা স্রেফ নাটক করছে বাবা। আমার জানতে কিছু বাকি নেই। ছেলেটাকে তোমাদের কোলে লেপ্টে দিয়েছে।'

'কোল খালি দেখেছে বলেই না সেটা পেরেছে।' বিষণ্ণ ভারি কণ্ঠস্বর সত্যসাধনের। 'বুড়ো বয়সেও মানুষের খেলনা লাগে।' তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু রোষ প্রকাশ করে বললেন, 'ওদের ওপর তোমাদের এত রাগ কিসের জন্যে বলতে পার? ইনস্টিগেট করছে কে?'

'রাগের কথা না বাবা। তোমাকে শুধু বলতে এসেছি এবাড়ি তোমার বেদখল হয়ে যাবে।'

সত্যসাধনের মনে ঝিলিক দিয়ে গেল একটা কৌতুক। শেখর বাড়ি নিয়ে ভাবছে, কিন্তু বাড়ির মালিকই যে সস্ত্রীক বেদখল হয়ে গেছে, সেটা ওর মগজে ঢোকেনি। বললেন, 'তার আগে আইনসম্মত দখল দিয়ে যাব। যাকে মনে হবে দেওয়া উচিত।'

হেঁয়ালি করছেন সত্যসাধন। মরীয়া হয়ে এবার চরম দাবিটা উত্থাপন করল শেখর, ঠিক যেমন শিখিয়ে দিয়েছিল ডলি। তাতেই অঘটন ঘটে গেল।

হৈমবতী বুঝতে পারলেন না কী হল। ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল শেখর আর ডলি। অথচ স্থির হয়ে বসে আছেন সত্যসাধন। ওরা বেরুবার সময় একবার ঘর ছেড়ে বাইরেও এলেন না।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই সুমি বলল, 'দাদা, আবার এস।'

পাশে দাঁড়ান সুনু হাত নেড়ে বলল, 'টা টা মামা, টা টা মামি।'

খানিক দূর গিয়েই ডলি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'রাজি হয়েছে? কত পাচ্ছ?'

ড্রাইভার যাতে বুঝতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে আগাগোড়া ইংরেজিতে কথাবার্তা চলল।

শেখর বলল, 'বাড়ি উনি বেচবেন না।'

'ঐ টাকায় আমরা আমেরিকায় এ্যাপার্টমেণ্ট কিনব। ওঁরা গিয়ে থাকবেন আমাদের কাছে। বলনি?'

'বাবা যাবে না। আগেও যেতে বলেছি, যায়নি। আমি জানতাম, বাড়ি বিক্রি করে আমাদের কাছে গিয়ে থাকা—কিছুতেই রাজি করান যাবে না।'

ডলি মুষড়ে পড়ল। 'তাহলে! এ্যাপার্টমেণ্টটা কেনা হবে না? আমাদের যা আছে, তার ওপর আরো অন্তত ত্রিশ হাজার ডলার ত লাগবেই।'

'প্লিজ ডলি, এসব কথা পরে হবে।' বলে অর্ধশায়িত হল শেখর। সব কথা ডলিকে বলা যাবে না। নিয়মিত বাবার নামে ও যে ডলার পাঠিয়েছে, তা থেকে একবারও কিছু তোলেননি তিনি। বলেছেন, ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যবস্থা করে যদি সম্ভব হয় তার সবটাই শেখর ফেরৎ নিতে পারে। তিনি সম্মতি লিখে দেবেন। একটা ভেঙে-পড়া মানুষের মতো এলিয়ে পড়ে আছে শেখর। অস্ফুটে বলল, 'সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে ডার্লিং।'

অনেকটা পথ নিউ আলিপুর। কথা না বলে পাশাপাশি বসে থাকা যায় নাকি! অল্প সময়ে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি দেখে। ডলিও দেখেছে। পুরো সংসারটা চালাচ্ছে ঐ থিয়েটারের মেয়েটা। শেখরের মা-কে কব্জা করে ফেলেছে। বলল, 'দেখো তোমাদের ঐ বাড়ি ওরাই বাগাবে। কত ছলাকলা জানে মেয়েটা, বাব্বা!'

শেখর কোনো মন্তব্য করল না।

বাবার কথাগুলো মনে পড়ছে ওর। অপত্য স্নেহ বল, দাম্পত্য প্রেম বল, সবই বানিয়ে তোলা জিনিস। সভ্যতাও এগিয়েছে, প্রেম ভালবাসার বোধও দানা বেঁধেছে। চর্চা না করলেই ক্ষয়ে যায়। এক সময় মানুষের সাধনা ছিল রাগ-দ্বেষ জয় করার, এখন এসেছে প্রেম-ভালবাসা জয় করার দুঃসময়। ওগুলো মিডল ক্লাশ সেন্টিমেণ্ট, যতটা পার কমাও। রক্তের সম্পর্ক দিয়ে আর স্বজন চেনা যায় না। মানুষ অভ্যাসের দাস। সবাই পারে না। তাই বিকল্প খোঁজে। পরজন স্বজনের মতো হয়ে যায়।

এইসব দার্শনিক কথার উত্তরে বেশ উত্তেজিত স্বরে শেখর বলেছে, 'ও মেয়ে ড্রামা করছে, বাবা, ড্রামা। তোমার সন্তানের অভিনয় করছে।'

অভিমানরুদ্ধ শান্ত গলায় সত্যসাধন বললেন, 'তোরা! যদি তাও করতিস, অন্তত জীবনে একবার ....'

শহীদ আবদুর রশীদের কবর

বশীর আল্‌হেলাল

"মুসাফির, মোছরে আঁখি-জল
ফিরে চল্ আপনারে নিয়া।
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়াছে আপনি ঝরিয়া।"

কাজী নজরুল ইসলাম

খুব তোড়জোড় চলছে। তোড়জোড় তো সেই কবে থেকে চলছে। রাজধানী যাওয়া হবে, তার তোড়জোড়। প্রথম ঠিক হয়েছিল ২৬শে মার্চ উপলক্ষে যাবে, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তারপর ঠিক হয় ১৬ই ডিসেম্বর যাবে। কিন্তু না, যাবে বললেই কি যাওয়া হয়। এখন ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে যাওয়ার তোড়জোড় চলছে। তা, কত মাস এইভাবে গেল, ভালোই হল। ছেলেটা খানিক ডাঁটালো হল। ওই রকম কচি বাচ্চাকে নিয়ে সফর করতে হয়তো কত ঝামেলা হোত। এখনই কি আর হবে না। ১৬ই ডিসেম্বর না যাওয়ার কারণ ছিল তখন ভরা শীত। কচি ছেলেটাকে আর বুড়ি মানুষকে নিয়ে কোথায় ঘোরে, কোথায় থাকে তার ঠিক নেই। একটা দিন যেমন-তেমন করে কাটিয়ে দেওয়া। গাছতলায় কি সোহ্‌রাওয়ার্দি উদ্যানে, কিংবা, শুনেছে, বাস-স্টপে সব রোদ-বৃষ্টিতে মাথা গোঁজার ছাউনি রয়েছে, যেখানে হোক, মাঝখানের একটা রাত কাটিয়ে দিয়ে চলে আসবে। সকাল হলে আর একবার কবর জিয়ারত করে প্রাণ ভরে ফাতেহা পড়ে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরবে। তা, ওই রকম শীতে কী রকম অসুবিধা হোত? ছেলেটাকে টানত, না বিছানা-কম্বল টানত?

এখন এই ফেব্রুয়ারির শেষে আবহাওয়া বড় সুন্দর হয়ে আছে। শীত আছে, কিন্তু মিষ্টি শীত। সাবেরার হৃদয় বড় উতলা হয়ে উঠেছে। কী এক উত্তেজনা তার বুকে ধক্ ধক্ করে বাজে। যেমন বেজেছিল বিয়ের বাসরে, স্বামী-সম্মিলনের আগে। মৃদু পায়ে বসন্ত নামছে পৃথিবীতে। বেলা চড়লে রোদে ওই বসন্ত প্রখর গন্ধ ছড়ায়। না, আর দেরি সয় না। সাবেরা এবার পাগলিনীর মতো ছুটে চলেছে রাজধানীতে। সেখানে এই নব বসন্তে স্বামী তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সকাল দুপুর সন্ধ্যা ন্যাড়া বাঁশঝাড়ের মাথা ছুঁয়ে নব-ফাল্গুনের হাওয়া এসে গায়ে লাগে। তখন সাবেরা শাড়ির আঁচলে চোখ মোছে।

চারজনই ওরা যাচ্ছে। সে সাবেরা, কোলের বাচ্চা পলাশ, দেওর মুর্শেদ আর শাশুড়ি। এ যেন শুধু সেই অভিমানী স্বামীর জন্যে যাওয়া নয়, সেই বীরযোদ্ধা ছেলের জন্যে শুধু যাওয়া নয়, কিংবা বিরাট সেই গৌরবময় পুরুষ ভ্রাতার জন্য কেবল যাওয়া নয়, এই অজ পল্লীতে সেই লোকটার কীর্তির মহিমা যতই হোক বোঝা যায়নি, জানা হয়নি, আমরা কুয়োর

ব্যাং কেবল হাউহাউ করে কেঁদেছি, আমি মুর্শেদ গাঁয়ের স্কুলে বিনা-মাইনের ছাত্র হওয়ার সুযোগ পেয়েছি, আমি সাবেরা সরকারের কাছে হাত পাতলে খয়রাতের টাকাগুলি পেয়েছি, শাশুড়ি বুক চাপড়ে বলেছেন, বৌমা ওই টাকা তুমি নিয়ো না, আমার রশীদ তো ওই টাকার জন্যে জান দেয়নি, সাবেরা তখন ঘোমটার নিচে বুক ফাটিয়ে পিঠ কাঁপিয়ে হা হা করে কেঁদেছে। হ্যাঁ, সেই লোকটার কীর্তির মহিমা বোঝার জন্যেই ওরা রাজধানীতে চলেছে। বিরাট জায়গা সেই রাজধানী ঢাকা। সারা বিশ্বের তীর্থ। হাজার শহীদ সেখানে শুয়ে রয়েছে। উনসত্তরের শহীদ, সত্তরের শহীদ, একাত্তরের শহীদ, বাহাত্তরের শহীদ। পলাশের বাপ রশীদ সেই শহীদদেরই একজন। ওখানে মহানগরীর বুকে শুয়ে রয়েছে। রাজধানীর বুকে লোকে যত্ন করে কবর দিয়েছে। তাতে মর্মর-ফলকে সুন্দর করে লিখে দিয়েছে 'শহীদ আবদুর রশীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা!' সেখানে লোকে ফুল দেয়, বাতি দেয়। শহীদ রশীদের মা বলেন, কেবল আমরাই দেখলাম না।

এবার তাই দেখতে চলেছেন সবাই।

যুদ্ধ শেষ হলে খবরের কাগজে শহীদ রশীদের কাহিনী ছাপা হয়েছিল। গাঁয়ের ছেলে গোলাম রব্বানি আর নেয়ামত ঢাকা থেকে এসেছিল। ওরা তো নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি। কেবল বলেছে, হ্যাঁ, শহীদদের কত কবর চারদিকে। গোরস্তানে তো রয়েছেই। রয়েছে রাস্তার পাশে, ফুটপাতে, ট্রাফিক-দ্বীপে। সব বাঁধানো কবর। নাম লেখা রয়েছে।

শহীদ রশীদের মা যখন পরে ঢাকায় ছেলের কবব জিয়ারত করতে যাবেন মনস্থ করলেন তখন একদিন নেয়ামতকে ডাকিয়ে আবাব জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ বাবা. তা, আমার ছেলের কবর খুঁজে পাওয়া যাবে তো। অত বড় শহর। তুমি নিজেও তো দেখনি?

নেয়ামত বলেছে, দাদি-মা, খববের কাগজের অফিসে গিয়ে খোঁজ করলে ওরা ঠিক বলে দিতে পারবে।

সেই ভরসাতেই ওঁরা যাচ্ছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহর সন্তপ্ত জনতার মেলা হয়ে ওঠে। কত লোকের সঙ্গে দেখা হবে। কত লোক পাওয়া যাবে। শহীদ বশীদের কবর কোথায় এই খবর দিতে পারে এমন একটা লোকও কি আর পাওয়া যাবে না?

মা বলেন, বৌমা রশীদের কবরে সন্ধ্যা হলে চেরাগ দিতে হবে। তার কী ব্যবস্থা করেছ? মুর্শেদকে একটা টাকা দিয়ে হাটে পাঠাও, কটা মাটির চেরাগ নিয়ে আসুক।

সাবেরা বলে. তাহলে তো আবার সরষের তেল নিয়ে যেতে হয় মা. সলতে পাকাতে হয়। আমি ভাবছি মোমবাতি দেব। একটু বেশি খরচ পড়বে। তা পড়ুক, মা। আজকাল মোমবাতিই দেয়।

মা বলেন, বেশ। তাহলে মোমবাতি আনিয়ে নাও।

মুর্শেদ বিরক্ত হয়ে বলে, ঢাকা শহরে তোমার মোমবাতির অভাব নাই।

সাবেরা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগে। মা ঘোলাটে চোখ দুটি আকাশের দিকে তুলে কী খুঁজতে লাগেন। তাঁর দুই কোঁচকানো গাল বেয়েও দুটি ধারা বয়ে যাচ্ছে। সাবেরা মনে মনে বলছে, আমার এই দেহমোমবাতি তোমার জন্যে পুড়েই চলেছে, স্বামী। মা মনে মনে বলছেন, তুই সেবার তোর তেরো বছর বয়েসে রাগ করে বাড়ি থেকে তোর খালার বাড়ি পালিয়ে গিয়েছিলি। আমি সেবার তোর মান ভাঙাতে নারকেলের নাড়ু বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এবার নিয়ে যাচ্ছি মোমবাতি। তোর মান ভাঙবে রে খোকা?

পলাশ ছুটতে ছুটতে আসছে টলতে টলতে। ন্যাংটা, গায়ে গেঞ্জি। ধুলো মেখেছে। এসে দাঁড়িয়ে দু'জনকে দেখে। তারপরে মা'র পিঠে দুম্‌দুম্‌ করে কিল বসায়, দাদির পিঠেও বসায়

দুটো কিল। আগে বলত, কাঁদছ কেন? এখন বলে না। এসেই পিঠে কিংবা গালে কিল-চড় মারে। বুড়ি দাদিকেও ক্ষমা করে না। কারণ ওই কান্না তার পছন্দ নয়। কাঁদতে দেখলেই রাগ। সে তখন তার চাচার তৈরি বাঁশের রাইফেলটি তুলে অমনি তার বাবাকে যারা হত্যা করেছে তাদের তাক্‌ করে ক্যাট্‌-ক্যাট্‌ গুলি ছুঁড়তে লেগে যায়।

এই হচ্ছে তোড়জোড়। তোড়জোড় চলছে। ঢাকায় গিয়ে দুটো রাত একটা দিন যেখানে-সেখানে কাটিয়ে দেবে। না, হোটেলে ওঠার সাধ্য তাদের নেই। ছেলেটার চাকরিই বলতে গেলে সম্বল ছিল। বিঘেচারেক ধানজমি রয়েছে. সরকার মাসে একশো টাকা শহীদ-ভাতা দেন। একশো টাকা এখন একশো পয়সার সমান। ওই টাকা সাবেরা অন্য কাজে খরচ করে না। বলে. এ পলাশের টাকা, এতে কেউ হাত দেবে না। পলাশকে মানুষ করব এই টাকা দিয়ে। পলাশ আমার অনেক বড় হবে, অনেক বড় হবে।

একগাদা রুটি করে সঙ্গে নেবে, বাস্‌। কিছু আলু ভেজে নেবে। কেবল পলাশকে এটা-ওটা কিনে খাওয়াবে। বুড়ি মানুষটার ক'টা মাত্র দাঁত। শুকনো রুটি কি আর চিবোতে পারবেন? তিনি বলেন, বাপু, আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। ওখানে যতক্ষণ থাকব, আমার মুখে কি আর কিছু রুচবে?

এই হচ্ছে তোড়জোড়। তোড়জোড় চলছে।

শেষে ২০শে ফেব্রুয়ারি ওরা রওনা হয়। মুর্শেদ এক সহপাঠীর এক প্লাসটিকের ব্যাগ ধার করে এনেছিল। তাতে দু-চারখানা গামছা-কাপড়, একটা ছোট বালিশ, খটি, টিনের গেলাস আর খাবারের পোঁটলা ভরে স্টেশনে গিয়ে ওঠে। মা একখানা ঘি-রঙের মোটা চাদর আপাদমস্তক গায়ে জড়িয়ে সম্ভ্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সাবেরা পরেছে কালো চিকন-পাড় সাদা শাড়ি। সাবেরাকে ওর বিয়েতে স্বামীর এক বন্ধু লাল টুকটুকে এক হ্যান্ড ব্যাগ উপহার দিয়েছিল। বিয়ের মাস ছয় পরে, পলাশ তখন পেটে, ওই বন্ধুর বাড়িই ওরা দু'জন ট্রেনে চড়ে বেড়াতে গিয়েছিল, এই তো দুটো স্টেশন পর, মনে পড়ে, টুকটুকে হ্যাণ্ড ব্যাগটি হাতে ঝুলিয়ে। ব্যাগটা এখনো আছে। আজ হাতে সেই ব্যাগ তো দূরের কথা, একগাছা করে চুড়িও নেই। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে সাবেরা পলাশকে বুকে চেপে ধরে। মনে মনে বলে, আমার তুই রয়েছিস পলাশ।

পলাশের খুব আনন্দ। ট্রেনে চড়বে। সে কোলে থাকতে চায় না। নামিয়ে দিলে ছুটোছুটি করে। চারদিকে ছেলেধরার উপদ্রব হয়েছে খুব। কখন হঠাৎ ট্রেন এসে পড়ে।

অন্য সবার আনন্দ নেই কিন্তু উত্তেজনা আছে। ঢাকা গিয়ে একদিন থেকে চলে আসা. এই ব্যাপারটা মুর্শেদের ভালো লাগছে না। ওখানে কত কী দেখার থাকবে। কত সভা, অনুষ্ঠান, পথ-নাটক, কবিতার আসর। একদিনে তার কতটুকু দেখা শোনা যাবে! আর ওই একটা দিন তো এই মেয়েমানুষ দুটিকে নিয়ে ঘুরতেই কেটে যাবে।

মুর্শেদ আজকাল কবিতা লিখছে। হ্যাঁ, সে কবি হবে। আসলে বড়ভাইয়ের শাহাদতই তাকে কবি করেছে। দুটি কবিতা নিয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি সকালবেলা বাংলা একাডেমীতে কবিতাপাঠের আসর হয়। বলা যায় না, যদি ওখানে কবিতা পড়ার সুযোগ জুটেই যায়।

মধ্যরাতের আগে ওরা কমলাপুর স্টেশনে নামে। স্টেশনের বিরাট উঁচু ঢেউ-খেলানো ছাদ। দীর্ঘ প্লাটফর্ম সাদা আলোয় ঝকঝক করছে। সাবেরা মাথার ওপরে ও চারদিকে তাকিয়ে কেমন ভয় পেয়ে যায়। মা তার বিহ্বল দৃষ্টি কোনো দিকে না পাঠিয়ে পায়ের কাছে ফেলে রাখেন, ঘোমটা আরো টানেন, ছেলের বাহু শক্ত করে ধরেন। যেদিকে যান সেদিকেই যেন মানুষজনের গমগমানির আগুন গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। পলাশ ঘুমোচ্ছে, তাকে কাঁধে নিয়ে মুর্শেদ ওঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

কিন্তু মুর্শেদ কী পথ দেখাবে? সে নিজেই পথ চেনে না। তারও ভয় ধরে গেছে। এই প্রথম তার ঢাকায় আসা। যেন নতুন কিশোর মাঝি ছোট নাওটিকে তার নিয়ে হঠাৎ ছোট খাল থেকে ভাদ্রমাসের উথালপাথাল গাঙে পড়ে থ বনে গেছে। গেটে টিকিটগুলি দিয়ে ওরা খোলা চাতালে একটা থাম ঘেঁষে দাঁড়ায়। এখানে-ওখানে লোকে কাঁথামুড়ি দিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। একদম খালি গায়েও নেড়ি কুত্তার মতো গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে লোক। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। আহা, লোকগুলি ঠাণ্ডায় বড় কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু এখানে এই ঠাণ্ডা পাকা মেঝেয় ওরা এভাবে শুয়ে রয়েছে কেন? ওদের ঘরবাড়ি নাই?

দেখতে দেখতে ট্রেনের লোকজন, কোলাহল, মোটরগাড়ি, রিক্সা, অটোরিক্সার আওয়াজগুলি ব্যস্তত্রস্ত ঝাপসা কোন্‌দিকে চলে যায়। প্রবল বায়ু সরে যাওয়ায় এখন নদীর ঢেউ যেন মাথা নামিয়েছে। কেবল কুলু কুলু ধ্বনি কিছু আছে। ছোট-ছোট ছোঁড়ারা পান সিগারেট ফিরি করে বেড়াচ্ছে। মা বলেন, মুর্শেদ, ছেলেটাকে ঘাড়ে করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি?

তখন ব্যাগ থেকে কাপড় বালিশ বের করে শক্ত ঠাণ্ডা মেঝেয় বিছানা পাতা হয়। তাতে পলাশকে শোয়ানো হয়। সাবেরা বলে, মা, আপনাকে শীতে ধরেছে। আপনি পলাশের পাশে বসেন।

মা বসেন। তাঁর সত্যি ঠাণ্ডা লেগেছে। এই ফেব্রুয়ারির শেষে যে এমন ঠাণ্ডা পড়তে পারে ভাবেননি। রাজধানীর ঠাণ্ডা এই প্রথম দেখছেন। সাদা কাচের মতো ঝকঝকে আলো আর সাদা কাচের মতোই ঝকঝকে ঠাণ্ডা। এখনই বুঝি মাটিতে ফেলে কেটে কুটে খান খান করে দেবে। আহা, আমার বাছা ওই ঢাকার মাটিতে কোথায় এই ঠাণ্ডায় শুয়ে রয়েছে।

কিসের এত গন্ধ নাকে লাগে, মুর্শেদ? মা বলেন। আমার গা বমি-বমি করে।

মুর্শেদ বলে, চারদিকে সব ফকির-গরিবের ভিড়, দেখছ না? হেগে-মুতে সব কী করে রেখেছে, আখ্-থু!

ওপাশে গিয়ে সে থুতু ফেলে আসে।

মা বলেন—মুর্শেদ, আমি ওজু করব। দেখ্ বাবা, কোথায় পানি পাওয়া যায়।

এখন তুমি নামাজ পড়তে বসবে? এই তোমার নামাজ পড়ার সময়? কত হাঁটতে হবে, কত জায়গায় যেতে হবে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও, মা।

মা বলেন, এখানে আমার ঘুম আসবে না, বাবা।

মুর্শেদ ঘটি হাতে পানির খোঁজে যায়। পানি নিয়ে ফিরে আসে। বলে, ওদিকে পায়খানা-টায়খানা আছে, দরকার হলে বোলো, ভাবী। তবে সাংঘাতিক নোংরা।

মা ওজু সেরে গামছায় মুখ মোছেন। বলেন, পশ্চিম কোন্‌টা?

মুর্শেদ চারদিকে এক চক্কর ঘুরে নেয়। এই যে এই দিকে হবে বলে মনে হয়।

মা নাকের ওপর থেকে দুটো মশা তাড়ান। তারপর সন্দেহ তাড়াবার চেষ্টা করে গামছা পাতেন। তাতে পা মুড়ে বসেন। পরনের থানের খুঁট থেকে তস্‌বিহ্ খুলে নেন। তারপর যাবতীয় দুর্গন্ধ, নোংরা যত মানুষের পায়ের আর নাকের শব্দ, দূরে কোন্ ট্রেন-ইনজিন আর মালগাড়ির শানটিঙের আওয়াজ অগ্রাহ্য করে নামাজে আর দোয়া-দরুদে মগ্ন হয়ে পড়েন। সাবেরার ঘুমে চোখ ভেঙে পড়ছিল। গুটিসুটি ছেলের পাশে ঘুমিয়ে পড়ে। মুর্শেদ কোন্‌দিকে কেমন সব পথঘাট তাই দেখে-শুনে রাখার জন্যে স্টেশনের বাইরে পা বাড়ায় সাবধানে।

তারপর, একসময়ে, তখন রাত বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছিল, ঠাণ্ডা বেড়েছে, ওদিকের প্লাটফর্মে একটা একলা-ইনজিন এসে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল, তাতে সাবেরার ঘুম ভেঙে যায়, কিন্তু পলাশ ঘুমোচ্ছে, তিনজনে জবুথবু বসে রয়েছে, তখন হঠাৎ দূরে কোথায় যেন শেষ নিশীথের হাওয়ার মতনই আওয়াজে সুরেলা কী শোনা যায়। মুহূর্তে এরা উচ্চকিত

হয়ে ওঠে। এ যে সেই গান! কোন্‌দিকে? মা বলেন—মুর্শেদ, ভোর হয়েছে নাকি? এখানে এত আলো, কিছুই বোঝা যায় না, ওঠ্, চল্।

বলতে বলতে তিনি তাঁর বাঁকা পিঠ তুলে দাঁড়ান। সাবেরা ছেলেকে ঘাড়ে তুলে নেয়। মুর্শেদ ব্যাগে সব গুটিয়ে নিয়ে ঘাড়ে ঝোলায়। মায়ের হাত ধরে। মা বলেন, আমার যে ফজরের নামাজ হল না, মুর্শেদ?

মুর্শেদ সেকথার জবাব না দিয়ে বলে, মা—প্রভাত-ফেরী বেরিয়েছে।

সেই পরিচিত গান তখন আরো দূরে সরে গেছে ঃ "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রুরাঙা এ ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি" মুর্শেদের হাতে সেই অশ্রুর গরম ফোঁটা ঝরে পড়ে। মা কাঁদছেন। ওরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকায়, কিন্তু প্রভাত-ফেরীটাকে কোথাও পাওয়া যায় না, তার গানও শোনা যায় না। মা চোখে বেশিদূর দেখতে পান না, তবু তিনি চোখ তুলে কপালের ওপর হাত রেখে দেখার চেষ্টা করেন। আকাশে আলো ফুটেছে। বড় সুন্দর হয়েছে পুব-আকাশের রূপ। যেন হাজার পায়রা পাখা মেলেছে ওখানে।

ওরা এগিয়ে যায়। এই রাস্তাটা আব [illegible] রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে দেখা যায় বাঁয়ে কুয়াশামাখা অন্ধকার থেকে এক মিছিল বেরিয়ে আসছে। কণ্ঠে সেই গান, মৃদু সুললিত, ধীর তার লয়। মিছিলের পায়ের দিকে তাকিয়ে মুর্শেদ বলে ওঠে—ভাবী, মা, জুতো খোলো।

ওরা তাড়াতাড়ি পায়ের স্যাণ্ডেল খুলে ব্যাগে পুরে মিছিলে সামিল হয়ে যায়।

কিন্তু মিছিল বড় দ্রুত। যেন সেই প্রত্যূষের হাওয়া। ধরে রাখা মুশকিল। মা পিছিয়ে পড়ছেন। মুর্শেদ বিরক্ত হয়ে বলে, মা, অত আস্তে চললে চলবে কেন?

মা অসম্ভব চেষ্টায় জোরে পা ফেলার চেষ্টা করে বলেন, আমি যে পারি না রে।

মিছিল হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। মা একজনকে আঁকড়ে ধরে বলেন—বাবা তুমি শহীদ আবদুর রশীদের কবর কোথায় জান?

ছেলেটা আকাশ-পাতাল ভেবে বলে, শহীদ আবদুর রশীদ? কিসের শহীদ?

মুক্তিযুদ্ধের শহীদ। মুর্শেদ বলে।

ছেলেটা বলে, নাম শুনিনি তো।

বলে সে মিছিলের সঙ্গে এগিয়ে যায়। এরা পেছনে পড়ে থাকে।

তখন দেখা যায় আর এক প্রভাত ফেরী আসছে। তার সামনে দুই ফুটফুটে মেয়ের হাতে বিরাট ফুলের মালা। ওরা এই মিছিলেও সামিল হয়। মিছিল এত দ্রুত চলছে যে, কারো সঙ্গে কথা বলাই দায়। মা খপ্ করে একজনের হাত ধরেন। বাবা, তুমি শহীদ আবদুর রশীদের কবর কোথায় জান?

ছেলেটা তো অবাক? ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করে, কেন?

মা বলেন, আমি তার মা। এই যে তার ছেলে।

পলাশ তখন মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ফ্যালফ্যাল করে ঢাকা দেখছে। ছেলেটা বলে, আমি বলতে পারবনা।

বলে জোরে হাঁটা শুরু করে। কারণ তার মিছিল এগিয়ে গেছে।

রোদও উঠে গেছে। বড় মিষ্টি রোদ রাস্তায় এসে পড়েছে। কুয়াশাগুলি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে। নারী-পুরুষ ছেলেমেয়ে কিশোর-কিশোরী ফুল-হাতে চলেছে। ছোট ছোট মিছিল চলছে। মায়ের ঠাণ্ডা আড়ষ্ট শরীরের বাঁধনগুলি রোদের তাপে খুলে যেতে থাকে। তিনি

তোবড়ানো গাল দুটি তুলে যাকে পান তাকেই জিজ্ঞেস করেন—বাবা, শহীদ আবদুর রশীদের কবর কোথায় বলতে পার?

কেউ বলতে পারে না।

ট্রাকে চড়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে একদল চলে যায়। মুর্শেদ ভাবে, ওই ট্রাকে যদি মাকে তুলে দেওয়া যেত! উনি যে হাঁটতে পারছেন না, আরো পারবেন না। একজনকে জিজ্ঞেস করে, শহীদ মিনার কদ্দূর এখান থেকে?

বেশিদূর না, এক মাইল হবে।

বেশিদূর না, এক মাইল হবে! বলে কী? মা তো অত পথ হাঁটতে পারবেন না। পারলেও, যেভাবে হাঁটছেন, ক'ঘণ্টা যে লেগে যাবে! সাবেরা বলে—মুর্শেদ, রিকসা কর।

কেন, রিকসা কেন? মা বলেন। আমরা কি দাওয়াত খেতে বেরিয়েছি? দেখছ না, সবাই ফুল-হাতে হাঁটছে। আমাদের হাতে একগোছা ফুলও নাই। শহীদ মিনারে কী দেব?

মুর্শেদ বলে—মা, তুমি তো হাঁটতে পারছ না। শহীদ মিনারে যেতে কত সময় লেগে যাবে ভেবে দেখ। সেখান থেকে আবার ভাইয়ার কবর খুঁজতে বেরোতে হবে। শহীদমিনারে দেখবে কত লোক। ওখানে ঠিক খোঁজ পাওয়া যাবে।

তাহলে কর্, রিকসা কর্।

দুই রিকসা লাগে। একটাতে মা আর সাবেরা। অন্যটাতে পলাশকে নিয়ে মুর্শেদ ওঠে। তাতে পলাশের খুব আনন্দ হয়। সে হাততালি দেয়। মায়ের বুকও কেমন গর্বে ভরে উঠেছে, যেন অশ্রুমাখা আকাশের মতো গর্বে। হাতে ফুল নিয়ে চলেছে পুরুষ-নারী শিশু-কিশোরী। চলেছে শহীদ মিনারে। শহীদদের কবরে ওরা ফুলের পাপড়ি আর চোখের পানি ফেলতে চলেছে। সেইসব শহীদের একজন তাঁর ছেলে। তিনি চলেছেন শহীদ-জননী।

কিন্তু রিকশা নিলেই বা কী হবে! পুলিস ওই পর্যন্ত রিকশা যেতে দেয় না। তাই কি দেয়? যাচ্ছ শহীদ মিনারে। হেঁটে যেতে হবে না মাথা নত করে? কত লোক যাচ্ছে, কত লোক যাচ্ছে! দেখ কারো পায়ে জুতো নেই। মা দেখেন, যেন হাজার হাজার সকালবেলার পদ্মফুল চলেছে শুচিস্নাত শহীদ মিনারের পথে।

মা তো স্তম্ভিত হয়ে যান শহীদ মিনারে পৌঁছে। এত লোক? লোক যে গিজগিজ করছে। গান হচ্ছে, স্লোগান হচ্ছে। হাতে হাতে ফুল। মেয়েদের খোঁপায় খোঁপায় ফুল, যার খোঁপা আছে। যাঁর এলোচুল তিনি যেখানে পেরেছেন গুঁজেছেন ফুল। ছেলের বাহু আঁকড়ে ধরে মা তাঁর বাঁকা পিঠ যতদূর সম্ভব সোজা করে শহীদ মিনারের দিকে তাকান। শহীদ মিনারের উঁচু চুড়ো মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে। মিনারের চাতালে লোক গিজগিজ করছে। ওরা ওখানে কী করছে? ফুল দিচ্ছে? আমার ফুল নাই। কিন্তু পুত্র ছিল, আমি তা-ই দিয়েছি, আমার অশ্রু আছে, তা-ই দেব।

কিন্তু সিঁড়িগুলি ডিঙিয়ে ওখানে যে কেমন করে যাওয়া যাবে সেই পন্থা বের করতেই বহু সময় চলে যায়। যেদিক দিয়েই চেষ্টা করে, যাওয়া যায় না। মানুষের প্রাচীর পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শেষে জানা যায়, লাইন রয়েছে, লাইনে দাঁড়াতে হবে। অনেক কষ্টে, অনেক হেঁটে লাইনের লেজুড় খুঁজে পাওয়া যায়। সে আসলে ক্রুদ্ধ যেন অজগরের লেজ, মাঝে মাঝেই ঝাপটা মারছে। মা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন সাধ্য কী! মুর্শেদ কয়েকজনকে অনুরোধ করে, ইনি এক শহীদের মা। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। এনাকে একটু আগে যেতে দিন।

এক তরুণ জিজ্ঞেস করে, শহীদের নাম কী?

মুর্শেদ বলে, আবদুর রশীদ।

আবদুর রশীদ? নাম তো শুনিনি? এই তোরা কেউ শুনেছিস?

কিন্তু অন্য তরুণ বলে, অনেক ভেজাল শহীদ বেরিয়েছে বাজারে।

এত হুজ্জুত দেখে সাবেরার কোলে পলাশ কেঁদে ওঠে। বলে—চল মা বাড়ি যাই, ট্রেনে চড়ে বাড়ি যাই।

অতএব শহীদ মিনারে মায়ের অশ্রু দেওয়া আর হয় না, অশ্রু তিনি যা দেন রাজপথে দেন, মানুষের পায়ের তলায় যা নিমেষে ধুলো হয়ে যায়।

অনেককে জিজ্ঞেস করা হয় শহীদ আবদুর রশীদের কবর কোথায় কারো জানা আছে কিনা। নতুন আজিমপুর গোরস্থানে মুক্তিযুদ্ধের অনেক শহীদের কবর আছে জানা যায়। আজ শোকার্থী পদচারীদের দিন। তাই ওখানে যেতে রিকসা পাওয়া যায় না। মুর্শেদ একবার ভেবেছিল মাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু যে কাজ গ্রামে চলে তা এই চৌকস শহরে চলে না। লোকে হাসবে। হয়তো ইশপের গল্পের সেই বোকা চাষাকে নিয়ে যা হয়েছিল তাই হয়ে যাবে। এর মধ্যে এই রাজধানী সম্পর্কে মুর্শেদের যেটুকু ধারণা হয়েছে, এখানকার মানুষের মেজাজে নুন-ঝাল টক-মিষ্টি নাই। এরা কাঁদে যদি, শব্দ হয় না, হাসে যদি, ঠোঁট ফাঁক করে না।

তবু মা গোরস্তানে পৌঁছোতে পারেন। হায় আল্লা! এমন আলিশান গোরস্থান! আল্লা তাঁর পৃথিবীতে কি স্বর্গ রচনা করে রেখে দিয়েছেন নাকি? মারবেল, রঙিন ইট, মোজাইকে আর গ্র্যানাইটে তাঁদের মরণ-পরের সুরম্য কুঠরিগুলি থরে থরে সাজানো রয়েছে।

তাঁর বুক ভরে যায়। গেটে ঢুকতে ডাইনেই শহীদদেব একসার কবব। জিয়ারতের জন্যে বেশ কিছু লোক গেছে। একটি কামিনীগাছের নিচে ক'টি কমবয়েসি ছেলে আর মেয়ে ভালো পোশাক-আশাক পরে দাঁড়িয়ে খুব গল্প লাগিয়েছে। ওদের কেউ একজন এখানে এই শহীদদের সঙ্গে শুয়ে রয়েছে। সেই একজন নাকি ডাঁসা পেয়ারা আর মুরগির মাথা খেতে ভালোবাসত। ভারি সরস ওদের আলোচনা। ওদের পোশাকে একটা গন্ধ আছে, কিন্তু সে গন্ধ গোরস্তানের গন্ধ নয়। মা মুর্শেদকে জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁ রে, এরা কি কিরিস্টান?

মুর্শেদ গলা নামিয়ে বলে, চুপ কর, মা চুপ কর, কী যে বল তার ঠিক নাই।

শহীদদের কয়েকটি কবর বাঁধানো, বেশির ভাগ এখনো বাঁধানো হয়নি। কিন্তু প্রত্যেকটিতে নাম লটকানো আছে। মা পায়ে পায়ে এগিয়ে যান। কবরের গায়ে স্নেহে আদরে হাত বুলিয়ে দেন, অশ্রু ফেলেন। মুর্শেদ শহীদের নাম পড়ে। এক এক করে সব কবর জিয়ারত করা হয়। কিন্তু রশীদের নাম নেই। মা কাঁদছেন, দোয়া-দরুদ পড়ছেন। দু'একজনকে জিজ্ঞেস করেন—বাবা, তোমরা কি শহীদ আবদুর রশীদের কবর কোথায় জান?

কেউ কিছু বলতে পারে না।

পলাশ কখনো মায়ের কোলে কখনো চাচার কোলে। সে মাঝে মাঝে কাঁদছে। তার কিছুই ভালো লাগছে না। বলছে চল বাড়ি যাই, ট্রেনে চড়ে বাড়ি যাই।

বাইরে এসে তাকে একটি লজেন্স কিনে দেওয়া হয়। এবার রিকসা পাওয়া যায়। রিকসায় চড়ে ওরা এক জায়গায় নেমে বাংলা একাডেমীর দিকে যায়। সেখানে লোক থই থই করছে। লোক যাচ্ছে, আসছে। বেশির ভাগ খালি-পা বলে শব্দ বাজছে কম। 'একুশের সঙ্কলন' ফেরি করে বেড়াচ্ছে ছেলেরা, মেয়েরা। ভেতরে গমগম করে মাইক বাজছে। স্বরচিত কবিতা পাঠ চলছে। মুর্শেদ বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখে হ্যাঁ, কবিতা দুটি আছে। সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু মাকে নিয়ে হয়েছে ফ্যাসাদ। ভাইয়ের কবর যে খুঁজে পাওয়া যাবে না সে ব্যাপারে এতক্ষণে সে নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু মাকে সেকথা বলা যায় না। মুর্শেদ এখানে গেটে দাঁড়িয়ে ভেতরের সুসজ্জিত প্যান্ডেল দেখছে, মানুষের ঢল দেখছে, কালো মঞ্চে মেদুর আলোকে কবিদের সব বসে থাকতে দেখছে, কবিতা পাঠ দেখছে, ওদিকে যত লোক

ধরে ধরে মা জিজ্ঞেস করে ফিরছেন—বাবা, তোমরা কি শহীদ আবদুর রশীদের কবর কোথায় জান? মাকে আর ভাবীকে দুটি চেয়ারে এখন ওখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিতে পারলে ওঁদের বিশ্রামও হোত, একটা কবিতা পড়ার সুযোগ পাওয়া যায় কিনা তার ধান্দায় ওদিকে একটু ঘোরাও যেত।

কিন্তু দেখতে দেখতে ওদিকে ফুটপাতে মা-দের ঘিরে কিছু লোক জমে গেছে। মুর্শেদ গিয়ে দেখে মা প্রায় বক্তৃতাই ফেঁদে বসেছেন। তিনি নিজেকে, সাবেরাকে আর পলাশকে জনতার কাছে পরিচিত করাচ্ছেন। জনতা আনন্দ পাচ্ছে। কারণ গ্রামের ওই বুড়ি মেয়েটার গল্প বিশ্বাস হয়, আবার সন্দেহও জাগে। হতেও পারে তারও ছেলে বড় বীর ছিল, সে যা দিয়েছে, কেউ তা শোধ করতে পারবে না। হতে পারে, এরা লোক ঠকাতে বেরিয়েছে। লোকেও ওদের নিয়ে মজা করে নিচ্ছে।

মুর্শেদ তখন মা-দেরকে ওই ভিড়ের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসে। এক মাঝবয়েসি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে মুর্শেদের কানে ফিসফিস করে বলেন, এই যে খোকা, এটা নাও।

তাঁর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট। মুর্শেদ অবাক। কেন?

ভদ্রলোক কাঁচুমাচু করে বলেন, শহীদ আবদুর রশীদ না কী যেন নাম, তাঁর ওই ছেলেকে মিষ্টি কিনে দিয়ো।

মুর্শেদ বলে, না, আমরা ভিখিরি নই।

ভদ্রলোক তখন হতভম্ব হয়ে মাফ চেয়ে চলে যান।

তখন একটি সাদা জমিনের কালোপাড় শাড়ি পরা মেয়ে কোত্থেকে যেন হাওয়ায় উড়ে আসে। মায়ের হাতে একগোছা লাল সাদা ফুল গুঁজে দেয়। উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে শেষে মায়ের দুই গাল বেয়ে অশ্রু নেমে আসে।

লাভ হয় এইটুকু যে, কিছু শহীদের কবরের সন্ধান পাওয়া যায়। সেসব জায়গা মিরপুর থেকে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া রামপুরা খিলগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত। পলাশকে নিয়ে হয় মুশকিল। সে আর কিছুতে এভাবে ঘুরবে না। মুর্শেদ বলে— হাঁরে এত বড় রাজধানী, ওই যে দেখ্, ওই বাড়িটা দেখ্, তোর ভালো লাগছে না? সন্ধেবেলা তোকে স্টেডিয়ামে নিয়ে যাব, হ্যাঁ?

না, রাজধানী তার ভালো লাগেনি। সে কেবল কাঁদে আর বলে, চল বাড়ি যাই। ট্রেনে চড়ে বাড়ি যাই।

সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে গাছতলায় গিয়ে বসা হয়। ঠাণ্ডা মাটি মায়ের পায়ে শান্তি দেয়। তাঁর পায়ের তলায় ফোস্কা পড়ে গেছে। খাবারের পোঁটলা খুলে পলাশকে খাওয়ানো হয়। মা বলেন—মুর্শেদ, তুইও খেয়ে নে। বৌমা, তুমিও খেয়ে নাও।

মুর্শেদ খায়, সাবেরাও না খাওয়ার মতো করে খায়। কিন্তু মা খান না। বলেন, আমি রোজা রেখেছি, রশীদের কবরে আমি সারাদিন নামাজ-কালাম পড়ব। সূর্য ডুবলে মুখে পানি দেব।

আবার সন্ধান চলে। পায়ে হেঁটে রিকশায় বাসে সারা শহর ঘুরে বেড়ানো হয়। শহর তো নয়, একটা পৃথিবী। অনেক কবর দেখা হয়। কিন্তু রশীদের কবর পাওয়া যায় না। যেসব কবরে নাম নেই, কেউ বলে না রশীদের হতে পারে। শোনা যায় শেরে-বাংলা নগরে এক মুক্তিযোদ্ধার কবর রয়েছে। যাওয়া হয়। না, রশীদের কবর নয়। খবরের কাগজের অফিসগুলোতে যেতে লেগেছিল। ওগুলোতে আজ শহীদ দিবসের ছুটি, বন্ধ। থানায় গেলে বলে, এ বাপু আমাদের বিষয় নয়, সিটি করপোরেশনের বিষয়।

মহাখালীতে এক কবর পাওয়া গিয়েছিল, তাতে লেখা ছিল শহীদ আবদুর মজিদ। কেউ বলতে পারে না কোথাকার লোক, কেমন দেখতে ছিল।

পলাশকে আর বয়ে বেড়ানো যায় না। সে ঘাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দুপুর গড়িয়ে চলে বিকেলের দিকে। বাংলাদেশ বেতারের সামনে বাস স্টপের এক ছাউনিতে গিয়ে ওরা ভেঙে পড়ে। একটা কুকুর শুয়ে ছিল, বেচারা অনিচ্ছায় গা তুলে চলে যায়। মা গড়িয়ে পড়েন। মনে হয় মূর্চ্ছা গেছেন, দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। কিন্তু মুখে পানি দিতে গেলে জেগে ওঠেন, বাধা দেন। খানিক পরে উঠে ওজু করে বিলম্বে হলেও জোহরের নামাজটি পড়েন।

রাস্তা কাঁপিয়ে বড় বড় বাস যায়, ট্রাক যায়, ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর গাড়িও যায়। সাবেরা ভাবে, কেন এসেছিলাম। এমন বোকামিও কি মানুষ করে?

মুর্শেদ ভাবে, ঢাকায় আমাদের আত্মীয়স্বজন নেই সে তো জানা কথা, আমরা সারাদিনের যা হোক খাবারের সংস্থান করেই বেরিয়েছিলাম। তবু মনে মনে একটা আশা, বরং বাসনা ছিল ঃ শহীদ-পরিবার, মফস্বল থেকে ঢাকায় এসেছে, এসেছে একুশে ফেব্রুয়ারি, এসেছে শহীদ ছেলের, শহীদ স্বামীর কবর খুঁজে পেতে, আশা, বরং বাসনা ছিল, কত লোকে এসে বলবে, আসুন, আমাদের বাসায় দুপুরে চাট্টি খাবেন, আসুন, আমাদের বাড়ি রাতটা থাকবেন। মুর্শেদ সঙ্গে সঙ্গে বলে, ছিহ্ আমরা আমাদের কথা ভাবছি, কী পেলাম না তা-ই ভাবছি। কিন্তু সেই শহীদ পেয়েছে? কিছুই কি পেয়েছে? তার কবর ফুল পায়নি, মোমবাতি পায়নি। না পাক। কিন্তু তার স্বপ্ন কী পেয়েছে। তার রক্ত কী পেয়েছে?

সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে যিনি তখন পঞ্চাশটা টাকা দিতে চেয়েছিলেন, সেই মেয়ের কথা মনে পড়ে যে মাকে ফুল দিয়েছিল। না, এদিক-সেদিক ভালো লোকও সব আছে যাদের বুকে কান্না আছে। কিন্তু কান্নাকে ফাটিয়ে তোলার সাধ কারো নেই।

শক্ত সিমেন্টে গামছার ওপর পলাশ ঘুমোচ্ছে।

মা নামাজ শেষ করে বলেন—মুর্শেদ, আমাকে সেইখানটায় নিয়ে চল্।

কোন্খানটায়?

সেই যে যেখানে শহীদ আবদুল মজিদের কবর রয়েছে।

সেখানে গিয়ে কী হবে?

ফাতেহা পড়ব।

কেন, মা?

ওটা আমার রশীদের কবরও হতে পারে। হয়তো ওরা নামের ভুল করেছে।

তাই বুঝি কেউ করে!

না, আমি ওখানে যাব। মা বলেন। বাসে যাওয়া যাবে না, মুর্শেদ? রিকশায় চড়ে-চড়ে তো সব শেষ করে ফেললি। ক'টা মোমবাতি দেখ্ কোথায় পাওয়া যায়, কিনে নে।

পলাশকে ঘাড়ে তুলে ওরা আবার যাত্রা করে।

কবে, সেই তখন ফাঁকা জায়গায় কার বাড়ি তৈরি হওয়ার পর এখন শ্যাওলা ধরা ভাঙা ইটের স্তূপ পড়ে রয়েছে। তার পাশে কাঁটা-নটের গাছে ঘেরা কবরটি। কবরটিকে কারা ওই ভাঙা ইট দিয়েই যেমন-তেমন বাঁধিয়ে রেখে গিয়েছিল। একটা মোটা রড পুঁতে তাতে ছোট একটা টিনের নাম-ফলক ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল। টিনের খণ্ডটুকু বেঁকে-চুরে গেছে কিন্তু মর্চে ধরেনি, ভালো টিন। কালো পেন্ট দিয়ে লিখেছিল, কালো বর্ডারও দিয়েছিল। শুধু নাম। দু'লাইনে লেখা ঃ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মজিদ। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা কথাটা বেশি বড় করে লেখা নামের চেয়ে। বাবার নাম, জন্মস্থান নেই। মা বলেন, দেখ্ কী লেখা আছে। আবদুর রশীদ হতে পারে না?

মুর্শেদ বলে—না মা, আমি ভালো করে দেখেছি। সে আর একবার দেখে।

মা কবরের পাশে ক'টা ইটের টুকরো সরিয়ে কিছু ঘাসে কিছু মাটিতে পশ্চিমমুখী পা দুমড়ে বসে মাথায় ঘোমটা টেনে খুব করে ঠোঁট আর তোবড়ানো গাল নাড়িয়ে নাড়িয়ে ফাতেহা পড়া শুরু করেন। সাবেরাকে বলেন, তুমিও পড়।

সাবেরা শোনে না। ছেলেকে নিয়ে ওদিকে ঘুরতে যায়। মুর্শেদের এসব ভালো লাগছে না। একপাশে ব্যাগটি নিয়ে বোকার মতো বসে থাকে। কার না কার কবর। এখনি যদি লোকে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কী বলবে?

কিন্তু মায়ের মনের ভাব ওরা বোঝে না। তিনি কখনো তস্‌বি জপছেন, কখনো কেরাআত পড়ছেন। দুই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। অশ্রু দমন করার চেষ্টা করছেন, কারণ এত শোক আল্লা পছন্দ করেন না, তাঁর এবাদৎটুকু, এই উপাসনা, প্রার্থনাটুকু তিনি যদি গ্রহণ না করেন তাহলে লাভ কী হল? কিন্তু তিনি ঠেকাতে পারছেন না। বারবার ছেলের মুখ মনে পড়ছে। দুশমনের গুলি খেয়ে যখন সে পড়ে গেছে, রক্তে-ভেজা মাথাটা এপাশ-ওপাশ করছে, তখন নিশ্চয় এই মা-হতভাগীর মুখ তার মনে পড়েছিল। তার কতদিন পরে আমরা জেনেছি. রশীদ, তুই আর নেই। বাবা বে, তোর কাছে আমি এসেছি, এই দেখ্, তোর কাছে আমি এসেছি। তুই এখন শান্তি পা, বাবা।

রশীদ হয়তো এই কবরে নেই। থাকতেও তো পারে। যদি না থাকে, তার কোনো সাথী. সহযোদ্ধাই তো আছে। সেও মায়ের ছেলে। সেও গুলি খেয়ে তড়পাবার সময়ে তার মা'র মুখ মনে করেছিল। ওরা সবাই আমার ছেলে। নিশ্চয় এখানে আমার এক ছেলে রয়েছে।

হ্যাঁ, লোকজন, ছেলেমেয়ে এসে দাড়ায়। চলে যায়। কারো খুব কৌতূহল নেই. স্পৃহা নেই। ওই দুটো জিনিস উবে গেছে।

সন্ধ্যা হলে, কাছেই মসজিদ, আজান পড়লে মা মোমবাতি জ্বেলে দেন। হাওয়া আছে, দেশলাই জ্বালাতে মুর্শেদ সাহায্য করে। মা কয়েক গণ্ডুষ পানি খান। মগরেবের নামাজ পড়েন। তারপর লম্বা অশ্রুভেজা মোনাজাত সেরে বলেন, চল্ মুর্শেদ, এবার আমরা ফিরি।

আর তো তাড়া নেই, স্টেশনে ফিরতে বেশ রাত হয়। দুর্গন্ধ কম এমন একটা জায়গা বেছে প্লাটফর্মে গিয়ে বসা হয়। পলাশ আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। সামান্য বিছানা পেতে তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। মা এবার এক দলা সুজি দিয়ে অনেক কষ্টে একটি শক্ত রুটি খান। কিন্তু কাঁদছেন। ঘোলাটে চোখে উজ্জ্বল আলোগুলো দেখছেন আর কাঁদছেন। তাঁর চোখের কোণগুলো কেঁদে কেঁদে সাদা হয়ে গেছে। মুর্শেদ ঘটি ভরে পানি এনে মাকে খাওয়ায়। তারপর নিজে খেতে বসে। কিন্তু সাবেরা খায় না, তাকে খাওয়ানো যায় না।

খাওয়া সেরে মুর্শেদ একটু ঘুরতে গিয়েছিল। নিজের একটা পান খায়। ভাবে. ভাবীর জন্যে এক খিলি নিয়ে যাই। পানের খিলিটি নিয়ে এসে দাঁড়াতে দেখে ভাবী নীরবে কাঁদছে, দুই গাল বেয়ে বয়ে যাচ্ছে ধারা। মুর্শেদকে দেখে তার দেহ আক্ষেপে আন্দোলিত হতে থাকে।

মা শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। পলাশ ঘুমোচ্ছে। তার মুখে ঢাকার পথের ধুলোর একটি মলিন প্রলেপ। কিন্তু ওদিকে প্লাটফরমে হঠাৎ কোত্থেকে মাটি কাঁপিয়ে এক ইনজিন এসে সিটি মারতে লেগে গেলে পলাশের ঘুম ভেঙে যায়। সে তারস্বরে কেঁদে ওঠে। মনে হয় তার গলা-চেরা কান্নার শব্দ ইনজিনের চিৎকারকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে।

ঠিকাদার

মনোরঞ্জন হাজরা

পাহাড়ের গায়ে সাবুই ঘাসের সবুজ বিস্তৃতি।

তারি ফাঁকে পায়ে চলা সরু পথ। এঁকে বেঁকে চড়াই-উৎরাইয়ের তরঙ্গায়িত পথে উধাও হ'য়ে গেছে, প্রতিদিন বৈকালে আমি এই পাকদণ্ডীর পথ ধরে পাহাড়ের ওপর বেড়াতে যাই। দীর্ঘকাল রোগ ভোগান্তির পর হাওয়া বদ্‌লাতে এসেছি। কাজেই খুব বেশীদূর যেতে পারি না। তা' ছাড়া কিছুটা পথ ইচ্ছে ক'রেই হাতে রাখি, কারণ শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য সন্ধ্যার আগেই পাহাড় থেকে যদি না নেমে যেতে পারি তা'হলে হয়ত কোনো বিপদ-আপদ ঘটেও যেতে পারে। তাই ...

পাহাড়ের পাথরকঠিন পথ। চলতে আমার বেশ লাগে। গোটা দুই চড়াই উৎরাই পার হ'লেই আমার লক্ষ্যস্থলে এসে পড়ি। সেখানটায় এক ঝাঁক ইউকালিপ্‌টাস গাছ সুদক্ষ সেনানীর মত দাঁড়িয়ে। প্রতিদিন এইখানে এসে একটা বড় পাথরের ওপর বসি। বসে বসে একাই আকাশের পশ্চিম দিগন্তে। অস্তসূর্যের রক্তরশ্মি সারা আকাশটাকে দেয় রাঙা আলোয় ভরিয়ে। কোনো কোনো দিন হয়ত ধূমল মেঘের বিস্তৃতি থাকে আকাশে। শাড়ীর রূপালী আঁজলার মত সেই মেঘরাশির প্রান্ত ভাগ রূপায়িত হ'য়ে ওঠে বিদায়ী সূর্যের কিরণ স্পর্শে।

এখান থেকে শহরের দৃশ্যটা চোখে পড়ে। ছোট্ট শহর। বড়লোকের বাগান বাড়ীর মত। পাহাড়ের প্রায় কোল ঘেষেই রেল স্টেশনের গম্বুজটা যেন প্রহরী। একটু দূরে জঙ্গলের ফাঁকে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের উঁচু মঞ্চ। শহরের মাঝামাঝি নীলকর সাহেবদের সেকেলে একটা গির্জার ছুচলো চূড়ো, আশেপাশের প্রকাণ্ড দেবদারু গাছগুলোর সঙ্গেপাল্লা দিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে। আরও ওদিকে শহর পার হ'য়ে নদী। নদীর ওপারে অস্পষ্ট প্রায় নীল-বনরেখা।

বাতাস এসে ঢেউ তুলে যায় সাবুই ঘাসের বনে। চেয়ে চেয়ে দেখি। বাংলাদেশের মানুষ আমি। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপসজ্জা প্রতিদিনই আমি নূতন চোখে দেখতে অভ্যস্ত। তা'ছাড়া এই দৃশ্য বৈচিত্র্যের মাঝে আমি যেন দেখতে পাই আমারই চিরকালের বাংলাদেশকে। তাই দেখেও আমার তৃপ্তি হয় না।

দিনের শেষে সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা শহর থেকে ফেরে। পাহাড়ের মধ্যে তাদের বাস। হিন্দুস্থানী আহিরেরা ফেরে পাহাড় থেকে। তারা শহুরে। পাহাড়ের বন্ধুর পায়ে চলা পথে, সাবুই ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একচোট খেলা শুরু ক'রে দেয়। আহিরদের গরুগুলো ভরপেট খেয়েও খাওয়ার নেশা ভুলতে পারে না। বোধ হয়, তাই ফোঁস ফোঁস ক'রে সাবুই ঘাসের কচি কচি ডগাগুলোয় টান মারতে মারতে চলে।

প্রায়ই সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আহিরদের বচসা হয়, মারামারি হয়। মারামারিটা কখনো কখনো খুনোখুনির পর্যায়ে গিয়েও পড়ে। ননরেগুলেটেড্ প্রদেশ। তসিলদার অথবা নগর-রক্ষীদের কেউ এসে হয় ঝগড়া মিটিয়ে দেয় নয় জরিমানা করে। দু'পক্ষেরই আক্কেল হ'য়ে যায়।

এখানে একটি লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছে। কপালে চন্দনের ফোঁটা কাটা, মাথায় মাড়োয়ারী টুপি, শুঁড়তোলা লক্কড় নাগড়া পায়ে, ঢিলে পাঞ্জাবী গায়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে লোকটা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যায় আর আসে। লোকটা রাজপুতানার কোন জায়গার অধিবাসী। ছেলেবেলা থেকেই এদেশে আছে। এখানে সে ঠিকাদারী কাজ করে অর্থাৎ এই বিহার প্রদেশেরই খনি অঞ্চলের কোন কয়লাখনিতে শ্রমিক সরবরাহ করে। বয়স হ'য়েছে লোকটার অনেক। মাথার চুল পেকে শাদা হ'য়ে গেছে কিন্তু শরীর ভাঙেনি এতটুকুও। নাম মহারাজ। নামটা আসল—কি, উপাধি প্রাপ্তির সূত্রে পাওয়া তা' সেই জানে। সাঁওতাল পল্লীতে মহারাজের খাতির খুব। শহরেও যে খাতির নেই তা' নয়। কয়লাখনিতে শ্রমিক চালান দেওয়া তো শুধু শ্রমিক চালানই নয় গোহাটার গরুর মত মানুষ বেচা। মানুষ বেচে পয়সা হয় না এমন নয় বরং তা'তেই আরও বেশি হয়। কাজেই পয়সার মালিক হ'লে খাতির ক'রবে না এমনতরো লোক পৃথিবীতে কেউ আছে কি? অবশ্য মহারাজ যে সাঁওতালদের খাতির সেইজন্যই পায় তা' নয়, মহারাজ সাঁওতালদের বোঝাতে পেরেছে যে, সে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

প্রায়ই ইউকালিপ্‌টাস্ গাছের তলায় এসে মহারাজ আমার সঙ্গে গল্প করে। সাঁওতালই হোক আর আহিরই হোক সবাই তাকে সেলাম ঠুকে যায়। জিজ্ঞাসা করি, —হ্যাঁ মহারাজ শহরবাসীরা তোমায় সেলাম ঠোকে সেটা না হয় বুঝতে পারি কিন্তু এই সাঁওতালদের হৃদয় জয় ক'রলে তুমি কি ক'রে?

মহারাজ মাথার টুপিটা বাঁ-হাতের তালুতে বসিয়ে ডানহাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, —বাবুজি আমি ওদের অনেক উপকার করিছি।

—কি রকম?

মহারাজ বল্‌তে থাকে, জানো বাবুজি—আগে আমি এই সাবুই ঘাসের কারবার করতুম। ডেরী-অন্-শোন্ আর টিটাগড়ের কাগজ কলে চালান দিতুম্। সে সময়ে পাহাড়ের এই সাঁওতাল মহল্লাতে এসে প্রায়ই শুন্‌তুম ওদের দুঃখের কথা। কয়লাখনিতে বড় বড় সাহেবরা ওদের ঘরের ছেলেমেয়েদের দালাল দিয়ে নিয়ে পালাতো আর কয়লা খাদে কম মজুরীতে খাটিয়ে নিতো।

—তারপর?

—তারপর আর কি। একদিন শুনলুম এই ঘাসের ব্যবসা আর এইভাবে চলবে না। সোজাসুজি কলের মালিকরা জমা নেবে। আমিও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। তখন আমার মনের ভেতরে তোলপাড় ক'রছে সাঁওতালদের কথা। কয়লাখনির সাহেবদের কাছে গিয়ে বল্‌লুম, এবার থেকে আমি তোমাদের মজুর যোগাবো। দিশী সাহেব—শুনে খুব খুশি হোল।

—কিন্তু তাতে সাঁওতালদের তুমি কি ক'রলে মহারাজ?

বাঃ। কপাল কুঁচকে মহারাজ বলে, আমার হাতে পড়ে সাঁওতালরা তো বেঁচে গেল। ওদের ছেলেমেয়েদের গিয়ে আর কম মজুরীতে মেহনৎ ক'রতে হয় না। বছরে দু'বার তো দেশে আসেই। তারপর আগেকার মত বেয়াড়াপনা ক'রলে কয়লাখনিতে ডিনামাইট্ পুঁতে জাহান্নামে পাঠানো হয় না। আজকাল পাকা রেজিস্টার, কম্‌পেনসেসন্ এ্যাক্ট—এসব তো আমারই তদ্বিরে?

—বল কি মহারাজ?

—বাবুজি, গরীব আর কি ক'রবে?

তা' ঠিক। মনে মনে ভাবি —মহারাজের এই কথাগুলোই হয়ত সাঁওতালদের এতখানি মুগ্ধ ক'রেছে। কেন না মহারাজ যেভাবে কথাগুলো বলে তা'তে লেখাপড়া জানা লোক না হ'লে আমারও মুগ্ধ হবার কথা।

তবু মহারাজ লোকটাকে মন্দ লাগে না। হাওয়া বদ্‌লাতে এসে যেসব সমপর্যায়ভুক্ত নরনারীকে পথে ঘাটে দেখি, তাদের অনেকেই দেখায় নিজেদের অহঙ্কার, ঐশ্বর্যের অহঙ্কার। আমি সাধারণ ঘরে মানুষ, সহ্য ক'রতে পারি না তাদের। তাই তার চেয়ে ঢের ভাল লাগে আমার এম্‌নিতরো মানুষ। হোক্ মহারাজ ভিন্‌দেশী লোক্ হোক তার পেশাটা ঘৃণ্য, তবু তার মধ্যে নেই অহঙ্কার, মিথ্যা অহঙ্কার।

ক্রমে মহারাজের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে যায়। শহরের একটা বড় রাস্তার ধারেই আমার বাসা। জানালা দিয়ে বহুদূর অবধি পথের বিস্তৃতি দেখতে পাওয়া যায়। তারি ধারে আমার শোবার জায়গা। শুয়ে শুয়ে কখনো একটু আধটু পড়ি নতুবা জানালার ফাঁকে তাকিয়ে থাকি পথের দিকে।

এখানের আকাশ বাংলাদেশের আকাশ নয়। প্রখর রৌদ্রকিরণে আকাশে লেগে যায় আগুনের বন্যা। নিঃসীম নীলিমায় দেখা যায় তার দুরন্ত গ্রাস। তাকানো যায় না সেদিকে। কপাল টন্‌টন্ ক'রে ওঠে, চোখের তারা যেন ঠিকরে যায়। ওদিকে পথও অসম্ভব তেতে ওঠে দিনের বেলা। তবু আমি জানালা বন্ধ করি না। জানালা বন্ধ ক'রলে বাতাস না পেয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়ব। এম্‌নিতরো অবস্থায় যখন ছট্‌ফট্ করি তখন মহারাজের জন্যে মনটা কেমন করে। যদি লোকটা আসে তো বেঁচে যাই।

অবশ্য মহারাজ আসেই। হয়ত ঠিক সেই সময়েই আসে না কিন্তু আসেই। হঠাৎ নজরে পড়ে—ঘোড়ার ক্ষুরে পশ্চিমে পথের লালধুলো উড়িয়ে মহারাজ আসছে সত্যিকারের রাজপুতের মত। ঠাট্টা ক'রে আমি বলি, কি মহারাজ পূর্বপুরুষদের নাম রাখছ ঘোড়া ছুটিয়ে?

মহারাজ হেসে বলে, দেখুন বাবুজি— ঘোড়া একটা নাহলে এখানে চলে না!

বাস্তবিকই। শহরের পথ একটুখানি। বেড়াতে হ'লে পাহাড়েই বেড়াতে হয় এবং সেখানে যন্ত্রযুগের সহজলভ্য প্রত্যেকটি যানবাহনই অচল। তাই ঘোড়া সেই জায়গায় সত্যিই কার্যকরী। আমি মহারাজকে বলি, —আমায় ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দেবে মহারাজ?

মহারাজ বলে,—আচ্ছা বাবুজী।

দু-একদিন পাহাড়ে গিয়ে ঘোড়ায় চাপা অভ্যাস করি। দুর্বল শরীর খানিকটা যেতে না যেতে হাঁপিয়ে পড়ে।

মহারাজ বলে, —আপনার শরীর ঠিক নেই বাবুজী!

—তা ঠিক।

তবু এরি মধ্যে একদিন ঘোড়ায় চেপে সাঁওতাল পল্লীতে ঘুরে আসি। মহারাজের আর একটা বুড়ো ঘোড়া ছিল। সেটাকে নিলে মহারাজ আর ইদানীং সে নিজে যে ঘোড়াটা ব্যবহার ক'রছে সেটা দিলে আমাকে। দু-জনে মিলে চলি পাহাড়ের পথ বেয়ে।

ঘোড়ার পিঠে বসে দেখি পার্বত্য প্রকৃতির অপূর্ব শোভা। ওদিকে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া রক্তসূর্য, নীচে গাছপালা ও পাহাড়ের ছোট ছোট চূড়া—তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মত নিঃসীম। আমরা চলেছি, কানে আমাদের অশ্বক্ষুরের ধ্বনি।

পাহাড়ের মাঝে মাঝে সমতলভূমি দেখে সাঁওতালরা ঘর বেঁধেছে। ছোট ছোট ঘর পাশাপশি ঠাসাঠাসি। কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা যেমন গোবর দিয়ে ঘর নিকোয় ঠিক তেমনি ক'রেই সাঁওতাল বধূরা ঘর নিকিয়েছে। সাবুই ঘাসে ঘরগুলো ছাওয়া। দেয়ালে [illegible] সৌন্দর্যানুভূতির বিকাশ। দু-একটা জন্তু জানোয়ারের ছবি—যেন অজন্তার চিত্র। যারা চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি জানে না, তারা দিয়েছে দেয়ালের চারিদিকে গিরিমাটির অসংখ্য [illegible] ফোঁটা। মাঝে মাঝে দু-একটা চুনের ফোঁটাও দেখা যায়। প্রত্যেক বাড়ীরই উঠোন আছে। উঠোনের একদিকে গরু বাঁধা, অন্য সবদিকে পাল পাল মুরগী আর ছাগল।

মহারাজ আর আমি একটা উঠোনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ি। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে একটি কুড়ি একুশ বছরের মেয়ে। মাথায় [illegible] খোঁপা। খোঁপায় গোঁজা কি একটা সাদা পাহাড়ী ফুল। নিটোল স্বাস্থ্য মেয়েটির, যেন পাথরে কোঁদা। মেয়েটি এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলে— সর্দারকে [illegible] মহারাজ [illegible]

[illegible] লখিয়া —মহারাজ বলে।

[illegible]

মহারাজ ইসারা [illegible] সঙ্গে যাই। মহারাজ নিজের [illegible] একটা [illegible] অপর একটা [illegible] বাবে। তারপর দু জনেই বসি [illegible]

কিছুক্ষণ পরেই সর্দার আসে। [illegible] বুড়ো হয়েছে। গলায় কুচের মালা। [illegible] গায়ের চামড়া কোঁচকাতে শুরু করেছে। আমাদের দেখে বিশেষ ক'রে আমাকে দেখে সর্দার যেন কেমন একটু [illegible] মহারাজকে [illegible] স্বরে সে বলে,— আসমানের চাঁদ এতো [illegible] কিন্তু তাকে খাতির করোন।

সর্দার [illegible] —লখিয়া

লখিয়া [illegible] সাড়া দিতে দিতে ছুটে আসে। সর্দার চেঁচিয়ে বলে —সাদা পাইটাকে [illegible] দুধ দুয়ে [illegible] দে। বাবুকে খেতে দিব। আর [illegible] খবর দে চিকনকে। সে শহরে যাবে, ভাল প্যাঁড়া কিনে আনুক—

সর্দারের কথা আমি এক বর্ণও বুঝতে পারি না। মহারাজ আমাকে বুঝিয়ে দেয়। বাস্ত [illegible] —সর্দার [illegible] আমি এমনি এসেছি বেড়াতে।

—এই [illegible]

কথা চলে মহারাজের [illegible]

আর কিছু বলা যায়না। সভ্যতার স্পর্শ লেগে সাঁওতালরাও ক্রমশঃ লৌকিক আচারের মধ্যে নিজেদের টেনে আনছে। সাদা গাইয়ের দুধ জ্বাল দিয়ে আমাকে দেয়াটা লৌকিকতা নয় আতিথ্য। কিন্তু প্যাঁড়া কেনবার জন্য চিকনকে শহরে পাঠানোটা নিশ্চয়ই তাই। শেষোক্ত ব্যাপারটা তাদের বাইরে থেকে আমদানী করা।

চিকন আসে। আশ্চর্য রকমের চেহারাটার তার। কোন্ বিশ্বকর্মা যে তাঁর শিল্পীমনের সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষ ক'রে তাকে তৈরী করেছিলেন তাই শুধু ভাবি। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল কানে কাপোর আংটা, টিকালো নাক, টানা টানা দুটো চোখ, বুকের মাংসপেশীগুলো একটুখু সঞ্চালনে মহাসমুদ্রের অসংখ্য ঢেউয়ের মত একই সঙ্গে দুলে দুলে উঠে। সে আসতেই সর্দার তাকে হুকুম করে। কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত যেতে দিই না তাকে।

অতঃপরে চিকনকে লখিয়ার কাজে সাহায্য করতে বলে দিয়ে বুড়ো মহারাজের সঙ্গে নানারকম আলোচনা সুরু করে। তার বেশিরভাগ কথাই কতকগুলি সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে। অনেকদিন তারা কয়লাখনির কাজে গেছে এবার তাদের কিছুদিনের জন্য ছুটি

দেয়া দরকার। মহারাজ ছেলেমেয়েগুলির পুরো একটা লিষ্ট তৈরি ক'রে নেয়। তারপর বলে,—তাতে আর কি সর্দ্দার, ছুটিতে সবাই আস্‌বে।

সর্দ্দার বলে, —কিন্তু তাদের পুরো মাইনেটা আমাকে দিতে হবে মহারাজ।

উহু তা' হবে না, —মহারাজ বলে। সে আমাদের নিয়ম না আছে।

আসল কথা কিন্তু মহারাজ আমাকে বলে,—পুরো মাইনে মিটিয়ে দিলে বাবুজি ওরা আর খনির কাজে যাবে না। সেই টাকা নিয়ে এখানেই দু-একটা গরুভইস্‌ কিন্‌বে, আর দুধের ব্যবসা ক'রবে।

বুঝতে চেষ্টা করি মহারাজ এদের কোন দৃষ্টি নিয়ে ভাল ক'রছে বা ক'রতে চায়। খানিক বাদেই লখিয়ার জ্বাল দেয়া দুধ প্রকাণ্ড একটা জামবাটিতে ক'রে চিকন্‌ নিয়ে আসে। মহারাজ এদের হাতে খায় না, আমাকেই খেতে হয়। খাওয়া হ'লে চিকন্‌কে দেখিয়ে সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করি, —এটি তোমার কে?

উত্তর দেয় মহারাজ। বলে, —নাতি।

আমি বলি, —লখিয়ার ভাই?

সর্দ্দার এবার উত্তর দেয়। বলে, —হ্যাঁ, ওদের মা-বাপ আমার কাছে ওদের দু-জনকে রেখে খনির কাজে যায় কিন্তু আর ফেরে না তারা।

মনে মনে ভাবি, খনি সম্বন্ধে এদের অভিজ্ঞতার কথা। আসবার সময় সর্দ্দারকে বলি, —সর্দ্দার এবার পাহাড়ের মাঝে ঝরণার সন্ধান পেয়েছি, মাঝে মাঝে উৎপাত ক'রে যাব।

সর্দ্দার বলে, —বেশতো, —এসো তুমি বাবুজি।

আমরা বেরিয়ে পড়ি যে যার ঘোড়া নিয়ে। মহারাজ বক্‌তে সুরু করে,—এদের মত সরল মানুষ তুমি পাবে না বাবুজি। তবু এদের, সাহেবরা খারাপ ক'রে দিয়েছে।

প্রশ্ন করি,— কি করে?

—বাবুজি। শহরের ওদিকে নীলকুঠির ভাঙ্গা-বাড়ীগুলো দেখেছেন কিনা জানি না। একদিন সেইখানে এদের মেহনৎ মাটি হ'য়ে যেত। ওরা সে সময় শুধুই ঠকেছে। তারপর সবচেয়ে বেশি ঠকেছে ওরা, যেদিন ওদের বুক থেকে ওদের যোয়ান যোয়ান ছেলেগুলোকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

পুনরায় প্রশ্ন করি, —সেটা কি রকম মহারাজ?

মহারাজ হেসে বলে, —বাবুজি তুমি লিখাপড়া জানো—আর সে কথাটা জানো না?

চোখের সমুখ থেকে আমার একটা পর্দা সরে যায়। মনে পড়ে খৃষ্টান মিশনারীদের কথা। সে সব কথা ভোলবার নয়, ভোলাও যায় না। কিন্তু মহাত্মা কেরী বা মার্সম্যানের কথা যখন আমার মনে পড়ে তখন মিশনারী সাহেবদের আন্দোলন সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ ক'রতে আমার রীতিমত ভয় হয়, —ভয় হয় পাছে সেই সব মহাত্মা পুরুষদের সহকর্ম্মীদের ওপর না জেনে কোনো কটাক্ষপাত ক'রে ফেলি। তবু ভারতের এই নিষ্পাপ যাযাবর জাতিকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করার কোনোই অর্থ বুঝতে পারি না।

আমি কোনো মতামত প্রকাশ করি না। মহারাজ অনর্গল বকে চলে। ক্রমশঃ ঘোড়া ছুটতে শুরু করে, জোর কদমে।

কয়েকদিন পরের কথা।

পাহাড়ের সেই ইউকালিপ্‌টাস্‌ গাছগুলোর নীচে, আমার পরিচিত পাথরটার ওপরে এসে বসেছি। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দিনান্তের সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত।

সঙ্গে মহারাজ নেই। কয়েকদিন আগে সে চলে গেছে তার কর্ম্মক্ষেত্রে। তার বড় সাহেব তাকে তলব ক'রেছে। কয়লা খনিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভিতরের পিলার ধ্বসে নাকি সমস্ত

খনিটাকে বরবাদ ক'রে দিয়েছে। অনেক লোকের প্রাণহানিও হ'য়েছে। বেশির ভাগই তারা মজুর। খবরের কাগজে আমি ও মহারাজ আগেই দেখেছিলুম। মহারাজ তো মুষড়ে পড়ল। কে জানে কে বা কারা মারা গেল। কাগজে কারো নাম বেরোয়নি। যাই হোক শেষপর্যন্ত মহারাজের বড়সাহেবের 'তার' এলো তার কাছে। মহারাজ মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব না ক'রে বেরিয়ে পড়ল খনির উদ্দেশ্যে।

সেই থেকে আমি ক'দিন একাই কাটাচ্ছি। মহারাজ ফিরেছে কি-না তারও কোনো খবর জানি না। অবিশ্যি এলে সে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা ক'রত। এদিকে বাড়ী থেকেও চিঠি এসেছে ঃ স্বাস্থ্য যদি তেমন ভাবে না ফেরে, তবে চলে এস। তাই কি ক'রব ক'দিন যেন এক সমস্যায় পড়েছি।

পাহাড়ের এই নির্জ্জন প্রান্তরে বসে বসে এইসব সাতপাঁচ ভাবছি এমন অবস্থায় সাবুই ঘাসের মাঝখান থেকে শুনলুম একটা প্রচণ্ড হট্টগোল। পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে উঠে দেখি, সাঁওতালদের সেই বুড়ো সর্দারটা তীর ধনুক হাতে নিয়ে ছুটছে। তার পিছনে আবার চিকন্! কি ব্যাপার! দেখতে পেলুম একদল আহির এক জায়গায় গরুচরানো লাঠি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে আর ঠিক তার সামনাসামনি চিকন্ তার হাতের ধনুক তীর লাগাচ্ছে তাদেরই লক্ষ ক'রে। আমি শিউরে উঠে হাঁকি, —চিকন্?

চিকন্ আমার দিকে তাকায় না। শুধু পিছনদিকে হাতটা নেড়ে আমাকে থামতে ইঙ্গিত করে।

ওকি! একটি আহির বুকে তীরবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল যে! আরও একটা ... আরও ... আরও উপর্য্যুপরি কয়েকটা।

সহসা পিছন থেকে আমার কাঁধে একটা হাত এসে পড়ে। চম্‌কে উঠে সেদিকে তাকাই। দেখি মহারাজ! মহারাজের মুখে অদ্ভুত একরকম হাসি। জিজ্ঞাসা করি, — একি মহারাজ — তুমি?

হাঁ বাবুজী। মহারাজ বলে, — আমি চলে এসেছি কয়েকদিন আগে, সময় পাইনি বলে দেখা ক'রতে পারিনি।

সভয়ে ও সবিস্ময়ে আমি বলে উঠি, —কিন্তু এসব কি মহারাজ!

বলব সব। মহারাজ বলে,—আগে ফিরিয়ে আনি ওদের ...

মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে মহারাজ এগিয়ে যায় সেদিকে। আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটার সূত্র খোঁজবার চেষ্টা করি।

খানিক পরে সাঁওতাল সর্দ্দার, চিকন্ এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে মহারাজ আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর সর্দ্দারকে বলে,— ভয় নেই সর্দ্দার আমি আছি। তোমাদের যদি কেউ ধরতে আসে তা'হলে আমাকে ডাকবে।

সর্দ্দার আর চিকন্ দলবলকে নিয়ে ফিরে যায়। মহারাজ সেইখানেই বসে পড়ে ক্লান্তভাবে। মাথার টুপিটাকে খুলে বাঁ হাতের তালুতে রাখে। তারপর ডানহাতে ক'রে পাকাচুল গুলোতে হাত বুলোয়। আজ যেন মহারাজকে সত্যিই বুড়ো বলে মনে হয়। আজ যেন তার ভিতর থেকে তার ঠিকাদারী মনটা কোথাও পালিয়েছে। কপালের শিরাগুলো ঠেলে উঠেছে। পোষাকটাও আজ কেমন যেন বিশ্রী। ময়লা পাঞ্জাবী, ময়লা ধুতি, ছেঁড়া নাগরা। মহারাজ বসে পড়ে যেন হাঁপায়।

ব্যাপার কি মহারাজ! আমি বলে উঠি, —কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

মহারাজ হাসে, ম্লানহাসি। আঙুল দিয়ে দেখায় দিগন্তের সূর্য্যের দিকে। তারপর বলে, —বাবুজি! মানুষের জীবনও অম্‌নিতরো। তারও কাজ ফুরালে সে অমনিই ম্লান হ'য়ে

আসে। রাজপুত আমি, বহুকাল ধরে মানুষের রক্তের বিনিময়ে রক্ত নেয়া আমাদের পেশা। কিন্তু রাজপুত কখনো ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেনি!

এসব কি বলে মহারাজ! তার কণ্ঠে যেন অনুশোচনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। আমি জিজ্ঞাসা করি,—মহারাজ এসব তুমি কি বলছ?

মহারাজ টুপিটাকে একটা পাথরের ওপরে রেখে বলে, —আমি ঠিকই বলছি বাবুজি। আপনি ভাবতে পারেন—এই যে খুন হ'য়ে গেল, এর মূলে আমি ছাড়া আর কেউ নেই?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাই। সে বলে, —বাবুজি কয়লাখনি ধসে গিয়ে সাঁওতাল মহল্লার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে খনির মালিকদেরও। যা হবার তা তো হ'য়েই গেল। নতুন খাদে কাজ শুরু করাবে মালিকেরা। কিন্তু কোথাও আর একটিও মজুর নেই। সব পালিয়েছে। আমার ওপরে ভার পড়ল—মজুর আনতেই হবে। কিন্তু কদিন ধ'রে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও এদের আমি রাজি করাতে পারলুম না। এরা সবাই বললে, —নিশ্চয়ই খাদ ধসিয়ে অর্থাৎ ডিনামাইট পুঁতে ফাটিয়ে দেওয়া হ'য়েছে—আমরা আর যাব না। আমি তো একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলুম। তারপর ভেবে ভেবে এই পথ বের করলুম। এই যে কটা নির্দোষ আহিরের জান চ'লে গেল, এ আমারই জন্য!

বুঝতে পারলুম মহারাজের অবস্থা। একদিকে তার ঠিকাদারী বৃত্তির দুর্নিবার ক্ষুধা, আর একদিকে তার রক্তে জড়িয়ে আছে যে বীর রাজপুত জাতির ইতিহাস—এই দুইয়েরই দ্বন্দ্ব চলেছে তার মনে।

মহারাজ বলে চলে, —তাই একদিন লখিয়াকে চুরি ক'রে নিয়ে এলুম ঘোড়ায় চাপিয়ে। তাকে আটক রেখে দিলুম। সাঁওতাল পাড়ায় পঞ্চায়েৎ বসল। সেখানে বললুম—এ নিশ্চয়ই ব্যাটা আহিরদের কাজ। ওরাও তাই বললে। ব্যস! সাঁওতালরা তুলে নিলে তাদের কাঁড়। শালকবাঁধা তীরগুলোকে পাথরে ঘষে আগুনের ঝুলকি কাট্‌লে বারকয়েক, তারপর বেরিয়ে পড়ল এই দাঙ্গায়—

—এরকম ক'রে তোমার কি লাভ হ'ল মহারাজ? জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

মহারাজ এবার বিস্ফারিত চোখে বলে, —লাভ তো হবে এইবার। তসিলদার আসবে, আসবে নগররক্ষক, তালুকের ম্যাজিস্ট্রেট। সাঁওতালরা ভয়ে কুঁকড়ে এসে পড়বে আমার কাছে। আর একটি একটি ক'রে আমি ওদের চালান ক'রে দেব খনিতে। এই তো আমার ব্যবসা।

আমি শিউরে উঠি। সম্ভবতঃ মহারাজ বুঝতে পারে আমার অবস্থাটা, তাই উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর আমার পিঠে হাত রেখে বলে, —বাবুজি ঘাবড়াও মৎ ... আমি রাজপুত।

শেষ কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে নীচু হয়ে টুপিটা তুলে নেয় পাথরের ওপর থেকে এবং তারপরই সুরু ক'রে দেয় চলতে।

পাহাড়ের একটা গাছে সে বেঁধে রেখে এসেছিল তার ঘোড়া। ঘোড়াটাকে খুলে নিয়েই সে এক লাফে তার পিঠে উঠে বসে। আমি তাকে অনুসরণ ক'রতে ক'রতে একেবারে তার কাছেই এসে পড়েছিলুম। বললুম—এরপর কি ক'রবে মহারাজ?

শুধু একটি মাত্র উত্তর, —লখিয়াকে আমি বাড়ী পৌঁছে দোব বাবুজি।

আর কোনো উত্তর নেই। শুধু ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ খট্ খট্। আর সাবুই ঘাসের বনে মর্ম্মরিত হ'য়ে ওঠে তার প্রতিধ্বনি।

আসন্ন সন্ধ্যায় আমি খুঁজতে লাগলুম আমার পথ।

দায়

রঞ্জন ধর

অনেকক্ষণ ধরে একটা অস্বস্তি বোধ করছে রিনা। অবিশ্যি এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়। তবে সব দিন নয়, ভিড়ের বাস-এ মাঝে মাঝে এমনি অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় বৈকি! রিনা একটু আড়চোখে দেখে নেয় লোকটিকে। বয়স মাঝারি, চোখে-মুখে নির্বিকার ভাব, যেন যা ঘটছে তা সে বুঝতেই পারছে না অথবা বুঝলেও তাব করার কিছু নেই। ভিড়ের চাপে অমন ঘটেই থাকে। লোকটা বোধহয় জানে না যে, ভিড়ের চাপে কিছু ঘটা আর ইচ্ছা ক'রে ঘটানোর তফাৎটা মেয়েরা বুঝতে পারে। কিন্তু এই নিয়ে আজকাল কিছু বলতে যাওয়া মুশকিল। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ পুরুষকণ্ঠ প্রতিবাদ করে উঠবে, 'অত যদি স্পর্শকাতরতা, ট্যাক্সি ক'রে গেলেই পারেন।' সবচেয়ে বেশি গর্জন করবে এই লোকটি, যে অন্তত মনে মনে নিজেকে অপরাধী বলে জানে। রিনার অফিসেব বিশাখা একদিন সামান্য প্রতিবাদ করতে গিয়ে এমনি অবস্থাব সম্মুখীন হয়েছিল। চাবদিক থেকে তার ওপব কথার আক্রমণ। শেষটায় বাধ্য হয়ে তাকে গন্তব্যের আগেই বাস থেকে নেমে যেতে হয়েছিল। আগে পুরুষদের মধ্যে অন্তত কিছু সংখ্যক মেয়েদের সমর্থনে কথা বলত, আজকাল বলে না। এর কাবণ রিনাব জানা নেই। হয়ত চাকরি-করা মেয়েদের সম্পর্কে তাদের মনে ঈর্ষা বা একরকমের বিরূপতা দেখা দিয়ে থাকবে। যেন মেয়েরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তাদের অধিকাব কেড়ে নিতে বসেছে।

অফিসের মধ্যেও অনেকের এমনি মানসিকতা। এই তো কয়েকমাস আগে রিনা একটা প্রমোশন পেয়েছে—এল-ডি থেকে ইউ-ডি। অমনি শুরু হয়েছে গুঞ্জন! রিনা নাকি নিজের পারফরমেনসের জন্য নয়, অন্যভাবে অফিসারকে খুশি করার জন্য প্রমোশন পেয়েছে! কী নোংরা চিন্তা! কিন্তু কেউ যদি ও রকম ভাবে, সে আটকাবে কেমন ক'রে? এ তো তার ব্যক্তিগত রুচি-অভিরুচিব ব্যাপার। যেমন এই লোকটি! পোশাকে-পরিচ্ছদে যথেষ্ট ভদ্র, হয়ত ভাল চাকরিও করে, অথচ তার মধ্যে যে অমন একটা কুৎসিত মন লুকিয়ে রয়েছে, বাইরে থেকে কিছু বুঝবার কি উপায় আছে? রিনা কিছু বললেও লোকে বিশ্বাস করবে না। তার ভদ্র চেহারা আব পোশাকই তাকে বাঁচিয়ে দেবে। গড়িয়াহাট থেকে যাদবপুর পর্যন্ত ভিড়ের সুযোগ নিয়ে লোকটা রিনার শরীরের সঙ্গে একরকম লেপ্টে থেকে তার অশালীন মনের পরিচয় রেখে গেল। সামনের সিটে বসা একটি মেয়ের দৃষ্টি এড়ায়নি। সে রিনার সঙ্গে চোখাচোখি হলে একটু মুচকি হাসল, যার মানে, এটুকু মেনে নেওযা ছাড়া আর উপায় কি আমাদের?

প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে রিনা গাঙ্গুলীবাগান স্টপেজে বাস থেকে নামল। লোকটার আচরণ সে ভুলতে পারছে না। এ-সব লোক সমস্ত পুরুষজাতেব ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দেয়। খোলা হাওয়ায় কিছুক্ষণ হাঁটার পব উত্তেজনা থিতিয়ে আসে। রিনা একটা মুদি দোকানেব সামনে দাড়ায়। কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিয়ে কোয়ার্টারের দিকে চলতে শুরু করে আবার।

বাস-রাস্তা থেকে চার-পাঁচ মিনিট হাঁটতে হয়। সরকারি টেনামেন্ট স্কীমের কোয়ার্টারস। একটা ক'রে ঘর, সঙ্গে স্টোর-কাম-কিচেন আর বাথরুম। পাশাপাশি অনেকগুলি ফ্ল্যাটের সামনে লম্বা বারান্দা। কারুর ফ্ল্যাটে যেতে হলে অন্যের ফ্ল্যাটের সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। দরজা বন্ধ রাখলেও কার ঘরে কি কথা হচ্ছে বাইরে থেকে শোনা যায়। সব সময় সতর্ক থেকে নিচুগলায় কথাবার্তা বলা কি সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে? বিশেষ ক'রে পারিবারিক উত্তেজনা বা ঝগড়াঝাটির সময়? এই দিক থেকে রিনার সুবিধা। তার ফ্ল্যাট একেবারে শেষ মাথায়, কাউকে তার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হয় না। এ ছাড়া একটা বাড়তি সুবিধাও সে পেয়েছে। যেহেতু তার বারান্দা পর্যন্ত কাউকে আসতে হয় না, তাই সে বারান্দাটাকে টিন দিয়ে ঘিরে একটা চিলতে ঘর করে নিতে পেয়েছে। লোকজন এসে ওখানে বসে। অতিথি এলে শোয়ার ব্যবস্থা করা যায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের ছোট্ট সংসার, তাই এভাবেই চলে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে লাইট আর ফ্যানের সুইচ অন্ ক'রে হাতের জিনিসপত্রগুলো আর ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে রিনা এসে ফ্যানের তলায় বিছানার ওপর বসে। বাস-এর এক-দেড়ঘণ্টা ধকলের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিলে অন্য কাজে হাত দেওয়ার এনার্জি ফিরে আসে না। চা করা, ঘর গোছানো, রাত্রির রান্না সবই তাকে করতে হবে। ফ্রিজ নেই। সকালের রান্না রাত্রিবেলা পর্যন্ত থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়, তাই রাত্রির রান্না রাত্রেই রাঁধতে হয়। সাহায্য করার কেউ নেই। অর্ণব তো ফিরবে সেই কত রাতে, তার কোনো ঠিক নেই। আর আগে ফিরলেই বা কী, সে-কি সাহায্য করবে রিনাকে? সে একজন সোস্যাল ওয়ার্কার। অফিসে ইউনিয়নের পাণ্ডা, এখানেও রয়েছে তার ক্লাব আর পার্টি, চা-এর দোকানের আড্ডা। এসব ক'রে সংসারের কাজে রিনাকে একটু সাহায্য করার মত তার সময় কোথায়? কিছু বললে অমনি, যেন সে অন্য একটা উঁচু জগতের মানুষ, এমনি মুখভঙ্গি করে বলবে, 'এই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে তুমি আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চাও? জান, বাইরে আমার কত কাজ!' রিনা যদি বলে, 'ঘরটা কি আমার একার, এর সব ঝামেলা কি আমি একা সামলাব?' তক্ষুনি সে জবাব দেবে, 'আমি কি করতে পারি বল। বাইরের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সেলফ্‌সেন্টারড হয়ে জীবন কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' আর কি বলবে রিনা, তখন রাগে চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? বেশি তর্ক করতে গেলে লাগবে ঝগড়া। এই জিনিসটাকে সে সব সময় এভয়েড্ করে চলতে চায়। রুচিতে বাধে। তাছাড়া যে তার অসুবিধাগুলি বুঝতে চায় না, তাকে সে কেমন ক'রে বোঝাবে?

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রিনা উঠে পড়ে। অফিসের শাড়ি ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধোয়। এক কাপ চা না খেয়ে কাজে হাত লাগানো যাবে না, সে গ্যাসের উনুনে চা-এর জল চাপায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা তৈরি হয়ে যায়, কাপটা হাতে নিয়ে এসে আবার ফ্যানের তলায় বসে রিনা। একবার সারা ঘরে চোখ বুলোয়। সব এলোমেলো হয়ে আছে। সকালে তাড়াহুড়ো করে সব কাজ সেরে আর ঘর গুছিয়ে রেখে যাবার মত সময় থাকে না। অর্ণবের একটু দেরিতে ঘুম ভাঙে, তবু দয়া করে সে বাজারটা করে দেয়, এই যথেষ্ট। বাজার এলে সাত-তাড়াতাড়ি ক'রে মাছ-তরকারি কোটা, রান্না করা, তারপর চান-খাওয়া সেরে অফিসের জন্য তৈরি হয়ে বাস ধরতে ছুটতে হয়। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নেবার জো নেই, তা হলেই লেট। না, রিনা অন্যদের মত লেট করে অফিসে যায় না। এই ব্যাপারে তার সুনাম আছে। কাজের ব্যাপারেও আছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মিস্টার ঘোষ তার প্রশংসা করেন এবং তার এ-সি-আরও ভাল লেখেন। এই জন্যই তার এত তাড়াতাড়ি প্রমোশন পাওয়া সম্ভব হয়েছে, অথচ এই সহজ সত্যটাকে অস্বীকার ক'রে কলীগ্‌দের কেউ কেউ অন্য

রকম রটিয়েছে। আসলে ঈর্ষা। এমন কি অর্ণবও এর বাইরে নয়। নিজে তো বারোবছর ধরে এল-ডি হয়ে পড়ে রয়েছে। থাকবেই বা না কেন। রোজ লেট, যখন খুশি অফিসে গিয়ে হাজিরা দেওয়া। ওর অফিসার কিছু বলেনা কেবল ইউনিয়নের পাণ্ডা, এই ভয়ে। সারা দিনে একঘণ্টাও সিটে থাকে কিনা সন্দেহ। নিজেই গর্ব ক'রে বলে, 'আমাকে কে বলবে। অতখানি বুকের পাটাঅলা অফিসার জন্মেছে নাকি?' জন্মেছে কিনা টের পাওয়া যায় বারোবছর এক গ্রেডে পড়ে থাকা দেখে। মুখে কিছু বলার দরকার কি, যদি এ-সি-আর-এ বছরের শেষে কলমের খোঁচায় প্রমোশনের বারোটা বাজিয়ে দেওয়া যায়। আলাদা অফিস হলে কি হবে, রিনা সব খবর রাখে। অর্ণবের অফিসে কাজ করে তার এক বন্ধু, ওর কাছ থেকে সব জানতে পারে সে। তাছাড়া রাগের মাথায় অর্ণবও মাঝে মাঝে বলে, 'শালা ব্যানার্জিটা আমাকে প্রত্যেক বছর খারাপ রিপোর্ট দেয়।' রিনা সহানুভূতি জানিয়ে বলেছিল, 'লেট ক'রে যাওয়া বন্ধ করে অফিসের কাজকর্ম কিছু কিছু কর, নইলে কীসের ভিত্তিতে তোমার ভাল রিপোর্ট যাবে?' শুনে ভীষণ রেগে গিয়েছিল অর্ণব। চিৎকার ক'রে বলেছিল, 'সব বাজে কথা। যারা অফিসারের পায়ে তেল মাখায়, তাদের জন্যই শুধু ভাল রিপোর্ট যায়।' শুনে ভীষণ বিরক্তি লাগে রিনার। অর্ণব মাঝে মাঝে এমনি স্থূল ভাষায় কথা বলে। রিনা প্রতিবাদ ক'রে বলে, 'হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, তবে সব ক্ষেত্রে নয়। তোমার কি ধারণা, আমি ওভাবে প্রমোশন পেয়েছি?' একটু চুপ ক'রে থেকে সে বোধহয় ভেবে নেয়, পরে বলে, 'কেমন করে বলব? তোমার ব্যাপার তুমিই জান।' হাসতে চেষ্টা করে, তবে সেই হাসিটা যেন প্রাণ থেকে আসেনি। অন্তত রিনার তাই মনে হয়েছিল। অর্ণব আরও বলেছিল, 'আমি কোনো শালাকে খুশি ক'রে প্রমোশন চাই না। আমার একটা আদর্শ আছে। প্রমোশন আটকে রেখে আমাকে ওরা দমাতে পারবে না।' তা ঠিক। অফিসে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে ও খুব পপুলার। যে কোনো সংগ্রামে আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাছাড়া খুব মন খোলা। মনের কথা চেপে রাখতে পারে না, কেউ খুশি হবে না জেনেও সোজা মুখের ওপর বলে দেয়। কিছু আটকায় না। সেদিন রিনা তাকে প্রমোশনের খবরটা দিল, সেদিন একটু অবাক হয়ে সে মন্তব্য করল, 'এত অল্পদিনের মধ্যে আপগ্রেডিং!' খুব অস্বাভাবিক। কীসের বিনিময়ে তোমার অফিসারের মন জয় করলে!' শুনে ভীষণ রাগ হয়েছিল রিনার, তবু তার ইঙ্গিতটাকে গায়ে না মেখে সে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেছিল, 'কাজের বিনিময়ে। আমি তোমার মত ফাঁকি দিই না, জানতো! লেট করে অফিসে যাওয়ার অভ্যাসও নেই।' এ-ও রিনা লক্ষ্য করেছে, তার প্রমোশনের পর থেকে অর্ণবের মধ্যে যেন এক রকমের কমপ্লেক্স দেখা দিয়েছে। পুরুষ হিসেবে তার সভিনিস্টিক মর্যাদায় ঘা লেগেছে বলে কি সে মনে করে? কিন্তু তা তো তার মনে করার কথা নয়। সে যে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদার আদর্শে বিশ্বাসী। বোধহয় বিশ্বাস আর তার বাস্তবায়ন এক নয়, নইলে আজকাল পারিবারিক বিষয়ে কিম্বা যে কোন বিষয়ে রিনা একটুখানি দৃঢ়ভাবে তার মত ব্যক্ত করতে গেলেই অর্ণব হঠাৎ রেগে যায়, আপাতদৃষ্টিতে যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু রিনা সেটা অনুভব করতে পারে, তাই কথা বলার সময় তাকে সচেতন থাকতে হয় আজকাল।

চা খাওয়া হয়ে গেলে রিনা উঠতে যাবে, তখন ঘরে ঢোকে পাশের ফ্ল্যাটের সুনন্দা। তার হাতে একটা খাম।

'রিনা, তোমার চিঠি।'

সুনন্দার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে রিনা বলে, 'তোমার খবর কি সুনন্দাদি?'

'আমার আবার খবর থাকে নাকি?' হেসে সুনন্দা বলে, আমি তো খাঁচায় বন্দী। ঘরে থাকি, রান্না করি, স্বামী আর ছেলে-মেয়ের মন জুগিয়ে চলি।'

আরও কিছুক্ষণ ঘরোয়া বিষয়ে কথাবার্তার পর সুনন্দা চলে গেলে রিনা খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে। মা-এর চিঠি। পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে রিনা। পড়া শেষ হলে বসে থাকে কিছুক্ষণ। নতুন একটা সমস্যা দেখা দিল তার সামনে।

বর্ধমানের বৈঁচী গ্রামে তাদের বাড়ি। বাবার মৃত্যুর পর দাদাই সংসারের কর্তা। সত্যি কথা, তার আয় খুব বেশি নয়— বৌদি আর তার তিন ছেলেমেয়ে, এর ওপর মা, ছোট ভাই রণু, এই নিয়ে সংসার। রণু এবার স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। দাদা বলে দিয়েছে, আর তাকে পড়াতে পারবে না, এবার নিজের ব্যবস্থা সে নিজে করুক। রণুর ইচ্ছা, আরো পড়বে। এই নিয়ে অশান্তি চলছে, রণু কান্নাকাটি করছে। তাই নিরুপায় হয়ে মা রিনাকে লিখেছে রণুর পড়াশুনার দায়িত্ব নিতে।

রিনা নিজের কর্তব্য স্থির ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মনে মনে একটা প্ল্যান করে। বারান্দার চিলতে ঘরটায় ঢুকে চোখ বুলিয়ে জরিপ করে। পাঁচ ফুট বাই চৌদ্দ ফুট ঘর। দু'দিকে দু'টো জানলা। আলো-হাওয়ার অভাব হবে না। দরকার হলে একধারে একটা টেবিলফ্যান বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। একটা চৌকি পাতা আছে, ছোট একটা টেবিলও ধরবে পড়াশুনার জন্যে। বইপত্র রাখার জন্য একটা ছোটখাটো র‍্যাক ধরাতেও অসুবিধা হবে না। অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে রিনা। এখন শুধু অর্ণবের মত নিতে হবে। রিনার মনে হয় না, তার দিক থেকে কোনো আপত্তি উঠবে। সে যদি রাজী হয়, রিনা কালই চিঠি লিখে দেবে মাকে। দাদা নাই বা তার দায়িত্ব নিল, এর জন্য রণুর পড়া বন্ধ থাকবে? একটা তো মাত্র ছোট ভাই, ছোটবেলা থেকেই সে তার একান্ত আদরের, তার জন্য কি এটুকুও করতে পারবে না রিনা? তাহলে আর স্নেহ ভালবাসার কি মূল্য রইল!

রিনা আর সময় নষ্ট না ক'রে রান্নার কাজে হাত লাগায়। ছুটির দিন ছাড়া তাদের সারা সপ্তাহের খাওয়া-দাওয়া খুব সাদাসিধে। সময় কোথায় পাঁচ রকম রান্না করার! বেশির ভাগ দিন ডালের সঙ্গে একটা ভাজা বা আলুসেদ্ধ আর ডিমের ঝোল। এরকম বিষয়ে অর্ণবের কোনো বিশেষ ধরনের আব্দার নেই। একটা কিছু হলেই হ'ল।

রান্না প্রায় শেষ, তখনও গ্যাস নেভানো হয় নি—অর্ণব ঘরে ঢোকে। তাকে দেখে রিনা বলে, 'চা করব, নাকি আড্ডা থেকে খেয়ে এসেছ?'

'সে তো অনেকবার খেয়েছি—তা বলে কি আর খেতে নেই?' জামা খুলতে খুলতে জবাব দেয় অর্ণব।

রিনা কেৎলিতে ক'রে দু'কাপ চা এর জল চড়ায়। অর্ণব জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমে চান করতে ঢোকে। যত রাত্রিই হোক, ফিরে এসে তার বারো মাস চান করা চাই। চান সেরে বেরিয়ে এসে সে টেবিলের ওপর খোলা চিঠিটা দেখতে পায়। 'কার চিঠি?' জিজ্ঞেস করে।

রান্নাঘরে কাপে চা ঢালতে ঢালতে জবাব দেয় রিনা—'মা-এর চিঠি। পড়ে দেখ, অনেক দরকারি কথা লিখেছে।'

চিঠিটা হাতে তুলে নেয় অর্ণব। পড়তে পড়তে তার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। পড়া শেষ হ'লে তেমনি চাপা দিয়ে রেখে দেয়। কোনো মন্তব্য করে না।

'পড়েছ?'

দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢোকে রিনা। একটা কাপ অর্ণবের সামনে টেবিলের ওপর রেখে আর একটা কাপ নিয়ে সে একটু দূরে গিয়ে বসে। নিজে থেকে তার মত জানতে একটু সঙ্কোচ বোধ করে। কিন্তু অপেক্ষা করতে হয় না তাকে বেশিক্ষণ।

'এ হ'তে পারে না।' অর্ণব বলে।

'কেন?' মৃদুস্বরে জানতে চায় রিনা। হাতে চা-এর কাপটা ধরাই থাকে, চুমুক দিতে ভুলে যায়। একই অবস্থা অর্ণবেরও।

'একটা ঘর, জিনিশপত্রে ঠাসা—এর ওপর আর একজন এলে কী অবস্থা দাঁড়াবে, বুঝতে পারছ না?' শান্তভাবেই বুঝাতে চেষ্টা করে অর্ণব, 'তোমার ওপরও দারুণ চাপ পড়বে, সামলাতে পারবে না। তাছাড়া এখন রান্নার লোক রাখা সম্ভব নয়। অনেক খরচ।'

'লোক রাখব কেন, আমি নিজেই পারব।' জবাব দেয় রিনা।

'তা না হয় পারলে, কিন্তু থাকার ব্যবস্থা?'

'সে-ও ভেবে রেখেছি। বারান্দার ঘরটায় ও থাকতে পারবে।'

'তবু এর অনেক ঝামেলা। দু'জনে বেশ আছি, এর ওপর কোন উটকো ঝামেলা আমার পছন্দ নয়।'

'উটকো বলছ কেন? মনের ক্ষোভটা চেপে রেখে রিনা শান্তকণ্ঠে বলে, 'অন্য কোনো উপায় থাকলে মা কি এ-প্রস্তাব দিত? মা এর অবস্থাটা ভেবে দেখ।

'ভেবেছি।' অর্ণবের বিরক্তি চাপা থাকে না, 'নিজের বড় ছেলের ঘাড়ে সে দায় চাপাতে পারেন নি, সেটা আমাদের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন।'

রিনা অর্ণবের চোখে দৃষ্টি রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, অনেকগুলি প্রশ্ন তার জিভের ডগায় এসে যায়, কিন্তু সেগুলিকে চেপে রেখে সে শুধু বলে, 'মা হয়ত আমাদের আপন ভেবেই প্রস্তাবটা দিয়েছে, যাই হোক, আমি তাকে জানিয়ে দেব, রণুর এখানে থাকার অসুবিধা রয়েছে।'

অর্ণব কিছু বলে না। রণুর এখানে আসার ব্যাপারে তার যে মত নেই, সেটা খুবই স্পষ্ট। এ অবস্থায় নিজের ভাই-এর জন্য আর কিছু বলতে রিনার আত্মমর্যাদায় বাধে। নিঃশব্দে চা খেয়ে কাপটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে সে। হঠাৎ স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ গড়ে ওঠে। অন্যদিন এসময় নানা রকম কথা হয় তাদের মধ্যে, আজ কেউ কথা বলছে না। রিনা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত, আর অর্ণব পত্রিকা টেনে নেয় মুখের ওপর।

খাওয়ার পাটও চুকে যায় নিঃশব্দে। প্রয়োজনীয় দু'একটার বেশি কথা হয় না। একবার শুধু রিনা বলেছিল, 'মা-এর চিঠি পড়ে তুমি খুব রেগে গেছ, মনে হচ্ছে।'

'রাগব কেন?' অর্ণবের গম্ভীর জবাব।

'সেটা তুমিই ভাল জান।'

'তোমার মা-এর ওপর রাগ নয়, তোমার কাণ্ডজ্ঞান দেখে আমি অবাক হয়েছি।'

'কেন?'

'তুমি জান, একটা জমি কেনার কথা চলছে। তারপর, বাড়ি করার কথাও ভাবতে হবে। এসব জেনেও এতবড় একটা খরচের বোঝা ঘাড়ের ওপর নিতে চাইছিলে, এতে কি প্রমাণ হয় না তোমার কতটা কাণ্ডজ্ঞান?'

রিনা আর কথা বাড়ায় না। চুপ ক'রে থাকে।

তবু ব্যাপারটা কি মিটে যায়? না, অন্তত রিনার দিক থেকে নয়।

একই বিছানায় শুয়েছে তারা রোজকার মত। কিন্তু দু'জনের মাঝখানে থেকে গেছে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, অন্যদিনের তুলনায়। তেমনি ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে দু'টি মনের মাঝখানেও, এই ঘণ্টা তিনেক সময়ের মধ্যে। রিনা চেষ্টা ক'রেও ভুলতে পারছে না। একটা বিশ্বাসে ঘা খাওয়ার ব্যথায় টনটন করছে মনের ভিতর।

'তুমি কি ঘুমিয়েছ?' জিজ্ঞেস করে রিনা।

'না।'

'বিয়ের পর চার-পাঁচ বছর তোমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আমি থেকেছি।'

'হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?'

'আমার রোজগারের সব টাকা তোমাদের ফ্যামিলি-ফান্ডে দিয়েছি। তোমার বোনের বিয়ের সময় তাকে কিছু গয়না দেবার দায়িত্ব পড়েছিল তোমার ওপর। তখন তোমার নিজস্ব কোন ফান্ড ছিল না, আমাকেও কিছু জমাতে দাও নি। বাধ্য হয়ে তোমার মর্যাদার খাতিরে আমার তিন-সেট গয়না তোমার বোনকে দিতে হয়।'

'কি বলতে চাও তুমি?' উত্তেজিতভাবে অর্ণব বিছানায় উঠে বসে।

ঘরে অন্ধকার, তারা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। একটা খোলা জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের একটুখানি আলো ঢুকে অর্ণবের চেহারাটাকে কেমন ভৌতিক ক'রে তুলেছে। রিনা তার দিকে না তাকিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, 'আমিই এতদিন বুঝতে পারি নি। আসলে তোমার কাছে তোমার নিজের চাওয়া-পাওয়াটাই প্রধান, যেমন আর সব পুরুষদের থাকে।'

'রাবিশ?'

'রাবিশ নয়, এটাই বাস্তব। আজ তোমার ভাই এসে এখানে থাকতে চাইলে, তুমি কি আমার মতামত গ্রাহ্য করতে?'

'বাজে বকো না। এখন ঘুমোতে দাও।'

অর্ণব শুয়ে পড়ে। রিনাও আর কোনো মন্তব্য করে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোটখাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া বা মতবিরোধ তো হয়েই থাকে। একদিন বা দু'দিন বাদে সব মিটে যায়। অর্ণবও কয়েকদিনের মধ্যে ভুলে গেল সব। তার নিজের কাজের জগৎ নিয়ে মেতে রইল। রিনার আচরণেও অস্বাভাবিকতার কোনো লক্ষণ নেই। সকালবেলার কাজকর্ম সেরে অফিসে যায়, ফিরে এসে আবার নিয়মমাফিক সব কিছু করে। রোজকার মত রাত ক'রে অর্ণব ফিরে এলে তার জন্য চা বানায়, নিজেও খায়। কথাবার্তাও চলে এটা-ওটা নিয়ে।

'আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে কি?'

রিনার প্রশ্নে একটু অবাক হয় অর্ণব। হঠাৎ আজ সে ছুটি নিয়েছে, আবার তাকেও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলছে। ব্যাপার কি? আজ তো তাদের বিবাহবার্ষিকী নয়, জন্মদিনও নয় দু'জনের কারুর। বোধহয় সন্ধ্যার শো'তে সিনেমা দেখতে যাবার ইচ্ছা।

'এই মুশকিল করেছ!' অর্ণব জবাব দেয়, 'আজ যে ছুটির পর ইউনিয়নের মিটিং রয়েছে। মিটিং শেষ না ক'রে আসা যাবে না।'

'ঠিক আছে।'

'তবু ভাল', রিনা আর পীড়াপীড়ি করে না।

রাত ন'টা নাগাদ অর্ণব বাড়ি ফিরে দেখে, দরজায় তালা। তার সঙ্গে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। অতএব ঘর খুলতে অসুবিধা নেই। রিনা তাহ'লে একাই সিনেমায় গেছে, ভাবে অর্ণব। কিন্তু সেটাও খুব অস্বাভাবিক। সে তাকে বাদ দিয়ে কখনও একা সিনেমায় গেছে বলে তো তার মনে পড়ে না।

তালা খুলে ঘরে ঢুকে অর্ণব সুইচ টিপে আলো জ্বালে।

কয়েক মুহূর্ত আগেও সে ভাবতে পারেনি, তার জন্য এতবড় একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে। যে-দু'তিনটা বড় স্যুটকেসে রিনার কাপড়-জামা থাকে, তার একটাও ঘরে নেই। নেই আরও কিছু জিনিস, যা তার নিজস্ব। বিছানার ওপর একটা খোলা চিঠি। যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গিয়ে অর্ণব চিঠিটা হাতে তুলে নেয়।

প্রিয় অর্ণব,

আমি আলাদা বাড়িতে উঠে যাচ্ছি, রণু আমার সঙ্গে থাকবে। কম ভাড়ার বাড়ি, আশা করছি, কোনোরকমে ভাই-বোনের চলে যাবে। যাবার সময় সামনে না থাকায় একদিক থেকে ভাল হয়েছে, একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া এড়ান গেল।

একটা কথা তোমার জানা দরকার। আমি মনে করি না, বিয়ে হলেই একজন মেয়ের কাছে তার বাবা-মা-এর সংসারের প্রতি দায়-দায়িত্ব বা কর্তব্য ফুরিয়ে যায়। কর্তব্যবোধে যা তুমি করতে পেরেছ এবং আমার দিক থেকে বাধা দেওয়া হয় নি, আমাকে সেই কর্তব্যপালনে তুমি বাধা দিলে—এই দুঃখ ও অপমান আমার মনে গাঁথা হয়ে রইল। অথচ তোমার কাছে অনেক বেশি উদারতা আমি প্রত্যাশা ক'রে এসেছি। আমার ধারণা ছিল, তুমি হবে পুরুষপ্রাধান্যবাদী সমাজে এক ব্যতিক্রম, অথচ আজ নিজের জীবনে বিশ্বাসকে প্রয়োগ করতে গিয়ে তুমি হয়ে গেলে নিদারুণভাবে ব্যর্থ। এ শুধু আমার দুঃখ নয়, লজ্জাও। ইতি—

রিনা।

কাঁঠাল কাঠের তক্তা

বংশী শিকদার

কাঁঠাল গাছটার বয়স যে ঠিক কত তার তার চেহারা দেখে আন্দাজ করা খুব কঠিন। বিশাল জটাজুট নিয়ে প্রায় বিঘা খানেক জমির ওপর তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে। কারও কারও মতে এর বয়সের শতবার্ষিকী হয়ে গেছে। কেউবা আরও একটু এগিয়ে হীরক বা প্লাটিনাম জয়ন্তীর কথা বলে। বয়স এর যাই হোক নিঃসন্দেহে এই গাছ দত্ত-বাড়ির প্রাচীনত্বের এক নিদর্শন। এই গাছের কৈশোর যৌবনের একমাত্র জীবিত সাক্ষী দত্ত-বাড়ির প্রাচীনতমা মহিলাটি। একানব্বই বছর বয়সের লোলচর্ম এই বৃদ্ধাটি যখন তার পক্বকেশ সম্বলিত মাথার ওপর আঙ্গুল বুলাতে বুলাতে যৌবনের স্মৃতিচারণ করেন তখন কান টানলে মাথা আসার মত স্বাভাবিকভাবেই ওই কাঠাল গাছের কথা এসে পড়ে। ঠিক এ ভাবেই এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধা বিভাবতীদেবীর কাছে শুনেছে এই কাঠাল গাছ সম্পর্কে কত কথা। এই কাঠাল গাছ দীর্ঘকাল ধরে কত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে আজও মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ বড় আঘাত এর ওপর এসেছিল সাতাত্তরের আশ্বিন মাসে। এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা ঝড়বৃষ্টিতে এর একটা অঙ্গহানি ঘটেছিল। একটা বিশাল ডাল ভেঙ্গে পড়েছিল। তিরিশ বছর আগের কথা হলেও সে সবের স্মৃতি বিভাবতীদেবীর মনে এখনও কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদের মত চকচক করছে। ঠিক এসময়েই বিভাবতীর ছোট পুত্র এ বাড়ি থেকে চলে গিয়ে ভিন্ন সংসার পেতেছিল। এসব কথা বিভাবতী মাঝে মাঝেই শুনিয়েছেন। আর প্রতিবারই তার মনটা ভেজা ভেজা ঠেকেছে। সংসার থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সে অবশ্য এই বসত বাড়ির ভাগ কোনোদিন দাবি করেনি। তবে কর্তামশায় তাকে দক্ষিণের বিলের লাগোয়া সাড়ে চার বিঘা ডাঙ্গা জমি লিখে দিয়েছিলেন বিভাবতীর পরামর্শে। বলা যায় তার বিচক্ষণতার জন্যেই যে যাত্রা দত্ত-বাড়ির বসত বাড়ি এবং তৎসংলগ্ন জমিজমা-গাছপালার ওপরে কোনো আঘাত পড়েনি।

কিন্তু এবারের সঙ্কট বেশ তীব্র। শুধু জমি-বাড়ি ভাগাভাগি নয়, কাঁঠাল গাছটাও রক্ষা পাবে না। ওটির অস্তিত্ব বিপন্ন। শরিকেরা সবাই সমান ভাগ বসাতে চায় ওই কাঁঠাল গাছে। কেউ চায় তক্তা সরাসরি আর কেউ পরিবর্তে মূল্য পেলেই খুশি। কর্তামশাই গত হবার পর তার বড় ছেলে হরিচরণই বর্তমান কর্তা। তিন পুত্র ও দুই কন্যার জনক হরিচরণ আজ এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি। গত কয়েক দিনের সঙ্কটটা বঙ্গোপসাগরের ওপর ভেসে থাকা ঘূর্ণীঝড়ের উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে ঘনীভূত হওয়ার মত হয়ে দত্ত-বাড়ির ভাগ্যাকাশে অবস্থান করছে। আর এর ফলে দত্ত-বাড়ির ওপরে বিশাল বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিভাবতীদেবী তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হরিচরণকে ডেকে বললেন, 'হরি, এই দত্ত-বাড়ি প্রকৃতির অনেক রোষ সহ্য করেছে। আর মানুষের সৃষ্ট বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারবে না?'

হরিচরণ বরাবরই খুব শান্ত স্বভাবের। ছোট ভাই যখন আলাদা হয়ে গিয়েছিল তখনও তিনি নীরব ছিলেন। বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে সবসময়ই খানিক যেন নির্লিপ্ত। বিভাবতীদেবী

বিপর্যয়ের কথা বলছেন। কিন্তু তাঁর ধারণা এতে বিপর্যয়ের কী আছে। তাঁর ছেলেরা এখন স্বাধীন। যে যার নিজের উপার্জনেই সংসার চালায়। দত্ত বাড়ির এজমালি সম্পত্তি থেকে যে আয় তার ওপরে তাদের অধিকার আছে ঠিকই। তবে সে আয়ের ওপরে তাদের নির্ভর করতে হয় না কোনোভাবেই। এই স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীন আয়ের সাথে স্বাধীনভাবে ব্যয় করে তাদের স্ত্রীপুত্র সবার মনেই স্বাধীনতাস্পৃহা খুবই জোরালোভাবে জেগে উঠেছে। ক্ষমতা থাকলে কে না চায় স্বাধীনতা?

হরিচরণ বা বিভাবতী বা হরিচরণের স্ত্রী হেমবালা কারোরই মনে পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা স্থান পাচ্ছে না। দত্ত বাড়ির কাঁঠাল গাছটা বছরের পর বছর কত ঝড়ঝাপটা সহ্য করে শত শত পাখপাখালিকে আশ্রয় যুগিয়ে গিয়েছে। সন্ধেবেলায় সব কটা পাখপাখালির সন্তান সন্ততি যখন তাদের কোটরগুলোতে ফিরে আসে তখন যে কোলাহলের সৃষ্টি হয় তা বিভাবতী উপভোগ করেন। বিভাবতী জানেন যে কোনো বৃহৎ পরিবারের সবাই একসাথে হলে এমন কোলাহল হওয়াটাইতো স্বাভাবিক। এই কোলাহল আনন্দেরই পরিচায়ক। দিনের শেষে তাদের পুনর্মিলনে যে আনন্দ বিভাবতী তা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেন। পাখিরাও তো স্বাধীন। তারাও তো যার যেদিকে ইচ্ছা উড়ে যায়। তাদের ডানায় তো কোনও বাধা নেই। কিন্তু তারাও কোনো এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছে। তাই তো সন্ধ্যা নামতে না নামতেই সবাই ফিরে আসে ওই কাঁঠাল গাছটার কোটরে কোটরে। বিভাবতীর প্রভাব হরিচরণের মধ্যে পুরো মাত্রায় আছে। তাই হরিচরণও উপভোগ করে পাখিদের ঘরে ফেরার ঐ হট্টগোল। বিভাবতীর মত হরিচরণের কাঁঠাল গাছটার প্রতি তার অমোঘ আকর্ষণ। হরিচরণ কল্পনাও করতে পারছে না কাঁঠাল গাছটার সম্ভাব্য পরিণতির কথা। ছেলেমেয়েরা পাকাপাকি বুঝিয়ে দিয়েছে কয়েক কাঠা জমি জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটাকে না কাটা হলে ও [illegible] দাম পাওয়া যাবে না। এই জমি বাড়ি ভাগ হওয়ার সাথে সাথে কাঁঠাল গাছটার সদগতি করতে হবে।

বিভাবতীদেবীর ব্যক্তিত্বের কাছে হেমবালা বরাবরই খানিকটা স্তিমিত। এ বাড়ির বউ হয়ে সংসার প্রথম দিন থেকেই তিনি শাশুড়ির পদানত। কোনোদিন কোনও ব্যাপারে তার নিজের মত প্রকাশ করেননি। তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা মূল্যবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ তিনি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক পক্ষীর পক্ষপুটে আশ্রিত পক্ষীশাবকের মত সারাটা জীবন আগলে রেখেছেন। অন্য দিকে তার সন্তানদের মুক্ত চিন্তায়, আধুনিক শিক্ষায় বড় হয়ে ওঠার পেছনে তার ছিল আন্তরিক প্রচেষ্টা। হেমবালা তার বাবা মায়ের কাছে যুক্তিবাদের শিক্ষা পেয়েছিলেন আর তার নিজের ছেলেমেয়েদের মনেও সেই একই চিন্তাভাবনা একটু একটু করে প্রবেশ করিয়েছিলেন। তবে সে শিক্ষার প্রয়োগ বাস্তব জীবনে তারা কতটা প্রয়োগ করেছে তা তার জানা নেই। হেমবালার শিক্ষাদান তার মতের বিশ্বাস আজ চরম এক পরীক্ষার সম্মুখীন। আকাশের ঈশান কোণে একখণ্ড কালো মেঘের আনাগোনা হেমবালার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কিন্তু তার স্বভাবসুলভ শীতলতার কোনো পরিবর্তন নজরে পড়ছে না। তবে এতদিন বাদে বড় ছেলে-ছেলের বৌ-মেয়েদের এবং নাতি নাতনিদের কাছে পেয়ে যেন একটু উত্তেজিত।

বড় মেয়ে নন্দিনীর ছেলেটা কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে হেমবালার কাছে এল। ওর সারাটা শরীরে যেন উথাল পাথাল সমুদ্রের ঢেউ – উঠছে আর ভাঙছে। শরীরের উর্ধবিভাগ যদি সে ঢেউ এর চূড়া হয় তবে শরীরের নিম্নভাগ ভেঙ্গে পড়া ঢেউ। ছেলের পরনে রাফ এ্যান্ড টাফ জিনস প্যান্ট আর ওপরে গোলগলা টি শার্ট। এবার আই সি এস ই-র ফাইনাল দিয়েছে। ঠাকুমাকে অনেকদিন পর দেখে তার আনন্দ হয়েছে। চিৎকার করে উঠল, হাই ঠাম্মা। কী করছ?

হেমবালা বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকাখানা খুলে একাদশী কবে এবং কটার সময় লাগবে তা উদ্ধার করবার চেষ্টা করছিলেন। তার শাশুড়ি নিয়ম করে একাদশী পালন করেন। বড় নাতির হাইহুই ডাকে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েও নাকের ডগা থেকে চশমাটা নামিয়ে বললেন, কীরে ব্যাটা, অমন হাই হাই করছিস কেন? ওটা কানে লাগিয়ে ধেই ধেই করে নাচলে আমার কথা আর শুনবি কী করে। বড় নাতি বব ততক্ষণে এ মঞ্চ ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেছে। আর ঠিক তখনই ছোট নাতি ডিঙ্গো ড্যাং ড্যাং করে চলে এল হেমবালার কাছে। তার বয়স বড়জোর বারো। ক্লাস সিক্সে পড়ে। ইংলিশ মিডিয়াম। চোখে আতশ কাচের মত ভারি কাচের চশমা, হাতে ধরা টিনটিনের কমিক। ইংরাজিতে। ডিঙ্গো তার ঠাম্মার গলা জড়িয়ে বসে পড়ে বলল, কীসব বই পড়ছ ঠাম্মা? টিনটিন পড়। যা সব কাণ্ডকারখানা। তোমার ব্রেনই ক্র্যাশ করে যাবে। ওর ঠাম্মার অভিধানে এসব শব্দ নেই। তাই বলেন, কী ভাষায় যে তোরা কথা বলিস বাবা। কিচ্ছু বুঝি না। ডিঙ্গো উত্তর দেয়, তোমার আর বুঝে কাজ নেই। এসব ওয়াই টুকের ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি যাই দেখি ববদাকে একটু অয়লিং করি। ওয়াকম্যানটা ম্যানেজ করে মাইকেল জ্যাকসনটা শুনতে হবে।

হেমবালা একটুক্ষণ অবাক চোখে তার নাতিদের চলে যাওয়া দেখেন। তারপর একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে আবার পঞ্জিকাতে মন দেন।

একটু আগে বিভাবতীদেবীর জারি করা সতর্কবাণী হরিচরণকে চিন্তিত করে তোলে। হরিচরণ ভাবেন, সত্যি কী অদ্ভুত সব ভাবনাচিন্তা তার ছেলে-মেয়েদের। অঙ্কটা কিছুতেই মেলাতে পারেন না তিনি। তাদের পদ্ধতি, বিন্যাস সব অন্য রকমের। তাদের যুক্তি তর্ক অন্য ধারার, অন্য ভাবনার। আর হবেই বা না কেন, তারা তো মুক্ত দুনিয়ার মানুষ। তাদের সময়ে তো বিশ্বব্যাপী মুক্ত হাওয়ার ঝড় বয়ে চলেছে। মুক্ত অর্থনীতি, মুক্ত বাণিজ্য, মুক্ত চিন্তা, মুক্ত দুনিয়া। তবে তাদের আর দোষ কোথায়?

বয়সের ভারে বিভাবতীদেবীর বোধশক্তি সামান্য কমে এলেও তার নাতি-নাতনি-নাতবৌ-তাদের ছেলে-মেয়ে সবার সদলবল উপস্থিতি ওকে বেশ খানিকটা উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তাদের যুক্তিতর্কের জাল বিছানো দেখে তিনি চিন্তিত। বিভাবতী বেশ বুঝতে পারছেন তারা নাতি-নাতনিরা সব এক পক্ষে। তারা পঞ্চরথীতে তাদের বাবাকে ব্যূহের মধ্যে ঠেসে ধরেছে। হরিচরণ কি পারবে সে ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে? বিভাবতীদেবী জানেন তার পুত্র তত বলীয়ান নয়। তাই তিনি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন বলে বেরিয়ে এলেন। লাঠি ঠুক ঠুক করে বিভাবতী গিয়ে হাজির হলেন হরিচরণের ঘরে। সেখানে তখন যেন লোকসভার অধিবেশন চলছে। পুরুষ-মহিলা সদস্যরা একযোগে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য বিতর্কে অংশ নিয়ে চলেছেন। বিভাবতীকে দেখে তারা সবাই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, অঃ ঠাক্‌মা, তুমি আবার এখানে কেন? তুমি এসবের মধ্যে—। মানে তুমি এসব ঠিক বুঝবে না।

বিভাবতীদেবী শুধু একটা কথাই বললেন সকলকে উদ্দেশ্য করে, 'হ্যাঁরে বাঁদরের দল। আমি কি করে বুঝব তোদের লঙ্কাভাগের ব্যাপার-স্যাপার। আমি এটুকু বুঝি যে নৌকোর তলায় ছেঁদা হলে সে নৌকোয় করে সমুদ্দুর পাড়ি দেওয়া যায় না। আর সে ছেঁদায় জোড়া চলে না। দত্ত-বাড়ির বজরাটায় তোরা ছেঁদা করে ফেলেছিস। তবু বলি, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ যদি জোড়া লাগাতে পারিস।'

বিভাবতীর কথা শুধু কথাই রয়ে গেল। কারও মনেই কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হল না। বিভাবতীকে যে বিষয়টা খুব বেশি ভাবিয়ে তুলেছে তা হল ওই কাঁঠাল গাছটার অন্তিম অবস্থাটা। তার কৈশোরের সঙ্গী ওই গাছটার কী গতি হবে। ওই কাঁঠাল গাছ যে তার জীবনের সুখে-দুখে, মানে-অভিমানে, আনন্দে-নিরানন্দে জড়িয়ে আছে। সময়ে-অসময়ে,

সুসময়ে-দুঃসময়ে বিভাবতী তার প্রাণের অনুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন ওই মূক সঙ্গীটির কাছে। কত রাতে তার ঘরের দাওয়া থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসে কথা বলেছেন তার সাথে। সে কথোপকথনে কোনো বাক্য বিনিময় হয়নি, কোনো শব্দ সৃষ্টি হয়নি। শুধু ইথার তরঙ্গে প্রবাহিত হওয়া নিশ্বাসে ভাবের বিনিময় হয়েছে দুজনের মধ্যে। সেই কাঁঠাল গাছটিকে ভূমিতে লুটিয়ে দিতে চাইছে ওরা। তারপর তার দেহ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের পরিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনাও করে ফেলেছে ওরা।

বড় নাতবৌ-এর ড্রেসিং টেবিল চাই। তার কাঠ আসবে ওই গাছের তক্তা থেকে। বড় নাতনির ছেলে ববকে আমেরিকায় পড়াশুনা করতে পাঠাবে তার বাবা মা, গ্রাজুয়েশনের পর। সে বাবদ কিছু টাকা তারা তিন বছরের জন্য ব্যাঙ্কে ফিক্সড় করে রাখবে। সেই টাকাটা আসবে তার ভাগের তক্তা বিক্রি করে। ছোট নাতনি বিশাখার দাবি রয়েছে কাঁঠাল গাছের ওপর। সে বাড়ি তুলছে সল্টলেকে, বাইপাসের ধাবে। সে বাড়িব জানালা-দরজার পাল্লা বানাতে কাঠ লাগবে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা। ওই কাজটা সে বাড়ির কাঁঠাল গাছের তক্তা দিয়েই করতে চায়। তার বিশ্বাস ওই তক্তার মধ্যে তাদের নিজেদের বাড়ির স্মৃতিটা অন্তত বেঁচে থাকবে।

বিভাবতীদেবীর ছোট নাতি এখনও পড়াশুনা করছে। সে এরই মধ্যে দুটো বিষয়ে এম এ পাশ করেছে। চাকরি পায়নি। তাই পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন কম্পিউটার না জানলে নাকি চাকরি পাওয়া যায় না। ও সেজন্য কম্পিউটাব শিখছে, কলকাতার কলেজে। ওর অনেক দিনের সখ ভাল একটা পড়ার টেবিলের। কাঠাল কাঠের তক্তা তারও চাই। একটা পড়ার টেবিল আর একটা বই রাখার আলমারি তৈরি করাবে সে।

এতো গেল কাঁঠাল কাঠের তক্তার হিসাব। বাকি মেজো নাতি। সে তক্তা চায় না। তার ভাগের তক্তা বিক্রি করে টাকা পেলেই সে খুশি। অবশ্য উদ্বৃত্ত তক্তা বিক্রিব টাকার ভাগও একেবারে হিসাব করে সমবণ্টন করতে হবে সবার মধ্যে। অর্থাৎ কাঁঠাল গাছটার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিপন্ন। বড় নাতবৌ-এর ড্রেসিং টেবিলের চাহিদা সত্ত্বেও বড় নাতি তার ঠাকুমার অনুভূতিটাকে সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েই বলতে চেয়েছিল কাঁঠাল গাছটা যেন অক্ষত থাকে। তারা নিজেরা ওই প্রাচীন বৃক্ষটিকে হত্যা করতে যাবে না। পরে জমি বিক্রি হয়ে গেলে জমিব নতুন মালিকের ইচ্ছানুসারে যা হবার তা হবে। তার কথা ঠাকুমার সেন্টিমেন্টটা সকলের বোঝা উচিত। গাছটার একটা ঐতিহ্য আছে। গান্ধিজির ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ঠাকুর্দারা ওই গাছের নিচ থেকেই কত মিছিল বের করেছে। শুধু হেরিটেজের কথা মেনে কলকাতাব কত বাড়ি কর্পোরেশন ভেঙে ফেলতে দিচ্ছে না।

বিভাবতীদেবী ঘরে ঢুকে চৌকিটার ওপর বসে সব শুনছিল। এক প্রস্থ সওয়াল জবাব হয়ে যাবার পর বললেন, বাবা হরি, তোর বড় ছেলে ঠিকই বলেছে। তুই ওদের জমি বাড়ি ভাগ করে লিখে পড়ে দে। কিন্তু কাঁঠাল গাছটাকে শেষ করতে দিস না। ওটার সাথে তোর বাবার যে কত সাধআহ্লাদ জড়ানো তা কি ওবা বুঝবে? পুরোনো জিনিসের প্রতি কি ওদের একটুও মায়া নেই? একটুও কি মমতা হয় না আমার সুখ দুঃখের সাথে ওই গাছটাকে নির্মমভাবে মেরে ফেলতে? কী পাষন্ডরে বাবা আজকালকার ছেলেমেয়েরা।

হরিচরণ মায়ের ক্রোধ মিশ্রিত আদেশ-অনুরোধের উত্তরে বলল, মাগো আমি চাই না ' দৃশ্য ঘটুক। কিন্তু তোমার স্বাধীনচেতা নাতি-নাতনিরা নাছোড়বান্দা। তারা তো কোনোদিন বুঝতেই চাইল না দত্ত-বাড়ির এই ঐতিহ্য গড়ে তুলতে বাবা কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ওরা জানে না এ ঐতিহ্যের মর্যাদা কত। নিত্য অশান্তি আর ভাল লাগে না। তাই ওদের ইচ্ছে মতই সব হয়ে যাক মা।

অঞ্চলের বহু পুরোনো অভিজ্ঞ আমিন নগেন মণ্ডলকে ডেকে আনা হল। জমি-জমা মাপা শেষ। উকিল ডেকে ভাগাভাগির ব্যাপারটাও একসময় মিটে গেল। কাঁঠাল গাছটি কাটা হবে। কে কী ভাগ পাবে সেই মত উকিলবাবু কাগজ পত্র দলিল সব তৈরি করিয়ে ফেললেন। বিভাবতী দেবীর পরামর্শে গৃহ পুরোহিতকে ডাকিয়ে রেজিষ্ট্রির জন্য একটা শুভদিনও স্থির করে নিলেন হরিচরণ। তারপর নির্ধারিত দিনে বসিরহাটের সাবরেজিস্টারের অফিসে দলিল রেজিষ্ট্রি হয়ে গেল।

এর পরের ঘটনাগুলো ঘটে গেল অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে। রুদ্রপুর বাজার থেকে কাঠের বড় কারবারি দুর্গাদাস ঠাকুরকে ডাকিয়ে তার লোক লাগানো হল কাঁঠাল গাছটাকে কেটে টুকরো টুকরো করার জন্য। কাঠ চেরাই-এর বড় বড় করাত এল। অতবড় গাছটাকে কেটে তক্তা বানাতে ওদের প্রায় দিন পনেরো লেগে গেল। যারা তক্তার দাবিদার ছিল তাদের ভাগেরটা আলাদা করে রেখে বাকিটা নিয়ে দুর্গাদাস ঠাকুরের সাথে দর কষাকষি চলতে লাগল। দর কষাকষি যখন অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন সাক্ষাৎ যমদূতের মত কোর্টের পেয়াদা এসে হরিচরণের হাতে শমন ধরিয়ে দিল। কোর্ট আমেরিকান কোম্পানি জনসন ইনকরপোরেটেডের আবেদনের ভিত্তিতে ওই কাঁঠালের তক্তার বিলি বন্দোবস্তের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তাদের দাবি অনুসারে সাবা বিশ্বের কাঁঠাল গাছের ওপর তাদের পেটেন্ট। পেটেন্ট আইনের বিশেষ ধারা অনুযায়ী ওই গাছের সমস্ত তক্তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর কেবল মাত্র তাদেরই আইনগত অধিকার। এমন কী ওই তক্তার মূল্যও তারা নির্ধারণ করতে পারবে তাদের ইচ্ছা এবং তাদের দেশের আইন অনুসারে।

এ গল্পের শেষ হবে এক বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃতি দিয়ে—

আন্তর্জাতিক পেটেন্ট আইন ও আমাদের কাঁঠাল গাছ

মহামান্য আদালতের নির্দেশে নূতন আইন অনুসারে সমগ্র বিশ্বে কাঁঠালের বীজ নিয়ন্ত্রণের অধিকার বিদেশি কোম্পানির উপর বর্তাইয়াছে। বাণিজ্যেব বিশ্বায়নের প্রভাবে আরও কতিপয় ভেষজের মানবহিতার্থে ব্যবহাব ও প্রয়োগ স্বদেশের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র বিশ্বে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছড়াইয়া যাইবে। আসুন আমরা সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রাচীন রীতিনীতির বিরোধিতা করি। উদারীকরণের জয় হোক। বিশ্বায়নের জয় হোক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বর্তমান প্রজন্মের সন্তান-সন্ততিরা তাহাদের পিতা-পিতামহদের ন্যায় কাঁঠালের রস পছন্দ করে না। ইহাদের এই প্রকারের দেশিয় খাদ্যবস্তুর প্রতি অনীহা দেখা যাইতেছে। প্রকারান্তরে বলা যায় ইহারা আমেরিকান চাপসে-চিকেন মাঞ্চুরিয়ান ইত্যাদি আন্তর্জাতিক খাদ্যাদির প্রতি অধিক অনুরক্ত।

পীড়নের শ্বাসরোধী কথা

শংকর কুণ্ডু

এক ঃ কলির সন্ধে

আমাদের বাতাসে কার্বন
আমাদের জলে আর্সেনিক,
নন্দিনী, তবুও খনিতে
সোনা খুঁজে ফিরছে শ্রমিক! ...

—পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কী কাজ, বাবা?
—তুমিই বল, কী কাজ ...
—হাজার ফণা সাপের মাথায় পৃথিবীর বোঝাটা বওয়া।
—নাঃ, আমার তা মনে হয় না।
— তোমার তবে কী মনে হয়?
—নুন ভাত খেয়ে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকা—এটাই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ! ...

বলকান ও প্রতীকের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ধরনটাই এরকম। বলকান ভাবে, বাবা কী যে বলে, মানেই বোঝা যায় না পুরোটা। প্রতীক ভাবে, বেচারা বলকান, ও তো জানে না সভ্য মানুষের সঙ্কটের কথা—নুনভাত থেকে দুধভাত, দুধভাত থেকে মৎসভাতে উত্তরণের জন্যে ঘরে ঘরে গৃহযুদ্ধ, দেশে দেশে সংগ্রামের কী বিপুল রক্তঝরা কাহিনী! বাসুকি নাগকাহিনী তার কাছে কী লাগে! ...

বলকান আর প্রতীক ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে খোলা পরিসরে অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি মেলে দিয়েছিল। দেখা কাজটা প্রতীকেয় ভিন্ন পটভূমিতে ভিন্নরকম। কুয়াশাওড়া সকালে, কিরণোচ্ছল দুপুরে, প্লাবিত রাতে—এক এক রকম। তা ছাড়া সে দেখে চিন্তার ভাষা কাঠামো থেকে। বলকান ছবি আঁকে, তাই সে দেখে আকারের, আয়তনের, রঙের ব্যাকরণ। তখন সন্ধেবেলা। প্রশান্ত, প্রাকৃত পৃথিবী। সূর্যাস্তের বর্ণমাধুরী আকাশে আকাশে ছড়িয়ে আছে। অলক মেঘের অচলায়তনের বর্ণ বিন্যাস দেখে বলকান মুগ্ধ হল। সে আত্মবিশ্বাসী, প্যাস্টেল রঙে একটা দারুণ ল্যান্ডস্কেপ নামানোর কাজে লেগে গেল। ... প্রতীক সংশয়ী, সে ভাবছিল, মানুষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করার চেয়ে ধ্বংস করার কাজে বেশি উদ্যোগী। সে দেখছিল, লাইনের ধারের পোর্সেলিন কারখানাটার চিমনি থেকে উ-কারের আঁকশির মতো টেরিকাটা কার্বনের রেখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আরো অনেক চিমনির বিষাক্ত ধোঁয়া শহরতলির এই ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাটাকে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সকলেই দেখছে, শুনছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। হচ্ছে। দম আটকে আসছে। আসছে। কেউ কিছু বলছে না দূষণ মুক্তির যন্ত্র লাগানোর কথা। অভ্যাস, অভ্যাস, নির্লিপ্ত থাকার অভ্যাস। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নির্লিপ্ত। কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

উচ্চতম ন্যায়ালয় থেকে ন্যায়াধীশ আদেশ জারি করবেন ঃ 'এই এই সংস্থা পরিবেশ দূষিত করছে। উহারা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না লওয়া পর্যন্ত উহারা পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন মোতাবেক বন্ধ থাকিবেক।' তখন খেয়াল হবে, ওই যাঃ। বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আরো আগে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। তাহলে হয়ত শ্রমিকদের বিপদ থেকে বাঁচানো যেতে পারত। আমরা সব কিছুই একটু দেরিতে বুঝি। আমাদের চৈতন্যের চামড়া একটু পুরু! ...

হঠাৎ ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এল। বৃষ্টির জলে প্রতীকের চিন্তা-ভাবনাও নেতিয়ে গেল বাসি খবরের কাগজের মতো।

দুই ঃ কলির সকাল

'কী খেল্ দেখালি বাছা,
উলটো কেন কাছা?
গাছে তুলে মই কেড়েছে,
নসীরামের চাচা! ...' (প্রবাদ)

একটা মানুষ প্রতীকের অস্তিত্বের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে! সবসময় তাকে তাড়া করে ফেরে। শয়নে স্বপনে জাগরণে—এস. এস. জে.। একটা ভাঙাচোরা মানুষ, তেরাবেঁকা হাঁটা। বারবার ভাগ্যের মার খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। আবার ধাক্কা খাচ্ছে। ধাক্কাটা কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে, বুঝতে পারছে না। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টাটা দেখে মনে হয়, মার খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার লোক ও নয়। শেষ দেখে তবে ছাড়বে। কিন্তু ওই লোকটাই কি প্রতীক? সে জানে না।

দক্ষিণ পশ্চিম থেকে মিষ্টি একটা হাওয়া বইছে। বোধ হয় শিল্পায়নের হাওয়া। আঃ, শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে প্রতীকের! পশ্চিম গোলার্ধ থেকে সাদা চামড়ার মহাবণিকেরা আসবেন। দেখবেন শুনবেন। ডলার ঢালবেন— 'মৌ' হবে, 'মোয়া' হবে। লাভ হবে। লাভের বখরা হবে। তাই নিয়ে মারা-মারি কাড়া-কাড়ি শুরু হয়ে যাবে। শুরু হয়ে গেছে। ...

প্রতীকের ভাবনায় ছেদ পড়ল। লোকটা প্রতীককে কিছু জিগ্যেস করছে। সত্যিই তো, একটা লোক তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অবিকল তার কল্পনার লোকটার মতো! ...

— আচ্ছা, আর কতদিন পড়ে পড়ে মার খাব বলতে পারেন?

— সবে তো ব্যাটিং শুরু। শচীন তো এখনো খাপই খোলেনি! ... প্রতীক হেসে উত্তর দিল। লোকটার চোখে মুখে হতাশা, কারখানার সামান্য মাইনের চাকরি করি। পরিবারের ভাত জোটে না দু বেলা—এত দামি দামি ওষুধ কিনব কোত্থেকে? দামি পথ্যির জোগাড়ই বা করব কী করে? ...

প্রতীক জানাল, 'সবুর। বহুজাতিকরা আসছে, ওষুধের দাম আরও বাড়বে। শুধু ওষুধ কেন, সবকিছুর দামই বাড়বে।'

'বহুজাতি?' লোকটি শঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করে, 'সেটা আবার কোন্ জাত? বামুন না কায়েত?'

প্রতীক কী বলবে ভেবে না পেয়ে উত্তর দেয়, 'সব জাতের খিচুড়ি আর কি!'

লোকটা কী বুঝল কে জানে। একটি যাত্রী উপচে-পড়া অটোতে কোনোরকমে হাফ চান্স নিয়ে উদয়শঙ্করের ভঙ্গিতে আধবেঁকা অবস্থায় নাচতে নাচতে চলে গেল। অটোটার করুণ অবস্থা দেখতে দেখতে প্রতীকের মনে হল, ওই অটোটা ভারতবর্ষের প্রতীক! ...

তিন ঃ বলির পাঁঠা

কারণে অকারণে	কেটো না গাছ।
পুকুরে মাটি ঢেলে	মেরো না মাছ।
সূর্য ডুবে গেলে	মানুষ ঘরে এলে
উনুনে জ্বলবে না	পাতার আঁচ? ...
রৌদ্রে জলে শীতে	প্রাণী ও প্রকৃতিতে
মিলন হলে দেখো	আলোর নাচ! ...
মৃত্যু ভীতি নয়,	এমন গীতিময় —
জীবন সঙ্গীতে	বাঁচরে বাঁচ! ...

অনেক সবুজ রং একসাথে দেখার জন্যে প্রতীক মাঝে মাঝে ছাদে যায়। চারধারে আদিগন্ত সবুজ বৃক্ষশ্রেণী—যেন সবুজের স্টেডিয়াম! ... মধ্যে এখানে ওখানে মানুষের কীর্তি হাওড়া ব্রিজ, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের চুড়ো, উঁচু অট্টালিকা, কারখানা, চিমনি, উড়ালসেতু, আরো কত কী। মানুষ বোধহয় ভাবে, একদিন তার কীর্তি দিয়ে পৃথিবীর প্রতি বর্গমিটার ভরিয়ে দেবে। বাঁধিয়ে দেবে পৃথিবীর পিঠ। গাছ থাকবে শুধু টবে। বনসাই হয়ে! দীঘির বদলে থাকবে কাঁচের অ্যাকোয়ারিয়াম! ... ব্যাপক মানুষের ইচ্ছে! ...

প্রতীকের ছেলেটা হয়েছে গল্পপ্রিয়। বলকান মনে করে, তার বাবা গল্পের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। গল্পের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। যখনি চাইবে, দু একটা করে বেরোবে। বলকানের সবচেয়ে প্রিয় হল বাঘের গল্প। পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণে বাঘের সংখ্যা যত নিঃশেষ হয়ে আসছে, প্রতীকের ব্যাঘ্রকাহিনীর সংখ্যা ততই বাড়ছে!

সেদিনও যথারীতি বলকান ফরমাস করল প্রতীককে, 'একটা বাঘের গল্প বলো বাবা ...

—ছাদের পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে অস্তগামী সূর্যের বিরল শোভা নিখরচায় দেখতে দেখতে প্রতীক বলল, 'কোন্ বাঘের গল্প?'

—সাদা বাঘ।

—ঠিক আছে, তবে শোন্। দুটো সাদা বাঘের তুমুল লড়াইয়ের গল্প।

—ডোরাকাটা বাঘ তো? বলকানের কৌতূহল জাগে।

—না। এ বাঘের ডোরাটোরা নেই।

—কেন? ফের প্রশ্ন ছোঁড়ে বলকান।

—চেনা বামুনের পৈতে লাগে না। ফটাফট সার্ভিস রিটার্ন করে প্রতীক। যেন ছেলে-বাবার টেনিস খেলা চলছে।

— কেন? বলকানের অনুসন্ধিৎসা শেষ হয় না।

—আঃ, গল্প শুনবি, না, সংসদের সরকার পক্ষ-বিরোধী পক্ষের মতো চাপান উতোর চালিয়ে যাবি?

ধমক খেয়ে তখনকার মতো চেপে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে বলকান। রাগন্ত বাবাকে বেশি ঘাটালে গল্প শোনাটাই মাটি হয়ে যেতে পারে।

—আচ্ছা বলো।

— শোন্। একদেশে একবার দুই ভিন্‌দেশী সাদা বাঘকে নেমতন্ন করে নিয়ে আসা হল। বাঘ দুটো এসে দেখল, আরে বাঃ। এদেশে প্রচুর মুরগি। এদের অনেকদিন ধরে বধ করা যাবে। তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে অন্য বাঘকে হটিয়ে জঙ্গলের দখল

নাও। ব্যস্‌। দুজনের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সে কী তুমুল যুদ্ধ! দুই 'কোলা' ব্যাঙের মহারণ বলা যায়।

—কে জিতল বাবা?

— সেইটেই তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এখনো যুদ্ধ চলছে। আজ রামকোলা জেতে তো কাল শ্যামকোলা এগিয়ে যায়। ক্রিকেটে দেখিসনি, কখনো এর ব্যাটিং ভাল হচ্ছে, চৌয়া ছক্কা হাঁকাচ্ছে, কখনো ওরা বোলিং চেপে ধরছে, ফ্লিপার-গুগলি-চায়নাম্যান ধসিয়ে দিচ্ছে উইকেট, আবার কখনওবা কেউ ফিল্ডিংয়ে ভেলকি দেখিয়ে তাজ্জব করে দিচ্ছে, দূর থেকে একটিপে উইকেট ফেলে দিচ্ছে টাঁই করে! তিনকাঠির আজব খেলা দেখে দেখনেওয়ালাদের সে কি টেনশন! সারা দেশ টি ভি পর্দার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—ধনী দরিদ্র, ছেলে বুড়ো, নরনারী নির্বিশেষে, রাস্তাঘাট ফাঁকা, একটার পর একটা ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে দিনে দুপুরে, কেউ টেরটি পাচ্ছে না—এ এক জাতীয় সার্কাস! ...

আকাশে এতক্ষণ ছেঁড়াফাটা মেঘের ওপর সূর্যের আলো পড়ে অপরূপ ইস্টম্যানকালার সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতীক সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে ভাবছিল, সূর্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মি 'ওজোন হোল' এর মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে আসছে না তো? বেশ গরম লাগছে, তা কি 'গ্রিনহাউস এফেক্ট' এর জন্যে? ...

পাশের অ্যাসিড কারখানাগুলো থেকে উড়ে আসা অ্যাসিডের ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে যেতে প্রতীকের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। ওফ্‌ কী জতুগৃহে বাস করছি! চোখ জ্বলছে, নাক জ্বলছে, নাইট্রিক অ্যাসিড গলায় আটকে কাশি আসছে! মহানগরীর ঘিঞ্জি, নারকীয়, দমবন্ধকরা পরিবেশে কী আহ্লাদে আমরা বেঁচে আছি, তা নিজেরাও কি জানি ছাই! ...

হঠাৎ আকাশ জুড়ে তুমুল ঝড় উঠল! একখণ্ড কালো মেঘ উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে উঠে এসে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল নিমেষে। শোঁ শোঁ হাওয়া প্রতীককে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় যেন অচেনা দেশে। গাছের মাথাগুলো দুলছে জুরাসিক পার্কের বেরসিক ডাইনোসরের মতো আক্রোশে! বলকান ভাবল, বাবা বোধহয় ভয় পেয়েছে প্রকৃতির পাগলামি দেখে। সে বলল, 'শিগ্‌গির ঘরে চলো বাবা। এখুনি বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে।'

তারা ঘরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই প্রচণ্ড শব্দে কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল। কয়েক মিলিয়ন ভোল্টের বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—দুটো মেগাস্টারের মেগাকোম্পানি বাজার দখলের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেন। সেই সঙ্গে আবোল তাবোল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। চারদিক এমন ঝাপসা যে প্রতীক দুহাত দূরের ভূগোলও বুঝতে পারছে না। শুধু কিছু শিল্‌ বারান্দায় এসে পড়ে পড়ে গলে যেতে লাগল। বলকান আর ওর মা আনন্দে ভিজে ভিজে সেগুলো কুড়োতে আর খেতে লেগে গেল। আহা বরফ যেন মেঘের আইসক্রিম। একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি শির্‌ শির্‌ করে গলা বেয়ে নেমে যায়, পেটের আগুনটাকে নেভায়, কিছুক্ষণের জন্যে। বলকান সে অনুভূতির স্বাদ নিতে নিতে বলল, 'কী মজা, না বাবা?'

হ্যাঁ, মজাই বটে। মজার ষোলকলা পূর্ণ হল যখন সে রাতে বলকানের ব্যাপক জ্বর এল।

চার ঃ হোলির উৎসব

> আজ রক্তে হোলি খেলা, আজ শুরু বসন্ত উৎসব। ...
> আবিরের রং রক্তে, রক্তের রং আজ লাগাব নিশানে—
> লক্ষ লোকের মধ্যে মিছিলে সভায় কিংবা দুর্মর শ্লোগানে
> পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন তুমিও কি করনি অনুভব? ...

বলকানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে গিয়ে প্রতীকের এক অজানা অভিজ্ঞতার জগৎ খুলে গেল। তার হাতের কাছেই কয়েক গণ্ডা ডাক্তারখানা, পলিক্লিনিক, স্পেশালিস্ট সেন্টার, নার্সিং হোম—কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে কাউকে পাওয়া যায় না। ডাক্তারবাবুরা এখন পার্টটাইম ব্যবসায়ী। যার গালভরা নাম—কনসাল্টিং ফিজিসিয়ান। যত ইনসাল্টিং কথাবার্তা রোগীর সঙ্গে, রোগীর পরিবারের সঙ্গে। ক্ষ্যাপাটে ব্যবহার—আধপাগলা টাইপের। কে রোগী—বলা মুশকিল। ... উলটোপালটা চিকিৎসার ধরন—আজ এ ওষুধের পরিবর্তে কাল অন্য ওষুধ—পুরানো ওষুধটা বেকার হয়ে গেল। রোগই ধরা যাচ্ছে না। পাঁচটা-সাতটা ওষুধের লম্বা ফিরিস্তি, যার নাম প্রেসক্রিপশন—ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, সিরাপ, ইনজেকশন, যা যা জানা আছে। একটা না একটাতে তো সারবেই! — সঙ্গে মূল্যবান উপদেশ রক্ত পরীক্ষা, প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট, এক্স-রে, ই সি জি, স্ক্যানিং, ফিজিওথেরাপি—(নির্দিষ্ট জায়গা থেকে করাতে হবে। অন্যখানে চলবে না। কমিশনের ব্যবস্থা নেই!) তবে না বোঝা যাবে রোগটা কী! রোগ সারাই থেকে পকেট কাটাই-এর দিকে নজর বেশি! ...

অনেক খুঁজে পেতে একজন ডাক্তার পাওয়া গেল— ভেটেরিনারি সার্জন। গরুর ডাক্তার। তবে মানুষের চিকিৎসা করেন। ভালই নাকি করেন! প্রতীক ইতস্তত করল, শেষ পর্যন্ত গরুর ডাক্তার! যাইহোক, মানুষ একরকম গরুই তো বটে। দ্বিধা ঝেড়ে প্রতীক তাঁরই শরণাপন্ন হল।

এত রাতে এসেছেন? ডাক্তারবাবুর বিস্ময়মিশ্রিত ঝামটা।

—কী করব—এত রাতে জ্বর আসবে, সেটা আগে জানলে আগেই আসতাম।

—না না, আমি এখন শুয়ে পড়েছি।

—আমি কি তবে ভূতের সাথে কথা বলছি?

—আঃ, বড্ড জ্বালালেন দেখছি। পেশেণ্টকে এনেছেন? ডাক্তারবাবু ইম্‌পেশেণ্ট হয়ে উত্তর দেন। অযথা প্রশ্ন করেন।

—না, পেশেণ্ট তো বেহুঁশ অবস্থায়। মাথায় সারাক্ষণ জল ঢালা হচ্ছে, বরফ দেয়া হচ্ছে। একশো চার-একশো পাঁচ থেকে জ্বর একটু নামছে তো ফের চড়ে যাচ্ছে। আনব কী করে?

— পেশেন্ট কে?

—আমার ছেলে।

—ওঃ, তা হলে হল না। আপনি আসতে পারেন। আমি বাছুরের চিকিৎসা করি না। বলে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে ডাক্তারবাবু ভেতরে গিয়ে রিমোটে ফের 'ফুনাই' ভিসিয়ারটা চালিয়ে দিলেন—মাধুরী দীক্ষিত শাহরুক খানের সাম্প্রতিকতম সুপারহিট ছবি 'সোনি'র পর্দায় চালু হয়ে গেল।

ক্যাসেটটার প্রচণ্ড ডিমাণ্ড—পাওয়াই যাচ্ছে না। অতিকষ্টে অনেক ভিডিও লাইব্রেরি খুঁজে বেশি পয়সা দিয়ে আনানো হয়েছে। এখন কি ফালতু সময় আছে কলে যাওয়ার! ...

প্রতীক দিশাহারা হয়ে গেল। এখন কী করবে? ডাক্তারের সন্ধানে আর কোথায় ছোটা যায়? ডাক্তার সাপ্লাই এজেন্সি হয় না? কোনো বুথ থেকে ফোন করলেই চটপট ডাক্তার পাঠিয়ে দেবে যারা। এখন তো সব কিছুই তো পয়সা দিলে পাওয়া যায়—ক্যুরিয়র থেকে ক্যারিয়ার—সবকিছু। ... ঠিক তখনই মুশকিল আসান হয়ে আবির্ভূত হল মিঠুন। প্রতীককে দেখে স্কুটার থামিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, স্যার? এত রাতে?' দুর্জনে বলে, আগে নাকি মিঠুন মস্তান ছিল, এখন হয়েছে মিঠুনবাবু, সমাজসেবী। সীমান্তে ইধারকা মাল উধার করে টু-পাইস করেছে, তাতে চড়ছে দুচাকা। ফোরপাইস করলে চড়বে চারচাকা। প্রতীকের সাথে পরিচয় অনেকদিনের। সেটা এখন কাজে লেগে গেল। মিঠুন তাকে স্কুটার চড়িয়ে এক ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ডেকে তুলল ঘুম থেকে।

—আপনাকে এখুনি একবার কলে যেতে হবে, ডাক্তারবাবু। ওনার ছেলের খুব জ্বর।

—কিন্তু আমি তো অর্থোপেডিক। মানে হাড়ের ডাক্তার।

—হাড় আর জ্বরের তফাৎ কতখানি? —এত হাড় সারিয়ে দিচ্ছেন, আর সামান্য জ্বর সারাতে পারবেন না? চলুন চলুন ...

ডাক্তারবাবু নিমরাজি হলেন। খামোখা মিঠুনকে চটাতে চাইলেন না। কেননা মিঠুনের দৌলতে তাঁর ঘরে জাপানের, কোরিয়ার, সিঙ্গাপুরের আসল ক্যামেরা, ভিসিয়ার, ঘড়ি, রেডিও, ক্যালকুলেটর, খেলনা—কী নেই। ...

এর পরের পর্বের কয়েকটা দিন প্রতীকের কাছে আতঙ্ক আর দুঃস্বপ্নের মিশ্র ইতিহাস! ডাক্তার থেকে প্রেসক্রিপশন, ওষুধ, পথ্য, অ্যামবুলেন্স, রাজনৈতিক দাদা, হাসপাতাল, নার্সিং হোম, ডায়াগনস্টিক সেণ্টার, স্পেশালিস্ট, স্ক্যানিং প্রভৃতির এক বিশাল মাকড়সার জাল থেকে—বরং বলা যাক হাঙরের হাঁ থেকে—প্রতীক যখন বেরিয়ে এল কয়েকদিন পর, তখন সে শরীরে-মনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। বলকান সুস্থ হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু ততদিনে প্রতীকের পকেট থেকে কুড়ি-বাইশ হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে গেছে প্রতীকের স্ত্রী সুবৃত্তার সামান্য সম্বল যে সোনাগয়না ছিল তাও। শুধু দুগাছা চুড়ি অবশিষ্ট রয়েছে। দাসত্বের চিহ্ন হিসেবে! ... কয়েকদিনের মধ্যেই প্রতীকের চুল পেকে গেছে, ঘাড় নুয়ে পড়েছে, বয়েস বেড়ে গেছে হাজার বছর! ... প্রতীকের ভেতরের সেই ভাঙাচোরা লোকটা হঠাৎ কোত্থেকে বেরিয়ে এল। আর মুচকি মুচকি হাসতে লাগল তার অবস্থা দেখে!

এমন সময় ফোন বেজে উঠল। প্রতীকের বিখ্যাত কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের গলা ঃ হ্যালো প্রতীক, ছেলে কেমন আছে? বিপদ কেটে গেছে তো? ... এদিকে আমাদের বিপদ বেড়েছে। আমাদের প্রজেক্ট সাইটের আওতায় যে গ্রামগুলো পড়েছিল, সেখানকার লোকেরা বেঁকে বসেছে। কোনোভাবেই সরানো যাচ্ছে না। ক্ষতিপূরণ ওরা প্রত্যাখান করেছে। আপনাকে আজই গিয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে হবে ...

—আমি এ কাজ পারব না স্যার। আমাকে ছেড়ে দিন।

— সে কী! আপনি প্রজেক্ট ম্যানেজার, পুরো দায়িত্ব আপনার! আপনাকে পারতেই হবে। চিন্তা নেই, সামনের বোর্ড মিটিংয়ে পদোন্নতির ব্যাপারটা আমিই তুলব ..

—আমি চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছি স্যার।

—কী বলছেন আপনি! ... ঠিক আছে, ঠিক আছে। অনেক ঝুটঝামেলা গেল, আপনার শরীর মন বোধহয় প্রকৃতস্থ নেই। আপনি বরং কদিন বিশ্রাম নিয়ে নিন। আমিই ব্যাপারটা দেখছি ...

আমি ঠাণ্ডা মাথায়, ভেবেচিন্তেই চাকরি ছাড়ছি, স্যার। পদত্যাগপত্র যথাসময়ে পাঠিয়ে দেব।

—কারণটা কী জানতে পারি?

—এ ক'দিনে আমার চোখ খুলে গেছে, স্যার। এতকাল চোখে ঠুলি পরেছিলাম। চারপাশের জীবনপ্রবাহের স্পন্দনটা ঠিক ধরতে পারিনি। এখন দেখছি, এই ছোট্ট জ্যান্ত নীল পৃথিবীটাতে ভয়াবহ অবস্থা হয়ে আছে! আমি শুধু চিকিৎসার জগৎটা দেখেছি। কিন্তু রাজনীতির জগৎ, খেলাধুলোর জগৎ, চাকরির জগৎ, ব্যবসার জগৎ, শিক্ষার জগৎ, শিল্পের জগৎ, সাহিত্যের জগৎ, সিনেমার জগৎ, আইনের জগৎ, প্রশাসনের জগৎ—সমস্ত জগতেই নারকীয় পরিবেশ তৈরি হয়ে আছে। পুরো সমাজটার গা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে! শিক্ষা আনে চেতনা—কোথায় চেতনা? আমি ওইসব অসহায় লোকদের পাশে আছি, যারা ভিটে মাটি থেকে

উৎখাত হবে—আবার অনিশ্চিত, বাস্তুহারা জীবনের স্রোতে ভেসে যাবে। আমরা জ্ঞানত তা হতে দিতে পারি না। ভারতবর্ষ আর যাই হোক, বহুজাতিকের স্বাধীন মৃগয়াভূমিতে পরিণত হবে না। —আজকে ফোন রাখছি—আবাব দেখা হবে।

ফোনটা নামিয়ে প্রতীক আচ্ছন্নের মতো বসে রইল।

—চাকরিটা ছেড়ে দিলি, সমু?

মার গলা শুনে সম্বিত ফিরে পেল সে।

—হ্যাঁ, মা। শুনেছ তো সবই। এছাড়া আমার কিছু করাব ছিল না। প্রতীক ভেতরে ভেতরে নিজের ক্ষতবিক্ষত হওয়ার কথাটা বলল না। মা কিন্তু ঠিকই বুঝে নিলেন।

—তাহলে এখন খাবি কী?

—একটা ছোটো খাটো চাকরি জুটে যাবে নিশ্চয়ই। বাঁচতে জানলে ডালভাতই তৃপ্তি করে খেয়ে দিব্যি সুখে বেঁচে থাকা যায়!

—আপনার সমু ঠিকই করেছে, বৌঠান।

মাস্টারমশাইয়ের গলা শুনে দরজার দিকে তাকাল প্রতীক। উনি নিশ্চয়ই সব কথা শুনেছেন।

এই একটা লোককে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করে প্রতীক। উনিও খুবই স্নেহ করেন প্রিয় ছাত্রটিকে। এখন দুজনের সম্পর্ক বন্ধুর মতন। প্রতীক জানে মনের কথা খুলে বলা যায় একমাত্র মাস্টারমশাইয়েরই কাছে। উনি উপলব্ধি করবেন তার যন্ত্রণা।

—তুমি দুর্দিনে মানুষের পাশে দাঁড়িযে ঠিক কাজই কবেছ প্রতীক। মহৎ কাজ কবেছ। আমাদের ধারণা মহৎ মানে বিশাল কিছু কাজ! তা নয়। ছোট কাজ দায়িত্বের সঙ্গে সম্পাদন করাটাই মহৎ কাজ। এই সামান্য কথাটাই ভুলে যাই আমরা। আমরা জানি না সভ্যতা আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে! ... অবাধ শিল্পায়নের নামে অরণ্য ধ্বংস করা, নদীর গতিরোধ করা, নদীর জল, মাটি, বাতাস বিষিয়ে তোলা, মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা, বেকারের সংখ্যা বাড়ানো, ভেজাল কালোবাজারি-দুর্নীতিতে সমাজকে নৈতিকভাবে হত্যা করা—এ সবই আমরা চেয়েছি? এ জন্যই কি আমরা স্বাধীনতাব জন্য লড়েছিলাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে?...

—আপনার কথা শুনে ভরসা পেলাম, মাস্টারমশাই।

—তুমি লড়াই চালিয়ে যাও প্রতীক। আমি তোমার সঙ্গে আছি। মানুষকে সচেতন করো। তার বাঁচার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করো।

—আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমি যেন সফল হই।

বলকান চোখ মেলে চাইল প্রতীকের দিকে। ঘুম ভেঙে গেছে তার। দুর্বল গলায় বলল, 'সাদা বাঘ দুটো এখনো যুদ্ধ করছে, বাবা?'

প্রতীক বলল, 'হ্যাঁ, বাবা। তবে এখন আর দুটো বাঘ নেই। অনেক বাঘ। সাদা, কালো, হলুদ, বাদামী, দেশী-বিদেশী, নেকড়ে, চিতা, প্যান্থাব—সবাই লড়তে নেমে গেছে।

— কে জিতবে, বাবা? বলকান জিগ্যেস করল।

এক মুহূর্ত কী ভাবল প্রতীক। তারপর উত্তর দিল, 'শেষ পর্যন্ত মানুষ জিতবে, মানুষ।

বলকান বড়ো বড়ো চোখ করে বাবার মুখ থেকে কিছু বোঝবার চেষ্টা করল। সকালের আলোয় বলকানের মুখটা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আজ দোল। সূর্যই বলকানকে আবির মাখিয়ে দিচ্ছে। মাখিয়ে দিচ্ছে জীবনের রং। ...

সেই হাত

শেখর আহমেদ

সে পেরায় দু কুড়ি পাঁচ বচ্চর আগে। ফুরফুরা শরিপির ছোটো হুঁজুর এয়েছ্যালো। জয়নগরের পোরোনো ছিনেমাহলে। কাতারে কাতারে নোক যাচ্ছে দেকতি। হুঁজুর বসে আচে ইসটেজের উপর কাটের চেয়ারে। নোকে নোকারণ্য। অত বড়ো ছিনেমাঘর উপচে পড়তেচে। ভেতরে যারা ঢুকতি পেয়েচে, সক্কলে হুঁজুরের সাতে হাত মেলাতি চায়। বাইরে হাজার মান্ষের ভিড়। ঠেলাঠেলি, হুটোপাটি। হুঁজুর বললে, ইমনি করে একে একে সকলার হাতে হাত মেলাতি বচ্চর ঘুরে যাবে। তোমরা এক কাজ করো, আমি এই দোওয়া পড়ে আমার কাঁদের শাহি গামচা মুটো করে ধরতিচি। তোমরা নিজের নিজের কাঁদের গামচা মুটো করো, তাহলিই আল্লার ইচ্ছায় সকলার হাত মেলানো হাসিল হবে।—

ছ বছরের সাত্তার দাওয়ায় চাটাইয়ে শুয়ে শুনছিল। কাল থেকে জ্বরে বড়োই কাবু হয়ে পড়েছে সে। একটু আগেও মেতে ছিল একঘেয়ে কান্নায়। বুড়োদাদার অতীতকথনে কান্না থেমেছে তার। এখন শুধু বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে আছে।

—তোর বাপ তকন তোর পেনা। এই টোকা। পুঁয়ে অসুকে কাহিল। হাত-পা কাটি কাটি। অ্যাদ্‌বড়ো প্যাট। ভালো করে খেতি পারে না। হাঁটাছোটা করতি গেলি মাতা ঘুরে ভিরমি খেয়ে পড়ে। সারাদিন খালি ছিল্লি আর ছিল্লি। ঠিক তোর ধারা। ডাক্তার-বদ্যি করে করে হাল্লাক হয়ে গিচি। কিচুতে কিচু হয় না। মউলুবি এনে ঝাড়ফুঁক করালুম। তবু ব্যারাম ঝ্যামন কে তেমন। তোর দাদি ধরে পড়লে আমারে, একবার পীরছায়েবের কাচে যাও। গেরাম ভেঙে নোক যাচ্ছে। তুমি অচ্ছেদ্দা করুনি। পানি পইড়ে আনো—

—আমার দাদি ছেল? অবাক চোখে প্রশ্ন করে সাত্তার। নাজিম-শহীদুল-মোক্তারদের দাদিমারা তখন বুঝি তার চোখের সামনে ঘোরে! —হাতে রুপোর বাউটি, নাকে ফুলকাটা নাকছাবি, কানে মাকড়ি। ওরা মাকে ছেড়ে দাদির আঁচলের তলায় ঘুমোয়। তাজপুরের বাদা জুড়ে গাঢ় অন্ধকার নামে। ঘরে ঘরে নিভে যায় কোরোসিন লম্ফ। শিয়াল-খটাশের উশখুশ শব্দে কুকুর ডেকে ওঠে। ওরা দাদিমার কাছে গল্প শোনে। ইউসুফ-জুলেখার গল্প, লায়লা-মজনুর গল্প, আমির হামজা, রূপবান কন্যার গল্প। একটু একটু গাঢ় হয় রাত। ঘুমপরিরা ওদের দু চোখে অনর্গল চুমু দিতে থাকে। দাদিরাও সই পাতায় ঘুমপরিদের সঙ্গে। হাই ওঠে। কথা জড়ায় ...

—ছিলুনি! বলিস কী রে। হরমুজ জোর দিয়ে বলে, তবে তোর বাপ আর ঝিমারা এল কোত্থে?

শিশু সাত্তারের মুখজুড়ে ছায়া নেমে আসে। জোর দিয়ে কথা বলে হাঁপায় বুড়ো হরমুজ। এমনিতেই কথা বলতে কষ্ট হয় তার। পুরো ডানদিকটা পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট। ডানপা ডানহাত অসাড়। পক্ষাঘাত অল্পস্বল্প ছোবল বসিয়েছে জিবের ডানদিকে, গালে। কথা জড়িয়ে যায়। ঠোঁটের এক দিক অনড়। পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়। দিনের বেলা মাটির দাওয়ায় তেলচিটে

বালিশ ঠেস দিয়ে বসে থাকে। উঠোন থেকে দাওয়া প্রায় একবুক উঁচু। অনেক দূর পর্যন্ত নজর যায়। উঠোনের পূর্ব প্রান্তে ছোটো পুকুর। তার ওপারে ধানখেত। মাঝামাঝি এলাকায় তিনবিঘে দাগ তার। নিচু আল দিয়ে ঘেরা প্রত্যেকের সীমানা। লোকে বলে, ভেড়ি। অজস্র ভেড়ির জঙ্গল। অনেক দূরে দেখা যায় গোঁড়ের পাড়-এর সীমানা। সবুজ গাছের সারি। গোঁড়ের পাড়-এর দিকে প্রতিবছর শীতে হয় ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। মেলা বসে। ছোটো ছোটো ঘোড়া। দশ-বারো বছরের ছেলেরা হয় জকি। বড়ো মানুষের ভার নিয়ে এইসব হাড়-জিরজিরে গেঁয়ো দো-আঁশলা ঘোড়ারা দৌড়োতে পারে না। তবু তাই নিয়ে কী বিপুল মাতামাতি। দশ গাঁ ঝেঁটিয়ে ছুটে আসে মানুষজন। বাচ্চা-বুড়ো, মেয়ে-মরদ। কলাপাতায় ঘুগনি, বরফগোলা শরবত, তেলেভাজা। রঙিন কাচ আর প্লাস্টিকের চুড়ি। সস্তা হার, দুল, পাউডার, স্নো।

গতবছর হরমুজ মণ্ডল যেতে পারেনি। ওই তিনবিঘের দাগে ধান কাটতে কাটতে বুকে মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে পড়ে গিয়েছিল সে। তারপর থেকে এই দাওয়া। দাওয়ায় বসে দেখেছে শুধু অগুনতি মানুষের কালো কালো মাথা। অনেক দূর অবধি নজরও তো চলে না আগের মতো। শুধু দেখতে পেয়েছে। দৌড়ের আগে ঘোড়ার লাগাম ধরে পুরো পথটা ঘুরিয়ে আনছে তার মালিক কিংবা সহিস। দৌড় শুরু হওয়ার পর এই পথ ধরেই ছুটতে হবে ঘোড়াদের। ছুটতে ছুটতে কত দূরে চলে যায় তারা। দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে। সেই পথে হাঁ করে চেয়ে থাকে লোকজন। চুকনগরের কালো ঘোড়া ফার্স্ট হবে না হাসানপুরের সাদা? নাকি ছাই রঙেরটা, যে এসেছে মৌজপুর থেকে? ছোটোখাটো বাজিও ধরা হয়ে যায় কারও কারও মধ্যে। এই যে একের পর এক ঘোড়ারা মিলিয়ে গেল দূরে, তারা সবাই ফিরে আসবে একে একে।

হরমুজ মণ্ডল দেখে নাতি সাত্তারের মুখে শূন্য মাঠের ছায়া। আনমনা হয়ে যায়। চোখের আড়ালে গেলে সবাই ফেরে না। সেই কালো গোলগাল মুখ, ভারী দুটো হাতে খাঁজকাটা বালা, কোমরে বিছেহার জড়ানো, দোক্তাপানের রঙে লাল ঠোঁট। সে কাউকে সঙ্গে নিয়ে পথ চিনতে যায়নি। চলে গেছে একা একা। তারপর আর ফিবে আসেনি। ফিরে আসবে না কোনো দিনও।

... হাছিমপুরনিবাসী মরহুম বরকত গাজির কনিষ্ঠা কন্যা আগলিমা খাতুনের সাতে জেওর বাদ একান্ন টাকা দেনমোহরে তোমার শাদি দেওয়া হচ্চে, তুমি কবুল? ... বেগুনি রঙের সিল্কের শাড়ি, লম্বা ঘোমটা, আগলিমা খাতুন ফোঁপাতে ফোঁপাতে এসে উঠছে কাপড়ঘেরা রিস্কায়—দুপুর বেলার গরমে বসে হরমুজ মণ্ডলের ঘুমন্ত শরীরে হাতপাখার বাতাস দিয়ে যাচ্ছে আগলিমা বিবি ... ছাড়িয়ে গেল, মাড়িয়ে গেল দু হাতের বাঁধন।

চোখের কোল টলটল করে হরমুজের। দু ফোঁটা মুক্তো যেন। শীর্ণ বাঁহাত তুলে মুছে নেয় সে। এক বুক মাটির নীচে। তখন জমিদারদের বাঘের পুকুরে তিন মানুষ পানিতে ডুব দিয়ে কাদা তুলে আনত হরমুজ। তবু এক বুক মাটির নীচের দূরত্বটুকু দুস্তর হয়ে গেল। ওখানে ঘুমোচ্ছে আগলিমা বিবি। আট বছর। আরও কত বছর থাকতে হবে। যতদিন না হাসরের ময়দানে রোজ-কিয়ামতের ডাক দেয় আল্লাপাক। তার আগে মাথা কুটে মরলেও হরমুজ তার দেখা পাবে না। তার নিজের পাকাপাকি বিছানা তৈরি হবে এক কোমর মাটির নীচে। তখনও না। কত শত বছর। রোজ-কিয়ামতের আগে পর্যন্ত। ছেলেকে সে বলে যাবে নাকি, তার গোর যেন তার মায়ের পাশেই দেয়? এক বুক আর এক কোমর মাটির মাঝের ফারাকটুকু থেকেই যাবে। তবু তো কাছে। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যায়।

—দাদি মরে গেচে, তাই না দাদা? আচ্ছা, এত তাড়াতাড়ি মরে গেল কেন দাদি? আমি দেকতি পেলুমনি। গল্প শোনা হলুনি।

হরমুজের দু চোখে আবার ভাদ্রের মেঘ ভেসে আসতে চায়। জোর করে থামায় সে, বদমায়েশ দাদা, বদমায়েশ বুড়ি। নইলে ইমনি করে সব ফেলে মাটির নীচে গে' কেউ শুয়ে থাকে!

দূর জমিতে মেঘের ছায়া। মেঘ গুমোট। জমির আলপথে হেঁটে যাচ্ছে এক বুড়ি। কুঁজো কোমর। ময়লা সাদা কাপড়। হাতে লাঠি। চমকে ওঠে হরমুজ। ঠিক ঝিমা-র মতো। ফুফা—তার বাপের একমাত্র বোন। এ তিনবিঘে জমি তারই। ছেলেমেয়ে ছিল না। স্বামীর কঠিন অসুখে জায়গাটা বন্ধক রেখেছিল হরমুজের কাছে। স্বামী গেল। জায়গাও। এই দাওয়ায় উঠে তার হাত জড়িয়ে কেঁদেছিল ফুফা। অঝোর কান্না। ভিটেটুকুও তর্তদিনে হরমুজের কবজায়। ফুফা কাঁদছিল, ভিক্কে করে খাব, মাতা গোঁজার ঠাঁইটুকু মরা পর্যন্ত অন্তত কাড়িসনে হরমুজ—

হাত দিয়ে হরমুজ ফুফাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। নীচে। উঁচু দাওয়া থেকে উঠোনে। ভিক্ষে করেই পেট চালাত বুড়ি। পড়ে থাকত বড়ুবাজারের চালায়। সেখানেই মরে গেল একদিন। কুকুর-বিড়ালের মতো। তখন অবশ্য হরমুজ দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেছিল। নিজে হাতে শুইয়ে দিয়েছিল কবরে। একবুক মাটির নীচে।

না, ঝিমা নয়। একবুক মাটির নীচে একবার শুলে কেউ আর উঠে আসে না। বুড়ি ধীর গতিতে হেঁটে যাচ্ছে। শসাপাড়ার দিকে। হয়তো ফকির মেয়ে। এপাড়ায় ভিক্ষে করে ফিরছে। হরমুজের বুকে ব্যথা চিক্কুর দেয়। আজ যদি সে ঝিমাকে ফিরে পেত, ফিরিয়ে দিত তিন বিঘে জমি। নিজের অচল ডানহাতের দিকে সতৃষ্ণ দেখে হরমুজ। এই হাত দিয়েই ধাক্কা মেরেছিল সে। আজ নাড়ানোরও সাধ্য নেই। মাছি বসলে সাড় হয় না। মবে গেছে হাতটা।

—তুমি পীরছায়েবের কাচে গেছ্যালে? পুরোনো কথা টানে সাত্তার। পাড়ার মুনশি মউলবি পর্যন্ত তার দেখা। পীরসাহেব কেমন আজব রকম হবে, তা সে কল্পনা করতে পারে না।

—নাঃ, আমার আর কাচাকচি যাওয়া হল কই? তোর দাদি শেষপর্যন্ত বললে, আমার গে' কাজ নিই। আব্বা, মানে আমার আব্বা, তোর বাপের বুড়োদাদা—মুরুব্বি মানুষ, তিনিই বরং নিজে হাতে পানি নে' দোওয়া পইড়ে আনুক। আব্বা টিউকল থে' বোঁতলে পানি ভর্তি করে হাঁটা দেলে। আঁই-ও গেলুম পিচন-পিচন।

কী ভীড়, কী ভীড়! মাতা গলায় কার সাদ্যি। এ ঠেলতেচে, ও ধাক্কা দেয়ে, দাঙ্গা বেঁদে যায় আর কি। সক্কলে নিজের পানি অগ্গেরে পইড়ে নিতি চায়। হুঁজুর বললে, আলেদা আলেদা করে এতজনার পানি পড়তি গেলি একমাস নেগে যাবে। তোমরা সক্কলে নিজের নিজের বোঁতল উঁচো করো। আমি এখেন থে' দোওয়া পড়ে ফুঁক দিচ্চি। আল্লার রহমে সব পানি পড়া হয়ে যাবে।

উত্তেজনায় উঠে বসেছে সাত্তার। নস্করপাড়ায় বোধহয় মেয়ে-বউদের ঝগড়া বেধেছে। চিৎকার ভেসে আসছে। সাত্তারের মা উঠোনে চালার নীচে পাতার জ্বালে ভাত ফোটাচ্ছে। কোলের মেয়েটা ঘুমোচ্ছে দোলায়। হরমুজ মণ্ডল যেন এখানে নেই। দু কুড়ি পাঁচ বছর পিছনে হেঁটে চলে গেছে জয়নগরের পুরোনো সিনেমাহলে, সক্কলে বোঁতল উঁচো করে একসাতে পইড়ে নেলে। খালি মোষমারির কচিমদ্দি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতি নাগল—তার পানিতি নাকি ফুঁক নাগেনে। হুঁজুর যত বোজায়, বুজ আর মানে না। তকন বিরক্ত হয়ে হুঁজুর তার বোঁতলে ফুঁক দেলে। বললি বিশ্বাস করবিনি দাদা, বোঁতল হাত থে' ঠিকরে উঠে নাগল গে' টিনির চালে। ভেঁয়ে চুরে নোকের গায়-মাতায় পড়ে অক্তাঅক্তি কাণ্ড।

—পানিপড়া খেয়ে আব্বার অসুক সেরে গেছ্যালো?

—যাবিনি। খোদ ছোটো হুঁজুরির দোওয়া পড়া পানি। শুর্নিচি ফুরফুরা শরিপির হুঁজুররা খোদ ওচুলুল্লা ছালামের বংশ। সেই পানি আব্বা দু সোপ্তা ধরে রোজ সোকালবেলা নিজে হাতে তোর বাপেরে খেইয়েছ্যালো।

—তবে আমার অসুক সারে না ক্যান্? মউলুবি ছায়েব পানি পড়ে দে' গ্যালো। আমি তো খেয়িচি।

হরমুজ হাত বুলিয়ে দেয় সাত্তারের মাথায়, কোতায় ছোটো হুঁজুর আর কোতায় মউলুবিছায়েব। ওই র্জন্যি তো বারংবার বলর্তিচি, ডাক্তারের কাচে নে' যা। তা আমার কতায় কান দিচ্চে কেউ? উলটে হুঁইকে উটে ঝোগড়া করতেচে।

সাত্তারের মা ঘর থেকে মশলাপাতি নিয়ে যাচ্ছিল। এ বাড়ির কোণে কোণে এখনও শোকের ছায়া জমাট বেঁধে আছে। তার চলাফেরা যন্ত্রের মতো। শ্বশুরের কথায় সে ঘুরে দাঁড়ায়,—কীর্জন্যি কচি ছাবালটার মাতা খাচ্চো? মউলুবিছায়েব নিজে বলে গেল যে এ অসুক-বিসুক নয়। উপ্‌রিভাব হয়েচে। ভরদুকুরবেলা একলা একলা বাগানে-আগানে ঘুরে বাতাস নেগেচে। তবে ডাক্তার ডাক্তার করে খাবি খাচ্চ কী কারণে?

সাত্তারের মা উনুনের কাছে চলে যায়। হরমুজ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে, কী র্জন্যি, তা তুমি জানো না? আমার কাহারদাদা নইলি কি ইমনিভাবে—

আর বলতে পারে না হরমুজ। চাপা কান্নার দমকে থেমে যায়। সাত্তারের মা আঁচল চাপা দেয় চোখে। সাত্তার আবার গোঙাতে শুরু করে। উঠোনে মুর্গি চরছে। দুটো ছাগল ধানের গোলার পাশে খোঁটায় বাঁধা। কাঠালপাতা চিবোচ্ছে। মেঘ ঠেলে উঁকি দিয়েছে রোদ্দুর। ধানখেতে অল্প জল জমেছে। কচি কচি ধানের চারা। এখনও রোয়ার অনেক দেরি। আরও বৃষ্টির দরকার। পুকুরে হাসেরা কিছু দেখে ভয় পেয়েছে। প্যাঁক প্যাঁক শব্দে বাতাস সচকিত করে উঠে আসছে।

পুকুরের দিকে বিহ্বল হয়ে চেয়ে আছে হরমুজ। সকলের অজান্তে কখন কাহার নেমেছিল ওখানে। ভরদুপুর। সকলের দু চোখে ক্লান্তির ঘুম। বুড়ো শকুনের মতো সর্বদা চোখে চোখে আগলে রাখে যে হরমুজ, তার চোখেও জেঁকে বসেছিল মরণ-ঝিমুনি। খোঁটা পুঁতে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বানানো ঘাট। পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল বেচারা। সেদিনও হাঁসেরা এমন চিৎকার করেছিল। ঝিমুনি কাটিয়ে চোখ মেলে হরমুজ তার কারণ উদ্ধার করতে পারেনি।

যখন কাহারের খোঁজ পড়ল, এ বাড়ি ও-বাড়ি, বাগান-আগানে টুঁড়ে পাওয়া গেল না, তখন নজরে পড়ল, পুকুরে ভাসছে তার রবারের লাল বল। খ্যাপলা জাল ফেলে কাহারকে তুলেছিল ওরা। আকণ্ঠ পানি গিলে তবু প্রাণ ছিল। দাওয়ায় বসে হরমুজ একে ওকে অনুনয়-বিনয় করছিল তখনই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কেউ কান দেয়নি। মউলবিসাহেব বললেন, পানির নীচে জিনপরি বসে আছে, তোমরা দোওয়া পড়ে পানি ঠেঁয়াও।

সাত্তারের বাপ আলতাফকে অভয় দিয়ে মউলবিসাহেব দোওয়া পড়ে ফুঁ দিতে শুরু করলেন কাহারের মুখে।

হরমুজ উঠতে পারে না। কাঁদতে কাঁদতে দাওয়ায় বসে অসহায়ভাবে একসময় দেখল, কাহারের বুকের ক্ষীণ ধুকপুকুনি স্তব্ধ হয়ে গেল। মউলবিসাহেব বললেন, হায়াতের দুনিয়া। আল্লামালিক যার যদ্দিন হায়াত দেচে, তার বেশি এট্টা দিনও বেঁইচে রাখা কারও সাধ্যি নয়।

হরমুজ জীবনে এই প্রথম একথা মানতে পারেনি। এখনও পারে না। রাতের অন্ধকারে বাদার মাঝখানে কখনও কখনও ভুতুড়ে আলেয়া জ্বলে। আর অন্ধকার পুকুরের বুকে ভাসতে থাকে একটি শিশুমুখ। হরমুজের চোখের পানি গড়িয়ে হারিয়ে যায় দাড়ির ঘন চুলে। তার

দাড়ি ধরে টানত কাহার, আমাল দালি ওতে না ক্যান্? অনেক দেলি? তবে তোমাল দালি আমি ছিঁলে নোব।

এখন, এই দুপুরবেলা পুকুরের পানিতে যেন টলটল করছে সেই মুখ। একদলা কান্না আর হাহাকার একই সঙ্গে ঘুরপাক খায় হরমুজের শীর্ণ বুকে। ঠোঁটের বাঁ প্রান্ত থরথর করে কাঁপতে থাকে তার। একসময় প্রতিরোধ ভেঙে উছলে ওঠে আর্তনাদ, কাহার, আমার কাহারদাদারে, তুই কোথায় গেলিরে ...

ফুঁপিয়ে ওঠে সাত্তারের মা, ও আমার বাপ রে, আব্বা তুমি কেন মনে পইড়ে দ্যাও গো - ও -

হরমুজ এবার কেঁদে ওঠে হুহু করে। সাত্তার ভুলে গেছে নিজের কষ্ট। বুড়োদাদার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠে সে-ও। এ বাড়িতে এ দৃশ্য এখন মাঝেমধ্যেই রচিত হয়। বাঁহাতে সাত্তারের মাথা বুকে চেপে আরও কিছুক্ষণ কাঁদে হরমুজ। তারপর নিজেই থেমে যায়। সাত্তারের কপাল যেন আরও গরম হয়ে উঠেছে। কাহারের বিরহ পার হয়ে সাত্তারকে নিয়ে আকুল হয় সে, খুব কষ্ট হচ্ছে দাদা গো? তোর বাপ আসুক, আজই ডাক্তারখানায় পাটাব।

কোমরে গামছা-জড়ানো অবস্থায় মউলবিসাহেব এলেন, গোছল করতি যাচ্ছি, ভাবলুম তাবিচডা একেবারে দে' যাই।

সাত্তারের মা তাড়াতাড়ি চোখ মুছে মাদুর পেতে দিল। মউলবিসাহেব হাত তুলে নিষেধ করলেন, না না, বসবুনি। এই নাও, তাবিচডা আল্লার নাম করে খোঁকার গলায় বেঁদে দিও।

—মউলুবিছায়েব, কীজন্যি ডাক্তার-বদ্যি করতি দিচ্চ না? হরমুজ ব্যাকুল, আমার কাহারের মতন শেষকালে—

মউলবি যারপরনাই রুষ্ট, দ্যাকো, খোদার ওপর খোদগারি আমি পচন্দ করি না। এটা কি রোগ-ব্যাদি। আর তুমি তো নিজের জন্যি ঢের ডাক্তার-বদ্যি করলে। তবে শুয়ে শুয়ে কবরের দিকে পা বাড়াচ্চ কেন? আল্লার ওপর অভরসা করে কবরের আযাব বাড়াতি যদি চাও তো সে তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা।

জবাব দিতে পারে না হরমুজ। মাথা নিচু করে শুধু বড়ো বড়ো শ্বাস ফেলে। গলায় হাতে তাগা-তাবিজ তারও তো কম বাঁধা হয়নি। তাতেই বা কী হল? কথাটা তুলতে প্রবৃত্তি হয় না তার। উত্তর জানা আছে, আল্লার ইচ্ছা হলি এক দণ্ডে তোমায় তুলে দাঁড় করাতি পারে। মন দে' শুদু তাঁরে ডেকে যাও।

আল্লার ইচ্ছা। কার ওপরে হয় আর কার ওপরে হয় না, কে জানে! ওই দুধের শিশু দুরন্ত কাহার, পানিতে ডুবিয়ে এমন দোজখতুল্য কষ্টে তাকে মারা—এ-ও আল্লার ইচ্ছা? পানির নীচে একটু একটু করে দম বন্ধ হয়েছে তার।

আঁকুপাকু করে দু হাত বাড়িয়ে সহায় খুঁজেছে। ঢোঁকে ঢোঁকে পানি গিলেছে নিশ্বাসের চেষ্টায়। সে-ও আল্লার ইচ্ছা? শিশুরা নাকি আল্লার পিয়ারা ফেরেস্তার মতো।

মউলবি চলে যান। যাওয়ার আগে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন না, আলতাপ এলি মনে করে বোলো, তাবিজির চোদ্দো সিকে পয়সা ঝ্যানো সন্দেবেলা মনে করে পৌঁচে দে' আসে।

মউলবিসাহেবের তাগা-তাবিজে ছোট্ট সাত্তারেরও বোধহয় খুব ভরসা নেই। তিনি চলে যাওয়ার পর ফিসফিস করে বলে, দাদা, সেই পীরছায়েবের পড়া পানি আর নি?

—না দাদা। সে তো বহু বচ্চর আগে শেষ হয়ে গেচে।

—তবে আর একবার পইড়ে আনলি হয় না? আশায় উৎসুক সাত্তারের চোখজোড়া।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে হরমুজ, ফুরফুরাশরিপ কি এ মুল্লুকি? সে কলকেতা ছেইড়ে আরও কত দূর। আমি গিচি কখনও? আর ছোটো হুঁজুর এন্তেকাল করেচে, সে-ও কত বচ্চর আগে। আল্লাপাকের তেমন পিয়ারা বান্দা এ যুগি কোতায় পাব রে দাদা?

নিজের দুরারোগ্য ব্যাধি স্মরণ করে থেমে যায় হরমুজ। আর একটা অপ্রতিরোধ্য দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক চিরে। বহু কষ্টে বাঁদিকে ঝুঁকে সে টিনের কৌটোটা টেনে নেয় কাছে। একটা বিস্কুট এগিয়ে দেয় সাত্তারকে, নাও দাদা, খাও। তোমার আব্বা এই এল বলে। বাজারখোলায় কেন এত দেরি করতেছে আজ।

পুকুরের উত্তর-পুব কোণে আজিজ লস্করদের বাড়ি। পাড় ভেঙে ভেঙে পুকুর ওদের ঘরের পোঁতা ছুঁয়ে ফেলেছে প্রায়। বারবার বলা সত্ত্বেও আলতাফ পাড় বাঁধানোর উদ্যোগ নেয়নি। গোঁয়ার, বলিষ্ঠ আলতাফকে ভয় পায় সকলে। যখন ও বাড়ি থাকে না, আজিজের মা প্রাণ ভরে বর দোওয়া করে। এখন তার অভিসম্পাত শোনা যাচ্ছে, আল্লাপাক ওর ঘর ঝ্যানো খালি করে দেয়, কবরে মাটি দোওয়ার কেউ ঝ্যানো না থাকে ...

কাহারের মৃত্যুর চল্লিশ দিন পার হয়নি এখনও। কলেমা খতম হয়নি। শিউরে উঠে হরমুজ। এমন অভিশাপ হলধর বাগদিও দেয় নিশ্চয়। বাগদিপাড়ার কোলে তাদের উঁচু বাগান। হলধরের জমির মাটি কেটে কেটে পাড় বেঁধে অন্তত দেড় হাত বাড়িয়ে নিয়েছে আলতাফ। বিষয়-সম্পত্তি নাকি এমনি করেই বাড়াতে হয়।

সাত্তারের জন্য কষ্ট আর শঙ্কা অস্থির করে হরমুজকে। ওর মাথায় হাত ছুঁইয়ে মনে মনে প্রার্থনা করে, ইয়াল্লা, ওর সব ব্যাদি-কষ্ট তুমি আমারে দাও। ওরে ভালো করে দাও আল্লামালিক, সব বালা-মুসিবত আমারে দাও খোদা।

বলে মনে জোর পায় না কিন্তু হরমুজ। বারবার ফুফার করুণ মুখ মনে আসে। কাঁদতে কাঁদতে কাপড়ের ধুলো ঝেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। না, কোনো বর দোওয়া করেনি। শুধু আলতাফের মা কেঁদে পড়েছিল তার কাছে, ওগো, এ তুমি কী করলে? নোকে যে কুকুর-বেড়ালকেও ইমনি করে ফেরায় না।

ফুফা যতদিন বেঁচে ছিল, এমন কাকুতি-মিনতি করত তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। লুকিয়ে অন্যের মাধ্যমে ফুফাকে দু একটা টাকা পাঠাত, গ্রীষ্মে ফল-পাকড়। এ দোওয়া করার জোর আলতাফের মায়ের হয়তো ছিল, হরমুজের নেই।

সাত্তার বিস্কুটে একটা কামড় দিয়ে আর খেতে পারেনি। কাঁপ দিয়ে জ্বর এসেছে তার। শুয়ে কাতরাচ্ছে। হরমুজ ছটফট করে, ও বৌমা, খাওয়াদাওয়ার চিন্তা ছাড়োদিনি। ছাত্তার যে কেমন করতেচে। তাড়াতাড়ি এসে এট্টু জলপট্টি দাও। পাখা নে' বাতাস করো। আর মেয়েগুনো যে কোতায় গা-ঢাকা দেলে। ঘরে অসুস্থ রুগি ...

গজগজ করতে থাকে হরমুজ। সাত্তারের মা ব্যস্ত হয়ে হাত ধুয়ে আসে। মউলবির দেওয়া তাবিজ ওর গলায় বেঁধে দেয়। ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে কপালে লাগায়। বাতাস দেয় হাতপাখার। অসহায় হরমুজ কী করবে বুঝতে পারে না। সাত্তারের মায়ের হাত থেকে বাঁহাত দিয়ে নিয়ে নেয় পাখাটা। হাওয়া করতে করতে বলে, আমি ইদিক সামলাচ্চি। তুমি এক কাজ করোদিনি, কারুর দে এট্টা ভ্যানরিস্কা আনাও। সাত্তারের সঙ্গে আমারে ভ্যানে তুলে দাও, আমি নে' যাই ডাক্তারখানায়।

আলতাফ ফেরে হাতে একটা বোতল নিয়ে। খুব খুশি খুশি মুখ তার। বলে, মুক গোমড়া করে আচো কেন? আর কোনো চিন্তা নিই। বাজারখোলায় একজন পীরছায়েব এয়েছ্যালো। শিশি-বোঁতল পাওয়া দায়। একটাকা দে' বোঁতল কিনে পানি পইড়ে এনিচি।

তার উৎসাহে কেউ সাড়া দেয় না। হরমুজ কাতরকণ্ঠে বলে, যা খুশি কর বাপ। কিন্তু এক্ষুনি একবার ডাক্তারখানায় নে' যা। কাঁসারিডাক্তার দুকুর একটা পর্যান্ত থাকে।

- -তোমার ভীমরতি হয়েচে। রেগে যায় আলতাফ, ক্যান্, পীরছায়েবের পানি পড়া খেয়ে আমি ভালো হইনি? খালি ডাক্তার-ডাক্তার করে পাগল হচ্চ।

—ক্যান্, ডাক্তার কি আল্লার বান্দা নয়? এড়িয়ে যাওয়া কথার পিঠ বেয়ে ফুঁসে ওঠে হরমুজ, ডাক্তার-বদ্যি কি আল্লা পয়দা করেনে? তুই কিরিচিস?

একটু চুপসে যায় আলতাফ। তবু ঘুরে দাঁড়ায়, পানিপড়ায় যদি বিশ্বাস না থাকে তবে আমার পানিপড়া খেয়ে ভালো হওয়ার কাহিনী দুনিয়ার লোককে ফলাও করে শোনাও কেন? এই পীরছায়েব কি ফ্যালনা? সক্কলে বলতেচে ইনি ছোটো হুঁজুরির তুল্য। এনার পানিপড়ার দাম নি'?

হরমুজ সব উত্তেজনা ছেড়ে দেয়। ধুধু ধানখেতের দিকে ব্যথিত চোখ রেখে ভাবনার গভীর থেকে বলে, যে পানি পড়ে, ফুঁক দেয়, শুদু তার গুণে কি কাজ হয় বাপ? যে-হাতে সেই পানি ধরে থাকি, যে-হাতে সেই পানি মুকে তুলে দিই, তারও তো গুণ থাকা দরকার। তোর মা সে কতা বুঝত। তাই তোর জন্যি পানি পইড়ে আনতি আমার উপর ভরসা করেনে, বলেছেল তোর বুড়োদাদাকে।

তিন বিঘে জমির দাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হরমুজ। মুখে ফুটে ওঠে আঁকাবাঁকা বলিরেখা, আমার ঝিমার তিন বিঘে জমি আমি হুইড়ে নিলুম। নিলুম ভিটেমাটি সুদ্দু। জায়গাজমির টানে সব ধম্মো ভুলিচি। আর আমার বাপ—তোর বুড়োদাদা? তকন আঙগার বড়ো সংসার। একদিন মাচ কিন্নাতি গেছ্যালো। ডেড়টাকার মাচ কিনে পাঁচ টাকার নোট দেলে। বেপারি ভুল করে দশ টাকা ভেবে ফেরত দেলে সাড়ে আট টাকা। আব্বা ছেল দিলদরিয়া মানুষ। অন্যের সাতে গপ্পে গপ্পে ফেরত টাকা না গুনে চালান করলে ফোতোর পকেটে। বাড়ি ফিরে টাকা বের করে চক্ষুচড়ক গাচ। তক্কুনি আবার ওই এক কোশ পথ পেরিয়ে ছুটলে বাজারে। মাচ বেপারি ততক্ষণে হিসেব মেলাতি না পেরে কান্নাকাটি করে ফিরে গেচে ঘরে। আব্বা জিজ্ঞেস করে করে আরও তিন কোশ পথ পাড়ি দে' হাজির তার বাড়ি। গোছল নি', খাওয়াদাওয়া নি। তার টাকা বুইজে দে' বিকালবেলা ফিরলে ঝ্যান ঝোড়ো কাগ। তবু বুক জুড়ে কী সুখ।

একটু থামে হরমুজ। হাঁপায়। দম নিয়ে আবার বলে, আর আমি? আর তুই? আজিজগার পাড় ভেঁয়ে ভেঁয়ে কত্টা এইগিচিস? কত্টা জবরদকল কিরিচিস হলধরের জমি? বাপ আমার, শুধু পানিপড়ার গুণ থাকলিই কাজ হয়? সে পানি ধরে নেওয়ার মতন হাত কই? তোর আচে? আমার আচে? দু হাত তুলে দোওয়া কবি। সে হাতে দগদগ্ করে অন্যের চোকের পানি। আল্লা কবুল করে সেই দোওয়া? আল্লার নাম করে তাবিচ আর মাদুলি ব্যাচে। আঙগার মউলুবিছায়েব। আল্লা কবুল করে না ক্যান্? আমার কাহারদাদা—

আবার একদলা কান্নার ঢেলা গলায় আটকে যায় হরমুজের। আলতাফ বোতলটা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে ঝিম মেরে বসে। প্রায় অচৈতন্য সাত্তারের মাথা নিজের কোলে টেনে নেয়। বুড়ো হরমুজ তখনও শীর্ণ বাহাতে বাতাস করে চলেছে সাত্তারকে। অশক্ত হাতে পাখা নাড়তে নাড়তে আবার বলে, যে-হাতে আল্লার রহম নেওয়ার ক্ষ্যামতা নি' সে-হাতে আল্লার গজব নামে। সেই হাত ফিরে পাওয়া কি মুকিব কতা? কত জম্মো সাধনা করতি হবে। তোর নি', আমার নি', হয়তো সে হাত আমার কাহারদাদার ছ্যালো। হয়তো ছাত্তারদাদার আচে। বাপ আমার, এরে তুই বাঁচা ...

রক্তের রং একটাই

সরিৎশেখর মজুমদার

জোহেন্সবার্গ সরকারি হাসপাতালের সংলগ্ন বাংলোর রেসিডেন্ট সার্জন নোবল্স উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছেন। রাত দুটো বেজে গেল। চোখে তবু ঘুম নেই। একটার পর একটা সিগ্রেট শেষ হয়ে যাচ্ছে। নেহাত যখন আঙুলে ছেঁকা দিয়ে তাঁর অন্যমনস্কভাবে জাগিয়ে দিচ্ছে সিগ্রেটের শেষাংশ, তখন তাকে মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে কী এক আক্রোশে রগড়ে দিচ্ছেন ডাঃ নোবল্স। অথবা সেই জ্বলন্ত টুকরোকে ক্যারামেব ঘুঁটির মতো ছুঁড়ে দিচ্ছেন দূরে। শিখার রেখা এঁকে যেন ডাক্তারের উত্তেজিত মন দূরের ঝোপে শুনতে গেল অন্ধকারের কাতরানি।

সন্ধ্যা থেকে সাতটা কেস এল এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে। সাতটাই কালো নিগ্রো। তিনটি শিশু, একটি নারী, তিনটি পুরুষ। কারু চোয়াল ভেঙেছে, মাথা ফেটে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে কারুর, কারুর বা তলপেট এফোঁড় ওফোঁড়। গুলিবিদ্ধ অন্তঃসত্ত্বা নারীর বীভৎস দেহটা ডাক্তার নোবল্স-এর চোখের সামনে যখনই ভেসে উঠছে, যন্ত্রণায় টানটান হয়ে ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা।

দাঙ্গা বেধেছে জোহেন্সবার্গের উপকণ্ঠে। শহরের কোনো কোনো অংশেও। ছড়িয়ে পড়ছে সাদার সঙ্গে কালোর সংঘর্ষ। শাসক সাদার সঙ্গে শোষিত নিগ্রোর। এমনটি হবে আশঙ্কা করেছিলেন নোবল্স। যে-কোনো সময়ে ছড়িয়ে পড়বে স্ফুলিঙ্গ। ক'দিন ধরেই কাগজের পাতায় লক্ষ করেছেন, কী এক জঘন্য বর্ণবিদ্বেষ প্রতিশোধস্পৃহ ভাষার প্রচার করেছে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা। এই তো সেদিনও পার্ক দিয়ে আসছিলেন ডক্টর। থমকে দাঁড়ালেন। সেদিনকার সেই বকাটে ইয়ং নামক ছোকরাটাও নেতা হয়ে গেছে! বক্তৃতা দিচ্ছে সে। জ্বালাময়ী বক্তৃতা। শুধু বিষোদগার। কালা আদমির রক্ত দেখতে চায়। সভ্য শ্বেতাঙ্গ কীভাবে এই অসভ্য বর্বরদের বোঝা বইছে, অথচ ওই অকৃতজ্ঞ অমানুষগুলো কিনা চাইছে আমাদেরই সঙ্গে একই পঙ্ক্তিতে বসার অধিকার? মুখে যা আসছে বলে যাচ্ছে ইয়ং। শ্রোতারা আকাশ-কাঁপানো হাততালি দিয়ে সমর্থন করছে ইয়ং-এর কটূক্তি। মাঝে মাঝে তারা সহস্রকণ্ঠে ঘোষণা করছে, কালা আদমির লাশ চাই! ... আর দাঁড়িয়ে শোনা যায় না। ডাক্তারের সাদা চামড়া লজ্জায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হনহন করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন, ইয়ং তার ভাষণে এবার সরকারি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ করছে। বলছে, 'দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের সরকারি ডাক্তারেরা ইউরোপীয়ানদের নিষ্কলুষ রক্তে বেজম্মা কালা নিগ্রোর রক্ত মিশিয়ে দিচ্ছে চিকিৎসার নামে। ওরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শত্রু, জাতির শত্রু। আসুন, আমরা দাবি জানাই, শ্বেতকায় আর অশ্বেতকায় ব্যক্তিদের দেহ থেকে সংগ্রহ-করা রক্ত সাদা ও কালো লেবেল দিয়ে পৃথক পৃথক বোতলে রাখতে হবে। বর্বরদের বাঁচবার অধিকার নেই, নেহাত যদি দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাতেই হয় তাহলে বর্বরের রক্ত বর্বরের জন্যই ব্যবহার হবে। সভ্য সাদা আদমির রক্ত যেন দূষিত না হয়।

শিউরে উঠেছিলেন ডক্টর নোবল্‌স। .. চমৎকার যুক্তি। লর্ড যেশাস। এই বাতুলকে ক্ষমা কোরো না প্রভু!

ইয়ং এইভাবে বর্ণবিদ্বেষ প্রচার করছিল। অনেক পত্রপত্রিকাও। তারই পরিণাম হল দাঙ্গা। আদিম দানবের তাণ্ডব—একথা জানতেন নোবল্‌স।

—এ কী! তুমি এখনো শুতে যাওনি? ঘুম থেকে জেগে উঠে স্বামীর পাশে এসে বসল রোজালীন।

—না, ঘুমোতে পারছি না।

—কেন, কোনো কষ্ট হচ্ছে তোমার? কী হয়েছে? রোজালীনের কোমল হাত দু'খানি নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে নোবল্‌স বললেন, বড়ো কষ্ট!

—কীসের কষ্ট?

—বাইরের দিকে কান পেতে শোনো। কিছু শুনতে পাচ্ছ রোজা?

রোজালীন সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শ্রুতিপ্রান্তে কেন্দ্রীভূত করে রইল কিছুক্ষণ।

—বন্দুকের শব্দ, হাতবোমার শব্দ, মানুষের কান্না আর উল্লাস, সব যেন একাকার!

—হ্যাঁ, রোজা। সাদা মানুষের সভ্যতা বন্দুকে আর বারুদে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করছে এখানে। তাদের সাতটি কনভার্ট ইতিমধ্যে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছে। আমি কয়েকটির অস্ত্রোপচার করে এসেছি। ওর মধ্যে একটি অন্তঃসত্ত্বা নিগ্রো রমণী আছে।

রোজালীন নিজে অন্তঃস্বত্ত্বা। ওর গর্ভের সন্তানও যেন এই কথা শুনে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল।

—ছিঃ ছিঃ! ভগবান যেন এইসব অত্যাচারীদের ক্ষমা না করেন।

—ভগবান! জান রোজালীন, ভগবান উপস্থিত ওইসব পশুদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। পরে কী করেন কে জানে। চলো, শোবার চেষ্টা করি। এই বলে ডাক্তার উঠলেন।

দূরের স্বল্পাভ বাল্বের আধো-আলো আধো-ছায়া মাড়িয়ে করিডর দিয়ে যেতে-যেতে বললেন, জ়ান রোজা! আফ্রিকান খনি শ্রমিকদের রক্ত থেকে গামা গ্লোবিউলিন নামে এক সিরাম প্রোটিন তৈরি হয়। দলে দলে দরিদ্র কালা আদমিরা এসে রক্ত দেয় দশ শিলিং আয়ের আকর্ষণে। কিন্তু ... আর তারা রক্ত দিতে আসবে না বোধ হয়। কারণ, শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষীরা প্রচার করছে, বর্বর কালা আদমির রক্ত দূষিত করছে সাদা সভ্যদের রক্ত। কালোদের রক্ত থেকে তৈরি গামা গ্লোবিউলিন দিয়ে কত ইউরোপীয়ান ছেলেবুড়োর প্রাণ বাঁচিয়েছি আমরা।

হঠাৎ সজোরে কলিং বেল বেজে উঠল।

—আঃ। আবার বোধ হয় ওয়ার্ড থেকে কল এল। বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেলেন ডক্টর নোবল্‌স। খানিক পরেই ফিরে এলেন।

— রোজালীন। তুমি শুতে যাও। আমায় আবাব এমার্জেন্সিতে যেতে হচ্ছে। তোমার কণ্ঠে যে ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছিল ভগবান তা শুনে লজ্জা পেয়েছেন মনে হচ্ছে। ওয়ার্ড বয় এসে খবর দিল, এবার একটা শ্বেতাঙ্গ যুবক এসেছে জখম হয়ে।

এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে হইচই পড়ে গেছে। একটি স্থূলাঙ্গী ইউরোপিয়ন মহিলা হাউমাউ করে কাঁদছেন আর অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছেন নিগ্রোদের—যত সব বেজন্মা বর্বর ... দেখো ডাক্তার, দেখো—পশুগুলো কী করেছে, আমার ছেলের তলপেটে কী সাংঘাতিক অস্ত্র চালিয়ে দিয়েছে। শিগগির ওকে অ্যাটেন্ড করো ডাক্তার, ওকে বাঁচাও, আমি তোমায় পুরস্কৃত করব। আর দেখো, আমি উচিত শিক্ষা দেব ওই শূয়োরের বাচ্চাদের ...

একজন খবর দিল, এমার্জেন্সি কেস ডক্টর। আ হোয়াইট দিস টাইম ...।

—ওই মহিলার কে?

— ছেলে শুনছি।

—ওঁকে শান্ত করো আর ওরকম চেঁচামেচি গালাগালি করতে মানা করো।

সহকারী ডাক্তার এগিয়ে গেল। মহিলা কিন্তু থামে না। তেমনি বিষোদ্গার আর বিলাপ। নিজেই বুক চাপড়াতে চাপড়াতে নোবল্স-এর মুখোমুখি হয়ে মহিলা বললেন—ডক্টর! আমি ইয়ং-এর মা। ইয়ংকে চেন? ইয়ং—আমার ছেলে— হোয়াইট ম্যান্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একজন নাম-করা নেতা ...।

সারা শরীর যেন কেঁপে উঠল নোবল্স-এর।

—কী বললেন? ইয়ং আপনার ছেলে?

সর্বাঙ্গে গর্বের ঢেউ তুলে মহিলা জবাব দিলেন—ইয়েস ডক্টব! মহিলা লক্ষ করলেন না, কী তীব্র ঘৃণা রেখায়িত হল ডাক্তারের চোখে-মুখে। শুধু ঘৃণা নয়, এক ক্রূর পরিহাসও।

—মিঃ ইয়ং কোথায়? তাঁকে তো এখুনি একবার এখানে আসতে হয়!

— সে এসে পড়বে ডক্টর। আমি তাকে খবর দিয়েছি। তার কত কাজ, শুয়োরের বাচ্চাদের শিক্ষা দেবার কত দায়িত্ব তার মাথায় ... ।

এমন সময়ে তীব্রগতিতে একটা জিপগাড়ি এসে থামল। নেমে এল তিনজন।

নোবল্স চিনতে পারলেন, তার মধ্যে ইয়ং রয়েছে। তবু অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে তিনি ইযংকে না-চেনার ভান করে এগোলেন অপারেশন থিযেটাবেব দিকে।

—ডক্টর! মাই সান ইয়ং হ্যাজ কাম।

থমকে দাঁড়ালেন নোবল্স। চোয়াল শক্ত করে প্রস্তুত হলেন ইয়ংকে কিছু শিক্ষা দিতে।

—সার্জন। আই অ্যাম্ ইয়ং। আহত হয়ে এসেছে যে সে আমার ভাই। কুইক ডক্টর, চটপট চিকিৎসা করুন ...।

—যা করার সবই করা হচ্ছে ও হবে মিঃ ইয়ং। আপনার অনুরোধ বা নির্দেশের অপেক্ষায় আমরা থাকব না। কিন্তু ... আমার যেন আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার ভাইকে বোধ হয় মরতেই হবে ... মে গড্ হেল্প হিম্!

ইচ্ছা করেই সোজাসুজি উচ্চারণ করলেন নিষ্ঠুর শব্দগুলো।

—মরতেই হবে? একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল ইয়ং ও তার মা!

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে কাটা-কাটা উত্তর দিলেন নোবল্স ঃ জানেন নিশ্চয়, কঠিন অস্ত্রের আঘাতে আপনার ভাইয়ের শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ওঁর দেহে রক্ত দেবার প্রয়োজন হবে ...।

—রক্ত দেবেন। খিঁচিয়ে উঠল ইয়ং।

—কিন্তু আমাদের এখানে তো আলাদা করে চিহ্নিত সাদা রক্ত নেই মিঃ ইয়ং। মানে, সাদা চামড়ার দেহ থেকে নেওয়া আলাদা করে সাদা লেব্ল দিয়ে পৃথক বোতলে রাখা রক্ত তো নেই!

নোবল্স-এর কথার চাবুকে ইয়ং-এর মুখখানা রক্ত-রাঙা হয়ে গেল।

—জানেন মিঃ ইয়ং, রক্তের রং একটাই। এবং সেটা লাল। কাজেই পার্থক্যটা বুঝি কী করে? কী বলেন আপনি? আমাদের স্টকের রক্ত ওঁর শরীরে দেব কী? যদি সেটা কালা নিগ্রোর ব্লাড হয়?

—ডক্টর! এ তুমি কী বলছ ডক্টর! হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে নোবল্সকে জড়িয়ে ধরলেন ইয়ং-এর মা—নিশ্চয় দেবে সে রক্ত ডক্টর। আমার ছেলেকে বাঁচাতেই হবে ... যাও

ডক্টর, এখুনি যা করার করো ...। আমি মা—ও যে আমার সন্তান—আমি বলছি, তুমি দাও ওই রক্ত। বাছা আমার বাঁচুক।

—মিঃ ইয়ং। আপনি কী বলেন?

ইয়ং-এর মাথাটা লজ্জায় নুয়ে গেল। তার সঙ্গী দু'জনেরও। শহরের উপকণ্ঠে নিগ্রোদের বস্তি এলাকায় যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছে ইয়ং, তার লেলিহান শিখা যেন এগিয়ে আসছে তাকে গ্রাস করতে। সে আগুনের শিখায় যেন ঝলসে যাচ্ছে তার সাদা চামড়া। গুলিবিদ্ধা অন্তঃসত্ত্বা নিগ্রো রমণীর জঠরের মৃত ভ্রূণই বোধ হয় প্রতিশোধের শাণিত ছুরিকা বসিয়ে দিয়েছে ইয়ং-এর ভাইয়ের তলপেটে। আর কেউ না দেখুক, ইয়ং এখন দেখতে পাচ্ছে সেই দৃশ্য। সামনে দাঁড়িয়ে ওকে ধিক্কার দিচ্ছেন—ও কে? ডক্টর নোবল্‌স? না, লর্ড যেশাস ক্রাইস্ট?

—কই, মিঃ ইয়ং, শিগগির জবাব দিন, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!

টস্‌টস্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ল ইয়ং-এর দু'চোখ বেয়ে। বলল—তাই হোক ডক্টর। মা যা বলছেন তা-ই হোক।

শপথ

সুধীর করণ

ছোটশালবনের পেছনে ঝিমিয়ে পড়লো দিবসের শেষ সূর্য। ধীরে ধীরে একটা কালো মৃত্যুর যবনিকা নেমে এলো লাল মাটির বুকে। অন্ধকারের বুকে কিলবিল করে নড়ে উঠলো কতকগুলো সাপ। পৃথিবীর কালো বাজার তার হিংস্র কুটিল ফণা তুলে দাঁড়ালো অতি সঙ্গোপনে।

অগুন্‌তি লোক গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে শালবনের কোলঘেঁষা সরু পায়ে চলা পথে।

লখাই মাঝি ফিস্‌ফিস্‌ করে শিবু মাহাতোকে জিজ্ঞেস করে ঃ আর কতটা ধূর যাতে হবে হে?

ঃ আর ধূর ক্যথা! পুয়াটাক রাস্তা লয় ; উ-ই যে বাঁধটা দেখা যাচ্ছে— ; শিবু মাহাতো ফিস্‌ফিস্‌ করে জবাব দেয়।

ঃ শেলই আছে তুমার ট্যাঁকে? লখাই এগিয়ে যেতে যেতেই প্রশ্ন করে আবার।

ঃ আছে হে আছে। চ' না আর একটু। সীমার পাথরটা পেরিয়ে —তবে চুটা ধরাব। দেশলাইটা ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য শিবু মাহাতো একবার হাত বুলিয়ে নেয় ট্যাঁকের ওপর।

গামছা-পরা, কপ্‌নি-পরা, কালো মানুষগুলিকে প্রেতের মতোই মনে হচ্ছে। আঁধারের বুক ফুঁড়ে প্রেতায়িত মানুষের শোভাযাত্রা! মাত্র দু-আড়াই মণ ধানের ভারও যেন বইতে চাইছে না তাদের কাঁধ। কাঁধের শক্ত মাংসপেশীগুলো যেন তুলোর মতো নরম হয়ে গেছে হঠাৎ। কেউ কেউ হাঁপাতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। ভাদ্রের গুমোট গরমে টস্‌টস্‌ করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে তাদের। কালোঘাম। এক মাইলের চেয়ে কিছুটা দূর হবে। রোদে পুড়ে কঠিন মাটি-কাটা যাদের অভ্যাস, তাদের ঐ ন্যাকামি দেখলে কার না রাগ হয়। শিবু মাহাতো চাপা গর্জন করে ঃ পাগুলো কি চলছে না তোদের।

মরিয়া হয়ে কালো কঙ্কালসার মানুষগুলি দ্বিগুণ জোরে পা চালাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। অর্ধনগ্ন সাঁওতালের দল একমুঠো অন্ন সংগ্রহের জন্য মিলিয়ে যাচ্ছে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে। কর্কশ পায়ের চাপে খস্‌খস্‌ করে একটা শব্দ হচ্ছে মাত্র। সমান তালে পা ফেলার মধ্যে যেন আগামী দিনের আকাঙ্ক্ষা। রূঢ় অন্ধকারের পারে—হয়তো উজ্জ্বল সূর্যের সম্ভাবনা। এক তালে চলার স্বীকৃতি।

আর বেশী দূর নয়। কয়েক পা এগিয়ে বাঁধ। আর বাঁধের ধারেই পাঁচ-ছটা ট্রাক চোখ বন্ধ করে ঝিমুচ্ছে। শেঠ মনোহর চাঁদ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার ট্রাক!

বাঁধের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে হরিশ সাউ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ছে ঃ ই দিকে লি আয় সব। ... আরে, উখানে বসে পড়ছু যে তোরা। এ্যাই লখাই ; তোর জ্ঞানগম্যি কি নাই কিছু? সীমাটা পার কর আগে। ওজনের কাজটা শেষ করে, তারপর চুটা ধরাবি। শালারা বিড়ি না টানলে যেন বাঁচবেক নি। গজ্‌গজ্‌ করতে থাকে হরিশ সাউ।

বাঁধের ওপাশে ওজনের কাঁটা টাঙানো রয়েছে। পেট্রোম্যাক্স্ জ্বলছে একটা, রাঢ়ভূমির বন্ধুর প্রান্তরের মধ্যে একটু ঢালুমতো জায়গায় কাঠের একটা চৌকিতে বসে থাকে রাঘব সামন্ত, — শেঠ ঝুনঝুনওয়ালার কর্মচারী।

আসবার সময় সীমান্তের পুলিশ ক্যাম্পে টুঁ মেরে এসেছে হরিশ সাউ। পনেরো টাকায় চুক্তি। কোন সবুট পদধ্বনি এ দিকটায় শোনা যাবে না। হরিশ সাউ এদেশের ধান ও-দেশে নির্বিঘ্নে পার করে দিয়ে, কয়েক ঘণ্টায় কমপক্ষে দেড়শো টাকা রোজগার করে—ফিরে আসবে। বাঙলার ধান শেঠ ঝুনঝুনওয়ালার মিলে চলে যাবে বিহারে।

শিবা ক্যথায় শিবা ঃ হাঁক দেয় হরিশ সাউ। উয়াদের এদিকে লি আয়। শিবু মাহাতোর ভালো লাগে না হরিশ সাউকে। লোকটা ভালো ব্যবহার করতে জানে না। না হয় পেটের দায়ে চোরাবাজারীদের চাকরি করেছে সে, কিন্তু একেবারে তো আর হীন হয়ে যায়নি।

শিবু মাহাতোর কাজ হলো সাঁওতাল-কুলি জোগাড় করা। ঠিক সময়ে তাদের ডেকে আনা, তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া। বাধ্য হয়ে একাজ তাকে নিতে হয়েছে। না হলে এ জ্ঞানটুকু তার আছে, যে দেশের ধানচাল বিদেশে গেলে দেশেরই ক্ষতি। দেশের লোকেই না খেতে পেয়ে মরে। হু হু বেড়ে যায় ধান-চালের দাম। কিন্তু বাঁচতে হবে তো! দৈনিক দু'এক টাকা না পেলে তার সংসারটাই বা চলে কি করে!

বাঙলা-বিহারের সীমান্ত।

প্রাকৃতিক কোন সীমারেখা নেই। গড় মিল নেই কিছু, এপারের আর ওপারের মানুষের, তাদের ভাষার। সিংভূমের ধলভূম আর মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা, প্রত্যন্ত রাঢ়ের বনভূমি।

ট্রাকের ওপর বস্তা বোঝাই হতে থাকে। করকরে নোটগুলো গুনে নেয় হরিশ সাউ।

ঃ এত কম-কম ধান আনছো কেন সাউর পো? রাঘব সামন্ত জানতে চায়।

ঃ শালারা বইতে পারছে নি যে! না হলে তুমাদের শেঠজীর গোলায় জায়গা থাকতো নি আর।

ঃ একটু অভিমানের ছোঁয়াচ লাগায় গলার স্বরে ঃ তা' —তুমরা দামটা আর একটু চড়াও সামন্ত। জান কত লোকসান দিয়ে ধান দিতে হচ্ছে। একটা বিড়ি ধরায় বলতে বলতে।

ঃ তুমার যে বড় খাঁই হে। বলি কম দর দিচ্ছি নাকি! নরেশ ঘোষের গোলায় এর চেয়ে অনেক কম দেয় জানো। শেঠজী আমাদের সে-রকম গলাকাটা লোক নয়, হুঁ হুঁ। ষোল টাকা মন দিচ্ছি। এতে কি বাঁচে আমাদের? ট্রাক ভাড়া আছে, কুলি ভাড়া আছে, চাকর বাকরদের মাইনে আছে আর—। কথা শেষ না করেই, সামন্তও বিড়ি ধরায় একটা।

হাতের ঝাকুনি দিয়ে নিবিয়ে দেয় জ্বলন্ত কাঠিটা। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পুনরাবৃত্তি করে আবার—জানলে সাউর পো, নানান্ ঝামেলা। ব্যবসা করা কি সুখের কথা। এই রাত জেগে অন্ধকারের মধ্যে মশার কামড় সহ্য করা কেমন সুখের কথা বল দিকি? তাছাড়া—গলার স্বর একটু নামিয়ে আনে রাঘব সামন্ত। বলে ঃ তুমার সাঁওতাল বেটাদের রেট তো দশটি আনা। বেড়ে বাগিয়েছো শালাদের। মন করা কম পক্ষে তো পুরা দেড়টি টাকা লাভ থাকে তোমার। কেমন, খারাপ বলছি কিছু। বাঁ চোখের বাঁ কোণটা কুঁচকে মুচকি হাসবার চেষ্টা করে রাঘব সামন্ত। তাছাড়া, বাবা হাটে হাঁড়ি ভাঙতে পারি আমি। মন করা চারটি গণ্ডা পয়সা তো তোমার ট্যাকেই যায়। তোমার মালিক গোকুল মহাপাত্রর পকেটে তো যায় না। এ্যাঁ কি বল? হো হো করে হেসে ওঠে রাঘব সামন্ত। দুপাটি দাঁতের মাঝখানে তার হাঁ টা রাঘব বোয়ালের মতো মনে হয়।

ঃ কি যে বল সামন্ত, আমার আবার লাভ। মাইরি বলছি, কোন্ শালা মিছা কথা বলে।

ট্রাকগুলো গুমরে ওঠে একবার। তারপর এক এক জোড়া কুটিল উজ্জ্বল চোখ নিয়ে ঝুনঝুনওয়ালার মিলের দিকে ছুটে যায়। গোটারাত ধরে চলবে এই আনাগোনা।

গোটা রাত ধরে সীমান্তের পুলিশ ক্যাম্প অপেক্ষা করে থাকবে—অনেক হরিশ সাউর জন্য। কোন সবুট পদধ্বনি এগিয়ে আসবে না এদিকে।

ঃ এখন তবে উঠি হে সামন্ত, হরিশ সাউ আড়মোড়া ভাঙে। পাক্কা তিনটি মাইল হাঁটতে হবে।

লখাই মাঝি এগিয়ে আসে। পেট্রোম্যাক্সের আলো তার কুচকুচে কালো শরীরের ওপর ঠিকরে পড়ে যেন। কোমরে একটা ছেঁড়া গামছা জড়ানো। বাহুর মাংসপেশীগুলো শিথিল হয়ে আসছে ক্রমশ। চওড়া, চোয়াল—উঁচু মুখের ওপর। কেমন যেন একটা বিষাদের ছাপ। অন্ধকার আকাশের সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে তার। সারা দেহে নিরন্নতার আঁচড়।

ঃ আমাদের দামটা চুকাই দে হে। আমরা সোজা বাটে চলি যাবো। হুই পাশ দি'।

শিবু মাহাতোও এগিয়ে আসে ঃ আমার পাওনাটাও দিয়ে দ্যান সাউ মশয়। আজ আর আপনার উখানে যাবনি।

হরিশ সাউ খেঁকিয়ে উঠে ঃ তর আর সয়না যে তুদের। বলি, পয়সাটা কি আমি দিব না তুদের? পেলে তো তাড়ি গিলবি, হাড়িয়া খাবি। নাঃ, শালা তুদের আর ভালো করতে পারা গেলনি। তার চেয়ে চাল দিব চল্। পয়সা কি করবি? চাল নিয়ে ভাত রান্না করে খাবি যা। গায়েগতরে বল হবে। কদিনে তো আউসে পড়েছিস একেবারে। —এ্যাঁ, কি বল সামন্ত?

রাঘব সামন্ত ফিরেও তাকায় না ওদিকে।

ঃ না বাবু, তুই পইসা দে আমাদের। তোর ঘরে গেলে দিন দিন ঘুরাতে থাকু। আজ আমরা মানবোনি। পইসা লিব।

ঃ তাহ'লে চাল লিবি না তোরা? খাবি কি? হরিশ সাউ বলে।

ঃ উ আমরা দেখি লিব। সবাই আমরা পইসা লিব।

শিবু মাহাতোর দিকে ফিরে হরিশ সাউ গলার মধ্যে কোমলতা আনবার চেষ্টা করে।

ঃ তোদের ভালোর জন্যই বলিরে শিবু। তা তোরা যখন পয়সাই লিবি তাই দোব। তা অত তাড়াহুড়া করলে কি চলে? আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি? তবে ইখানে তো খুচরা পয়সা নাই, বাড়িতেই চল।

মজুরদের চালই দিত হরিশ সাউ। চালটা অখাদ্য। সরু মোটা, ভাঙ্গা, আভাঙ্গা, গুমো চাল। একটু সস্তা দামেই দিতো। ভাদুরে টানের সময় এটা। কারুর ঘরে এক ছটাক ধানও নেই। সাঁওতালদের তো কথাই নেই। এ সময়টায় বড় অভাব। মকাই সেদ্ধ আর কদো ঘাসের বীজ খেয়ে কাটিয়ে দেয় সাঁওতাল-মাহাতোরা। বেঁচে থাকবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় হাঁপিয়ে ওঠে ওরা। ওদের চোখের ওপর দিয়ে হাজার হাজার মণ ধান চলে যাচ্ছে। কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে, কিছুই জানে না ওরা। মাঝে মাঝে ওদেব চোখগুলো ট্রাকের চোখের মত জ্বলে ওঠে। ইস এত ধান!

হরিশ সাউর মনিব গোকুল মহাপাত্র কমপক্ষে আটশো বিঘে জমির মালিক। অরণ্য অঞ্চলে কুলি-মজুরের অভাব হয় না তাঁর, খেতে সোনালী ফসল ফলাতে। হরিশ সাউ তাঁর ডান হাত।

গোকুল মহাপাত্রর একটা ঘরের কোণে স্তূপীকৃত হয়ে আছে চাল। ডুলং নদীর সাদা কুচো কুচো পাথর হাত দিয়ে বোঝা যাবে না ওখানে, দাঁত দিয়ে বোঝা যাবে। ঐ চাল, আকালের সময় একটু সস্তা দরে বিক্রি করা হয় সাঁওতাল মাহাতোদের মধ্যে। পরিবর্তে দয়ালু গোকুল মহাপাত্র পয়সা নেন্ না, শ্রম নেন। গায়ে গতরে খেটে দিয়ে যায় সবাই।

অনেক দিন থেকে শিবু মাহাতোর মনে কালো মেঘ জমছিল। একদিন না একদিন ঝড় উঠবেই।

ঃ বিড়ি খা সব, আয়—। হরিশ সাউ ডাক দেয়।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে সবাই। এ বাবা, শাল পাতার বিড়ি লয়, দস্তুর মতো খাকি সিগরেট। হরিশ সাউ আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

ঃ আঁ মরণ, ঘাড়ের ওপর পড়ছু যে তোরা। ফস করে একটা কাঠি জ্বেলে নিজের বিড়িটা ধরিয়ে নেয় সে। তারপর দু বাণ্ডিল বিড়ি শিবু মাহাতোর হাতে তুলে দেয়—দাও হে শিবু, ভাগ করে দাও উয়াদের। তুমি রাখবে বেশী করে নিজের জন্যে। দয়া প্রকাশের সুযোগ পেয়ে হরিশ সাউর বুকটা এক ইঞ্চি ফুলে ওঠে যেন।

পরস্পরের বিড়ির আগুন থেকে যে যার বিড়ি ধরিয়ে নেয় ওরা। অন্ধকার রাতের বুকে দপ্‌দপ্ করে জ্বলে উঠছে কতকগুলো মুখ।

পাড়ায় পৌঁছাতে রাত হলো ঢের।

সবাইকার মনের মধ্যে ভাদ্র মাসের গুমোট-ভরা। কি যেন একটা উদ্বেগ, একটা প্রকাশহীন চিন্তা। কি যেন করতে চায় ওরা। জানে না, কি করতে চায়।

লখাই মাঝির ছেলেটা ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে। অত রাতেও চেঁচাচ্ছে ঃ ভাত খাবো, পান্তা ভাত দে না দুটি।

লখাই-এর বুকের ভেতরটা টন্‌টন্ করে ওঠে হঠাৎ। হাঁড়িটা যে পুরোপুরি শুকনো, তা সে ভালো করেই জানে। সন্ধের সময় খালি পেটেই বেরুতে হয়েছে তাকে।

আজ চালও পাওয়া যায়নি। পয়সাও পাওয়া যায়নি। কাল সকালে সবাইকে ছুটতে হবে হরিশ সাউর কাছে।

ছেলেটার গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। লখাইকে দেখে আরো জোরে চেঁচিয়ে ওঠে সে।

একটা ধমক দিয়ে ওঠে লখাই। বলে ঃ জল খাবি?

ঃ দেঁ।

ভয়ে ভয়ে জল খেয়ে ছেলেটা মড়ার মতো পড়ে থাকে। খেজুর পাতার চাটাইটা টেনে নিয়ে অবসন্ন লখাইও শুয়ে পড়ে।

সকাল না হতেই মুরগীর পাল বেরিয়ে পড়ে সাঁওতালদের কুঁড়ে ঘর থেকে। শুয়োরগুলো ঘোঁৎ ঘোঁৎ ডাক ছাড়ে। উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলো মহুয়ার গাছের তলায় এসে ভিড় জমায়।

ঃ যাবি নাকি হে? শিবু মাহাতো সাঁওতাল পল্লীর ভেতর দিয়ে হেঁটে আসে। চল্।

ঃ না গেলে চলবে? পেট যে ঘন্‌ঘন্ করছে। লখাই জবাব দেয়। অন্ধকারে শ্রমিকেরা মহুয়া গাছের তলায় এসে জড়ো হয়। একসঙ্গে যাবে সবাই।

ছিরু মুর্মুর বয়সটা বেশী নয় কিন্তু পাকা পাকা কথা বলে।

সেই বলল ঃ শিবু কাকা এমন করি কদিন বাঁচব গো।

ঃ খেতে পাচ্ছি নাই যে— কে একজন বলে ওঠে।

ঃ পাবি কুথার থেকে? সব ধান চাল তো শালা মাড়োয়ারী লিয়ে যাচ্ছে। দামটাও বাড়ছে হু হু করি। আমরা শালা মরব ইবার। উপায় নাই আর।

লখাই মাঝি, একটা শাল পাতার বিড়ি তৈরি করে শিবু মাহাতোর হাতে তুলে দেয়। নিজেও ধরায় একটা। উগ্র ধোঁয়ায় গমগম করে গাছতলাটা।

যদ্দিন ই ব্যবসা ছিল নাই, তদ্দিন ধানের দামটাও কম ছিল, কি বলো শিবু কাকা? লখাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শিবুর দিকে তাকায়। কি যেন ভাবছে শিবু। অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর মনে হয় তাকে।

ছিরু মুর্মু ফস করে বলে ওঠে ঃ আর ধান চাল পেরাতে নাই দিব আমরা। আমরা আর নাই যাব ভার বইতে। কি করি ধান লি যাবে ইখান থাকতে। টেরাকের রাস্তা তো আর ইখানে নাই। শালা গেরামে চাল কিনতে গিয়ে কুথাও পায়নি হাড়াম বুড়া। পেট চাপড়ে কাঁদছে। সব ধান চাল যদি এমনি করি চলি যাবে, তাহলে—

ঃ হঁ হঁ ঠিক কথা। আকস্মিক সমর্থনে সারা জায়গাটা কাঁপতে থাকে যেন। ঠিক কথা। ছিরুই সবাইকার মনের কথা বলেছে। বোধ হয় এই কথা বলবার জন্য সবাই উশখুশ করছিল কদিন ধরে। কেউ বলতে পারেনি সাহস করে। —ধান চাল নাই পেরাতে দিব আমরা। সকলে মনে মনে ঐ গুমরে-ওঠা কথাটা হঠাৎ জোর আওয়াজে ফেটে পড়েঃ নাই দিব, নাই দিব—

ঃ চুপ কর ছিরা। শিবু মাহাতো বলে। ইটা যদি তোদের মনের কথা হয়, তাহলে গোলমাল করিস না। আগে পইসা কড়ি লিয়ে আসি চল, তারপর যাহোক করা যাবে।

দলটা এগিয়ে যায়। যেতে যেতেই কে একজন বিজ্ঞের মতো বলে ঃ ভার বহিতে নাই গেলে, মরি যাব হে। খাব কি?

চেঁচিয়ে ওঠে ছিরু ঃ নাই থাকব ইখানে। মাটি কাটতে চলি যাব উ-ই মেদ্‌নীপুরেব দিকে। তবু উয়াদের লাভের গুড়টা খসাতে হবেক। শালা দেশশুদ্ধা লোক মরি যাচ্ছে। উয়ারা টাকা জমাচ্ছে।

ঃ খাঁটি কথা বলেছিস তুই। শিবু বলে। কিন্তু পারবি তোরা, ই কাজ করতে?

লখাই মাঝি অনেকক্ষণ পরে কথা বলে ঃ যদি মারে? উয়াদের বন্দুক আছে? যদি গুলি মারে? পুলিশের সাথে তো উয়াদের পিরিত আছে। উয়ারাও যদি বন্দুক লি আসে।

নির্লিপ্তভাবে ছিরু জবাব দেয় ঃ কাঁড় নাই নাকিআমাদের? না খাঁয়ে মরার চাইতে, এমুন করি মরা-ও ভালো।

ঃ হুঁ হুঁ মরবোতো মরবো। একটা গরম বাতাস ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। লখাই অনুভব করে, তার পেটের ভেতর থেকে কি একটা যেন বুকের মধ্যে ঠেলে উঠে পড়েছে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করে পেটের বাঁ দিকটায়। কাল গোটা রাত উপোস দিতে হয়েছে তাকে। তার রোগা ছেলেটাকেও।

ঃ চল, ইবার সব। চাল লিয়ে আসি। শিবু মাহাতো বলে।

দলটা এগিয়ে চলে হরিশ সাউর কাছে।

গোকুল মহাপাত্রর বাড়িতে হরিশ সাউ বসেছিল দাওয়ার ওপর। আর দাঁতন কাঠি চিবোচ্ছিল।

দলটাকে দেখে, দু একবার ওয়াক্ ওয়াক্ করে মুখটা ধুয়ে নিল। বলল ঃ এসে গেছু তোরা? দাঁড়া, কাজটা সেরে নিই। তা পয়সা লিবি না, চাল? মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতেই বলে। পয়সা যদি চাস তো দেরী করতে হবে একটু। খুচরা পঁয়সার জোগাড় করতে হবে।

ঃ চালই দেন সাউ মশয়। পয়সা কি করব লিয়ে। লখাই জবাব দেয়।

অদ্ভুত ভাবে নাকটাকে সঙ্কুচিত করে একটা পৈশাচিক হাসি চেপে রাখে হরিশ সাউ।

ঃ উযারা দুদিনের আগ্‌তরা চাল চায় যে গো, শিবু মাহাতো সহজ ভাবে সাঁওতালদেব হয়ে ওকালতী করে।

ঃ এ্যাঁ। হরিশ সাউ যেন চমকে ওঠে। অগ্রিম দিতে হবে? একটু চিন্তাগ্রস্থ হয় সে। তারপর কি ভেবে বলে ওঠে ঃ বেশ, তাই দোব। সবাই চাল পেলো।

ঃ ঠিক সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবি সব। আবার যেন হাঁক ডাক করতে না হয়। না হয, কে কোথায় হাড়িয়া খেয়ে পড়ে থাকবি। হরিশ সাউ সাবধান করে দেয় ওদের।

ঃ আর হাঁড়িয়া! খাতেই পাচ্চি না, তার আবার হাঁড়িয়া। চাল না হলে আর হাঁডিয়া হবেক নি। লখাই জবাব দেয়।

আবার সন্ধ্যা এলো আবার কালোবাজারী আর চোরাকারবারীদের সর্পিল চোখগুলো জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠলো।

সন্ধ্যা হতে না হতেই হরিশ সাউ সাঁওতাল পাড়ায় হাজির। পাড়া একেবারে পুরুষ শূন্য।

ঃ গেল কুথা সব? —একটা মেয়েকেই প্রশ্ন করে হরিশ সাউ।

ঃ নাই জানি। জবাব দেয় মেযেটা। তারপর কুঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

ঃ ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় হরিশ সাউ। শালা, যত সব শূয়োরের বাচ্চা। দেখাচ্ছি মজা। হনহন করে হরিশ সাউ মাহাতো পাড়াব দিকে পা বাড়ায়।

বুড়ো নিমু মাহাতো, দাওয়ায় বসে শনের দড়ি কাটছিল, ঢেবা ঘুরিয়ে। হরিশ সাউ-কে দেখে বলল ঃ কে গো? বাবু মশায়?

হরিশ বলে ঃ গেল কুথা সব? শিবে কোথা?

ঃ কি জানি বাবু উই দিকে ত গেল সবাই—উই বনটার দিকে।

নিরুপায় হযে বাড়ির দিকেই পা বাড়ায় সে। মনে মনে গজরাতে থাকে ঃ ডোবাবে নাকি শালারা। এক দিনের ফাঁক মানে তিন চারশো টাকা লোকসান। শালাদের অগ্রিম দাম দিয়েছি কিনা তাই।

ফিরতি পথে সাঁওতাল পাড়ায় ঢুকে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় একটু। সুস্পষ্ট যৌবনা একটি সাঁওতাল তরুণীকে দেখে তার জিভ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে যেন। ছিরু মুর্মুর বৌ।

ঃ ছিরু কুথায়, জানিস?

মেয়েটি মুচকি হেসে জবাব দেয় ঃ নাই জানি। হুই দিকে গিছে সব। সন্ধের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে আস্তে আস্তে। কয়েকজন লোকের গলার স্বর শুনতে পায় হরিশ সাউ। আসছে বোধ হয় শালারা।

ছিরু বাঁশি বাজাচ্ছে। হৈ হৈ করতে করতে আসছে সবাই। দলটা পাড়ায় পৌঁছুতেই ফেটে পড়ে হরিশ সাউ। কি ব্যাপার তুদের? এখনও ঘুবছে যে? দাম দিই নাই অগ্রিম? শালা, তোদের খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান ইদিকে। উদিকে—

ঃ নাই যাব আজ আমরা, হাঁড়িয়া খাব, ছিরু জবাব দেয়।

ঃ যাবি না?

ঃ নাই যাব। খুশি বটে আমাদের না? খুশি হলেই যাব।

ঃ যাবি না? যাবি না বল্লেই হলো? কোথায় বাস করিস জানিস।

ঃ হাঁ জানি ত। লখাই জবাব দেয়। বাকি, আজ আমরা যাব নাই।

ঃ বলি দেনা হে, আমরা ধান চাল ..।

কে একজন কি বলতে চায়। ছিরু তাকে থামিয়ে দেয় এক ধমক দিয়ে। বলে ঃ চুপ কর এখুন। হরিশ সাউর দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বলে ঃ আজকে যাতে নাই পারব আমবা সাউ মশয়।

রাগে এবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো হরিশ সাউ ঃ কে কে যাবি না, বল শালারা, অগ্রিম দাম দিয়েছি, আকালের সময় ধান চাল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি কিনা, তাই শালাদের বাড় বেড়েছে।

ঃ কেনে গাল দিচ্ছু হে। আমরা নাই যাবো, আমাদেব খুশি। লখাই বলে।

ঃ খুশি? চেঁচিয়ে ওঠে হরিশ সাউ। কি যেন ভাবে সে। হঠাৎ যেন রূপ বদলে যায় তাব। গলার স্বর নামিয়ে আস্তে আস্তে বলে ঃ কত চাস তোরা? চোদ্দ আনা?

আমরা ধান চাল নাই বহিব আব। মাটি কাটার কাজ দে আমাদেব। ই দেশেব লোক খাতে পাচ্ছে নাই; আর তোরা সব ধান চাল পার কবাই দিচ্ছু—ছিরু মুর্মু এইবার আসল কথাটি বলে। সমর্থনে চাপা গুঞ্জন ধ্বনিও শোনা যায়।

হরিশ সাউব মুখটা রাগে অপমানে কেমন যেন নেকড়ে বাঘের মুখের মতো ভযংকব বীভৎস হয়ে ওঠে। দাঁতেদাঁত চেপে সাঁওতালদের ধৃষ্টতাকে জোব করেই সহ্য করতে চায। কিন্তু পারে না। শালাদের সাহস তো কম নয়? কে শেখালো এদেব একথা।

কিন্তু এদের কাছে হেরে গেলে তো চলবে না! তাহলে এরা তো মাথায় চড়ে বসবে!

হঠাৎ জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে হরিশ ঃ সরকারের বিপক্ষে যাচ্ছিস তোরা। এর ফলটা জানিস? বন্দুক দিয়ে উড়িয়ে দেবে সবাইকে। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবি সব।

ছিরু রেগে কি বলতে যাচ্ছিল। লখাই তার মুখটা হাত দিয়ে চেপে দিতে চায়।

এক ঝটকায় হাতটাকে সরিয়ে ফেলে ছিরু বলে ঃ কাঁড় আছে, কাঁড়। সরকারকে বলি দিবেন। উয়াদের বন্দুক, তো আমাদের কাঁড। ধান নাই বহিব আমরা, আমাদের খুশি।

হরিশ সাউ ততক্ষণে হন হন করে এগিয়ে গেছে কিছুদূব। সাহস করে সাঁওতালদেব মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছে না। বিশ্বাস নেই শালাদের, জংলী তো।

দূরের থেকেই হাঁক দিযে বলতে বলতে যায়—খাবি কি শালারা? দেখবো তোদের তেজ—

ঃ এমনুতেই তো না খাঁয়ে আছি। মাটি কাটতে চলি যাব, তবু তোব উ কাজ আর কববনি। কে শালা ধান বহিতে যায়, তাকেও দেখব।

দূরের অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হরিশ সাউ। জ্বলজ্বলে তারাগুলোকে ইতস্তত ছড়ানো টাকার মতো মনে হয় তার। আজ রাতে অনেকগুলো টাকা আসত। খোঁচাখাওযা বাঘের মতো একটা চাপা গর্জন তার গলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে।

মামাল্লাপুরমের মহাবীর

সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার

যেদিকে তাকাও সমুদ্র। বঙ্গোপসাগরের ঢেউ আছড়ে তটের পাথরের উপর। বিকেলের রোদ মন্দিরের চূড়ো স্পর্শ করেছে। পৃথিবীর এই প্রান্তে সমুদ্র শুধু দক্ষিণে নয়। পূর্ব আর উত্তরেও। মনে হয় পৃথিবীর সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি। তিনদিকে জল, শুধু জল। সেনানীর মতো সেই জল পাহারা দিচ্ছে সপ্তম শতকের বিষ্ণু মন্দির।

—মাগা মানে মহা, বলী হল স্যাক্রিফাইস আর পুরম মানে গ্রাম। মাগাবলীপুরম। এখন মামাল্লাপুরম বলে অনেকে। গাইডের মুখে দিগ্‌বিজয়ী হাসি।

এতদিন ধরে যে জায়গাটা মহাবলীপুরম বলে জেনে এসেছে, আজ হঠাৎ রূপা জানতে পারল সেটার নাম আসলে মাগাবলীপুরম। সেই মহাবলীপুরম বা মাগাবলীপুরমের শোব টেম্পলের সামনে দাঁড়িয়ে একটু আগে এই কথা বোঝাচ্ছিল নাছোড়বান্দা গাইড।

কেন যে নতুন চটিটা কিনতে গেলাম! মনে মনে নিজের উপর চটে উঠল রূপা। এখন ওরা সবাই ঘুবে ঘুরে বেড়াবে. আর ওকে স্থাণুর মতো একটা জায়গায় বসে থাকতে হবে। হলও তাই। ওরা চলে গেল, দল বেঁধে, ওকে সান্ত্বনা দিযে। বসে রইল রূপা। সমুদ্রের দিকে পিঠ করে, ঘাসের উপর। সামনে বিষ্ণু মন্দির। ভিতরে শায়িত বিষ্ণুর মূর্তি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দেখে এসেছে। দেখেছে কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ। মনে হয় ওরা যেন মেশিনে পালিশ করেছে সেটা। ওটা নাকি চোদ্দো কিংবা আঠারো ফুট উঁচু ছিল, কী একটা বিবাদের পর সেটা ভেঙে চার ফুটে নামিয়ে আনা হয়েছে। রূপা ঠিক বুঝতে পারেনি কে কার সঙ্গে লড়াই করে এই সর্বনাশ ঘটিয়েছে। মন্দিরের বাইরে চত্বরের একপাশে দেখেছে, ছোট্ট পাথবের ফলকের মধ্যে দুর্গার মূর্তি। পাশে মৃত মহিষ। মহিষাসুর বধের কাহিনী খোদাই করা পাথরের গায়ে।

—যে গল্পটা বললাম, বুঝতে পেরেছ তো? ওর দিকে চোখ রেখে বলেছিল গাইড।

—হ্যাঁ, আমাদের দেশে দুর্গাপুজো বড়ো পুজো, উত্তর দিয়েছিল রূপা।

কিন্তু তারপব আর বেশি এগোতে পারেনি। পায়ে ভীষণ লাগছিল। তাই ওকে বসিয়ে রেখে অন্যরা সাইটসিয়িং করতে চলে গেল।

—দ্যাখ্, বসে বসে যদি মহাবীরের দেখা পেযে যাস, হাসতে হাসতে বলল শোভা।

হোটেলের এক বুড়ো বেযারা গত রাতে ওদের বলেছিল, বিষ্ণু মন্দিবে মহাবীরের মূর্তি রয়েছে। খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি ওদের। শ্রীদীপ আবার এসব নিয়ে পড়াশোনা করে। কথা শুনে ওর দিকে তাকিয়েছিল ওবা। মাথা নেড়ে শ্রীদীপ জানিযেছিল, বাজে কথা।

ঘাসের পরে কিছু ঝাউ গাছ। তারপর শক্ত তার দিয়ে বেড়া বাঁধা। তাবও পরে পাথরের বাঁধ সমুদ্রের জল আগলাচ্ছে। ডানদিকে ছড়ানো-ছেটানো অনেকগুলো পাথরের ষাঁড়। গাইড বলল, নন্দী। বলল, আরও ছ-টা মন্দির ছিল, এখন জলে তলিয়ে গিয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে নাকি তাদের চূড়া দেখা যায়। অতগুলো পাথুরে ষাঁড় দেখে আরও ছ-টা মন্দিরের কথা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল রূপার।

সূর্য ধীরে ধীরে নামছে। এদিকে লোক খুব একটা নেই। দেখারও কিছু নেই। বাঁদিকে সমুদ্রের দিকে উঁকি মেরে বসে থাকতে থাকতে রূপা কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, নিজেও টের পেল না।

—আমাকে ধরিয়ে দেবে না তো? ধরিয়ে দিও না!

চমকে উঠল রূপা। সামনে দাঁড়িয়ে উশকো-খুশকো এক মাথা চুলের একজন মানুষ। গায়ে বিচিত্র পোশাক। সোজা লোকটার চোখের দিকে তাকাল। চোখ দেখে মানুষ চেনার একটা ক্ষমতা রূপার আবাল্য। তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। এ কে!

—কে আপনি? বলে উঠল ও।

আর বলেই টের পেল ও তো লোকটির ভাষা বলল না। কী ভাষা সেটা, যা ও জানে না, কিন্তু মানে বুঝতে পারল?

—ওরা আমাকে খুঁজছে, আজও খুঁজছে।

লোকটি হাঁফাচ্ছে। চোখেমুখে ভয়, আশাও।

— কেন?

— কেন! করুণ হাসি হাসল লোকটি।

বন্দর শহরে সন্ধে নামছে। এমন সময় ট্যাঁড়ার শব্দ উঠল। রাজবার্তা পৌঁছোল ঘরে ঘরে। সমুদ্রতটে, যেখানে মহাসমারোহে চলছে মন্দির গড়ার কাজ। সোভম আচারীকে রাজা নরসিমহা বর্মন তলব করেছেন। তাকে দেখা মাত্রই যেন এই খবর পৌঁছে দেওয়া হয়। আচারীদের ছেনি-হাতুড়ির ঠুংঠাং কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। এ সময় রোজই হয়। আজ বহুদিন সোভম ঘরে নেই। কেন নেই, তা কেউ বলতে পারে না। তাই রোজ সন্ধের এই সময় রাজার দূতেরা একবার করে এখানে এসে ট্যাঁড়া পিটিয়ে সবাইকে মনে করিয়ে দেয়, সে এলেই যেন রাজার কাছে যায়। জরুরি তলব। কয়েক নিমেষের নৈঃশব্দ্যে শিল্পীরা একটু উদাস, কিছুটা বিপর্যস্ত। রোচনের ছেনি ফসকেছে আজ নিয়ে দু-বার। বিষ্ণুর জটায় মহাবীরের আভাস দেখে ওরই গুরু রাজিবাবার ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল। তিনি কিছু বলেননি।

—আরে, রুমিনী, সোভমের কোনো খবর পেলি?

পেরুনিলাই বরাবরই ঠোঁটকাটা। সকলে জানে সোভম চলে যাওয়ার পর থেকেই রুমিনী প্রায় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সামনের অঘ্রান মাসে ওদের বিয়ে হওয়ার কথা। তার মধ্যে হঠাৎ কাউকে কিচ্ছু না বলে সোভম উধাও। রুমিনী পেরুনিলাইয়ের কথার কোনো উত্তর দেবে কিনা দেখতে কয়েকজন মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল। আরে, আজ যেন ওকে খুশিখুশি দেখাচ্ছে, তবে কী সোভমের খবর পেয়েছে?

—না, মাসি, খবর আর পেলাম কই। তবে মন্দির হবে আর ও থাকবে না, তা কি হয়। দেখ ঠিক এসে যাবে, বলে এক গাল হেসে যেমন নাচতে নাচতে যাচ্ছিল, কোনো ছন্দপতন না ঘটিয়েই ঠিক তেমনই নাচতে নাচতে চলে গেল।

— বেহায়ার হদ্দ। নিজের মনে গজগজ করতে করতে পেরুনিলাইও পথ দেখল। ও কী আশা করেছিল তা ঠিক বোঝা গেল না।

আচারীরা কাজে মন দিল। দিনের আলো আর বেশিক্ষণ থাকবে না। তার মধ্যে হাতের কাজ যতটা পারা যায় এগিয়ে রাখা। পোঙ্গলের আগে মন্দিরের কাজ শেষ করতেই হবে। তার আগে সোভম এসে পড়লে সকলেই নিশ্চিন্ত হবে। রাজা নরসিমহা তো বটেই।

মন্দিরের ভার যে ওরই উপরে পড়েছে। ও, গুরু মেলু আর কয়েকজন মিলে গোটা চত্বরের নকশা, মন্দিরের আকার সবই ঠিক করে ফেলেছিল। বাকি শুধু চুড়োর নকশা। ঠিক ছিল সামনের পূর্ণিমায় সেটাও তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু তার ঠিক পাঁচদিন আগে, হঠাৎ শোনা গেল সোভম হাওয়া।

শিল্পীদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। তবু কাজ আটকে থাকেনি। মূর্তি গড়া, দেয়ালের কাজ সবই এগোচ্ছে। আজকালের মধ্যে এসে পড়লে শেষ রক্ষা হবে। আর না এলে?

—রুমিনীকে দেখে মনে হচ্ছে এবার সোভম এসে পড়বে, খোদাই করা পাথর থেকে মুখ তুলে বলল ধম্মন।

—আরে, ধম্মন, তুমিও বুড়ো হয়ে গেলে? দেখনি, আজকাল রুমিনী সচ্ছুর সঙ্গে কীরকম হেসে হেসে কথা বলে?

—কী বলছিস রে? ধম্মন খবরটায় অবাক হয়েছে বোঝা গেল। ওর না সোভমের সঙ্গে বিয়ের কথা চলছিল?

—তা বললে চলবে কেন? ওই ভাবে একটা মেয়েকে ফেলে চলে যাবে, আর সে হাঁ করে বসে থাকবে? কীসের ভরসায়?

সমুদ্রতটে সন্ধে নামল। রাজসূয় যজ্ঞ আজকের মতো শেষ। আবার আগামীকাল ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ছেনি-হাতুড়ির কোলাহলে মুখর হয়ে উঠবে জলরাশি। একে একে ওরা নিজেদের টুকিটাকি গুছিয়ে নিয়ে চলল ঘরের দিকে। এখানে এখন আর শব্দ নেই। শুধু ঢেউ ভাঙার অবিরাম কলধ্বনি।

সৈকতের নীল আঁধার বেয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে মামাল্লাপুরমের দিকে। এই কি সেই? একটু সময় লাগল ঠাহর করতে, তারপরেই বোঝা গেল, না, সে নয়। একেবারেই অন্য? এ অন্য কেউ। তাহলে কেন এই হঠাৎ শিহরণ? অকস্মাৎ উত্তেজনা? আগন্তুক জানতেও পেল না ওর পিছন পিছন নিঃশব্দে আসছে রুমিনী। ওর দু চোখ দিয়ে অনর্গল জল ঝরে পড়ছে। অন্ধকার তট থেকে দেখা মিটিমিটি আলোর নিশানা ধরে আগন্তুক এসে পড়ল একেবারে আচারী-পাড়ার মাঝে। খবর দিল ওদের। নিমেষে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল ঘর থেকে ঘরে, ঝড়ের মুখে দাবানল যেন। ছড়িয়ে পড়ল হাহাকার, একই গতিতে। হতাশা, নিরাশা, উদ্‌বেগ। তবে কী হবে?

রাজা নরসিমহা তাঁর পূর্বপুরুষের মতোই বৈষ্ণব। কিন্তু সে শুধু কয়েক পুরুষের কথা। তাই বুঝি বিষ্ণু মন্দির গড়ার এত ঘটা। কিন্তু তার আগের কথা ভুললে চলবে কেন? পল্লব রাজারা যে জৈন ছিলেন। দেশের মানুষও তো তাই। মহাবীরকে এত সহজে ভোলা সম্ভব? আচারীরা প্রশ্ন করেনি। কেউ মুখ খোলেনি। হাতের কাজে পেট চলে যাদের তাদের ওসব অধিকার থাকে না। কিন্তু দ্বিধা, সংশয় কাজ করেছে। সকলের মনে। প্রথম কথাটা তুলেছিল সোভমই।

—জৈন হয়ে বিষ্ণুর মন্দির গড়তে হচ্ছে, কপাল মন্দ বলতে হয়।

অগ্নিনক্ষত্রের মাস সেটা। হাওয়া ফিসফিস করছে না। কথাটা ফিসফিসিয়ে উঠেছিল আচারী পাড়ায়। এ যে রাজদ্রোহিতা। এর কী শাস্তি তা ওরা কেউ জানে না। নিশ্চয় ভয়ানক কিছু। ভয়ে ভয়ে কেটেছিল দিনগুলো। সোভম ওই একবারের পর আর ও বিষয়ে কোনো কথা বলেনি। নকশা হল। কাজও শুরু হল রাজার আদেশ মতো। আর তারপর হঠাৎ সোভম উধাও হল। অবাক হয়নি কেউ। একরকম নিশ্চিন্তই হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল সাময়িক। গোটা নকশা যে শেষ হয়নি। সোভম ছাড়া আর কে আছে শেষ করবে? আর শেষ করতে ফিরে এলে ওর যে সমূহ বিপদ। সে কথা ভেবেই ওদের মাথায় বাজ ভেঙে

পড়েছিল। ফিরলে তো ওর নিস্তার নেই। রাজার চর কী আর এতদিনে খবরটা রাজার কানে তুলে দেয়নি।

ভিনদেশি আগন্তুককে দেখে ঘিরে ধরল ওরা। কোথা থেকে এসেছে? কে পাঠিয়েছে? শত্রু, না মিত্র। সব জানতে আচারী-পাড়ার রাত থরথর করে উঠল। ওদের চোখ পড়ল পিছন পিছন আসা রুমিনীর দিকে। তাহলে কী ...

—গুরু মেলু কে?

ছোকরার তেজ দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল দু চারজন। কুশল প্রশ্ন নেই, পরিচয় দেওয়া নেই। প্রথমেই গুরু মেলুর নাম করছে, বেআদবটি কে?

কিন্তু ওরা কেউ কিছু বলার আগে গুরু মেলুই বলে উঠলেন।

—আমি মেলু, কোনো-খবর আছে?

—মন্দিরের নকশা নিয়ে এসেছি, নির্ভীক কণ্ঠে বলে উঠল লোকটি।

— সে কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন গুরু মেলু।

লোকটি মাথা নিচু করল। আর তখনই গোটা পাড়া জুড়ে হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল।

—কার নকশা? প্রশ্ন করলেন গুরু মেলু।

—ওর।

—তুমিও কি আচারী?

—হ্যাঁ।

--আমার সঙ্গে এস।

আগন্তুককে সঙ্গে নিয়ে গুরু মেলু তাঁর বাড়ির দিকে এগোলেন। পিছন পিছন চলল রুমিনী। গুরু মেলু ওকে বারণ করলেন না।

মন্দিরের চুড়োর নকশা এসে গিয়েছে, খবরটা পরেব দিনই নরসিমহা বর্মনের কানে পৌঁছে গেল। সেই সন্ধে থেকে ঢ্যাড়া বন্ধ হল। আর সেই দিন থেকে শুরু রুমিনীর জন্য সচ্ছুর অপেক্ষা। রুমিনীকে ও বিয়ে করতে চায়। কথাটা বলার জন্য সকাল থেকে ছটফট করছে। সেই বিকেলে, সূর্য হেলে পড়লে তবেই এদিকে একবার আসে রুমিনী। আজও আসবে ভেবে বসে রইল সচ্ছু। রুমিনী এল না।

—কার জন্য বসে আছিস রে? বাড়ির দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন গুরু মেলু।

আকাশে তখন একটা একটা করে বেশ কয়েকটা তারা ফুটে উঠেছে।

—রুমিনী, লাজুক কণ্ঠে জবাব দিল সচ্ছু।

—বাড়ি যা, শান্ত গলায় বলে উঠলেন গুরু মেলু।

—আজ্ঞে?

—বাড়ি যা। আচারীদের আরও তো মেয়ে আছে, নেই?

— সে কোথায়?

— সোভমের পথে।

— সোভম।

সচ্ছু সাদামাঠা লোক, হেঁয়ালি বোঝে না। অবাক হয়ে প্রশ্ন করল গুরু মেলুকে। এবারেও তিনি সরাসরি উত্তর দিলেন না।

—বাড়ি যা, বলে আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

আগন্তুকও কাজ জানে। লেগে পড়ল কাজে। ওর প্রতি গুরু মেলুর পরোক্ষ পক্ষপাতে অনেকেই বিরক্ত। কিন্তু এইসব ছোটোখাটো ঈর্ষা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কই। আসল কথা ও ওদের একজন। নকশা নিয়ে এসেছে। সোভমের করা নকশা। গুরু মেলুর কাছেই ওরা শুনেছে, নকশা যে সোভমের তা দেখেই বোঝা যায়। কেউ চোখে দেখেনি, সেই নকশা। রাজা দেখতে চাইতে পারেন। কিন্তু এখনও দেখতে চাননি।

কাজ এগিয়ে চলেছে হু হু করে। পঞ্চরথের মতো একখানা বিপুল পাথর কুঁদে এ মন্দির তৈরি হচ্ছে না। আলাদা আলাদা পাথরের চাঁই চুন, গুড়, পাথরকুচি মিশিয়ে পরপর জোড়া হচ্ছে। তার আগে রাজিবাবারা পাথরের গায়ে ছেনি দিয়ে এঁকে দিচ্ছে মূর্তি। না, হর-পার্বতী নয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণুও নয়। বিষ্ণু মন্দিরের গায়ে জায়গা করে নিচ্ছে সাতশো শতাব্দীর সাধারণ মানুষ আর তাদেব প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার গাথা। বিরহিনী রুমিনীর প্রতিকৃতি, সংসারি পেরুনিলাইয়ের মূর্তি। আছে সচ্ছু, সোভম, ধম্মার দৈনন্দিন জীবন কাহিনী। আছে সিংহ, গোরু, নানান জন্তু জানোয়ারের, পাখির আদল। আর আছে নন্দী। উৎসবের আগে উৎসবের আয়োজন যেন বেশি মধুর।

তবু খুঁটিয়ে দেখলে শিল্পীদের চোখে-মুখে চাপা ব্যথা, উদ্‌বেগ বোঝা যায়। এতই চাপা যে তাকে না খুঁজলে ধরা যায় না। মনঃকষ্টের বহিঃপ্রকাশ দুই ভুরুর মাঝখানে বলিরেখার গভীর খাদে। কালকের চেয়ে আজ তা আরও ঘন, আরও স্থায়ী।

ভাববৈলক্ষণ নেই শুধু পেরুনিলাইয়ের। রুমিনী চলে যাওয়াতে বড়ই বিপদে পড়েছে বেচারা। এখন কাকে জ্বালাতন করবে ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে শেষে সচ্ছুকে নিয়ে পড়ল ক-দিন।

—কী রে, কী করলি যে মেয়েটা একেবারে দেশছাড়া হয়ে গেল?

—আমি আর কী করব? ভাবছিলাম বিয়ে করব, তার আগেই তো চলে গেল। মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম মুছতে মুছতে উত্তর দেয় সচ্ছু।

নাহ্, এর পিছনে লেগে লাভ নেই। এ তো এমনিতেই মরে আছে, ভেবে পেরুনিলাই অন্য শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে আগন্তুকের সামনে। বাকিরা গুরু মেলুর খাতিরে একে ঘাঁটাতে সাহস পায়নি। পেরুনিলাইয়ের সেসব বালাই নেই।

—এই যে নতুন জামাই, কার বাড়ির মেয়েকে কাঁদিয়ে এলে গো? নাকের নাকছাবি নাড়িয়ে বলে ওঠে পেরুনিলাই।

পাথর থেকে পাথরের মুখ উঠল। চোয়াল তো নয়, ছেনি বোলানো পাথর। চোখ নয়, কুঁদে আঁকা চাঙর। পাথরের মতো নিশ্চুপ, ভাবলেশহীন, নিরুত্তর আগন্তুকের মুখ দেখে পিছু হটে পেরুনিলাইও।

এ আবার কেমন ধারা মানুষ? নিজেকে জিজ্ঞেস করে, নিশ্চয় কোনো গণ্ডগোল আছে, না হলে আচারী হয়ে কেউ এত গম্ভীর হয় নাকি? সাগরপার দিয়ে আজ যে পেরুনিলাই চলেছে, তাকে পাড়ার আর পাঁচজন দেখে চিনতে পারলে হয়। হাসি-মশকরার ভেক খসে পড়েছে ভরাট মুখ থেকে। চোখের কোণে কুটিল ছায়া। দুরন্ত কুচিন্তায় মুখ বিকৃত। রাজার কানে কী এখনই কথাটা তুলব, নাকি মন্দিরের কাজ শেষ হলে? তার আগে গোলমাল পাকালে শেষে আমাকেই না বিপদে পড়তে হয়। তার চেয়ে বরং উৎসবের সময়ে কথাটা জানিয়ে বড়ো পুরস্কার পেলেও পেতে পারি।

আচারীপাড়ার শিল্পীরা জানেও না, তাদেরই চোখের সামনে দিয়ে রোজ চলে ফিরে বেড়ায় তাদের পরম শত্রু, রাজার চর পেরুনিলাই। তাই অবাক হয়েছিল জেনে, রাজা রুমিনীর খোঁজে নানাদিকে দূত পাঠিয়েছেন শুনে। আচারী ঘরের মেয়ে নিয়ে রাজার এত

মাথাব্যথা কেন? কে-ই বা তাঁকে খবর দিল যে রুমিনী আর ওদের শহরে নেই? অনেকদিন পরে একদিন হাওয়ায় হাওয়ায় খবর পেল, সোভমের মতো রুমিনীও নাকি আর বেঁচে নেই। অনেকে কথাটা বিশ্বাস করে নিল, অনেকে করল না। কারওবই বিশ্বাস যাচাই করে নেওয়ার মতো অবসর নেই। মন্দিরের কাজ প্রায় শেষ। পোঙ্গলেরও আর বেশি দেরি নেই।

অবশেষে দিনটা এসে গেল। সকাল থেকে ঘরে ঘরে উৎসবের হাওয়া বইছে। প্রথম দিন আত্মীয়-বন্ধু নিয়ে আমোদের দিন। তারপর ভূমি নিয়ে উৎসব। তৃতীয় দিনে গোরু-বাছুরের পুজো। আচারীপাড়ায় সেসবের সুযোগ নেই। তিনদিন ধরে টানা আমোদ। এ বাড়ি ও বাড়ি যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া করা। সব উৎসবের মতো এই উৎসবেও শিশুদের ফুর্তি সবচেয়ে বেশি। দিনভোর পাড়ায় দৌরাত্ম্য করে বেড়ানো। সেই ছুটন্ত, হাস্যমুখর শিশুদের মুখেই প্রথম কথাটা রটেছিল। ওদের একজন নাকি দেখেছে, সমুদ্রের তটে রুমিনী আর সোভম এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে সে-কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। করবেই বা কেন? হুল্লোড়ের মধ্যে বাচ্চারা তো কত কথাই বলে। কিন্তু সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল, তখনও বালু, ললু, চোরুরা একই কথা বলছে শুনে গুরু মেলুরই প্রথমে সন্দেহ হল। তাহলে কি কথাটা মিথ্যা নয়। সারা দিনের উৎসবে ক্লান্ত অনেকের চোখের পাতা বুজে এসেছে। গুরু মেলু একা একা চললেন মন্দিরের দিকে।

মন্দির এখন প্রায় ফাঁকা। চত্বরে ছড়িয়ে রয়েছে কলা, নারকেল, জবা ফুল, গাঁদা ফুল। কিছু ছেঁড়া কাপড়। মাঝে মাঝে দু-একজন উঁকি দিয়ে প্রণাম করে চলে যাচ্ছে।

—কী ব্যাপার মেলুদাদা, নিজের কাজ আর একবার দেখার ইচ্ছা চাপতে পারলে না বুঝি?

চমকে তাকালেন গুরু মেলু, সামনে পেরুনিলাই।

—ভর দুপুরে তুমি এখানে? প্রশ্ন না করে থাকতে পারলেন না গুরু মেলু। তিনি বাস্তবিক অবাকই হয়েছেন।

— তোমরা ভাব, আমি সকলের সঙ্গে শুধু মশকরা করে দিন কাটাই, তাই তো? আমারও যে কাজ থাকতে পারে, সেটা তোমরা বিশ্বাসই করতে চাও না, তাই না?

—তা এখানে বুঝি কাজেই এসেছো? ছুটির দিনে, উৎসবের দিনেও তোমার কাজ। তোমার জন্য আমার কষ্টই হচ্ছে। তবে দেখ, কাজটা তো ভারি, চাপা না পড়ে যাও।

মন্দির প্রদক্ষিণ করে গুরু মেলু ফিরে গেলেন। বহুকালের মানুষ তিনি। কার মনে কী আছে, মুখ দেখলেই টের পেয়ে যান। এতদিন পেরুনিলাইকে খেয়াল করেননি। আজ একেবারে সামনাসামনি দেখে সমস্তটাই পরিষ্কার হয়ে গেল। ওর সামনে সোভমের খোঁজ করা মোটেই উচিত হবে না। তাতে সোভমের বিপদ, ওঁর নিজের হয়রানি। তিনি তো কোনো নির্দিষ্ট খবর পাননি। দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলে পেরুনিলাইয়ের মতো লোকেরা জল ঘোলা করতে ছাড়বে না।

ধীরে ধীরে সন্ধে নেমে এল সমুদ্রতটে। আরতির আয়োজন শুরু হয়েছে মন্দিরে। আবার দলে দলে লোক আসতে শুরু করল। প্রদীপ, ঘণ্টাধ্বনি, মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনিতে তোলপাড় হয়ে উঠল সন্ধ্যাবাতাস। তারপর এক সময় আরতি শেষ হয়ে গেল। একে একে সকলেই বিদায় নিল মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। আবার শান্ত হয়ে গেল মন্দিরের চতুর্দিক। তারপর সন্ধেও বিদায় নিল। দূর থেকে লৌকিক আনন্দের শব্দ ভেসে আসছে। আচারীপাড়ায় কারা যেন ভেঁপু বাজাচ্ছে, দূর থেকে উলুর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

নীল সমুদ্র গাঢ় নীল হল, তারপর কালো। একের পর এক ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালির উপর। ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে পাথরের গায়ে আঘাত লেগে। তারপরে চাঁদ উঠল।

সেই আলোয় রুপালি হয়ে গেল কালো জল। ছলাৎ ছলাৎ করে রুপার পাত ছড়িয়ে পড়ল পাথরের গায়ে। মন্দিরে পড়ে চমকে উঠল চাঁদের আলো। কিন্তু সে কথা বলবে কাকে। সেখানে কেউ নেই। নিরাশ হয়ে চাঁদ হেলে পড়ল পশ্চিম আকাশে। সমুদ্রতীরে দাঁড়ালে এখন মন্দিরের চূড়ো আড়াল করেছে সেই আলো। কালোর মধ্যে আরও কালো, উঁচু সেই মাথা দেখলে অজানা রোমাঞ্চ লাগে।

ঠিক সেই মুর্হূতে যেন জল থেকেই উঠে এল যুগল মূর্তি। নারী আর পুরুষ। সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া যেমন কালো, তেমন মন্দিরের চুড়ো যেন চন্দ্রগ্রহণ ঘটিয়ে কালো ছায়া হয়ে আছে। তার চারদিকে সাদা আলো-ছটা। সেই ছটার মাঝে অন্ধকার চূড়োর দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করল পুরুষটি। মেয়েটি বুঝি ঈষৎ মাথা নাড়ল। পরক্ষণেই স্তম্ভিত হয়ে হাত দিয়ে দু-কান ঢাকল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল দুজন। অসীম ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। তারপর যে আঁধার থেকে এসেছিল, সেই আঁধারে মিলিয়ে গেল। কিছুদূরে, নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে গুরু মেলুর মনে হঠাৎ আনন্দের ঝলক উঠে মিলিয়ে গেল। যাক, ওর তাহলে মন্দির ভালোই লেগেছে, মনে মনে বললেন। অদূরে বসেছিল পেরুনিলাই। এ সবের বিন্দুবিসর্গ টের পেল না।

—আমি তাহলে আসি? সামনে দাঁড়িয়ে আগন্তুক। ওকে দেখে মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। যতদিন ও ছিল, ততদিন যেন সোভমের সঙ্গে একটা যোগসূত্র আছে মনে হতো।

—আজই যাবে?

—কাজ তো শেষ হয়ে গেল।

সম্মতি জানালেন গুরু মেলু।

—পথে মেয়েটার সঙ্গে দেখা হলে বলো, আমরা সবাই ওর আশায় বসে আছি। এমনকী, রাজামশাইও। মন্তব্য করল পেরুনিলাই।

কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেল আগন্তুক।

—রূপা, এই রূপা!

অনেক দূর থেকে কারা যেন ডাকছে।

—কিন্তু আপনাকে খুঁজছে কেন, বললেন না তো, প্রশ্ন করল রূপা।

পুরুষটি ঠিক যেভাবে নারীকে মন্দিরের দিকে হাত তুলে দেখিয়েছিল, বিচিত্র লোকটিও ঠিক সেইভাবে হাত তুলে মন্দিরের দিকে দেখাল। চাঁদ নয়, সূর্য হেলে ঠিক মন্দিরেব পিছনে চলে গিয়েছে। সেই আলোর ছটার মধ্যে কালো হয়ে ফুটে ওঠা মন্দিরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রূপা। সপ্তম শতকের বিষ্ণু মন্দিরের একেবারে চুড়োতে বসে আছেন এক পাথরের ধ্যানস্থপুরুষ।

—মহাবীর? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রূপা।

—বর্ধমান মহাবীর, বলল লোকটি।

রূপা ফিরে তাকাল মন্দিরের দিকে। তারপর তরতর করে উঠে এল ছায়ার বাইরে। মুখ তুলে তাকাল রৌদ্রস্নাত মন্দিরের দিকে। যেমন মন্দিরের চুড়ো হয় ঠিক তেমনই আছে, মহাবীরের চিহ্ন নেই। ছায়ায় ফিরল রূপা। সেখানে তখনও মহাবীরের অবয়ব স্পষ্ট। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়? তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে আর দেখতে পেল না রূপা। দূর থেকে তখনও ওরা ওকে ডেকে চলেছে।

সোনাগলা রোদ

সুবোধ সেনগুপ্ত

যশোদাকে প্রায় একঘরে করে রেখেছে সকলে। অপরাধ, সবাই বলাবলি করে ওর নাকি যক্ষা হয়েছে। খুক-খুক কাশি ওর লেগেই আছে। ধরা গেল কাশিটা না হয় বর্ষার দিনে ভিজেটিজে হয়েছে। কিন্তু প্রায়দিন বিকেল হোলেই ওর মুখটা ফ্যাকাসে দেখাবে কেন? সেতো নিজের মুখেই বলেছে, ওর জ্বর আসে রোজ সন্ধ্যায়। ঘরে ঢুকেই কাঁথাটা গায়ে দিয়ে গুম হয়ে থাকে খাটিয়াটার ওপর। নির্দ্ধিধায় বলা যায় ওর টি বি হয়েছে।

তাই কি? —অতীন উৎকণ্ঠিত। স্বামীর আশঙ্কা ছাই মেখে দেয় মানদার মুখে। গালে হাত দিয়ে ভাবে, সবই কপাল। বাড়ীতে এতো বড় একটা রোগ আর পুরুষমানুষটা একেবারে বেঁহুশ।

অতীন হুকোটায দু-একটা টান দিযে মুচকি হাসে। মানদার জ্বালা ছ্যাং ছ্যাং করে। নিমেষে আনাজের ঝুড়িটা আর বঁটিটা টেনে নিয়ে স্বামীকে মেজাজ দেখায়— শোনো, তুমি তোমার কপালে আগুন জ্বালো আপত্তি নেই, কিন্তু বলি, ছেলেটাকে বৌঠানের কাছে কি না পাঠালে নয়? বেশি মাখামাখিতে ওকেও তো সেই রোগ ধরতে পারে—

—আহা, ছোট্ট ব্যাপারটা নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছো কেন? তাছাড়া জ্বর কাশি হোলেই কি অমনি যক্ষা হয়ে গেল?

মানদা ফিসফিস করে স্বামীকে বলে—হ্যাঁগো। সেদিন রমেশডাক্তারই তো বললো, এটা নাকি যক্ষার পুরো-লক্ষণ।

—তাহলে বৌঠানকে বলছনা কেন, একটু চিকিৎসা-টিকিৎসা করাতে?

—তা কি বলিনি ভাবছো?

এবার অতীন হুকোর নলটা মাটিতে রেখে ভাবে—একটা বিহিত তো করা দরকার। স্ত্রীকে প্রশ্ন করে—তা, বৌঠান কি বললো?

—বলবেন আবার কি? —'ও কিছু নয় মানদা। এরকম একটু আধটু সর্দিকাশি এদিনে কারই বা না হয়ে থাকে? দুদিনেই সেরে যাবে।

আক্ষেপে মানদার গলাটা কোমল হয়ে আসে— ফের দিদিকে বললাম— সেরেতো যাবে। কিন্তু বাড়াবাড়ি হোলে যে ঝামেলা হবে। তখন ঝক্কি কে পোয়াবে শুনি? এটা ঠিক হচ্ছে না দিদি। গোড়াতেই সতর্ক হওয়া উচিত।

স্বামীকে নিরুত্তাপ দেখে মানদা থামে। একটু বাদেই আবার বলে—হয়তো টাকা পয়সার অভাব। তাই চেপে যাচ্ছে।

রান্নাঘরের বেড়ার পাশে এসে কান লাগিয়ে যশোদা সবকিছু শুনতে থাকে। ঘর জোড়া ঘুটঘুটে আঁধার। সে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে মানদা বা অতীনের কেউই টের করতে পারেনি। মানদা কুপীটাকে একবার এধার ওধার পরখ করলো... । এবার এদিকে এসে বলতে শুরু করে—শুনছি ভাসুরপো নাকি চারমাস ধরে টাকা পাঠাচ্ছেন না। তোমার সাথেই তো খুব গা ঢলাঢলি। বলনা, যা শুনছি, তা কি সত্যি?

অতীন সারাদিন ক্ষেত খামারে রোদে তেতে-পুড়ে আল কাটে, রোয়া লাগায়, জলে ভেজে। বাড়ীতে আসার পর দুএকটা হাল্কা আলাপ অতীনের ভালোই লাগে। কিন্তু স্ত্রীর এ-ভারী কথায় সে যেন আয়াসে মন দিতে পারে না। মানদা বরাবর একটু বেশী বকে। অতীনকে সে বোঝে। পরিশ্রান্ত মানুষটাকে সে ঘাটায় না। আজ কিন্তু মনটা জ্বলে ওঠে। ওর কর্তব্যবোধে হঠাৎ যেন কোথায় ধোকা লাগে। চারমাস-ধরে দাদা টাকা পাঠাচ্ছেন না, অথচ ওর সঙ্গে এতো অন্তরঙ্গতা থাকা সত্বেও বৌঠান এর তিল মাত্র অতীনকে জানায়নি? টাকায় পাঁচপো চালের দিনে তাহলে কি করে সংসার চালাচ্ছে দিদি?

অতীনের একই সংশয়—তাঁতের ফ্যাকটরীতে মাকু চালিয়ে মাত্র তিরিশ টাকা আনে বৌঠান দুটো ছেলের পড়ার যাবতীয় খরচ চালিয়ে কটা টাকাই বা হাতে থাকতে পারে?

মানদা বেশীক্ষণ দমবন্ধ থাকতে দেয় না অতীনকে। সহসা উৎসাহ প্রকাশ করে—কিগো, চুপ মেরে যে!

—ভাবছি দাদা টাকা পাঠাচ্ছে না কেন?

—পুরুষ মানুষের মনতো! কদিনই বা ঠিক থাকে, তাছাড়া বর্মী মেয়েরা যা বজ্জাত! ওদেশে যারাই গ্যাছে তারাই এক একটা মাগীর খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত।

এপাশে যশোদা আর কাশি চেপে রাখতে পারে না। মানদা আর অতীন চমকে উঠল দুজনেই। আলো হাতে দোরে এসে দাঁড়াতেই দেখলো— যশোদা উঠান বেয়ে ছুটে কোঠাঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছে।

এ ধরনের আলাপ-আলোচনা রোজই কানে আসে। তবে সে কান দেযনা। বেহুঁশ হয়ে সংসারের ঘানি টেনেই চলে। কিন্তু এ গা-সওয়া কথাটা আজ মানদার মুখে শুনে কেন যেন যশোদা কেঁদে ওঠে। ছি। ওদের জিবে একটুও আড় নেই? যশোদা বা তার স্বামী তো ওদেরও পর নয়। আপন ভাসুর আপন বড়দা। তাদের নামে শোনা-কথায় কান দিয়ে এতটা গুরুত্ব কলঙ্ক দিতে আটকায় না। অবিশ্যি এ-ধবনেব একটা কিছু সন্দেহ কবা ওদের পক্ষে স্বাভাবিক আর মানদার পক্ষে তো খুবই সহজ। মাত্র পাঁচ বছর হোল, সে এ-বাড়ীতে এসেছে। কদিনই বা দেখেছে যতীন ভাসুরকে? কতটুকুই বা জানতে পেরেছে ভাসুরের চরিত্র? আজ তাই সে খেয়াল খুশীতে যাতা বকতে পারছে। কিন্তু যশোদাতো জানে তাব স্বামী তাকে কতো ভালো বাসে। এইতো, সেবার এক ব্যারামে ভোগার পর যখন যশোদার মুখে কালিপড়ে গেলো পোড়ামুখের মতো হাটে ঘাটে যশোদাকে দেখে যখন সকলে মুখ টিপে হাসতো তখনও তো সে স্বামীর তাচ্ছিল্য পায় নি। স্বামীকে ফেঁপে ফুঁফিয়ে বলেছিল—একতোলা আফিম এনে দাও। আর বেঁচে থাকতে পাচ্ছি না আমি।

যতীন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল—এসব কি বলছো? কে কি বলেছে তাতে আমাদেব কি এসে যায়?

যশোদা দৃঢ় হোয়ে জবাব দেয়—কেউ কিছু বলার জন্যে কেন? আমি কি বুঝতে পারছি না আমি সকলের কতটা উপেক্ষার পাত্র এখন।

জবাবটা শুনে যতীন মুখের হাসি আড়াল করতে পারেনি—তাই বুঝি?'

—তুমিও আমাকে বিদ্রুপ করছো?

—এতে বিদ্রূপ দেখলে কোথায়? তবে ....। আবার হো হো করে হাসে। — তোমার কথা শুনে সত্যি হাসি চেপে রাখতে পারছি না।

সারাদিন যশোদা ভবিষ্যতকে ইচ্ছামত কালি লিপে দিয়েছে। স্বামীও যেখানে ওকে ঠিকমতো গুরুত্ব দিচ্ছে না তখন তার বেঁচে থাকাটা নিশ্চয় বিড়ম্বনা। ... কিন্তু যতই বেলা গড়াতে থাকে

রাগটা ক্ষোভে পরিণত হয়। রাত্রে আর সামলাতে পারেনি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে স্বামীর পাশে শুয়ে—আজ আমি এতোই অনাদরের পাত্র হয়ে দাঁড়ালাম তোমাদের কাছে?

কোনমতে হাসি চেপে রাখে যতীন। স্বাভাবিকভাবে বলে—পাগলামো করছো কেন? তোমাকে আমি বুঝতে পারি। নিজেই তো দশ বছর ধরে শুধুমাত্র তোমার রূপের আরাধনাই করিনি। আজ যেন আমার ভালোবাসাকে ছল, উপেক্ষা মনে করতে চাইছো?

যশোদার কান্না যেন আরো বেড়ে যায়। যতীন কি করবে সহসা ভেবে উঠতে পারল না। ওকে কাছে টেনে বলে—তুমি যদি আমায় সন্দেহ কর তবে যেন মরে বেঁচে যাই যশোদা।

যতীন একটু থামে। যশোদাকে চোখ মুছতে দেখে বলে—

জানো, এ দুনিয়াতে সব ভূয়ো। নিজেকে দিয়েই বোঝার চেষ্টা করনা কেন? কি ছিলনা তোমার? রূপ? নিটোল যৌবন? আজ কি আছে? আমরা দুজনে দুজনের কথা ভাবি; জীবনের সব চাইতে বড় পাওনা, সত্যি।

এ ঘটনার পরেই যশোদার প্রথম তিন ছেলে জন্মে।

এসব যারা জানে তারাও কি করে সাহস পায় তার স্বামীর স্বভাবে কালি মাখিয়ে দিতে? এযেন যশোদা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। আজ যতীন কাছে থাকলে সে নির্ঘাৎ প্রতিবাদ জানাতো। কিন্তু এখন সময়টা যে খারাপ। কিছু বললে অমনি দলবেঁধে জোরগলায় বলবে—সাফাই গাইতে এসেছে।

এ মাগ্‌গী-গণ্ডার দিনে হাড়ভাঙ্গা খেটে সে সংসার চালাচ্ছে! ধারে আকণ্ঠ ডোবা। মহাজনদের টাকা ঠিকমত না দিতে পারায় ওরা যে দুচারটে মন্দকথাও না শুনিয়ে যাচ্ছে তা নয়। তবু গাটাকে গণ্ডারের চামড়া করে সব সয়ে যাচ্ছে। একমাত্র সান্ত্বনা—ছেলে দুটোকে মানুষ করার জন্যই তো সে এতসব কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছে। কিন্তু যতীনকে কেউ কিছু বলুক সে কোন মতে বরদাস্ত করতে পারে না। এ দুর্দিনে যার যা খুশী বলে যাক। সে নীরবে সয়ে যাবে চোখ মুখ বুজে। ভগবান যদি কোনোদিন মুখ তুলে তাকান যশোদা নিশ্চয় এ-সব মিথ্যার কৈফিয়ত্ তলব করবেই করবে।

যশোদার মুখটা ক্রমশঃ শুকিয়ে আসে। অন্যমনস্ক হয়ে আস্তে আস্তে দেয়ালের কোণে আবছা আঁধারে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে। সারা জীবনের অসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধৈর্য্য আজ যেন কোন এক অসহায়তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেলো। তার সংসারটা যে একটা জোড়াতালি ছাড়া আর কিছু নয় একথা আজ বেশিকরেই মনে হচ্ছে।

বাইরে কড়ার ঝনঝনি শুনে নিজেকে সহজ করে নেয় যশোদা। তানইলে, অশোক যা ছেলে, মার এ-অবস্থা দেখে ঠিক জেরা করবে কি হয়েছে, কেন হয়েছে? চোখের কোন আঁচলে মুছে ধীরে পা ফেলে দোরের কাছে এসে কপাট খুলে দেয়।

বাঁ হাতে ক্ষীণ আলোর একটা ল্যাম্প ও ডানহাতে আঁকড়ে-ধরা কতগুলো বই নিয়ে ঘরে ঢোকে অশোক।

কোন এক বন্ধুর কাছে বই ধার করতে গিয়েছিল। তাই যশোদার আগ্রহ — সব পেয়েছিস তো?

অশোকের মুখে উল্লাস। পা চালিয়ে ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ধপ করে বইগুলো ফেলে বলে—যাক বাঁচা গেলো।

যশোদা পাশে এসে ফের প্রশ্ন করে—সব পেয়েছিস তো?

—হ্যাঁ মা আর ভাবনা নেই। এবার ঠিক পাশ করবো।

আমি সব গুছিয়ে রাখছি। তুই ততক্ষণে খাটিয়ার ওপর জিরিয়ে নে। তারপর খেতে দেবো তোদের।

—পিন্টুকে দেখছি না যে? —চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অশোক মাকে জিগগেস করে।

—শ্যামকাকুর বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পুজো হচ্ছে। সেখানে গেছে .... তুইও তো গেলে পারতিস। এখনও সময় আছে।

কি একটা আগ্রহ নিয়ে যশোদা ছেলের দিকে তাকাল। অশোক কিন্তু পাশ ফিরে আয়াস-মসৃণ সুরে বলে বসল—বড্ড ক্লান্ত। তাছাড়া এখন গেলে সবাই বলবে প্রসাদ খেতে এসেছে।

দুর পাগল। সত্যনারায়ণের—পুজোয় কে না প্রসাদ খেতে যায়? কেউই কিছু বলবে না।

ছেলের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে যশোদা কেমন যেন হতাশ হয়। মুখটা ফ্যাকাসে করে শীতল পা ফেলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবে, বললাম ছেলেটাকে যেতে, প্রসাদ ট্রসাদ খেতে পারত। গেল না। আমি আর কি করব? ভাত যা রেঁধেছি তার বেশিরভাগটা অশোককে তো দিই। তারপর যা বাকি থাকবে তা পিন্টু এসে খাবে।

থালাটা হাঁড়ির কাছে এনে যশোদা সযত্নে হাতা দিয়ে ভাত বাড়তে লাগল। কড়া থেকে বেশ কিছুটা কল্মিশাক আর কুমড়োর চচ্চড়ি থালার একপাশে সাজিয়ে দিয়ে অশোককে ডাকে—আয়। খেতে দিয়েছি। থালাটা সরাতেই যশোদা দেখল কিছুটা ভাত মাটিতে কখন যে পড়ে গেছে সে খেয়ালই করতে পারেনি। তাড়াতাড়ি আলগোছে দু-আঙ্গুল দিয়ে ভাতগুলো খুঁটে তুলে রাখে হাঁড়িতে। এ-দুটো ভাতও কম নয়। এতে হয়তো পিন্টুর পেট একটু বেশি ভরতে পারে।

অশোক পিড়ির ওপর বসে পড়ে। থালার দিকে নজর দিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে—তুমি খাবে না মা?

—নে, হাতটা ধুয়ে খাওয়া শুরু করতো। আমি পিন্টুর সঙ্গে খাবো ...।

কয়েক গরাস ভাত মুখে গুঁজে একগ্লাস জলের প্রায় সমস্তটা চুমুক দিয়ে গিলে অশোক বলে উঠল—অতীনকাকুর জমিটাতে ভাগ্যিস ছোট খালটা ছিল। কোনোরকমে বাঁধ দিয়ে জল সেচে লাঙ্গল চালানো যাচ্ছে। ও-পাড়ার বিধুখুড়োর তো প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। দিনরাত শুধু বর্ষাকে ডেকেই যাচ্ছেন। ওঁর এগারো বিঘে জমির একটাতেও ফলা বসছে না।

—দেখছি, কদিন বাদে টাকা দিয়েও এক মুঠো চাল পাওয়া যাবে না।

সমান উৎকণ্ঠা যশোদার।

—কদিন বাদের কথা ছেড়ে দাও মা, বিধুখুড়োর বাড়ীতে ইতিমধ্যে ফ্যান-ভাত আর খিচুড়ির পাঠ শুরু হয়ে গেছে।

যশোদা আঁতকে ওঠে। বলে—তোদের আমি ফ্যান-ভাত খাওয়াবোনা কিন্তু। না থাকে একমুঠো খেয়ে খিধে মেটাবি। তবু ফ্যান-ভাত খাইয়ে গত মন্বন্তরের মতো ... । —আর বলতে পারে না। বাকিটুকু মুখেই জড়িয়ে থাকে। একটা মৌনপরিতাপে যশোদা বারবার গুমরে ওঠে। না, না। ফ্যান-ভাত খাইয়ে তার মেজোছেলে পল্টুর মতো এবারে অশোক পিন্টুর শোচনীয় পরিণতি হতে দেবেনা যশোদা।

—আজকের কাগজে দেখলাম, আমাদের এ-নদীয়ার পুরো পরিবার কিভাবে কচুসেদ্ধ খেয়ে...

—থাক ওসব কথা। শিগগির খেয়ে পড়তে বস।

আরও দু এক গ্রাস গালে পুরে অশোক উঠে গেল—আমার হয়ে গেছে ...

—কি, হয়ে গেছে? অর্ধেকওতো খাসনি। তরকারিটা ভালো লাগছে না, না?

ভাতগুলোর দিকে তাকিয়ে বিশেষ কিছু বলেনা যশোদা। অশোক্ চোখদুটো একবার ভাতের থালাটার দিকে আবার হাঁড়ির দিকে বুলিয়ে বেরিয়ে আসে।

পিন্টু ফিরলো অনেক পরে। যশোদা ততক্ষণে আলোটা নিবিয়ে রান্নাঘরেই একখানা পিড়ি পেতে গড়িয়ে নিচ্ছিল। সারাদিনের খাটুনির পর হাত পা এতো অবশ হয়ে আসে যে কাঁথাটা টেনে নিতে ইচ্ছা হয় না , তবু পিন্টুর যে খাওয়া হয়নি। তাই এ-রান্নাঘরেই শুয়েছিল যশোদা।

অনেকক্ষণ পরে পিন্টু হাতরে ঢুকে পড়ে। হেঁকে বলে—মা, ওমা ....

হুড়মুড় করে উঠে যশোদা কুপীটা জ্বেলে নিল। পিন্টুর দিকে চোখ দিতেই পিন্টু বলে বসল—শ্যামকাকা তোমার জন্যে প্রসাদ দিয়েছে মা।

—অশোককে দিয়েছিস? —মার প্রশ্ন।

—হ্যাঁ। এটুকু তুমি খেয়ে নাও।

পিন্টুকে ভাত দিয়ে যশোদা সিন্নির গ্লাসটা হাতে নিল—এযে খুব ঘন! একটু জল মিশিয়ে খেতে হবে। অত মিষ্টি আমি খেতে পারি না!

—তুমি ভাত খেয়েছ মা? —থালার ভাতটা কাবার করে পিন্টু বলে উঠল।

যশোদা প্রসাদটা পরম-তৃপ্তি ভরে খেয়ে জবাব দেয়—হ্যাঁ। দেবো আর দুটো? হাঁড়িতে যে-টুকু ছিল তার সবটা পিন্টুকে দিয়ে যশোদা হাত ধুয়ে নেয়।

—আজ এতো ভাত কোথা থেকে এলো মা?

পিন্টুর উচ্ছ্বাস বুঝতে পেরে যশোদা শুকনো হাসে—অশোক আজ অনেক কম খেয়েছে।

যশোদার চোখ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। কিন্তু পিন্টু অনেক রকমের প্রশ্ন করছিল, ছেঁড়া জবাবও দিচ্ছিল যশোদা। অতীনের গলায় বৌঠান সম্বোধন শুনে হড়বড়িয়ে উঠে বসে।

— তোর কাকাকে চেয়ারটা এনে দে অশোক।

—থাক যাক, নিজেই নিচ্ছি বলে একটু থেমে অতীন বলে চলে—হ্যাঁ বৌঠান, একটা জরুরী কথা নিয়ে এলুম তোমার কাছে।

যশোদা বলে—কি, ঠাকুরপো।

—বৌঠান, পিন্টুর বাবাতো আমার আপন বড় ভাই?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ঠাকুরপো?

অতীনের জিব অভিমানে গুটিয়ে যায়—তাই তো। তোমরা সকলেই এ-বাড়ীতে এসেছ অল্প দিন। অতসব কি করে বুঝবে। তা নইলে তোমার এতো দুঃখকষ্ট হচ্ছে, যক্ষার মতো একটা মারাত্মক রোগকেও চেপে রেখেছ টাকার অভাবে, এসব কি আমায় বলতে না?

যশোদা হেসে অতীনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে।

—অযথা আমায় ভুল বুঝতে যাচ্ছো ঠাকুরপো। একটু ভাবলেই সব টের পাবে।

ঘরটা যেন বিস্ময়ে মিনিট দুই চুপ করে গেলো। একটু ভেবে যশোদাই নিঃস্তব্ধতা ভাঙলো। হেসে বলে উঠল—অশোক, তোর পড়ার্র অসুবিধা হচ্ছে? যা বারান্দায় ছোট লণ্ঠনটা জ্বেলে পড়।

অশোক বেরিয়ে যায়।

যশোদা বলে চলে—জানি ঠাকুরপো তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু সে-কথাটা স্বীকার করতে আজকাল সাহস পাই কোথায়?

— কেন এমন বলছ বৌঠান?

— সেদিন তোমার কথামত পিন্টুকে চাল আনতে পাঠালাম মানদার কাছে। প্রথমে বললে—চাল ফুরিয়ে গেছে। শেষে আমায় এসে জিজ্ঞেস করল—তুমি চালের জন্যে পাঠিয়েছিলে দিদি? চাল ছিল না বলে দিতে পারলাম না। আমি চুপ করে গেলাম। ফের আমাকে প্রশ্ন করলো— তোমার ঠাকুরপো কি চাল আছে বলেছিলো? আমার কাছ থেকে যে সে কথা আদায় করতে চাইছিল সেটা মালুম হয়নি চট করে। বলেই ফেললুম—হ্যাঁ...

—তারপর?

—মুখটা ছাইপানা করে বললে—তাহলে বোধ হয় কোথাও উনি লুকিয়ে রেখেছেন। একটু পরে পিন্টুকে পাঠিয়ে দিওতো একবার।

—আমি কি অতই বোকা যে বুঝতে পারবোনা কি বিষে জ্বলছিল মানদা? চাল দিল। কিন্তু ...

—হারামজাদির স্বভাবই ও-বকম। কাউকে কিছু দিই সে পছন্দ করে না। সব আগলে রাখা—আমাকেও।

—তারপর ....

যশোদার গলা তীক্ষ্ণ —ও বাড়ীর বিন্তিঠাকুরঝিকে বলেছে, ওর সঙ্গে কেন এত গা ঢলাঢলি, বৌঠানের জন্যে কেন এত দরদ আমি কি বুঝিনা, কি আমার দাতা-কর্ণরে! আছে বলে ওদের সব বিলিয়ে দিতে হবে? দুদিন বাদে দেখবো, মুখে ভাত দেয় কি ছাই। সেই চাওর করে দিয়েছে আমার যক্ষা হয়েছে।

— ওসব বাদ দাও দিকিনি। সর্বনাশীটার ওধরনের কথাশুনে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেল এখন কাজের কথায় এসো।

যশোদা হঠাৎ কুঁচকে যায়। ছি, ছি, একি করলো সে। এ-ভাবে সব কিছু বলে কেন সে নিজেকে খাটো করতে গেল? সে না অটল ছিল যে কাউকে কিছু বলবে না, কোনো প্রতিবাদ জানাবে না? আজ কেন সাময়িক উত্তেজনাটাকে বড় করে দেখে, নিজেব অস্তিত্বে গ্লানি মেখে দিল। খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো সে।

—ঠাকুরপো, এসব বলার ইচ্ছে ছিল না। হঠাৎ মুখ দিয়ে অজান্তে বেরিয়ে এলো।

—সামান্য ব্যাপারে এতো মাথা ঘামাও কেন বলতো? শোনো ডাক্তারকে খবর দাও, আর তাঁতের কলে যাওয়া কদিন ক্ষ্যামা দাও। রোগে একবার যখন ধরেছে, প্রতিকার করতেই হবে।

যশোদা কোনো উত্তর দেয় না। কি যেন শুধু ভাবে।

—দাদার টাকা যদ্দিন না পাচ্ছো খরচ আমিই চালাবো। টাকা পেলে নাহয় পরে সব দিয়েই দিলে। কি, জবাব দিচ্ছনা যে?

—ভাবছি, মানদা যদি আবার বলে বসে, পরের সর্বনাশ করার মতলব নিয়ে গায়ে পড়ে এই আত্মীয়তা।

অতীন কিন্তু বিরক্ত হয়ে ওঠে—কি সব আজে বাজে বক তুমি।

অশোকও মাকে শেষ মেশ বলে—সবাই যখন বলছে তখন একবার ডাক্তারকে দিয়ে পবীক্ষা করানো দরকার।

—কিন্তু দুটো টাকা কমসে কম চাই।

—টাকা যেকোন রকমে জোগাড় করতে হবে। তাছাড়া কাকুইতো টাকা দেবেন বলেছেন।

— সে দুটো টাকার চাল ডাল কিনে মা ছেলেতে দিব্যি দুদিন চালাতে পারবো।

— তোমার চাইতে কি খাওয়াটাই আমাদের বড় হোলো? তুমি না থাকলে তখন কে ভাববে আমাদের কথা?

যশোদা ঘুমের ভান করে চোখ বুজে থাকে।

রেঁধে খেয়ে পরদিন সকাল আটটায় যশোদা দুলাল ঘোষের তাঁতের কলে এসে ঢোকে। আজ তার একটু দেরিই হয়েছে। সকালে একটু বেলায় ঘুম ভেঙেছে। এ-সামান্য দেরির জন্যে যে তাঁত বাবু দুলাল ঘোষ কিছুই বলবে না সে যশোদা জানে। তাই নির্ভয়ে পা চালিয়ে নিজের নির্দ্দিষ্ট তাঁতের কাছে এসে দাঁড়াতে অসুবিধে হোলো না। জাঁকিয়ে বসে পড়লো পা দুটো ঝুলিয়ে।

নীল রং-এর সুতোর মাকুটা তুলে রেখে সবুজ মাকুটা জুড়ে যেই হ্যাণ্ডেল ধরে টান দেবে অমনি একটা চাপা গুঞ্জন কানে এলো। যশোদা চোখ তুলতেই দেখলো অন্যান্য মেয়েরা যশোদার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আলোচনা করছে। সবকটা চোখ উগ্র।

যশোদা চারদিকে তাকালো ভালো করে। তবে কি তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে। হঠাৎ একটা ফিসফিসানি কানে ঢুকতেই সে আঁতকে ওঠে।

একটা কাশি ফুসফুসের ভেতর বারবার আটকে যাচ্ছিল। কাশিটা চেপে রাখতে গিয়ে এ কাণ্ডটা করে বসেছে সে। দমটা বোধ হয় এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে।

পাশে রঙ্গিলা খটখট করে মাকু চালাতে চালাতে এলোকেশিকে সমানে বলতে লাগল— বিশ্বাস করছিলে না তো! এবার নিজের কানেই শোনো, কি ধরনের খুক্-খুক্ কাশি। যক্ষা নাহলে এমন ধারা কাশি কারও হয়?

এলোকেশির মাকু থেমে যায়। দুশ্চিন্তার আঁকিবুকি মুখে। চোখদুটো যশোদার দিকে বাড়ানো।

কারখানার একতলার কানফাটানো খটাখট শব্দগুলো একসঙ্গে যেন একরাশ বিস্ময়ে থ' হয়ে গেলো।

সকলে উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দুলালবাবুর অফিসের দিকে এগিয়ে গেলো। যশোদা পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পেরেছে। তাই ওদের পিছু নেয় সে। আত্মপক্ষ সমর্থন দরকার।

তাঁতের মেয়ে কর্মচারীদের জোট বেঁধে এগিয়ে আসতে দেখে দুলাল ঘোষ বেকুব বনে গেল। প্রশ্ন করল—কাজ ছেড়ে এখানে কেন?

ওরা একসঙ্গে হেঁড়ে গলায় বলে ওঠে—আমরা কাজ করবো না।

— কেন?

— যক্ষা রুগীর সঙ্গে থেকে কাজ করে প্রাণ খোয়াবার সাহস আমাদের নেই। আমাদের সকলের ঘর-সংসার আছে—

দুলালবাবু বিরক্ত—যা বলতে চাও স্পষ্টই বলে ফেল।

দুলাল ঘোষের কাছে এগিয়ে এসে একটি মেয়ে বলে বসে—যশোদার যক্ষা হয়েছে। ওকে যদি না বরখাস্ত করা হয় আমরা কাজ করব না।

— যশোদার যক্ষা হয়েছে? কে বলল তোমাদের?

— সাক্ষী নজির আছে। তা নইলে মিছিমিছি এসব কথা বলতে আসবো কেন?

যশোদাকে তলব করা হয়। ওর ওপরে যেন এক ঝাঁক হিংস্র চোখ। এদের মাঝখান দিয়ে যশোদা এগিয়ে আসে দুলাল ঘোষের টেবিলের কাছে। বুকটা দ্রুত ওঠানামা শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে।

সকলে উন্মুখ হয়ে তাকায় সামনে।

— ওরা যা বলছে তাকি সত্যি, যশোদা?

মরিয়া হয়ে ওঠে যশোদা—বিশ্বাস করবেন বাবু? সব মিথ্যে।

দুলালবাবু একটু থেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে—কি করে বুঝবো?

রঙ্গীলা মাঝখান থেকে ঠোঁট কাটে—খুক্‌খুক্ কাশির সঙ্গে রোজ জ্বর, যক্ষা নয়তো কি? এইতো সেদিন নিত্য কবরেজও তাই বলল।

মুখটাকে কাচুমাচু করে যশোদা দুলালবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করে—কাশি হয়েছে সত্যি, কিন্তু ওরা যা বলছে তা নয়।

দুলালবাবু বলে— রোগ পুষে কি লাভ? একদিন ঠিক জানাজানি হয়ে যাবে। বাড়াবাড়ি হলে তখন কি কাণ্ডটা হবে বলত? তার চেয়ে বরং এক কাজ কর—কিছু টাকা তোমাকে পাইয়ে দিচ্ছি, তা দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। সুস্থ হলে আবার কাজে আসবে। এ-রকম পাশাপাশি থাকলে তাদেরও তো সে রোগ হতে পারে। জেনেশুনে এটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না।

— আমায় বিশ্বাস করুন। সব মিথ্যে। ওদের যেতে বলুন, সব আমি খুলে বলছি।

মেয়েরা মুখটিপে হাসছিল। একজনতো বলেই ফেললো—মাগীর ঢং দেখে আর বাঁচিনে বাপু! ম্যানেজারকে পকাবার তালে আছে। ফুসলে ফাসলে কাজ ঠিক হাশিল করে নেবে দেখিস। ম্যানেজারও তো আমাদের দয়ার অবতার কিনা। আমরা কিন্তু মানছি না।

ম্যানেজার ওদের আশ্বস্ত করে— তোমাদের ওপর কোনো অবিচার করা হবে না। এ আমি নিশ্চিন্ত করে বলছি। তোমরা একটুখানি আড়ালে যাও।

যশোদার জিব কান্নায় আড়ষ্ট দ্যাখুন স্যার, আমাকে ভুল বুঝবেন না—বলেই ইতস্ততঃ করে হাঁড়ির হালের কথা ম্যানেজারকে বলা যায়? অবশ্য না বললেও যে তাকে চাকরীতে ইস্তফা দিতে হবে।

— কোনো দ্বিধা কোর না যশোদা। অসঙ্কোচে বলতে পার সবকিছু। —দুলালবাবু অভয় দেয়।

যশোদার গলার আওয়াজ কেঁপে কেঁপে ওঠে—আমার কোনোদিন জ্বর আসে না। অন্তত এ দুবছরে একদিনও হয়নি।

— তাহলে তুমি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছো কেন? নিশ্চয় তুমি মিথ্যে বলছ। চাকরী যাবার ভয়ে তো?

দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। শুধু বলে—কি করে যে বোঝাবো আপনাকে? বোঝালেও আপনি বিশ্বাস করবেন না।

— ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অত কথা না বলে সোজাসুজি বলতো ব্যাপারটা কি , তা নইলে তো তোমায় কাজ করতে— দিতে পারবো না আমি।

যশোদা কাতর কণ্ঠে বলে—না না। বলছি। শুনুন—রাত্তিরে জ্বর কোনোদিনই আমার আসে না। ছেলেদের ভোলাবার জন্য ভান করতে হয়। অছিলা না দিলে ছেলেরা বলবে— মা, ভাত খাচ্ছোনা কেন?

যশোদার দুচোখ সাদা। দরদর করে চিবুক বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে—।

—ওরা কি করে বুঝবে যে এত অল্প টাকার চাকরীতে তিনটে লোকের দুবেলা অন্ন জোটানো যায় না।

গর্ভিনী

সুমিতা চক্রবর্তী

ইংরেজি মাসের শুরুতে নতুন দশতলা বাড়িটার একটা ফ্ল্যাটে ঠিকে কাজ নিল কমলা। এ সময় আরও এক বাড়ি কাজ নেবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু গেঞ্জি কারখানায় ধর্মঘট চার মাস হয়ে গেল। অভাবের জিভ চেটেপুটে খেয়ে নিয়েছে কয়েকটা জমানো টাকা, বিয়ের সময়ে বাবার দেওয়া দুশ টাকার হাতঘড়ি আর দুটো কানের দুল। রোজগার না ড়ালেই নয়। দিন চলে না।

বড়লোকের বাড়িতে কাজ নিলে একটু বেশি ফিটফাট হতে হয়। পরিচ্ছন্ন কমলা বরাবরই। তার বাইশ বছরের উজ্জ্বল শ্যাম শরীরে ময়লা জমে নেই কোথাও। খেটে খাওয়া মেয়ের মজবুত স্বাস্থ্য। ছাপা শাড়িতে তেল হলুদ ময়লার অবাধ্য দাগ থাকলেও তা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে কাচা। চুল টেনে বাঁধা—তাতে তেল পড়ছে না কিছু দিন। তবু উসকো খুসকো নয়। পায়ে পুরনো চটি, দু হাতে প্লাসটিকের লাল-শাদা শাঁখা-পলা। আর বাঁ হাতে অধিক সংযোজন দুটি লোহা। টানটান করে কোমরে জড়ানো কাপড়ের ওপর দিয়ে উদরের সামান্য স্ফীতি নজরে পড়ে। ছ মাস চলছে। নজরে পড়ে কালো চোখের তলায় কালির ছোপ আর মুখের শীর্ণতা।

দুধের মত সাদা বেসিন আর চকচকে রূপোলি কল সোডা দিয়ে বোলাতে বোলাতে কমলা বেসিনের কাকচক্ষু আয়নায় নিজেকে দেখে। এই সাত সকালেও তার ক্লান্ত লাগে। ঠোঁটের দু পাশে দুটি কষ্টের রেখা ফুটেছে কখন। দক্ষিণের শোবার ঘর থেকে পর্দায় ঝোলানো ধাতব ঘণ্টার হালকা মধুর আওয়াজ ভেসে আসে। বৌদি সুরেলা গলায় ডাকেন—

কমলা—

যাই বৌদি—

আমার দুধটা দিয়ে যা—

একটু আগেই দুধ ফুটিয়েছে কমলা। ঝকঝকে লম্বা কাঁচের গেলাস উষ্ণ জলে ধুয়ে দু চামচ টিনের ফুড গুলেছে অল্প দুধে, তারপর তাতে গরম ধোঁয়া ওঠা দুধ ঢেলে সহনীয় উত্তাপে আনার জন্যে রেখেছে খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে।

বৌদিরও পেটে বাচ্চা আছে তিন মাসের। কমলারই মতো প্রথম পোয়াতি। পনেরো দিন অন্তর ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। কখন কি খেতে হবে তার একটা ছক আছে। সেটা বৌদি ঝুলিয়ে রেখেছে শোবার ঘরে। বড় বড় দুটো কাঁচের জানলার মাঝে শরীর দেখানো মেয়েটার ছবির তলায়। ঘড়ি না দেখলেও কমলা বলে দিতে পারে এখন সাড়ে নটা। বৌদির প্রথম গেলাস দুধ খাওয়ার সময়। সকাল আটটায় দাদার সঙ্গে ফলের রস আর টোস্ট খাওয়া হয়েছে শুধু। কমলা দুধের গেলাস বৌদির হাতে তুলে দিতেই বৌদি বলেন—কমলা আমার পা দুটো খসখসে লাগছে। আজ পরিষ্কার করে দিস তো— বৌদির ফরসা মসৃণ হাঁসের পালকের মতো নিটোল হাতে সোনার চুড়ি ভারি সুন্দর আওয়াজে বাজে। কমলা তাকিয়ে

দেখে বৌদি তার পেটের বাচ্চাটার জন্যে অল্প অল্প চুমুকে শুষে নিচ্ছে পুষ্টি, স্বাস্থ্য আর মেধা। মোটা ফিয়ের ডাক্তার নির্ভুলভাবে ছকে দিয়েছেন শিশুর সবল সুস্থ শরীরের জন্য, তার মজবুত হাড়ের জন্য, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি ও ফুলের মতো নরম ত্বকের জন্য ঠিক কোন সময়ে কি চাই। আর বৌদি সারাদিন শুধু সুন্দর সুন্দর শাড়ি পড়ে। পড়তে থাকে রঙ্গীন মিষ্টি ভালবাসার বই। মৃদু সুগন্ধে তার চারপাশের বাতাস আবেশে ভরন্ত হয়ে আসে। আর সারা বাড়িতে খেলা করে রহস্যময় বিদেশী সুরের অপূর্ব মূর্চ্ছনা। সৌন্দর্যের মধ্যে থাকলে বাচ্চাটার দেহ সুন্দর হবে, তার ভাবনা হবে এই বাড়িটার মতো অমলিন, মসৃণ। বৌদি একথাই বলেছেন কমলাকে—

এই সময় শুধু ভাল ভাল জিনিসের কথা ভাবতে হয়, আর মন পবিত্র রাখতে হয়। তাহলে বাচ্চাও সুন্দর হবে, বুঝলি তো?

হাতটা ঈষৎ জ্বালা করছে। এই সোডাটায় ক্ষার বেশি। খুব বেশি পরিষ্কার হয় সব কিছু। কমলার হাতের তেলো থেকে বিন্দু বিন্দু কোমলতা শুষে নিয়ে এই সোডার ছোঁয়ায় ঝকঝকে হেসে ওঠে বাসনপত্র, বেসিন, জলের কল, কাঁচের র‍্যাক ও বাথরুমের মেঝে।

কমলা আয়না দেওয়া টেবিল থেকে দুটো ক্ষুদ্র রঙ্গীন শিশি নিয়ে এল। শিশুর বাড় হবে এতে। সতেজ হবে শরীর। কত আদরের, মা বাপের স্নেহ ভালবাসা ছেনে গড়া বুকের ধন আসছে। তার জন্যে কত আয়োজন, কত স্নেহের পসরা! কমলা নিজের পেটের ওপর হাত রাখে—

তোকে নিয়েও আমার কত স্বপ্ন রে বাপ। আমার নাড়ি ছিঁড়ে জন্মাবি তুই সোনার পুতুল। কেমন করে তোকে পুষ্টি দিই, শক্তি দিই মানিক আমার! বাপের কারখানায় মেশিন বন্ধ। বাসনমাজুনী মা-র দিনে এক ফোঁটাও দুধ জোটে না রে ধন। ঠাকুর— ঠাকুর—

কমলা আকুল হয়ে দেবতাকে ডাকে। বৌদির হাত ফসকে ওষুধের একটা শিশি ঝনঝন করে আছড়ে পড়ুক মেঝেয়। কাঁচের টুকরোর সঙ্গে মাখামাখি হয়ে ওষুধগুলো সব ছড়িয়ে যাক মাটিতে। এক একটা বড়িতে লুকনো আছে কমলার সন্তানের স্বাস্থ্য, জীবন। এত সব তো জানতই না কমলা, কিন্তু এই এক মাসেই সে নির্ভুল জেনে গেছে রং-বেরঙের গোল, চ্যাপ্টা, শক্ত, তরল ওষুধ, সুষম খাদ্য আর আরাম ও বিলাসের বিভিন্ন প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা।

কিন্তু বৌদি সতর্ক সুন্দর আঙ্গুলে ওষুধের শিশি ঢাকনা বন্ধ করে কমলার হাতে দেন। উচ্ছিষ্ট দুধের গেলাসটা কমলা নিজেই তুলে নেয় অন্য হাতে। ঘর থেকে বেরোতে তার বুক উত্তেজনায় ঢিপঢিপ করে। উষ্ণ হয়ে ওঠে গাল আর দুটি কান। পর্দা সরিয়ে সে দ্রুত চলে যায় রান্নাঘরের বেসিনে। তারপর আগ্রাসী চুমুকে টেনে নেয় কফোঁটা দুধ। গেলাসে বার বার জল দিয়ে সেই জলটুকু পান করে, আর যেন অনুভব করতে থাকে ভ্রূণের শরীরে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছে মহার্ঘ উত্তাপ।

এগারোটার সময় কাজ সেরে লিফটে নামতে নামতে কমলার মুখে আবার চিন্তার ভাঁজ পড়ে। একটু যদি ওষুধ আর পথ্য পাওয়া যেত! একবার হাসপাতাল থেকে মামুলি কয়েকটি বড়ি কাগজে মুড়ে এনে পরম যত্নে খেয়েছিল বটে, কিন্তু এখন সে জেনে গেছে ওতে কিছুই এমন হবে না। লিফটচালক কমলার দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন কৌতুকে হাসে। লিফট থেমে আছে। স্কুল ফেরৎ দুটি বাচ্চা কলকল করে ঢুকছে লিফটের ছোট্ট ঘরটিতে। দুটি বইয়ের স্যুটকেস, জলের বোতল আর ইস্ত্রি করা কাপড়ের গোছা বিচিত্র কায়দায় সামলাতে সামলাতে ছ তলার দিনরাতের কাজের মেয়েটির মুখেও কৌতুকের জিজ্ঞাসা ফোটে। কমলা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। শুনতে পায় লিফটচালক তাকে বলছে—শুনছি এগারো তারিখের পর থেকে নাকি কারখানা খুলবে। মাইনে টাইনে বাড়াচ্ছে মালিকরা?

কমলা বেরিয়ে আসতে আসতে আঁচলের খুঁট খুলে একটি মলিন এক টাকার নোট বের করে। কত লোক তো লটারিতে টাকা পায়। দোহাই ঠাকুব, একবার মুখ তুলে চাও। শুধু পেটের বাচ্চাটার জন্যে ঠাকুর! দয়া কর মা। বাকি তিনটে মাস যেন একটু ওষুধ কিনতে পাই আর ভাল পথ্যি।

মোড়ের লটারির টিকিটের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েও কমলা পেরিয়ে চলে যায়। রেশনের চালে কালকের দিনটাই হবে শুধু। এক মাস ধরেই ডাল কেনা যাচ্ছে না। একটা ডিমের যা দাম! যদি সপ্তাহে একটা করে ডিমও খাওয়া যেত! অনেক ভেবে কমলা কটি আলু কিনে ঘরে ফেরে। ছোট বেলায় তারা বর্ষার দিনে পুকুরে গামছা ফেলে চুনো মাছ আর গুগলি ধরত। ওসব খাওয়াও ভাল। আমিষ না খেলে কি বাচ্চা বাড়ে?

রান্নাবান্না সেরে ঘর পরিষ্কার করে দুপুরে কমলা একটু শুতে চায়। একটু একটু হাঁপ ধরে আজকাল। হাত পায়ের শিরাগুলোতেও মাঝে মাঝে টান ধরছে। পাশের ঘরের মাসী বলেছে ওরকমই হয় এখন। একটা নতুন মানুষ জন্ম নেবে পৃথিবীতে, তার জন্যে গর্ভধারিণীর শরীর এমন বদলে যায়।

আচ্ছা, সত্যিই বাচ্চাটা কার মতো হবে? কমলার স্বাস্থ্য তো মোটের ওপর ভালই। তার মাও ছিল খুব শক্ত, স্বাস্থ্যবতী আর কাজের। অনেকদিন পর ভুলে যাওয়া মায়ের মুখটা মনে পড়ে। বারো বছর হলো মা নেই। আচ্ছা মা-ও নিশ্চয়ই কমলাকে পেটে নিয়ে এমন করেই ভাবত। আর প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। দূরে বাচ্চাদের খেলার গোলমালের মধ্যে আম গাছে বসা কোকিলের সুমিষ্ট ডাক ভেসে আসে। কমলা চোখ বন্ধ করে সব গোলমালের মধ্যে থেকে তার অনুভবে ছেঁকে নিতে চেষ্টা করে ওই সুর।

তিনটের সময় ব্যাঙ্কের বাবুর বাড়িতে বাসন মেজে কাপড় কেচে বৌদির কাজে যেতে হবে। কী মিষ্টি শব্দে টুং-টাং বেল! রাঁধুনী পিসি দরজা খুলে দিয়ে জলখাবার তৈরিতে ব্যস্ত থাকে। বৌদি ঘুম থেকে উঠে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে ভারি সুন্দর সাজবে। কমলা খাবার টেবিলে বৌদিকে এনে দেবে দ্বিতীয় গেলাস দুধ আর বিকেলের তিন রকম ওষুধ। আচ্ছা শোবার ঘর থেকে ওষুধ আনতে আনতে কয়েকটা বড়ি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়? ভগবান পাপ দেবে? পেটে না খেতে পাওয়া বাচ্চাকে ভালবেসে খাওয়ানোও কি পাপ? কত সময় লাগতে পারে? দেরি হলে বৌদি সন্দেহ করবে না তো? রোজ নয়, পাঁচ সাত দিন অন্তর অন্তর যদি দু তিনটে করে ......?

এক থমথমে মেঘলা বিকেলে বৈশাখ মাসের শেষে, কমলা স্যাকরার দোকান থেকে সাতাশটা টাকা আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেরোল। মা-র হাতের পুরনো একটা রুপোর পাত বসানো সরু পলা ছিল আর ব্রোঞ্জের ওপর সোনার জল করা ছোট্ট পুঁতির মতো একটা নাকছাবি। কারখানা খোলে নি। লোকটাকে এখন খুব চিন্তিত দেখায়। দু সপ্তাহের রেশন ধরে এনেছে। শান্তিকাকার মুদিখানার তেল নুন আলু আটায় দু মাসের বাকি উনিশ টাকা। তবু কমলা চোয়াল শক্ত করে সরু রাস্তা পেরিয়ে বাস রাস্তার ঝকঝকে ব্যস্ত ওষুধের দোকানে ঢুকল। সারা দেওয়াল জোড়া সাদা কাঠের তাকের খোপে খোপে, চকচকে পালিশ করা টেবিলের কাঁচ ঢাকা তাক ভরে শুধু রং বেরঙের ওষুধ, ফুডের টিন, বাচ্চার দুধের বোতল, কিছু সাজগোজের শিশি। একটা পাঁচমেশালী গম্ভীর গন্ধ। কথার আওয়াজ আর তাড়াতাড়ি কাজ করার শব্দ—সব মিলিয়ে কমলা যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু ছাগলছানার পাল থেকে নিজেরটিকে খুঁজে বার করার নির্ভুল প্রত্যয়ে সে দোকানের কর্মচারীকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় গাঢ় খয়েরি আর সাদায় মেশানো সেই ফুডের টিনখানি, আর গোল

গোল পুঁতির মতো ওষুধের মধু রঙের শিশিটি। দুটো মিলিয়ে একাত্তর টাকা। বিয়াল্লিশ আর উনত্রিশ। ছোট শিশি হয় না। ছোট টিন-ফুডের দাম ছত্রিশ টাকা।

স্বপ্নের পাখিগুলি সব একে একে উড়ে যাওয়ার আকস্মিকতায় তার বুকে শূন্যতাটুকু ঝাপটা মারে। বঞ্চনার আর আশাভঙ্গের ক্রোধে কমলার চোখ নাক ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

এই দু মাসে নানা চাতুরি করে সব রকমের ওষুধ মিলিয়ে মোট চোদ্দটা বড়ি সে খেয়েছে। দুধের গেলাসে একদিন আঁচলের সুতো ফেলেছিল, বৌদি দুধটা খায় নি, কিন্তু ফেলে না দিয়ে রেখে দিয়েছিল অতিথিদের চায়ের জন্য। আট মাস চলছে। অনেক ভালবাসায় সযত্নে লালিত গোপন ইচ্ছের চারাগাছে সার জল পড়ে নি কিছুই। কেমন করে ফুটবে ফুল? পেটের ধনটাকে না দেওয়া গেছে একটু ভাল খাবার, অনাগত শিশুর জন্যে কোনো রকম ভেষজ বা রাসায়নিক ওষুধ। নিজের শরীরের ভেতরের বাচ্চাকে তিলে তিলে শুকিয়ে মারতে মারতে চোখের জলে, ঘৃণায় আর অভিমানে এক আসন্নপ্রসবা মা তৈবি করে আরেক গর্ভিনী মায়ের জন্যে খাদ্য আর আরামের উপাচার।

বস্তির দিকে অন্ধের মতো হাঁটতে হাঁটতে কমলার মনে পড়ে এই দুটো মাস সে লোভী বিড়ালের মতো ছোঁক ছোঁক করে খুঁজে বেড়িয়েছে শুধু একটু পুষ্টিকর খাবার। পয়লা বোশেখ ব্যাঙ্কের বাবুর বাড়ি থেকে কটা বাসি লুচি, টকে যাওয়া আলুর দম আর দুটো দলা পাকানো সন্দেশ সে একাই খেয়ে নিয়েছে নিঃশেষে। কোনো ভাল জিনিস লোকটাকে না দিয়ে এতদিন খেতে পারত না কমলা। ছেঁড়া তারের মতো তির তির করে নাক আর মুখ কেঁপে দু চোখে উজিয়ে আসে তপ্ত জল। বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে কমলা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধবে, ভেবেছিলাম যেমন করে পারি তোকে ঠিক ভাল ভাল জিনিস খাওয়াব। কিন্তু এই দুনিয়াটা বড কঠিন রে বাপ। এই গরীব মায়ের পেটে কেন জন্মাতে এলি তুই?

ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগে কমলার চোখে মুখে। দেখতে দেখতে বাতাসের তীব্র স্রোত সোঁ সোঁ করে আছড়ে পড়ে রাস্তায়। হাওয়ার গর্জনের সঙ্গে বিচিত্র আওয়াজ ওঠে। পাতা ওড়ার, মানুষের দ্রুত চলা ফেবার। সশব্দে দোকানের আধ ভাঁজ করা দরজা বন্ধ হতে থাকে। উচ্ছিষ্ট শালপাতা হাওয়ায় ঘুরতে ঘুবতে কমলার শরীরে এসে লেপটে যায়। ধুলো বালিতে তার দাঁত কিচকিচ করতে থাকে। আকাশের এক দিক থেকে অন্য দিকে লাফিয়ে যায় বিদ্যুৎ, আর আশঙ্কায় কমলা দু হাত দিয়ে তার উন্নত গর্ভ আঁকড়ে ঢুকে যায় একটি দোকানে। গর্ভের শিশু যেন ভয় না পায়।

অভাবের হাত থেকে শেষ সম্বল কমলার বড় সাধের সাতাশটি টাকার কিছুই বাঁচানো যায় না। তবু কমলা ছোট্ট চাদর দিয়ে বড় বিছানা টেনেটুনে ঢাকার মতো সুনিপুণ গৃহিণীপনায় চারটি টাকা লুকিয়ে তুলে রাখে। হঠাৎ ব্যথা উঠলে রিকশা ডেকে হাসপাতাল যেতে হবে তো। অবশ্য আশ পাশের ঘরের সবাই আছে, তাও এসময় কখন কি দরকার হয় বলা যায় না।

এগারো দিন কেটে গেছে। মাইনে পেতে এখনও পাঁচ ছ দিন দেরি। এখন প্রায় জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। এর মধ্যে আর একদিনও বৃষ্টি হয় নি। ভ্যাপসা গরমের মধ্যে উনুনের সামনে বসে রুটি বেলার পরিশ্রমে কমলা ঘেমে ওঠে। যা আটা আছে তাতে পাঁচটা রুটিও হবে না। কাল কাজ থেকে ফেরার পথে আবার ধারে আটা আনতে হবে। এদিকে আলু তেল সবই ফুরিয়েছে। লম্ফ জ্বালার তেলও নেই। হয়তো ওই চারটে টাকার থেকে একটা কাল ভাঙ্গাতে হবে। ক্ষোভ আর ক্রোধে কমলা আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এসময় কোথায় একটু পেট ভরে খাব, না আধ পেটা খেয়ে আছি! বাচ্চাটা যদি রুগ্ন লিকলিকে হয়ে জন্মায়! এই

বাইশ বছরের জীবনে তো কিচ্ছুটি চাই নি ঠাকুর, শুধু পেটের সন্তানটা একটু সুস্থ হোক, তাও তুমি মুখ তুলে চাইলে না। বেড়ার দেওয়ালে ঝোলানো মা কালির ছবির তলায় পদ্মাসনে বসে থাকা রামকৃষ্ণ আর সারদা স্মিতমুখে কমলার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বাইরে থেকে লোকটার কথার শব্দ এগিয়ে আসে। কমলা দরজার দিকে না তাকিয়ে শুধু একটু সরে বসে। ও হাত মুখ ধুতে ধুতেই খাবার বাড়া হয়ে যাবে। এই কদিন শুধু রাতে সাত আটটা করে রুটি হচ্ছিল। আজ মোটে পাঁচটা। কার মুখে কি দেবে কমলা! যাই হোক না কেন পেটেরটাকে তো সব আগে খাওয়াতে হবে।

পাতলা ট্যালট্যালে ডাল দিয়ে ভিজিয়ে দুটো রুটির শেষ গুঁড়োটুকুও খেয়ে নিয়ে কমলার স্বামী জিজ্ঞেস করে—আর রুটি নেই, না? অবশ্য খিদেও নেই তেমন—

নিজের জন্যে তিনখানা রুটি গুছিয়ে তুলে রাখার অপরাধবোধে কমলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।— আর একটা মোটে আছে, চাও তো তাও দিয়ে দিচ্ছি। একা আমার রোজগারে আর কত টানবো? তবু তো এই শরীরে দু বাড়ি খাটছি।

লোকটা অপ্রতিভ হয়ে বলে—না না, তা বলছি না। আমি বিকেলে পেট ভরে খেয়েছি। তুমি বরং আমার জন্যে দুটো না রেখে একটা রাখলেও পারতে।

বলতে বলতে সে এ্যালুমিনিয়মের গেলাসে করে বাঁ হাতে জালা থেকে জল তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘরের বাইরে কুলকুচোর আওয়াজ শোনা যায়। ঘরে এসে হাত মুখ মুছে লোকটা উলটো দিকে হারানদার ঘরে বিড়ি খেতে যাবার জন্যে মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কমলা চটপট নিজের খাবারটা বেড়ে নেয়। এর মধ্যে একদিন তিরিশ পয়সায় গুঁড়ো দুধ কিনেছিল। তারই শেষ ডেলাটুকু জলে গুলে তাই দিয়ে তিনটে রুটি খেতে খেতে কমলা জোর করে স্বামীর ক্ষুধার্ত মুখটা মন থেকে সরাবার চেষ্টা করে। সত্যিই কি বিকেলে কিছু ধরেছে লোকটা? মাইনে পেয়ে ওর জন্যে কুড়ি পয়সার একটা সিগারেট কিনে আনবে। আর গুঁড়ো দুধও কিছুটা কিনতেই হবে। দুধই হচ্ছে বাচ্চার জন্যে সব চেয়ে ভাল। খাওয়া শেষ হলে কিনকিনে খিদেটাকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য বাঁ হাতে গেলাস ধরে আলগোছে জল খেতে গিয়ে ও থমকে যায়। শোবার আগে খাবে। ততক্ষণ এই দুধ আর রুটিটুকুর নির্যাস ভাল করে বাচ্চার শরীরে মিশুক। জল খেলেই তো পাতলা হয়ে যাবে সব।

গভীর রাতে স্বামীর পাশে শুয়েও চিন্তায় ছটফট্ করে। প্রসবের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই যেন নিজেকে অসহায় লাগে। দেখতে দেখতে কটা মাস কেটে গেল। এই কিছু করেও কিছু করা গেল না বাচ্চাটার জন্যে। অথচ কি করলে কি হয় সব জানে কমলা। কারখানাটাও যদি খুলে যেত, তাহলেও হয়তো .... কমলা পাশ ফিরে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। রাস্তার ঘোলা আলোর সঙ্গে মিশে পাতলা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে লোকটার মুখে। আমগাছ থেকে কি একটা পাখি হঠাৎ শী শী করে ডেকে উঠল। আচ্ছা, শুয়ে আছে বলেই কি গালের হাড়দুটো এত উঁচু দেখাচ্ছে লোকটার? গলায় ঘামাচি বিজিবিজ করছে। পাঁজরের হাড়গুলোর ওপর থেকে মাংস আর চামড়ার চাদর এত পাতলা হয়ে গেল কবে? কতদিন—কতদিন লোকটাকে পেট ভরে খেতে দিতে পারে নি কমলা! নিজেও যে পেট ভরে খেয়েছে তা না, তবু পেটের বাচ্চাকে বাঁচাবার আগ্রহে ইদানীং খাবারের ভাগটা অসমান হয়ে যাচ্ছে। যেমন আজ। কমলা দেখতে পায় না তার নিজের চোখের তলার কালিও গাঢ়তর হয়েছে, শীর্ণ হয়ে এসেছে তার দেহ। অনুশোচনায় আর অসহায় রাগে বিদ্ধ শরীর আকুল কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে। লোকটা পাশ ফিরে তার অশ্রুসিক্ত মুখখানি নিজের ঘেমো বুকটায় টেনে নেয়। এক হাতে তাকে জড়িয়ে রেখে অন্য হাতটি রাখে কমলার স্ফীত গর্ভের ওপর। আর ঠিক সেই

মুহূর্তে কমলার গর্ভের উষ্ণ অন্ধকারে সেই রক্তমাংসের প্রাণটি যেন নড়ে ওঠে। রোমাঞ্চে, আবেগে কমলার সারা শরীর উথাল পাথাল করে।— কি করিস রে বাপ? মায়ের মধ্যে শুয়ে শুয়ে বাপের হাতের ছোঁয়ায় সাড়া দিস বুঝি তুই? নাকি মায়ের আধপেটা খাবারে খিদে মেটে নি তোর? চার পাশে এত খাবার, তবু তোকে পেট ভরে খাওয়াতে পারলাম না মানিক! জন্মাবার পরেও এমনি করেই আমার চোখের সামনে তুই রোগা থেকে আরও রোগা হয়ে যাবি ধন! সৌন্দর্য, পুষ্টি, শক্তি, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য—সব বন্দী রয়ে গেল রং-বেরঙের শিশি-কৌটোয়, অমৃতের মতো দুধ, সুস্বাদু মাছ, মাংস, ডিম আর তাজা ফলের রসে। এই নটা মাসে তোকে আমি এসব কিছু দিতে পারলাম না বাপ। কিন্তু তোকে আমি আমার সব রাগ, সব বেদনা আর দুঃখ উজাড় করে দিলাম লালকমল! যে দুনিয়াটা আমায় এই বাইশ বছর ধরে ঠকিয়ে এল তার জন্যে ঘেন্না দিলাম। নীলকমল রে, তোর জন্যে তুলে রাখলাম চোখের জল আর অভিমান। যেমন করে আমার শরীর ছিন্নভিন্ন করে বেরুবি তুই, তেমনি করেই এই দুনিয়াটাকে তুই ছিঁড়ে ফেলে দে বাপ!

কমলার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার স্বামী। টান টান হয়ে ওঠে তার বিনিদ্র স্নায়ু। আর আশা-আকাঙ্ক্ষা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপে এক অভিমানিনী গর্ভিনীর শীর্ণ শরীর।

সৎকার

সমর মুখোপাধ্যায়

।। এক ।।

হাসপাতালে ছিদাম কাহারের মৃত্যু হয়। তার লাশ তারই আস্তানার সামনে এখন। সবারই চিন্তা কি করে ছিদামের দেহ সৎকার হবে। ছিদাম না খেতে পাওয়া রোগে মরেছে। অতএব নিঃসম্বল। গা লাগালাগি ছাবড়ার মেয়ে-মদ্দরা হুমড়ে পড়েছে মৃতদেহের সামনে। খোঁয়াড়ে ব্রজবাবুর পোষানী শূয়োরগুলো চিল্লোতে থাকল। চালার ঝাঁপের বাইরে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। নিবু হলুদে আলোর সামনে পড়ে আছে ছিদামের লাশ। ধুলো মাখামাখি গা ঢাকা চামড়ার খালোটি ভেদ করে কঙ্কাল। জাগন চরের জমির মত স্পষ্ট।

মাথার শিয়রে তার সদ্য বিধবা বৌ। ল্যাংটো তিনটে ছেলে। কোলের মেয়েটা বুকের ওপর আঁটুলের মত লেপ্টে মাই টানছে। বৌ কাঁদছে না। স্থির দৃষ্টিতে মরা লোকটার দিকে চেয়ে রয়েছে। জড়ো হওয়া মেয়ে পুরুষেরা সান্ত্বনা দিচ্ছে সমানে।

একজন দুঃখ করে বলল .... ছিদেমডা না খেয়ে মরেচে।

উপোষী রয়েছে যারা সেখানে, পেটে হাত দিয়ে কঁকিয়ে উঠল।

কাহার পাড়ার লোকেরা বেশীর ভাগ প্রায়ই উপোষী থাকে। ঠিকে জনের ধান্দা, ভারী খাটার কাজ, মুটে মজুরের ফরমায়েসী খাটা কালে ভদ্রে জোটে। কখনও বাজনদার হয়, চামড়াও ছুলতে বেরোয়। কেউ কাজ পায়, আবার পায় না কখনও। অবরে সবরে লাগাতার কাজও জোটে। কখনও পেটে কিল মেরে পড়ে থাকে। ভাবে ব্রজবাবুর পোষানী শূয়োরগুলো আর তাদের কোন তফাৎ নেই। রাস্তার ওপিঠে গঙ্গাপারের চটকলের মাকুর ঝাপট চলে ঝমঝম। হাজার মানুষ ঘড়ি বাঁধা সময়ে বেরোয় ঢোকে। ফেস্টোর চুলচ্যাৎরা বাতাসে ছড়িয়ে থাকে। এর মধ্যে দূরে গজিয়ে ওঠা না খাওয়া কাহারদের শব্দ কানে পৌঁছোয় না।

ছিদামের লাশ পোড়ানোর খরচ নিয়ে ভাবছে সবাই। ওর বৌ যেমন ছিল, ঠায় তেমনি। স্বামীর মরা বাঁচা তার কাছে সমান। থাকলেও যা, না থাকলেও তাই। কুপির আলোটা অনিশ্চয়তার মত নাচছে। জোর হাওয়ায় নিবে যেতে পারে। দূরে বিন্দু বিন্দু ইলেক্‌ট্রিকের আলো। এখানে চিরকালের অন্ধকারে ছিদাম পড়ে আছে।

এরই মধ্যে ব্রজবাবু হাজির। পালানী শূয়োরের মালিক। কাহার-পাড়ায় 'ভদ্‌দোরবাবু' বলে পরিচিত। রাজনৈতিক নেতা। মাঝে মধ্যে দান খয়রাতী করে ইমেজ রাখেন নিজের। ছিদামের মৃতদেহ দেখে চুক্ চুক্ শব্দ তুলে সমবেদনা জানান। মৃতের প্রতি সম্মান জানাতে ফুল এল, ধূপ, চটাবাখারির চালি, কাপড় এল। সবই তাঁর আয়োজন। ব্রজবাবু ছিদামের লাশে ফুল দিলেন। ধূপ জ্বলল। একজন বলল—শ্মর্শান খর্চা জোটবে কনতি? ও ব্যাটার তো কিস্যু লাই। মরবার আগে কদ্দিন খাতি পায়নি।

— আমাকে বলিসনি কেন? অত্যন্ত দুঃখেও ব্রজবাবু ধমকান। একটা লোক না খেয়ে মরবে ...। একটু থেমে বললেন — ওর বৌ আর তোরা রাজী থাকলে একটা ব্যবস্থা করতে পারি।

উপস্থিত সকলে বিনয়ে আর কৃতজ্ঞতায় হাত কচলাতে লাগল।

ছিদামকে হাসপাতালে নিয়ে চল ফের। বেওয়ারিশ লাশের লিষ্টিতে ওর নাম তুলে দেবখন। দাহ করার খরচ লাগবে না এক পয়সা। হাসপাতাল থেকে ওসব বন্দোবস্ত করবে। ওর বৌ কিন্তু দাবী করতে পারবে না স্বামী বলে।

— ছেলে যে মুকি আগুন দ্যায়! একজন বিধান তুলল।

—দরকার নেই। ভাত না খাওয়া মুখে আগুন দিলে পাপ হয়।

সবাই 'সেই ভাল,' ' সেই ভাল' বলে ব্রজবাবুর প্রশংসা করল। এক বুড়ি ছিদামের বৌ-এর দিকে তাকিয়ে চিল্লিয়ে উঠল—ডাইনী উডা, ভাতার খাগী। অকম্মা গতুরে। সাত বিয়োনীর মা, তোর লরক হবে।

ছিদামের বৌ চোখ তুলে তাকাল। আগুন ঠিকরে পড়ল চোখে। রাগে নাকের পাটা ফুলল। বারকতক ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল অমন স্বোয়ামীর দরকার লাই আমার। উর দেহে পুকো হোউক। পচি গলি ছ্যাদড়ায়ে যাক। আমি উ ভাতারের মাগ লই। ঠোঁট চেপে আর্তস্বরে কেঁদে উঠল। মাটিতে পা দাপাতে লাগল। মায়ের সঙ্গে বাচ্চাগুলোও কান্না জুড়ল। খোঁয়াড় তোলপাড় করে পোষানী শূয়োরের পালও চিল্লোতে থাকল। ব্রজবাবু কটা টাকা পকেট থেকে ছিদামের বৌকে দিলেন। নির্দেশ দেন, কাল যেন ছিদামের বৌ বাচ্চারা ভাত খায়। যাওয়ার আগে ছিদামের মৃতদেহের সৎকারের বন্দোবস্ত করে আবার হাসপাতালে গেলেন। ওয়ার্ড মাষ্টারকে বলে বেওয়ারিশ লাশ ছিদাম কাহারের সৎকারের ব্যবস্থা করবেন।

দোমড়ানো নোটগুলো হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে ধরল ছিদামের বৌ। ভাবতে থাকল স্বামী মরার ফল। পেট পুরে খাওয়া। অনেক মানুষের হায় হায়। ইস! রোজ যদি আমি বিধবা হতাম।

রাত অনেকদূর গড়ালো। বয়সী রমণীরা বলল— স্বোয়ামীর পায়ে মাথা ঠ্যাকা অনামুকী। পা ধুয়ে চুল দে মোছায়ে দে। মনে মনে সাতজন্মের পাপ ক্ষ্যামা করি দিতি বল্।

মৃতস্বামীর পায়ের গোড়ায় বসানো হ'ল তাকে। এক রাঁড় ইঁট দিয়ে ভাঙ্গল হাতের প্লাষ্টিক শাঁখা। কপালের সিঁদুর ফোঁটা ধুলো ঘসে তুলে দিল। মরা ছিদামের পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে জন্মের শোধ সিঁথির চিটে লাল দাগ তুলে দিল।

কাহারপাড়ার থেকে ছিদাম পড়শীদের কাঁধে চেপে চলল। বাঁশের চালি কঁচ কঁচ করে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে চলল হাসপাতাল পানে। তাব মৃতদেহ ফিরিতে সৎকার হবে। কি আনন্দ! ব্রজবাবুর মহান দয়া। সামনে ভোট। এবারে লিষ্টিতে এ পাড়ায় একটা লোকেরও নাম বাদ যায়নি। শুধু ছিদামই মরে গেল।

।। দুই ।।

হাসপাতালের খাতা পত্রের মাঝখানে সুবিমল। সিগারেটের নীল ধোঁয়া পাক খেয়ে জানলা দিয়ে বেরোচ্ছে। একটু পরেই সাপ্লায়াররা আসবে। পাওনার চুক্তিগুলো নতুন করে ঝালিয়ে নিতে হবে। বাজার দর বাড়ছে। ঘুষের পার্সেন্টেজও বাড়াতে হবে। সে সব চিন্তায় ওয়ার্ড মাষ্টার সুবিমল আপাতত ব্যস্ত। সামনেব দরজায় হঠাৎ ভজুয়ার মুখ। ঝাঁটু গোফ, খাঁকি প্যান্ট। হাসপাতালের ধাঙড় ভজুয়াকে দেখে কিছু বিরক্ত সুবিমল।

—কি চাই!

—মাষ্টারবাবু, মড়িখানে মে ইক লাশ।

সুবিমল অবাক। তিনমাসের ভেতর তো কোন বডি মর্গে যায়নি। তবে কার বডি। কোত্থেকে এল!

অবশেষে খাতাপত্র তোলপাড়। কিছুতেই মাথায় আসছে না একটা মৃতদেহ এল কোত্থেকে।

ভজুয়ার পিছন পিছন হাসপাতালের পিছনের বডি চেম্বারের দিকে এলেন। উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। আজকেই একটা বডি রাখতে এসে ভজুয়ার নজরে আসে। ভজুয়া জংধরা তালা খুলে দরজাটা ঠেলল। আর্তনাদ করে খুলে গেল পাল্লা। স্যাঁতা ঘর। ঘুলঘুলির ফোকর ঠিকরে আসা আলো। খোলা দরজা দিয়েও অনেক আলো ঢুকল ঘরটায়।

সুবিমল উঁকি দিলেন ঘরে। ওয়ার্ড মাষ্টারের চাকরি করতে করতে বিকার বোধ কমেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বীভৎস দৃশ্যও কোন রেখাপাত করে না মনে। ভীষণ খাবাপ গন্ধও নাকের পাঁচিলে আটকে যায়। কথায় বলে বারো শকুন মরলে এক ওযার্ড মাষ্টার পয়দা হয়।

দিনমান, তবু ঘরজুড়ে যেন রাত। কংক্রীট থাকার ওপর একটা মৃতদেহ। সাদা কাপড়ে ঢাকা। রসরক্ত গলে গলে ঘরময়। কুঁই পোকার পাল থিক থিক করে সাঁতরাচ্ছে। সেলাইয়ের ফোঁড়ের মত বিজবিজ খেলে বেড়াচ্ছে।

—কাপড়টা সরিয়ে মালটার মুখখানা দেখা ভজুয়া।

মাষ্টারবাবুর আদেশ পেয়ে মুখটার ঢাকা খোলে। চোখ মুখ সাফ। কুঁইপোকার ছানাপোনা চরছে।

—আরেট্টু খোল! ভজুয়া সুবিমলের দিকে চেয়ে ফ্যাকফেকিয়ে হাসে। বুকের পাঁজরা, হাতের হাড় থেকে গলে গলে পড়ছে পচা মাংসের ডেলা। নাক নেই, চোখ নেই, দাঁতগুলো মেলে হাসছে কঙ্কালসার একটা মানুষ। চুলসমেত খুলির ছাল ঝুলছে। মগজেব ঘিলু ফোটা ফুলকপির মত ছেদড়ে বেরিয়ে রয়েছে।

—কবজিতে কোন টিকিট আছে?

— নেহি তো মাষ্টারবাবু, কুছভী নেহি।

দরজা বন্ধ করে অফিসে আসতে পা আর উঠছিল না সুবিমলের। একশো বেডের হাসপাতাল। তিনজন ওয়ার্ড মাষ্টার, অথচ একটা লাশ উইদাউট নোটিশ মর্গের ভেতর শুয়ে পড়ল কিভাবে! জানাজানি হবার আগেই ব্যবস্থা করে ফেলা দরকার।

রাতে ওটাকে রেললাইনের ধারে ফেলে আসা যায়। কিন্তু ধাঙড় মুদ্দোফরাসরা রটিয়ে দিতে পারে। ওটাকে গোর দিয়ে দিলে হয়। কিন্তু পচা গলা মাল বের করলেই চিত্তির। কার লাশ! নাম কি, খাতার এনট্রি ইত্যাদি হাজার ঝক্কি। দিনমানে কৈফিয়ৎ রাতে সন্দেহ। কি করা যেতে পারে এ চিন্তায় বড় ব্যস্ত সুবিমল।

অন্য দু'জন সহকর্মীও যখন পেল না বডিটার গতি, হঠাৎই সুবিমল পেয়েছি পেয়েছি বলে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। সহকর্মীরাও অবাক হয়। সুবিমলের সামনে মাস দুই আগের একটা রাত ভেসে আসে। ছিদাম কাহারের ডেড বডি। বেড থেকে বিলিজ করেও আবার ফেরৎ আসে হাসপাতালে। জননেতা ব্রজবাবুব অনুরোধে সুবিমল সে রাতেই লখোন নামের ধাঙড়কে কবরখানায় গোর দিয়ে দিতে বলে। লখোন পরদিন সকালে করবে এই অজুহাতে বডিটা মর্গে ঢুকিয়ে রাখে সে রাতে।

এ ঘটনাটুকু অনেক কাজের মধ্যে থেকে ভেসে আসে সুবিমলের সামনে। অতএব পরের ঘটনাটুকুও পরিষ্কার হয়। লখোন পরদিন থেকে বেপাত্তা। লখোন নাকি চটকলে জমাদারের কাজ নিয়ে চলে যায়, ভজুয়াই বলেছিল। সেই থেকে একা ঘরে ছিদামের লাশ মর্গের ভেতর পচেছে, গলেছে। সদগতি সৎকার হয়নি।

।। তিন ।।

লোডশেডিং-এর রেশন চালু হতে ন'টা বাজল। চটকলের মাকুর ঝাপট থামল। হঠাৎই যেন নিস্তব্ধ হ'ল চারিদিক। মানুষের চলাফেরা কথাবার্তা কমল। এর মধ্যে সচল হ'ল হাসপাতালের চাতাল।

ছিদামের পচা-গলা লাশের সদগতি হবে। ভজুয়া চোলাই টেনে টলটল করছে। তিন ওয়ার্ড মাষ্টার সতর্ক পাহারার কাজে। তাদের হাতের টর্চ ঝলসাচ্ছে মাঝে মাঝে।

ভজুয়ার হাতে আরও এক পাঁট মাল ধরিয়ে দিলেন সুবিমল। অন্ধকারে ওর অসম্ভব সাদা চোখ চকচক করে উঠল। এখন সুবিমল ভজুয়ার বন্ধু। সাগির্দ।

— ভজুয়া, কঙ্কাল পার্টি কোথায়?

— মর্গকা বগল বো হ্যায়।

— টাকা কোথায়?

— উসকা পাসহী হ্যায়।

— কতোয় রফা কল্লি মাইরী।

—ইক হাজার।

ভীষণ আনন্দে ভজুয়ার হাত থেকে বোতল নিয়ে খানিকটা গলায় ঢালল সুবিমল। কি আনন্দ যে লাগছে। বডিটা বেচা মানে টাকা। একটা বিরাট দুশ্চিন্তারও শেষ। শুধু হাসপাতালের চৌহদ্দিটুকু পার করে দেওয়া। তারপর তিনজনে তিনশ করে, ভজুয়াকে বাকীটা।

টলতে টলতে ভজুয়া এগোলো, সুবিমল পিছনে। মর্গের কাছটাতে এসে দাঁড়ালেন। এদিক ওদিক আগাছা জঞ্জাল।। তার ভেতর থেকে একটা লোক এসে দাঁড়াল। সুবিমল টর্চ ফেললেন লোকটার মুখে। আঁটো ধুতি হাঁটুর উপর। গণ্ডের উপর বেড়ে আসা মাংসের দলা। কাইজারী গোঁফ, কান পর্যন্ত দীর্ঘ। কালো রঙের মানুষ, ইঁটভাটার আঙরা আগুনের মত চোখ। সুস্থভাবে দাঁড়াতে পারছে না।

সুবিমল হাত বাড়াল। লোকটা একটা টাকার বাণ্ডিল দিল হাতে।

—ইক হাজার বাবুসাব। পাক্কি বাত। অন্ধকারে ওর গলার শব্দ গমগম করল।

ভজুয়া মর্গের দরজা খুলল। জংধরা কবজা যক্ষা রোগীর কাশির আওয়াজ করে উঠল। টর্চের আলোয় ঘরটা ঝলসে উঠল। ভজুয়া আর লোকটা ভেতরে ঢুকল। বোতলটার থেকে ভাগ করে মদ খেয়ে নিল। সুবিমল টর্চ ধরে দাঁড়াল বাইরে। ওরা ছিদামকে মেজেতে নামাল। ফিনাইল জল ঢালল গায়ে। বুরুশ চালাতে থাকল। হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকা অবশিষ্ট মাংসের শাঁস ধুয়ে দিতে লাগল ওরা।

সুবিমলের পকেটে এক হাজারের মাতন। তারও ওপর পেটের ভেতর মালের মাতন। এদিক সেদিক তাকিয়ে মাঝে মাঝে বলছে—কুইক, জলদি।

সবুজ রক্ত

সুখেন্দু পাল

সকালে চায়ের টেবিলে চা খেতে খেতে দৈনিক পত্রিকাটি খুলতেই হতবাক হয়ে গেলাম। প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে হেডলাইন—বিশ্বখ্যাত বোটানিষ্ট ডঃ অরিন্দম সাহা এন. আর. এস হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর মুখোমুখি।

পরের খবর সংক্ষেপে যা দাঁড়ায়—ডঃ সাহা ক্যাকটাস দ্বারা আক্রান্ত হন। তার রিসার্চ এ্যাসিসটেনট মণিময় মুখার্জী তাকে অচৈতন্য অবস্থায় এন. আর. এস হাসপাতালে নিয়ে আসে। তৎক্ষণাৎ তাকে উডবার্ণ ওয়ার্ডের বাইশ নম্বর কেবিনে ভর্তি করা হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। ডাঃ সুকান্ত রুদ্র বলেছেন—বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে কিছু বলা সম্ভব নয়।

ঘড়ি দেখলাম। সকাল আটটা। কোনোরকম চা-টোস্ট উদরে ঠেলে উঠে পড়ি। বারান্দায় এসে দেখলাম ড্রাইভার এসেছে। বললাম—অশেষ গাড়ি বের কর। এখনি হাসপাতালে যেতে হবে।

রূপা জিগ্যেস করে—হঠাৎ কী হল? কোথায় ছুটলে?

—আজকের পত্রিকাটা পড়লেই বুঝতে পারবে। বলেই পোষাক বদলাতে ঘরে ঢুকলাম।

বের হবার সময় রূপাকে বলি—ফিরতে দেরী হবে। গাড়িতে উঠে অশেষকে বলি—এন. আর. এস হাসপাতাল। উডবার্ণ ওয়ার্ড।

উডবার্ণ ওয়ার্ডের ওঠার সিঁড়ির মুখে স্কিন স্পেশালিষ্ট ডাঃ সমর বাসুর মুখোমুখি হতেই জিগ্যেস করি— কেমন আছেন ডঃ অরিন্দম সাহা?

—এখনি কিছু বলা যাচ্ছে না।

—সিমটম?

—এখনো বোঝা যায় নি। শরীরে নানা জায়গায় লম্বা লম্বা প্রায় আধ সেন্টিমিটার চওড়া কালো দাগ। দাগগুলির মধ্যে ঘন কালো স্পট। বলতে বলতে ডাঃ সমর বাসু আমার সঙ্গে আবার উপরে উঠে আসে।

ডক্টর অরিন্দম সাহার কেবিনে তখন চিফ প্যাথলজিষ্ট ডাঃ পার্থপ্রতিম ঘোষ। তার সহকারী রক্ত নিচ্ছে। আমাকে দেখে ডাঃ ঘোষ বললেন,—খুবই দুঃখজনক ঘটনা, ডাঃ নাহা।

কিছুক্ষণ বোটানিষ্ট অরিন্দম সাহাকে পরীক্ষা করি। ঘুরে দাঁড়িয়ে পার্থপ্রতিমকে জিগ্যেস করি—কার্ডিওলজির রিপোর্ট জান?

—ভালো না।

—রক্তের রিপোর্ট আমাকে জানাবে। বলেই বেরিয়ে আসি কেবিন থেকে।

নীচে এসে দেখি ডাঃ সুকান্ত রুদ্র ও মেডিক্যাল সুপার কথা বলছে। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে গাড়িতে উঠি। অশেষকে বলি—বিষ্ণুপুর।

ডাঃ অরিন্দম সাহার সঙ্গে আমার পরিচয় বইমেলায়। এলায়েড বুক পাবলিশার্সের স্টলে। ক্যাকটাস সম্বন্ধীয় একটা বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। ক্যাকটাস সম্বন্ধে জানার আগ্রহই আমাকে বইমেলার স্টলে স্টলে ঘুরতে হচ্ছে বইয়ের খোঁজে। আমার বাগানে কয়েকরকমের ক্যাকটাস উদ্ভিদ আছে।

আমার হাতে ক্যাকটাসের বই দেখে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তিনিও একটি বই তুলে দেখতে দেখতে আমাকে জিগ্যেস করেন—ক্যাকটাস সম্বন্ধে কি আপনি খুব ইন্টারেষ্টেড?

— হ্যাঁ। হেসে বলি।

— বই নিশ্চয়ই কিনবেন? আবার জিগ্যেস করেন ভদ্রলোক।

— ইচ্ছে আছে। মুখ ফিরিয়ে তার দিকে চেয়ে বলি।

— তাহলে চোখবুজে কিনে ফেলুন। প্রামাণ্য তথ্যে ভরা বইটি। আমিও কিনবো।

— বলছেন?

— নিশ্চয়ই। এর চেয়ে ভাল বই কোথায়।

বই কিনে দু'জনেই স্টল থেকে বেরিয়ে এলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে খুবই ইচ্ছে হল। নিশ্চয়ই তিনি ক্যাকটাস সম্বন্ধে কিছু জানেন।

ভদ্রলোক সে সময় দিলেন না। হাতে একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বললেন—সময় হলে এই ঠিকানায় চলে আসবেন। অনেক কিছু জানতে পারবেন। বলেই তিনি দ্রুত হেঁটে চলে গেলেন।

কার্ড পড়ে দেখলাম। লেখা রয়েছে—ডঃ অরিন্দম সাহা, বোটানিস্ট। ঠিকানা—ক্যাকটাস গার্ডেন। বিষ্ণুপুর। চব্বিশ পরগণা (দক্ষিণ)।

নাম দেখে চমকে উঠলাম। বিশ্বখ্যাত ডক্টর অরিন্দম সাহা, বোটানিষ্ট। ভারতের হয়ে অনেকবার রিপ্রেজেন্ট করেছেন উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় বিশ্ব-সেমিনারে। তাঁর তথ্যপূর্ণ বেশ কিছু প্রবন্ধ বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। আমিও কিছু কিছু তাঁর প্রবন্ধ পড়েছি। পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর প্রবন্ধ আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল এবং ক্যাকটাস সম্বন্ধে আগ্রহী করে তুলেছিল। ফলস্বরূপ আমার বাগানে কিছু কিছু ক্যাকটাস লাগিয়েছি।

সেই মুহূর্তে ঠিক করে ফেলেছিলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করব। এ বিষয়ে আলোচনা করব। তার কথা শুনব। ক্যাকটাস-বাগান দেখারও আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম।

কয়েকদিন পরই ফোনে ডঃ অরিন্দম সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করি। পরিচয় দিয়ে বলি—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনার ক্যাকটাস বাগান দেখতে উৎসুক। এসব বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতেও আগ্রহী।

বোঝা গেল ডঃ সাহা খুব খুশী হলেন। হয় তো মনের মতো এক নতুন ছাত্র পেয়ে আনন্দিত হলেন। বললেন — কালতো রবিবার। আপনার নিশ্চয়ই ছুটি?

—হ্যাঁ।

—কালই চলে আসুন। না, বিকেলে নয়। সকালেই আসুন। সময় হাতে বেশী না থাকলে কিছুই জানা যাবে না। দেখাও যাবে না। দুপুরের খাওয়া এখানেই।

ডক্টর সাহার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হই। বলি — বেশ তাই হবে।

সারাদিন কাটিয়ে বিকেল পাঁচটায় ডঃ সাহার বাগান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। আসার সময় বলেছিলাম—মাঝে মাঝে আসব কিন্তু।

—নিশ্চয়ই।

ব্যক্তিগত দু'চার কথা বাদে উদ্ভিদ নিয়েই কথা হয়েছে বেশী। ক্যাকটাসের সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন। এই উদ্ভিদ নিয়ে রিসার্চ করছেন। এর ওপর থিসিস লিখে ডক্টরেট হয়েছেন।

খুব বড় লেবরেটরী নয়। বেশ সাজানো-গোছানো। রিসার্চ এ্যাসিসটেন্ট মণিময় মুখার্জীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।

বাগান ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বলছিলেন—পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত পাঁচ-ছ'শ রকমের ক্যাকটাসের খোঁজ পাওয়া গেছে। আরও কোথায় কোন অখ্যাত জায়গায় কি ক্যাকটাস আছে তার খবর কে জানে।

ঘুরতে ঘুরতে অরিন্দম সাহা উদ্ভিদগুলির পরিচয় দিচ্ছিলেন। একটা উদ্ভিদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন—এই যে ক্যাকটাস গাছটি দেখছেন এর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ওল্ড ম্যান ক্যাকটাস। জলের দরকার হয় না। কিন্তু সূর্যের আলো চাই। ছায়া হলে চলবে না।

কয়েকটি একই রকমের উদ্ভিদে হোয়াইট-পিংক-অরেঞ্জ রঙের ফুল চোখে পড়ল। জিগ্যেস করি—এটা কি গাছ? নাম কি?

— ক্র্যাব ক্যাকটাস। দেখুন এর ফুলগুলি কতো সুন্দর দেখতে।

শেষের সারি দিয়ে ফিরছি। অরিন্দম সাহা তার বাড়ির কাছেই একটা উদ্ভিদ দেখিয়ে বললেন—পাশাপাশি দুটি উদ্ভিদ দেখছেন হলুদ আর কমলা রঙের সুন্দর ফুল ফুটেছে। অপূর্ব সুন্দর লাগছে না কি?

— এর নাম কি? জিগ্যেস করি।

— কমপাস বারেল ক্যাকটাস। আটফুট থেকে দশফুট উঁচু হয়।

— খাবার টেবিলে বসে অনেক কথা হল। দেশ-বিদেশের কথা। কোন কোন সেমিনারে কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে— কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে ডাক পড়েছে—তার ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনা সব বললেন।

মিসেস সাহা খাবার পরিবেশনের সময় দু-চার কথা ছাড়া বিশেষ কিছুই বললেন না। আমার সম্বন্ধে আমার পরিবার সম্বন্ধে কয়েকবার প্রশ্ন করেছেন মাত্র। একসময় হেসে জিগ্যেস করেছেন—আপনাকেও কি ক্যাকটাসে পেয়েছে?

বাড়ি ফিরছিলাম অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে।

বিষ্ণুপুর ডঃ সাহার বাগানে এসে অশেষ গাড়ি দাঁড় করায়। দারোয়ান আমাকে দেখে গেট খুলে দিল।

জিগ্যেস করি— মণিময় মুখার্জী আছে?

— না। দারোয়ান বলে।

— কোথায় গেছে?

— হাসপাতালে সাহা সাহেবকে দেখতে।

— ডঃ সাহার স্ত্রী?

— মণিময়বাবুর সঙ্গেই গেছেন। সাহেব কেমন আছেন?

— এখনি কিছু বলা যাচ্ছে না। ফটক পেরিয়ে বাগানের কাছে এসে দাঁড়াই। জিগ্যেস করি — কোন ক্যাকটাস গাছটা অরিন্দম সাহাকে জড়িয়ে ধরেছিল?

— সাহেব সামনে যাবেন না। তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—ঐ গাছটা। মণিময়বাবু বলছিলেন সব গাছগুলিই নাকি হিংস্র হয়ে গেছে।

বাগান থেকে বেরিয়ে এলাম। দারোয়ান পেছনে আসতে আসতে বলে—আপনি হাসপাতালে গেলেই ওনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

— আমি তো ওখান থেকেই আসছি। কখন বেরিয়েছে?

— মিনিট পনের হবে।

— আমি আর হাসপাতালে যাবো না। মণিময়বাবু ও মিসেস্ সাহাকে বলবে আমি এসেছিলাম।

ডঃ সাহার বাগান থেকে সোজা বাড়ি ফিরি। মন ভারি হয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে কোনো ডাক্তার কিছু বলতে পারছে না অরিন্দম সাহার সম্বন্ধে।

সকাল সাড়ে আটটায় হাসপাতালে চলে এলাম। সোজা উডবার্ণ ওয়ার্ডে অরিন্দম সাহার কেবিনে।

ওয়ার্ডে তখন ডাঃ সুশান্ত রুদ্র, মেডিক্যাল সুপার ডাঃ সন্দীপ লাহিড়ি, চিফ প্যাথলজিস্ট ডাঃ পার্থপ্রতিম ঘোষ ব্যস্ত আলোচনায়।

আমাকে দেখে সুশান্ত রুদ্র বলে—এখনো কিছু বুঝে উঠতে পারি নি। জ্ঞান ফেরে নি।

—ডঃ সাহার বাড়ি থেকে কেউ এসেছে কি? জিগ্যেস করলাম।

—না, কেউ আসে নি।

অবাক হয়ে গেলাম। কাল দারোয়ান বলেছিল দু'জনেই হাসপাতালে এসেছে অরিন্দম সাহাকে দেখতে। খবর নেয়ার সময়ও নেই। বিষ্ণুপুর যাওয়াও সম্ভব নয়। বিকেলের ফ্লাইট ধরতে হবে। চিকাগোতে মেডিসিনের ওপর সেমিনার হচ্ছে। আমি নিমন্ত্রিত। লেকচার দেয়ার বিষয় আমাকে জানানো হয়েছে।

সাত-আটদিন আগে ফেরা সম্ভব হবে না। আরও দেরি হতে পারে যদি অন্য কোনো জায়গা থেকে বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণ আসে।

ডাঃ লাহিড়ি জিগ্যেস করে—আপনি তো আজই যাচ্ছেন?

— হ্যাঁ। কিন্তু আমার মন এই কেবিনে পড়ে থাকবে।

— আমার তো মনে হয় ডঃ সাহা দু-চার দিন পর সুস্থ হয়ে উঠবেন। তাছাড়া পরীক্ষা করে তো ব্যতিক্রম কিছুই পাওয়া যায় নি। আজকের কার্ডিওলজির রিপোর্ট গতকালের চেয়ে অনেক ভাল। মনে হচ্ছে যেন ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছেন।

—ডাঃ লাহিড়ি আপনার কথা শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম। অফিসে এসে কতগুলি কাজ সেরে বাড়ি ফিরি।

চিকাগো থেকে ফিরতে দেরি হল। চৌদ্দ-পনের দিন। নানা জায়গায় বক্তৃতা দেবার অনুরোধ আসতে থাকে। বেশ কিছু ভারতীয় ডাক্তারের ডিনার এবং লাঞ্চের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়েছে।

ঘরে পা দিয়েই ডাঃ রুদ্রকে ফোন করলাম। জানতে চাইলাম অরিন্দম সাহার খবর।

ডাঃ রুদ্র জানাল—অরিন্দম সাহাকে গত পরশু ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি সুস্থই আছেন। এতোদিন ঘুমোচ্ছিলেন। তার কাছে শুনেছি রক্তপিপাসু ক্যাকটাস তাকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে রক্ত খেয়েছে। মণিময়বাবুর জন্যই বেঁচে গেছে। আমি শুনে তো অবাক। এমন ক্যাকটাসও হয় নাকি।

— অসম্ভব কিছুই নয়। আমরা কতটুকু জানি ওদের সম্বন্ধে। দেশ-বিদেশের অনেক বই পড়েছি। কোন কোন ক্যাকটাস সংসারী এবং রক্তপিপাসু হতে পারে। ডঃ সাহার কাছেও শুনেছি। তবে তিনি স্বীকার করেছেন আজ পর্যন্ত এমন ক্যাকটাস দেখেন নি।

— ডঃ সাহার রক্ত পরীক্ষা করে একরকম রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল যা দিয়ে ঘুমের ওষুধ তৈরী হয়। অরিন্দম সাহার জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। ডাঃ লাহিড়ি ঠিকই বলেছিলেন—ডক্টর সাহা ঘুমোচ্ছেন। গভীর ঘুম। ঘুম অবশ্যই ভাঙবে।

অরিন্দম সাহা ভাল আছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলাম।

সোফার পিঠে শরীর এলিয়ে দিলাম। বড় ক্লান্ত লাগছে। গত চৌদ্দ-পনের দিন ঘূর্ণি হাওয়ার মতো ঘুরপাক খেয়েছি। মাঝে মাঝে অরিন্দম সাহার জন্য দুশ্চিন্তায় মন অস্থির হয়ে উঠত।

তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। রূপা হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে বলে — খেয়ে নিয়ে স্নান করে এসো ততক্ষণে জলখাবার তৈরী হয়ে যাবে।

অশেষকে গাড়ি বের করতে বলে চায়ে চুমুক দিই। রূপাকে বলি—আমার ফিরতে দেরী হবে। বিষ্ণুপুর যাবো।

হাসপাতালে নিজের অফিসে বসে কিছু কাগজ-পত্র দেখলাম। হাউজ-ফিজিশিয়ানদের সঙ্গে কিছু দরকারি কথা সেরে বেরিয়ে এলাম।

অশেষকে বলি—বিষ্ণুপুর।

গাড়ি বাইরে রেখেই হেঁটে ফটকের কাছে এলাম। দারোয়ান গেট খুলে দিল।

ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে অরিন্দম সাহা খোলা বারান্দায় একা বসে। চোখ তার ক্যাকটাস বাগানের দিকে। বিমর্ষ মুখ। যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট।

ক্যাকটাস বাগানের দিকে মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ল বাগান পুড়ে ছাই।

জিগ্যেস করি—কি করে হল?

— পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছি। অরিন্দম সাহার কণ্ঠে আত্মবিসর্জনের করুণ সুর।

— নির্দিষ্ট ক্যাকটাসকে না পুড়িয়ে সারা বাগানটিকে?

— বসুন ডাঃ নাহা। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল — না, নির্দিষ্ট ক্যাকটাসকে হত্যা করলে হতো না।

— কেন?

আবার কিছুক্ষণ চুপ অরিন্দম সাহা। একসময় আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—আপনাকে একবার কংগোর জঙ্গলের কথা বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই?

— আছে। সেখানে আপনি ও নাইজেরিয়ার ডক্টর ওদুম্বো কংগোর জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিরল জাতির ক্যাকটাসের খোঁজে।

— হ্যাঁ, কংগোর গভীর অরণ্যে চারটে ক্যাকটাসের চারা পেয়েছিলাম। দুটি আমি এনেছিলাম। আপনাকে দেখিয়েছি এই বাগানে।

দারোয়ানকে দু'কাপ চা আনতে নির্দেশ দিয়ে আবার বলতে শুরু করে—চারাদুটো বাগানে লাগাবার প্রায় একমাস পর ডক্টর ওদুম্বোর চিঠি পেলাম। চিঠিতে আমাকে সতর্ক করে লিখেছিলেন, মনে হচ্ছে চারা দুটি হিংস্র জাতীয়। নজর রাখবেন ওদুটির ওপর।

— তেমন কোনো ইঙ্গিত পেয়েছিলেন কি ডক্টর ওদুম্বো?

— হয় তো পেয়েছিলেন অথবা নাও পেতে পারেন। স্টাডি করে জেনে থাকতে পারেন। তিনি যে ঠিক বলেছিলেন তা বুঝতে পারি যেদিন বড় ক্যাকটাস গাছটা শুঁড় দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

— ওটা তো নিরীহ ছিল।

কংগোর ক্যাকটাস গাছ সাবালক হয়ে বাগানের সব গাছগুলিকে হিংস্র ও রক্তপিপাসু করে তুলেছিল। আমি বুঝতে পারি নি। সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন মনে করি নি। ভেবেছিলাম ডক্টর ওদুম্বোর ডায়গোনেসিস ভুল।

— বাগান পোড়ালেন কবে?

— গতকাল সকালে। সারা বাগানে পেট্রল স্প্রে করে পুড়িয়ে দিয়েছি। ক্যাকটাস গাছগুলি যখন পুড়ছে তখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম অনেকগুলি যন্ত্রণাকাতর শব্দ। অবাক হয়ে দেখছিলাম ওদের ডাল-পালা ও গুড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে সবুজ রক্ত।

সবুজ রক্ত তো সুন্দরের প্রতীক। ভালবাসার প্রতীক। হিংস্রের প্রতীক তো নয়। আমি বলি।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলেন অরিন্দম সাহা। আমিও আর কোনো কথা জিগ্যেস করলাম না।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার মুখ খোলে। ব্যথা জড়ানো স্বরে বলে—ডাঃ নাহা, ঘরে বাইরে দু-জায়গা থেকেই ভুল ক্যাকটাস বেছেছিলাম। দুটি ছিল কংগো অরণ্যের আর একটি ছিল ভবানীপুরের পশ এলাকার।

অবাক হয়ে জিগ্যেস করি—মানে?

—কংগোর ক্যাকটাস আমার বাগানের সুন্দর ক্যাকটাসগুলিকে বিষাক্ত করেছে। আর ভবানীপুরের ক্যাকটাস আমার ঘরের অপূর্বসুন্দর ক্যাকটাস-টিকে দূষিত কলঙ্কিত করে নিয়ে গেছে। দুটি ক্যাকটাসের চরিত্র বুঝতে ভুল হয়েছে।

হাসপাতাল থেকেই জেনে গিয়েছিলাম মণিময় ও অরিন্দম সাহার স্ত্রী হাসপাতালে যায় নি। চিকাগো থেকে ফিরেও একই কথা শুনেছি ডাঃ রুদ্রের কাছ থেকে।

—আবার নতুন করে নিষ্কলঙ্ক ক্যাকটাস-বাগান তৈরী করব ডাঃ নাহা। ভালোবাসা ও সুন্দরের সবুজ রক্ত তাদের শিরা-উপশিরায় বইবে।

দুঃখ-যন্ত্রণায় অরিন্দম সাহার মাথা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে।

অসত্যকাম

সমরেশ রায়

কল্যাণী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, চিনতে পারে না, রোদের তাপে লাল টকটকে মুখ, কপালের উপর এলোমেলো চুল, জোড়া ভ্রূ, ঘন, ছোট চোখ, ঘামে ভেজা জামা—পার্থ হাসে। কল্যাণীর গোল মুখ, কোঁকড়া চুল—ঘাড় অবধি, তির্যক চোখ, কল্যাণীকে পার্থ ঠিক চিনতে পারে। পার্থকে চিনতে না পেরে কল্যাণী বিব্রত হয়। চিবুকেব গড়নে, নাকে, হাসিতে, খুব চেনা একটা আদল—কল্যাণী ধরতে পারে না। কোথায় দেখেছে? এখানকার কেউ নয়, দুপুরের এই বোদে এখানে কেউ বের হয় না। বোদে যেন চারদিক পুড়ছে। বাড়ি খালি, পরিতোষ ট্যুরে, পলা স্কুলে। কল্যাণী বুঝতে পারে না কী করবে।

আপনি? কল্যাণী একটু হাসে।

আমি কল্যাণী মুখোপাধ্যায়কে—

আমিই। আপনাকে তো—

কল্যাণী একটা নমস্কার আশা করে। পার্থ রুমালে মুখ মোছে।

কাল সন্ধেবেলা এসেছিলাম।

ও আপনিই? রোববার ও সময়ে আমি তো থাকি না।

এসে শুনলাম। গান শেখানোর ওখানেও গিয়েছিলাম, তখন আপনি চলে এসেছেন।

ও, তাই?

অত রাতে এত দূরে আব আসি নি।

ও।

কল্যাণী স্থির করতে পারছে না, ছেলেটিকে ভেতরে আনবে কি না। এই দুপুর রোদে, শহরের এক প্রান্তের এই হাউসিং এস্টেটে এসেছে, নিশ্চয়ই জরুরি কাজ। শেষ-কৈশোর প্রথম যৌবনের নরম দাড়ি ভরা মুখের দিকে তাকাতেই, পার্থ নিষ্পাপ হাসে। কল্যাণী একপাশে সরে যায়।

ভেতরে আসুন।

কল্যাণী বসার ঘরের পরদা তোলে, জানলা-দরজা বন্ধ, কেমন আবছা অন্ধকার; পার্থ বড় সোফায় বসে। ফ্যান চালিয়ে কল্যাণী ব্যালকনির দরজা খুলে দেয়।

এটা খুলব?

আমি খুলছি—কল্যাণী এগোনোর আগেই পার্থর হাতের ধাক্কায় জানলার পাল্লা খুলে যায়। ঘাড় ঘোরানোয়, কথায়, হাসিতে, খুব চেনা একটা ছবি তৈরি হতে হতে ভেঙে যায়। কল্যাণী বিরক্ত হয়।

আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।

পার্থর মাথার কাছে জানলা। বাঁদিকে ব্যালকনির দরজা। বাঁদিকের দেয়াল জোড়া বইয়ের আলমারি; ডানদিকে নিচু চৌকির উপর হারমোনিয়ামের বাক্স; ঘরে ঢোকার দরজার

কোণে কাঠের র‍্যাকে তানপুরা ঝুলছে, নীচে তবলা, সেন্টার টেবিলের উপরে, চৌকিতে, সামনের ছোট সোফায়, সোফার মাথায় অসংখ্য বই, পত্রপত্রিকা।

আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে কল্যাণী যখন ঘরে ঢোকে পার্থ আলমারির বই দেখছে; কল্যাণী ছোট সোফায় বসে, পার্থ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। হাসে। সোফায় বসে।

আপনি মুখে-চোখে একটু জল দেবেন?

না, ঠিক আছে।

রোদ যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে, খুব ঘেমেছেন—

হ্যাঁ কোনো রিকশা এল না, হেঁটে এলাম তো—

কোথা থেকে এলেন?

স্টেশন।

হেঁটে? স্টেশন থেকে? সান স্ট্রোক হতে পারত। এগারোটার পর আমরা বাইরে যাই না। রাস্তায় লোকজন কম। এদিকটা বোধহয় শহর থেকে একটু দূরেও; আমাকে আসতেই হল?

কল্যাণী অনুমান করতে চেষ্টা করে কেন এই সদ্য কৈশোর পেরনো যুবকটি, এই রোদে তিন মাইল হেঁটে তার কাছে এসেছে।

সকালে এলেন না কেন?

ভাবলাম ব্যস্ত থাকবেন, কথা বলা যাবে না।

কী কথা বলতে চায় ছেলেটি? এখনো নাম বলেনি।

বিকেলে এলেই হোত—

যদি না পাই—কালকের মতো। আমাকে রাতের গাড়ি ধরতে হবে।

কল্যাণী বুঝতে পারে না কী বলবে , পার্থ দু-হাঁটুতে কনুই রাখে, হাতের মুঠোয় থুতনি; একটু ঝুঁকে আসে; চেনা, ভীষণ চেনা এই বসার ভঙ্গি, ছেলেটি কথা বলার আগেই কল্যাণী চিনে ফেলতে চায়। পারে না। মনে মনে রেগে যায়।

আমার নাম পার্থ, পার্থ চৌধুরি—

কোন পার্থ? কোথাকার? চিনতে না পেরেও হাসি হাসি মুখে চেনার ভান করে ;

আমি তনু, আমার বাবা মনোজ চৌধুরী—পার্থ আর একটু সামনে ঝোঁকে। পার্থর গলার স্বর খুব শান্ত।

কল্যাণীর সামনে ঘরটা দুলে ওঠে। তেরো-চোদ্দ বছরের ওপার থেকে তনু উঠে আসে; সারা শরীর আলগা হয়ে যায় ; একটা অস্ফুট চিৎকার করেই মুখে হাত চাপা দেয়, উঠে দাঁড়িয়ে পার্থর দিকে এক পা এগোয়, ধপ করে আবার বসে পড়ে। পার্থ একদৃষ্টিতে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে থাকে। একটুও নড়ে না।

পাঁচ-ছয় বছর বয়সে দেখা কল্যাণীর একটা আবছা আদল তার মনে আঁকা আছে। কল্যাণী সে রকম নয়। আসলে পার্থর মনের কল্যাণী, অনেকটাই তার মনগড়া; এই তেরো-চোদ্দ বছর ধরে সেটাই তার কাছে সত্য হয়ে উঠেছে।

কল্যাণী হঠাৎ শব্দ করে কেঁদে ওঠে। সামনের দিকে নুয়ে পড়ে যেন নিজের কোলে মুখ লুকোবে। পার্থ বিব্রত হাসে। কী করবে বুঝতে পারে না। কল্যাণী ফুলে ফুলে কাঁদে। একসময় থামে। সোজা হয়।

তুমি একটু বসো, আমি আসছি—

সোফা থেকে উঠে, দরজার পাল্লা ধরে একটু দাঁড়িয়ে, বেরিয়ে যায়।

পার্থর হিসেব গোলমাল হয়ে যায় ; এই সাক্ষাৎকারের জন্য সে অনেকদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়েছে। মাস পাঁচ-ছয় ধরে খুঁজে কল্যাণীর এই ঠিকানা পেয়েছে। কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হলে কী বলবে, কেমন করে বলবে, তা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। কল্যাণীর আচরণ অনুমান করতে পারে নি। কল্যাণীকে তো প্রায় চেনেই না। নানাজনের কাছ থেকে শুনে সে যেমন অনুমান করেছিল, কল্যাণীর প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তা মিলল না। কল্যাণী এমন ভেঙে পড়বে পার্থ ভাবে নি। পার্থ একটা পত্রিকা তুলে নেয়।

কল্যাণীর ঘরে আসা পার্থ বুঝতে পারে নি।

তুমি এখানে এসেছ তোমার বাবা জানেন?

কল্যাণীর গলা সামান্য ভাঙা। পার্থ চমকে যায়।

না।

না বলেই এসেছ?

সব কাজে সবার অনুমতি নেবার বয়স আমার পেরিয়ে গেছে।

পার্থর গলা রুক্ষ হয়ে যায়।

তুমি এ ঠিকানা পেলে কী করে?

পেলাম—পার্থ নিরাসক্ত উত্তর দেয়।

কেউ তো জানে না, তাই , কী করে পেলে?

চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়—

পার্থ অন্যমনস্ক হয়ে যায। এ খোঁজার অভিজ্ঞতা খুব সুখের নয়।

বলবে না?

সে অনেক কথা, আপনার শোনবার মতো নয়। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম।

পার্থ হাসে।

তুই কেন এলি তনু, কেন?—হঠাৎ কল্যাণী চিৎকার করে ওঠে, গলা বিকৃত হয়ে যায়— এতদিন পর তুই কেন এলি? —কল্যাণী হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। পার্থ বিরক্ত হয়; কান্নাকাটি তার ভালো লাগে না। সে একা-একা বড় হয়েছে। তাই একটু নিস্পৃহ। কল্যাণীর সম্পর্কে তার ধারণাটা বদলে যাচ্ছে। সহজ হতে তার সময় লাগে। কল্যাণীর মুখে 'তনু' 'তুই' কেমন গায়ে পড়া মনে হয়, ভালো লাগে না।

আপনি আমাকে পার্থ বলে ডাকবেন।

কিছু না ভেবেই পার্থ বলে ফেলে; কল্যাণী এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসে। চোখের জলে মুখ ভেজা। জলভরা চোখে বিস্ময়। আঁচলে মুখ মোছে।

কেন?

এমনি; ঠামা আমাকে তনু ডাকতেন, বড়মা ডাকেন; আর কেউ ও নামে ডাকলে অস্বস্তি হয়।

তোমার বাবা কী বলে ডাকেন?

আপনি চলে আসার আগে যা বলে ডাকতেন।

পার্থ মজা করে বলতে চায়, কিন্তু কণ্ঠস্বরের ব্যঙ্গ চাপা থাকে না। পার্থর কথার নিস্পৃহতায়, বিদ্রূপে কল্যাণী মনে মনে চমকে ওঠে। পার্থকে কি ওর বাবা পাঠিয়েছে? প্রতিশোধ নিতে?

কেন এসেছ, কে পাঠিয়েছে তোমাকে?

কে পাঠাবে? কেউ না, আমি নিজে এসেছি।

কেন, কেন এসেছ?

জবাবদিহি কিন্তু আপনার দেবার কথা, আমার নয়।

তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

আমি কোনো সম্পর্ক পাতাতে আসি নি ; কার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আছে বা নেই, সে ব্যাপারে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আমার কিছু জানার আছে।

পার্থর গলায় কোনো উত্তেজনা নেই। কথায় ব্যস্ততা নেই। কেমন নিস্পৃহ-নিরাসক্ত। কল্যাণী বিস্মিত হয়; কেমন বয়স্কর মতো কথা বলছে; যেন কোনো কৌতূহলও নেই।

আমাকে একগ্লাশ জল দেবেন?

এতক্ষণে মনে হল বুক পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। কল্যাণী তাড়াতাড়ি উঠে যায়। জলের গ্লাশ, মিস্টির প্লেট টেবিলে রেখে চৌকিতে বসে। জলের গ্লাশ তুলে এক চুমুকে শেষ করে, পার্থ নিশ্বাস ফেলে।

মিষ্টিটা।

ঠিক আছে।

দুজনেই চুপ করে থাকে। পার্থ পকেট থেকে সিগারেট বের করে।

কিছু মনে করবেন না।

কল্যাণী ভুরু কোঁচকায়। পার্থ কি তাকে অপমান করতে এসেছে? ততক্ষণে পার্থ সিগারেট ধরিয়ে ফেলে, পোড়াকাঠি হাতে এদিক ওদিক তাকায়, উঠে আলমারির উপর থেকে অ্যাশট্রে নিয়ে আসে।

তুমি কেন এসেছ?

এই অনিশ্চয়তা কল্যাণী সহ্য করতে পাবে না। উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

আপনি কোনোদিন ভাবেন নি আমি এভাবে এসে যাব?

কল্যাণী চুপ করে থাকে।

আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন, বলেছি তো আমার কিছু জানার আছে।

কী জানতে চাও তুমি?

আপনি জানেন না আমি কী জানতে চাই?

পার্থ সামনে ঝুঁকে আসে।

সে সব জেনে তোমার কী হবে?

বাহ্ বাহ্! চমৎকার! পার্থ হো হো করে হেসে ওঠে।

তুমি হাসছ কেন?

হাসব না? পার্থ হাসি হাসি মুখে কল্যাণীর দিকে তাকায়—আমার যে হাসি পাচ্ছে!

কেন?

আপনারা আমাকে নিয়ে খেলা খেলবেন, আর আমি কিছু জানব না?

কী হবে জেনে?

পার্থ ব্যালকনির দরজা দিয়ে বাইরে তাকায়। রোদে আগুন ঝরছে।

আমার জানতে ইচ্ছে করে।

তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারতে।

সেটা তো বাবার গল্প, বাবার কাহিনী হোত ; আমি আপনারটা জানতে এসেছি।

শুধু এই জানতেই এসেছ?

পার্থ সোফার উপর ঘাড় এলিয়ে, সামনে পা ছড়িয়ে দেয়। ফ্যানের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে।

আরো কিছু কি জানার আছে? কি জানি। আমি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসি নি।

পার্থ যেন অনিশ্চিত। কল্যাণী বুঝতে পারে পার্থ অনেকটাই জানে। তাকে বলতেও হবে, কিন্তু পার্থ কী করে এখানকার—এই আধা গঞ্জ-আধা শহরের ঠিকানা পেল, কেমন

করে এল, এটা জানার কৌতূহল তাকে পেয়ে বসে। পার্থকে দেখার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কেটে গেছে। কল্যাণী হিসেবি হয়ে ওঠে, এখানকার হদিশ কেমন করে পেল জানা গেলে, আসার উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। কল্যাণী নিশ্চিত হতে চায়।

তুমি এখানকার খবর পেলে কোথা থেকে?

বললাম যে, পেয়ে গেলাম।

কী করে পেলে?

পার্থ হাসে, হাসি মুখে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

শুনে আপনার কোনো লাভ হবে না; বলতে আমার আপত্তি নেই।

বলো।

আপনার সঙ্গে একবার দেখা করার ইচ্ছে আমার মাথায় ঢোকে, তখন আমি নাইন-টাইনে পড়ি।

এখন কী পড়?

কলেজে।

কী নিয়ে, সায়েন্স না আর্টস?

বাদ দিন। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আপনার ঠিকানা উনি জানেন না। বাবার বাক্সপ্যাঁটরা ঘেটে, আপনাদের পুরোনো প্রেমপত্রটত্র দেখেছি। কিন্তু হালের হদিশ পাই নি। ঠামা মারা গেলেন, কয়েক মাসের মধ্যে জেঠুরা অন্য বাড়িতে উঠে গেলেন।

ওঁরা এখন কোথায় থাকেন।

এদিকে আমার পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেল, বাড়িতে গার্জেন-টার্জেনও নেই, চলে গেলাম আপনার বাবার বাড়িতে।

কোথায়? রাঁচিতে? কেন?

ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে ওঁদের হয়তো যোগাযোগ আছে। বাড়িতেই ঢুকতে দিল না। পরিচয় পেয়ে আপনার বাবা আমাকে জারজ বললেন, আপনার মা—থাকগে—

সে কি? দিদি—

ওঁরা জানিয়ে দিলেন আপনার সঙ্গে ওঁদের কোনো সম্পর্ক নেই; ওঁদের চোখে আপনি মৃত।

পার্থ চুপ করে যায়।

শুনেছিলাম আপনার এক দাদা ওদিককার কোনো সাহেবি স্কুলে পড়ান। গেলাম। গিয়ে শুনি সরকারী চাকরি নিয়ে এখন পোট্যাটো ইনসপেক্টর। বাড়ি ফিরে এলাম।

পার্থ যেন মনে করে করে কথা বলছে। তার কথা বলায় কোনো ব্যস্ততা নেই, আবেগ নেই।

এবার পরিতোষবাবুর বাড়িতে খোঁজ করলাম। নিজের পরিচয় দিলাম না। পরিতোষবাবুর দাদা জানিয়ে দিলেন তার ভাই ব্যাঙ্কের সোনার চাকরি ছেড়ে, এক খারাপ মেয়েমানুষকে নিয়ে কোথায় পালিয়েছে তিনি জানেন না। ওঁর কাছে আমি ব্যাঙ্কের আর ব্রাঞ্চের নাম পেয়ে গেলাম।

তুমি এত কাণ্ড করেছ? কল্যাণী অনিশ্চিত হয়ে যায়, পার্থর আসার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না।

সেই ব্রাঞ্চে চলে গেলাম। পরিতোষবাবুর এক বন্ধুর দেখা পেয়ে যাই। ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে যে স্কুলে উনি কাজ নিয়েছিলেন, সেই স্কুলের হদিশ পেয়ে সেখানে চলে গেলাম।

সেখানে? সে তো—

হ্যাঁ গ্রামস্য গ্রাম। সেই স্কুলেই জানতে পারলাম পরিতোষবাবু পরীক্ষা দিয়ে সরকারি চাকরি নিয়েছেন। মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলাম। হেড মাস্টারমশায় পুরোনো ফাইল খুলে,

পরিতোষবাবুর সরকারি চাকরি ডিপার্টমেন্টও বলে দিয়েছিলেন। তারপর খুঁজতে আর অসুবিধে কি? যতদূরেই যান, রাইটার্স-ই তো হোল অফিস।

পার্থ হাসে।

এত ঘুরে ঘুরে আমাকে খুঁজে? কেন?

শুধু এটুকু জানতে ভালোবেসে বিয়ে করা স্বামীকে ছেড়ে, পাঁচ বছরের ছেলেকে ফেলে, পরিতোষবাবুর সঙ্গে চলে এসেছিলেন কেন?

পার্থর কথায় একটা তীব্রতা এসে যায়।

তুমি বুঝবে না।

বাজে কথা বলবেন না। আমার এখন যে বয়স সে বয়সে আপনি বিয়ে করেছেন। আমি কী বুঝি না বুঝি আপনি জানেন না—

তোমার বাবার সঙ্গে আমার বনিবনা হয় নি, চলে এসেছি।

আপনি খুব স্পষ্ট কথা বলেন তো! বনিবনা হল না কেন?

হল না—

কেন হল না সেটাই তো জানবার।

সে কি অত ব্যাখ্যা করে বলা যায়।

চেষ্টা করলে যায়।

কী হবে চেষ্টা করে।

আপনার জবাবদিহির দায় নেই? পাঁচ বছরের একটা শিশুকে ছেড়ে আসার দায়?

আমি তোমাকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, তোমার বাবা দেয় নি।

বাবার সম্মতি নিয়েই তো আপনি সব কাজ করেছেন।

মানে?

এই পরিতোষবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা, ওঁর সঙ্গে চলে আসার পরিকল্পনা করা, চলে আসা, সব বাবার অনুমতি নিয়েই করেছিলেন।

তুমি কী বলতে চাও?

কবে আমাকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন? কবে? চলে আসার সময় আমার কথা মনে ছিল না? তিনমাস পরে হঠাৎ আমার জন্য আপনার মাতৃস্নেহের বন্যা বয়েছিল কেন? স্বামী ছেড়ে চলে আসতে পারলেন, সঙ্গে ছেলেটাকে আনতে পারলেন না?

তোমার বাবা তাহলে কেলেঙ্কারি বাধাত।

বাধালে বাধাত! কী করত? পুলিশে যেত? আপনি কোর্টে দাঁড়িয়ে বলতে পারতেন না, এ আমার ছেলে, আমি গর্ভে ধরেছি, তাই নিয়ে এসেছি? বানিয়ে বানিয়ে বলবেন না।

আমি বানিয়ে বলছি?

হ্যাঁ, বানাচ্ছেন। পরিতোষবাবুর শর্ত ছিল আপনাকে এক কাপড়ে চলে আসতে হবে, কিচ্ছু সঙ্গে আনতে পারবেন না, আমাকেও না।

কে? কে বলেছে এ কথা? মিথ্যে, মিথ্যে কথা।

কল্যাণী উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে।

কেউ বলে নি ; কেউ না বললে জানা যায় না? পাঁচ বছরের ছেলের তো অনেক ভার।

না, সে এমন কথা বলে নি, কোনো শর্ত দেয় নি, পরিতোষ তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসত।

বাবা পরিতোষবাবুর বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেন নি, আপনার বিরুদ্ধেও না। নিতে চান নি।

নেবার মুখ ছিল না তাই নেয় নি।

মুখ ছিল কি ছিল না, সে আপনারা জানেন। আইনের অধিকার তো ছিল!

নিলেই পারত, নেয়নি কেন?

সে উত্তর দেবার দায় আমার নয় ; আমি শুধু আমার কথা জানতে চাই।

কী কথা?

আমাকে সঙ্গে আনেননি কেন? নিজের সুখের জন্য পাঁচ বছরের একটা শিশুকে ফেলে এলেন কেন?

সুখের জন্য, কী বলছ তুমি—

কল্যাণীর গলা ভেঙে যায়—ওই গণ্ডগ্রাম থেকে কলকাতায় ছুটে ছুটে যাইনি তোমাকে দেখতে?

সে তো তিনমাস বাদে। বাদ দিন ; আমাকে ফেলে এসেছিলেন কেন?

আমি বলেছি, ছেড়ে আসতে চাইনি।

তবু তো এসেছেন।

আসতে বাধ্য হয়েছি।

এই বাধ্য হওয়ার গল্পটাই আমি জানতে চাইছি।

গল্প?

আমার কাছে ওটা গল্পই।

শুধু গল্প শুনতে এসেছ এত কাণ্ড করে।

হ্যাঁ এসেছি। এ গল্পে আমার একটা জায়গা আছে। ছোট্ট জায়গা। সেই জায়গাটা আমি জানতে চাই।

এ শুনে তোমার কোনো লাভ নেই।

দেখুন এ বয়সে আমি অনেক কিছু দেখেছি, জেনেছি, যা আরো কিছু পরে জানলেও ক্ষতি ছিল না। ঠাকুমাকে মরে যেতে দেখেছি, প্রায় বিনা চিকিৎসায়; দু-দুটো দেড়-দুই হাজারি ছেলে থাকতেও বড়মা-জেঠুকে পৃথক হয়ে যেতে দেখেছি ; সম্পত্তি নিয়ে কুৎসিত ঝগড়া শুনেছি। বাবার ক্লীবত্ব দেখেছি, স্বার্থপরতা দেখেছি, কর্তব্য দেখেছি ; আমার লাভালাভের বিচার আপনাকে করতে হবে না। পার্থ দাড়িতে হাত বোলাতে স্থির নিস্পৃহ, প্রায় নৈর্ব্যক্তিক গলায়, কল্যাণীর চোখে চোখ রেখে কথা বলে। পার্থর উত্তেজনাহীন কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গিতে কল্যাণীর হঠাৎ যেন শীত লাগে। গায়ে কাঁটা দেয়।

আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী জানতে চাও। এমন কথা বা ঘটনা তো নয় ; অনেকদিনের নানান ঘটনা-কথা-ঝগড়া-অপমান মিলেই তো এমন হয়।

আমি সে সব জানতে চাই।

আমাদের বিয়ে হয়েছিল আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি।

ও আমি জানি, আরো পরের কথা বলুন।

পরিতোষ ওর বন্ধু ছিল। খুব বন্ধু। রোজ বাড়িতে আসত। জানো ছোটবেলা থেকে আমার গান শেখার খুব ইচ্ছে ছিল। বিয়ের পর ও আমাকে একটা নামী স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিল। সপ্তাহে একদিন ও আমাকে প্রথম প্রথম রেখে আসত। তুমি হবার পর এই গান শেখা নিয়ে চরম অশান্তি শুরু হল। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তো গান শিখতে যাওয়া যায় না! বাড়িতে গানের অভ্যাস করা যেত না। ও-ও কেমন আমার কথা বুঝতে চাইত না, ও-ও চাইত আমি গান শেখা-গাওয়া বন্ধ করে দিই। আমারও কেমন জেদ চেপে গেল।

ও, শুরু থেকেই আমি নাটের গুরু?

না, শুধু তাই না, আরো অনেক ব্যাপার আছে.

হয়তো আছে, কিন্তু আমিও আছি।

এই সময় পরিতোষ আমাকে খুব সাহায্য করেছে। ওর সঙ্গে তর্ক করত। আমি গান শিখতে যেতাম। ও তোমাকে সামলাত।

শুধু গান শেখা নিয়ে এত ব্যাপার?

আসলে ও আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম।

আপনি পরিতোষবাবুর সঙ্গে দূরে সরছিলেন ; কিন্তু বাবা কোথায় যাচ্ছিল?

ও তখন রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

কে পরিতোষবাবু?

কেন, পরিতোষ কেন?

না, আপনি 'ও-ও' বলছেন তো, আমি ঠিক ধরতে পারি নি। বাবা তো আগেও রাজনীতি করত।

এ সে রাজনীতি না।

অথবা সে রাজনীতিরই এক্সটেনশন।

মানে?

ছেড়ে দিন, বলুন।

রাত দুপুরে আমাদের শোবার ঘরে কারা সব আসত। আমি চিনি না। তাদের কাছে আমি রক্তমাখা অস্ত্র দেখেছি। ঘরের মেঝেতে ঘুমিয়ে থাকত, ভোর হবার আগে চলে যেত। পরদিন জানতে পারতাম কেউ খুন হয়েছে। কোনো রাতে ওদের সঙ্গে তোমার বাবার সামান্য কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারতাম, এই ঘরে রাত কাটানো কেউ খুন হয়ে গেছে। আমার নাকে সব সময় রক্তের গন্ধ লেগে থাকত, সে এক দুঃসহ অবস্থা। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না, দম বন্ধ হয়ে আসত, রাতে ঘুম হত না। সে তুমি কল্পনা করতে পারবে না।

কল্যাণী চোখ বোজে।

তাই আপনি চলে এলেন?

তোমার বাবা আমার সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে যাচ্ছিল। ও কেমন করে যেন আমার দিকে তাকাত; আমি ভয় পেতাম। পরিতোষ আমাকে সাহস দিত, আমার সঙ্গে অনেক সময় কাটাত। পরিতোষ ছিল বলে আমি তখন বাঁচতে পেরেছিলাম।

আচ্ছা আপনারা তো ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। বাবা যখন দূরে সরে যাচ্ছিল, খুন জখমের রাজনীতি করছিল, তখন আপনি কিছু বলেননি?

ও আমার সঙ্গে রাজনীতির কথা বলত না! কোনো কথাই অবশ্য বলত না।

আপনার বাঁচার বড় সাধ, তাই না?

বাঁচার সাধ থাকবে না?

আচ্ছা বাবার জন্য আপনার চিন্তা হয় নি? বাবাকে ওই খুনোখুনির মধ্যে রেখে আপনি বাঁচার জন্য পালালেন? বাবা তো খুন হয়ে যেতে পারত! আশ্চর্য আপনাদের ভালোবাসা। আমি মানেই বুঝি না!

তোমার বাবার সঙ্গে বাস করা যায় না। তুমি বুঝবে না, তোমাকে বলতে পারব না। ওর মধ্যে কোনো কোমল ব্যাপার নেই, হি ইজ এ ব্রুট।

কল্যাণী হঠাৎ উত্তেজিত হয়। হাঁফায়।

তাই? আগে বোঝেন নি? বিয়ের আগে?

না, বুঝি নি, বুঝলে বিয়ে করতাম না।

পরিতোষবাবুর সঙ্গে পরিচয় না হলে বুঝতেন? তখনই বুঝলেন আমার বাবা ক্রুট-পশু-স্যাডিস্ট।

পাঁচ-ছ-বছর সব অত্যাচার সহ্য করেছি, ভেবেছি সময়ে ঠিক হয়ে যাবে; হয় নি।

তাই সব ছেড়ে, স্বামীকে মৃত্যুর মুখে রেখে, সন্তানকে ফেলে ভেসে পড়লেন? তারপর?

ও একদিন পরিতোষকে যাচ্ছেতাই অপমান করল, বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম, আমাকে কুৎসিত গালাগাল দিল। তখন তো আমাদের কোনো উপায় ছিল না! ওখানে আমি মরে যেতাম।

আপনার যুক্তিগুলো খুব সাজানো।

আমার সম্মান নেই?

নিশ্চয়ই আছে। অসম্মান নিয়ে থাকবেন কেন?

তুমি বুঝবে না প্রতি মুহূর্তের অপমানের জ্বালা।

তা হয়তো পারব না। পরিতোষবাবু নিশ্চয়ই পারেন?

মানে?

আপনার অপমানের জ্বালা না বুঝলে আপনাকে উদ্ধার করবেন কেন?

তুমি কী বলতে চাইছ?

আপনি নিজের মান সম্মান সম্পর্কে খুব সচেতন। কিন্তু অন্যের মান-সম্মান নিয়ে মাথা ঘামান?

আমি জ্ঞানত কাউকে অসম্মান করি না।

চুপ করুন, আপনি চুপ করুন—পার্থ চাপা গলায় হিসিয়ে ওঠে—পাঁচ বছর বয়স থেকে যে অসম্মান নিয়ে বড় হয়েছি, তা কে দিয়েছে? যার মা অন্য পুরুষের সঙ্গে চলে গেছে, পাড়ায়-বাড়িতে-স্কুলে সে ছেলেটির অবস্থা আপনি অনুমান করতে পারেন? আত্মীয়স্বজনের সহানুভূতির জ্বালা আপনি বোঝেন। বোঝেন শৈশবে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা? অপমান! সম্মান! ও সব তত্ত্বকথা আওড়াবেন না।

পার্থর চাপা গলায় বলা কথার তীব্রতায় কল্যাণী থতমত খেয়ে যায়। কেমন অসহায় লাগে। পার্থ একটু সময় চুপ করে থাকে।

দেখুন আপনাদের বড় বড় তাত্ত্বিকবুলি আমি বুঝি না। বউ বন্ধুর সঙ্গে পালিয়েছে। একজন বয়স্ক পুরুষ, সেই পালানো বউয়ের ধ্যান করে গেল। ছেলেকে আটকে রাখল। সে এই তপস্যার টোপ। স্বামীর টানে না আসলে ছেলের টানে আসবেই। আপনারা সবাই স্বার্থপর।

তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?

আপনাদের ইনটেলেকচুয়াল মনান্তরের কোনো মূল্য নেই—আমার কাছে নেই। স্থূলতাকে আপনারা তত্ত্বের প্রলেপ দিতে চান। ও প্রলেপে আমি বিশ্বাস করি না। অন্যাকে অভিযুক্ত করে নিজের সাফাই গান কেন?

আমাকে অপমান কোরো না।

এই পনেরো বছর ধরে আপনারা আমাকে অপমান করেন নি? কারো কাছে মায়ের গল্প করতে না পারার যন্ত্রণা আপনি বোঝেন? চলে গিয়েও, আমার নার্সারি স্কুলের সামনে আপনি নাটক করেছেন, আর আমাকে একের পর এক স্কুল পালটাতে হয়েছে। আমার শৈশবের কোনো বন্ধু নেই, আপনারা আমার শৈশবকে ধ্বংস করেছেন। একটা বউ-পালানো পুরুষের ছেলে হওয়ার যন্ত্রণা আপনি বোঝেন?

তোমাকে একবার দেখতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা শুধু নাটক?

তবে কি সন্তান-স্নেহ? ছেলের জন্য আকুলতা?

তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করছ?

একশোবার। পাঁচ-ছমাস পরেই আর কোনো খোঁজ করেন নি কেন? স্নেহ-ভালোবাসা-চোখের দেখা সব ওর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল?

বিশ্বাস করো আমি তখন—

চুপ করুন, আপনি চুপ করুন। পার্থ যেন গর্জে ওঠে। কল্যাণী কোলের ওপর হাত জড়ো করে বসে থাকে। স্থির। দুচোখ দিয়ে জল পড়ে।

আপনারা নিজেকে ছাড়া কাউকে বোঝেন না। নিজের মান-সম্মান—নিজের স্বার্থ—নিজের সুখ। সেখানে আমাদের কোনো জায়গা নেই।

বলো না, এ কথা বলতে নেই—কল্যাণী ফিসফিস করে।

কেন? বলতে নেই কেন? পার্থ এক ঝটকায় এগিয়ে আসে। দুহাতে সেন্টার টেবিলের ধার আঁচড়ে ধরে। —আপনি নিজেকে ফাঁকি দেন না। খুব তো 'পরিতোষ' 'পরিতোষ' করছেন, একবারও তো মনোজ বললেন না। বিয়ে করা স্বামী বলে? এখনো ডিভোর্স হয় নি বলে?

পার্থ হিসহিস করে।

আপনি তো বেশ সুখেই আছেন। আপনার গান আছে, মেয়ে আছে, পরিতোষবাবু আছেন, বই আছে, সুখ-স্বস্তি ভালোবাসা, সব আছে। আমার কী আছে? কী নিয়ে বাঁচব আমি? কোনো মেয়ের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করতে পারি না, যদি মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে, আমি কি উত্তর দেব? আপনাদের জন্য আমি কেন পালাব? কেন?

পার্থ চিৎকার করে ওঠে।

আস্তে কথা বলো প্লিজ! কল্যাণী উঠে ব্যালকনিতে যায়। পলার আসাব সময় হয়েছে।

সরি। আমি আস্তেই কথা বলি। হঠাৎ গলা চড়ে গেছে। কল্যাণী এসে সোফায় বসে।

আপনার ভয় নেই ; আমি ক্রিমিন্যাল নই। আপনার কোনো ক্ষতি আমি করতে আসি নি। আপনি ভাববেন না, আমি এখুনি চলে যাব। আপনার মেয়ের ফেরার সময় হয়েছে; আপনাকে বিব্রত করব না। ওর কাছে দেবার মতো আমার কোনো পরিচয় তো আপনার জানা নেই! পার্থ সিগারেট ধরায়; দাঁড়ায়। টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট-দেশলাই পকেটে রাখে; অ্যাশট্রে আলমারির মাথায়। কল্যাণী চুপ করে বসে থাকে। পার্থ বাইরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জুতো পরে। কল্যাণী ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। চোখের জল শুকিয়ে গেছে। পার্থ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়, দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে, কল্যাণীর মুখোমুখি।

দেখুন আমি ভেবেছিলাম আপনি সত্য কথা বলবেন—বলেননি। আপনি আমার বাবার উপর সব দায় চাপিয়ে দিলেন। কাকে ফাঁকি দিলেন? আমাকে, না নিজেকে? আমি কিন্তু জানি পরিতোষবাবুর সন্তান গর্ভে নিয়ে, আপনার না চলে এসে উপায় ছিল না।

কল্যাণী অস্ফুটে আর্তনাদ করে ওঠে, দেয়ালে হেলান দেয়। পা থেকে সব শক্তি চলে গেছে।

আমি খারাপ হয়ে যেতে পারতাম। হইনি। সুযোগ ছিল, প্রলোভনও ছিল। গাঁজা-মদ-হাসিস-এল এস ডি-মেয়েছেলে। সিগারেট ছাড়া কোনোদিন কোনো নেশা করিনি। খারাপ কাজ করিনি। আপনার বাবা আমাকে জারজ বলেছেন। আমি হয়তো তাই, আপনাদের ভালোবাসাহীন সঙ্গমের সন্তান। আমি কিন্তু আপনার কাছে নিষ্পাপ আসতে চেয়েছিলাম; এসেছি।

পার্থ দরজা খুলে দেয়। জামার হাতায় মুখ মোছে। পেছনে না তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যায়। কল্যাণী একহাতে দরজার পাল্লা ধরে, মূর্তি হয়ে যায়।

জন্ম কিংবা মৃত্যুর অপেক্ষায়

সুকান্তি দত্ত

মরা রোদ, নষ্ট শীতে
ঝরে গেছে কলরব
ডানা ভেঙে
নতজানু হতে হতে
শব্দগুলো ক্রমাগত ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়
বর্ণহীন গন্ধহীন ....

দেওয়াল ঘেরা দশফুট-বাই বারোফুটে চিন্তামগ্ন সুমিত দলাপাকানো পিন্ডের মত হাঁটুর উপর মুখগুঁজে বসেছিল। অগষ্টের অসহ্য গুমোট কর্মব্যস্ত ফ্যানের ঠিক নীচে খাটের উপব একনাগাড়ে বহুক্ষণ সেঁটে থাকা পিণ্ডটির দিকে বারকয়েক তাকিয়ে অবশেষে স্বাতী মুখ খোলে, "বিছানা—টিছানা করতে হবে না? ওঠো, ওঠো অনেক রাত হল —" তীব্র হুইশিলের শব্দভেদী বানে চরাচর ছিন্ন ভিন্ন করে এ রাতের শেষ ট্রেন চলে যায়, বেশ কয়েক সেকেন্ড তার তারস্বর আওয়াজের রেশ শহরতলীর রাতের নিস্তব্ধতাকে বিপন্ন বিপর্যস্ত করে তোলে। সুমিত উঠে দাঁড়ায়, কয়েক পা হেঁটে ঘরের কোণে দরজার পাশে ষ্টীলের চেয়ারে বসে।

সারাদিনের ব্যবহৃত চাদর তুলে বিছানায় নতুন চাদর পাততে পাততে স্বাতী আবেকবার তাকিয়ে নেয় তার স্বামীর দিকে, সুমিতের বিষন্নতার ওজনটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে। চাদর পেতে, বালিশ দুটো একদিকে রেখে তার উল্টোদিকে গায়ে দেবার চাদরটা পরিপাটি ভাঁজ করে রাখে।

ড্যাম্পপড়া বিবর্ণ দেওয়ালটাকে মোটা কালো তারের ইলেকট্রিকাল ওয়ারিং লাইন ভাগ করে দিয়ে গেছে। সুমিতের দৃষ্টি সেই ভাগাভাগির ডানধারে দুটো টিকটিকির লেপটে থাকাব দৃশ্যে যেন আটকে থাকে। স্বাতী মশারি গুঁজতে গুঁজতে বলে, "যা হওয়ার তা তো হয়ে গিয়েছে, কি করা যাবে? এখন আর ওসব ভেবে লাভ কি?" এতক্ষণে সুমিত যেন একটু সচল হয়, টেবিলে পড়ে থাকা সোনালী রঙের লাইটারটা হাতের আঙুলে নিয়ে খেলা করে।

আজ অফিস থেকে ফিরতেই স্বাতী মাথা নীচু করে খবরটা দিয়েছিল, ইউরিন রিপোর্টে প্রেগন্যান্সি কনফর্ম হয়েছে, বিকেলেই স্বাতী ডাঃ অদিতি বসুকে দেখিয়ে এসেছে, এখন দুমাস চলছে। স্বাতী কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে উগরে দিয়ে অনেকক্ষণ কোন উত্তর না পেয়ে ত্রস্ত হরিণীর মত মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেছিল সুমিতের মুখের প্রতিটি বিন্দুতে তখন পৌষের গাঢ় হিম, পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বস্তুটা কে যেন তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে।

সুমিতের চায়ের প্যাকিং বাক্স সাপ্লাইয়ের ব্যবসা, মানিকতলায় নিজের অফিস। পৈতৃক ব্যবসা, বাবা মারা যাবার পর দুই ভাই ভাগ করে নিয়েছে। বিয়ে করেছে বছর দেড়েক। সে বলেছিল, সংসারে নতুন অংশীদার অন্ততঃ বছর পাঁচেকের আগে নয়। স্বাতী মানতে চায়

নি। সুমিত তখন বুঝিয়েছিল তার হিসেবী পরিকল্পনা—সাউথ ক্যালকাটায় কোথাও ফ্ল্যাট নেবে, বিজ্ঞাপনের ছবির মত ঝকঝক করবে তার মেঝে, সিলিং, দরজা, জানালা, প্রতিবেশীরা এখানকার মত হেঁজিপেঁজি নয়, ক্ষমতাবান, শিক্ষিত, মাঝেমধ্যে সন্ধ্যের পর বাড়িতে পার্টি হবে, এখানে তো এক বাড়িতে দুটো পার্টিশান, তার উপর মা থাকেন পাশের ঘরে, আরাম করে দুজনে মিলে একটু হুইস্কির ফুরফুরে হাওয়া উড়বে তার উপায় নেই। তার ফেনিল স্বপ্নের লম্বা তালিকায় আরও ছিল অন্ততঃ একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মারুতি, সবচেয়ে বড় দামী কালার টিভি, ভি. সি. আর, আর বছরে একবার উটি কিংবা কাঠমান্ডু—এইসব। মায়াবী মারীচের যাদুমায়ায় কুঁকড়ে যায় স্বাতীর মাতৃত্বের সলজ্জ আশা, সে নিজেও সুমিতের পরিকল্পিত এইসব দিনরাত্রির দূরাগত ধ্বনি মূর্চ্ছনায় বিহ্বল হয়ে যায়, তার অঙ্গে অঙ্গে দুলতে থাকে যেন দশহাজারি বালুচরী। সুমিত বলেছিল এই স্বপ্ন-কল্পনার সবটা পূরণ যদি নাও হয় তবু একদিন যে আসবে সেই ভাবী সন্তানকে শুধু দুধে-ভাতে রাখলেই তো আর চলবে না, ভালো স্কুলে দিতে হবে, জীবনপণ গড়ে দিতে হবে রেডরোডের মসৃণতায়, প্রশস্ত বাধাহীন গতিময় জীবন চাই তার আত্মজের, একুশ শতকের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে তাকে, তো এমনি এমনি হবে না, কে না জানে তার জন্যে চাই টাঁকশাল থেকে বেরিয়ে আসা অফুরন্ত পেট্রোলের আর সেই পেট্রোলকে ঘরে বরণ করে আনতে চাই আরো বেশি বেশি পরিশ্রম, মূল্যবোধ, সততা এইসব প্যানপ্যানানি ছেড়ে কঠোর নির্মম বাস্তববাদ আর অল্প কিছু সময়—পাঁচ বছর এমন কি আর! তাছাড়া স্বাতীই বা স্রেফ ঘরে বসে থাকবে কেন? সেও কিছু রোজগার করবে, সুমিত সব ভেবে রেখেছে। দু আঙুলের চাপে বন্দী ফড়িং-এর মত ছটপট করতে করতে অবশেষে কি এক তীব্র নেশায় স্বাতী মেনে নিয়েছিল সব—হৃদয়ে কোনও খাদ রাখে নি।

সতর্ক সাবধানী সুমিতের হিসেবের রেখা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল। বিয়ের চারমাসের মাথায় আর একটা ব্যবসা খুলল সে, স্বাতী আর্ট কলেজের ছাত্রী ছিল, ড্রয়িং-এর হাত চমৎকার, সারাদিন গয়নার ডিজাইন আঁকতো সে, সুমিত বড় মাপের গয়না এক্সপোর্টারদের কাছে সাপ্লাই করত সে সব, অল্প কয়েক মাসেই কিস্তিমাৎ, গণেশ দেবতার দাক্ষিণ্যের অভাব হয় নি একটুও।

কিন্তু হঠাৎই এক প্রবল উচ্ছ্বাসের ঢেউ দারুণ দাবদাহের পর কোনও এক বৃষ্টিমগ্ন রাতে তোলপাড় করে দিল সুমিতের যাবতীয় ডেবিট-ক্রেডিট। সে তবুও আশায় আশায় ছিল কয়েকদিন, সব বীজে তো আর গাছ জন্মায় না, কিন্তু এখন কি হবে? সন্তানের জন্ম, তার লালন-পালন করতে গিয়ে স্বাতী ব্যবসায় সময় দেবে কখন? শুধু ডিজাইনের ড্রয়িংই তো নয় পুরো ব্যবসায়ের অনেক পেপার ওয়ার্কস্‌ও তো সে সামলাতো, স্বাতীর সব কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে করাতে গেলে যা টাকা ব্যয় করতে হবে তাতে ব্যবসার লাভের গুড় পিঁপড়ে নয় বড় ছুঁচো এসে খেয়ে যাবে! তাছাড়া স্বাতী যত দ্রুত নিত্যনূতন চমৎকার সব ডিজাইন বানিয়ে তুলতে পারত—সবাইকে দিয়ে তো তা হবার নয়। বাবা হবার সম্ভাবনা দেখা দিতেই আশঙ্কায় যখন বুক কেঁপে উঠেছিল সুমিতের তখন স্বাতী বলেছিল, তুমি একটু আমার পাশে থাক, ঘরের কাজ—তার সময় কোথায়, সারাদিন কাজ আর কাজ, বিশ্রামহীন অবসরহীন দৌড় আর দৌড়। তাছাড়া তার বউ হয়ে স্বাতী সারাদিন ব্যবসায়ে থাকবে এমন কোনও পরিকল্পনা তো সুমিতের ছিল না, সে চেয়েছিল এই পাঁচটা বছর স্বাতী থাকুক ব্যবসায়ে, তারা দুজনে মিলে লক্ষ্মীর ঝাঁপি কিছুটা ভরিয়ে ফেলবে — তারপর স্বাতী মেয়েমানুষের যা কাজ তাই করবে। কিন্তু স্বাতী যেন এখন ব্যবসাটাও ছাড়তে চাইছে না

আবার ভাবী সন্তানকেও আঁকড়ে ধরতে চাইছে, সুমিতের হিসেবের খাতায় শুধুই কাটাকুটি, অস্পষ্ট দুর্বোধ্য রেখার ঘন জঙ্গল।

"এই যা হবার তা তো হয়ে গেছে —এখন নতুন যে আসছে তার কথা না হয় ভাব একটু, ছেলে না মেয়ে কি চাও তুমি?"

সুমিত দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের তলদেশ থেকে উঠে আসা ভয়ংকর প্রাণীর মত মাথা নাড়ে, "না, না — না, স্বাতী ...." স্বাতীর কণ্ঠে শিকল-শিঞ্জিনী ঝলমল করে ওঠে, "কি বলতে চাও তুমি?" সুমিতের দৃষ্টি শিকারী চিলের মত পাক খেয়ে স্থির হয়ে যায় স্বাতীর গর্ভস্থানে, 'আই প্রেফার অ্যাবরশন্'।

বৃষ্টি মগ্ন ভোরে সোনালী রূপালী ধান
কত গান ছিল একদিন
প্রসন্ন বাতাসে ছিল নরম হৃদয় ......

চাপা পড়া চাঁদ, রাত নিরালোক, হাওয়ার গ্রামে শুধু সময়ের টিকটিক শব্দ, স্বাতীর অপলক চোখ ধীরে ধীরে বাঙময় হয়, "তোমাকে কোনদিন গান গাইতে শুনিনি, দেড় বছরে এক কলি গানও গাওনি তুমি, তোমার কখনও গাইতে ইচ্ছা করে না?' সুমিতের দীর্ঘশ্বাসে মরুঝড় গর্জন করে, "আমি গান গাইতে ভুলে গেছি—"

—"কখনও কি গাইতে?"

সুমিতের চোখে ম্লান ফাল্গুন খেলা করে যায়, "গাইতাম স্বাতী, জান, তখন ক্লাস নাইনে পড়ি, স্কুলের এ্যানুয়াল ফাঙ্শানে গেয়েছিলাম "আলো আমার আলো ওগো' পূর্ণেন্দু স্যার শিখিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু নার্ভাস হয়ে হঠাৎ মাঝখানে দুটো লাইন ভুলে গিয়েছিলাম, সে যাই হোক —সবাই বলেছিল আমার গলাটা না কি খুব মিষ্টি! তারপর কতবার কতগান গেয়েছি, কলেজ ক্যান্টিনে টেবিল বাজিয়ে গাইতাম হেমন্তের সেই গানটা 'ওগো কাজল নয়না হরিণি .'

—"কোন হরিণীর প্রেমে পড়নি কোন দিন?"

"পড়িনি আবার, হাবুডুবু খেয়েছি — তবে আমার প্রেমে কেউ পড়েছিল কি না তার খবর পাই নি . "

"কোনদিন গভীর রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে ছাদে পায়চারি করতে করতে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে কালপুরুষ কিংবা সপ্তর্ষিমণ্ডল খুঁজতে খুঁজতে এই মহাবিশ্বের অপার রহস্যে অবাক হও তুমি? কিংবা নদীর পারে নির্জন কোন ঘাসের মাঠে একা একেবারে একা নদীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হয় তোমার?"

"আমি জানি না স্বাতী .... কিন্তু এখন এই মাঝরাতে কি লাভ বল এইসব কথায় কাজের কথা আড়াল করে?"

"লাভ ক্ষতি জানি না, তুমি তো জান আমি ছবি আঁকতাম, কত ছবি এঁকেছি, গাছ, ফুল, প্রকৃতি, মানুষ, সেই সব অকাজের ছবি আঁকতে এখনও ভুলিনি আমি — তোমার ফরমায়েসে কত কেজো ডিজাইনের ড্রয়িং করতে করতেও এক—আধটা অকাজ নিয়ে মেতে থাকা মানুষের পোর্ট্রেট আমি এঁকে ফেলি জান! দেখবে একবার?"

কণ্ঠস্বর গাঢ় স্বর
নিভে গিয়ে তারপর
নিজস্ব নিরালোকে একা একা
তারপর ....

সুমিত জাল বোনে, যুক্তির কথার হিসেবের জাল। সুমিত বোঝায় একটি অনাকাঙ্ক্ষিত জন্মের জন্যে তাদের দেড়বছর ধরে গড়ে তোলা একটা স্বপ্ন কিভাবে রুগ্ন হয়ে যাবে! এই দীর্ঘ সময় জুড়ে স্বাতী নিরুত্তর থাকে। সুমিত বলে, "দ্যাখো, এটা অগস্টের শেষ, মার্চে যদি সন্তান হয়—তা হলে তার স্কুলে ভর্তির সময় এই ধর এপ্রিল/ মে-তে সেশন, বয়েসের হিসাবে তখন তার তিন বছর একমাস / দুই মাস কিংবা পাঁচ বছর একমাস / দুইমাস হবে — যে ছেলেটা ধর পাঁচ বছর দশমাস বা এগারো মাস বয়েস নিয়ে ওর সঙ্গে কম্‌পিটিশানে নামবে, মেন্টাল ম্যাচিওরিটিতে সে ওর থেকে কিছুটা এগিয়ে থাকবে—ভাল স্কুলে ভর্তি হতে গেলে শুধু ডোনেশনের জোরে তো হবে না—তাই ভেবে দ্যাখো সন্তানের স্বার্থেই ...... মানে ......"

"তাকে হত্যা করা দরকার .....''। স্বাতী সুমিতের দীর্ঘ সংলাপ এইভাবেই দাঁড়ি টানে।

বাইরে গাঢ় থমথমে অন্ধকার সরীসৃপের মত রাত্রির গায়ে জড়িয়ে থাকে। বৃষ্টিহীন গুমোটের বিস্তৃতিতে হাঁসফাঁস করে যাবতীয় গাছ, ফুল, পাতা, লেভেল ক্রসিং-এর ধারের পুকুরের জলে শান্ত হয়ে থাকা ইতস্ততঃ কচুরিপানা, কংক্রিটের দেওয়াল রেললাইনের ঘন ইস্পাত, দক্ষিণের পুরোনো ঝাঁকড়া বটের তলায় বাসা বেঁধে থাকা নাম না জানা পাখির দঙ্গল, বারান্দাকে কড়া পাহারায় রাখা খয়েরি রঙের গ্রীল, ঘরের চেয়ার-টেবিল, আলনায় আংটায় ঝোলানো বেল্ট, পুষ্পহীন নিথর কৃষ্ণচূড়া - এইসব ও আরও অনেক কিছু।

স্বাতী টিউবলাইটের সুইচ অফ করে, সুমিতের চমৎকার স্বর ফালাফালা করে দেয় নীরবতা, "আলো নিভিওনা, কথা শেষ হয় নি ......"

"অন্ধকারে বলা যায় না কথা?"

"না ঘুম ছাড়া অন্য সময় অন্ধকার আমি সহ্য করতে পারি না ...... আলো জ্বালাও......"

"ঘুমোও তবে — আমি অন্ধকার ভালোবাসি, মায়ের গর্ভে সন্তানকে ঘিরে থাকে সেও তো অন্ধকার ......"

তারপর তারা দুইজন দুই পাশ ফিরে শুয়ে থাকে যার যার নিজস্ব অন্ধকারে — কোনও এক জন্ম কিংবা মৃত্যুর অপেক্ষায়।